

প্রফুল্ল চক্রবর্তী



বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

॥ প্রচ্ছদ ॥
সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

মূল্য : বারো টাকা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও জ্ঞানোদয় প্রেস (১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯) হইতে শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক মুদ্রিত।

৺শ্রীমন্ত চক্রবর্তী

পিতৃদেবের স্মরণে—

ভূমিকা

মানুষের উদ্ভব ও উদ্‌বর্তনের কাহিনী মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করেছি। বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়। কাহিনীটি আমি সাধারণ পাঠকদের জন্য বলতে চেয়েছি।

জীবনবিকাশের কাহিনীর বিস্তার ব্যাপক। প্রাণময় জগতের স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে নিত্যকাল ধরে অনন্তরূপে জীবনের খেলা চলছে। সেই অন্তহীন খেলার ইতিবৃত্ত জীবনবিকাশের কাহিনীর মধ্যে বিধৃত। মানুষের উদ্ভবের কাহিনী সেই অতি-বিচিত্র কাহিনীর একটি কথিকা মাত্র। তবে মানুষের উদ্ভবের কথা বলতে গেলে প্রাণবিকাশের কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে। আবার তার উদ্‌বর্তনের কথা-প্রসঙ্গে এসে পড়ে সংস্কৃতি-বিকাশের কথা। কেন না সংস্কৃতি সৃষ্টি করেই মানুষ জীবন-সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করেছে। এখানে তাই জৈবিক ক্রমবিকাশের গতিপথের খানিকটা আভাস যেমন দেওয়া হয়েছে তেমন আবার কালগত সীমারেখা টেনে সংস্কৃতি-বিকাশের কাহিনীকেও মোটামুটিভাবে লিখিত ইতিহাসের যুগের সূচনা অবধি সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়েছে।

কিন্তু এই আলোচনার কোনটাই বিস্তারিত বা পর্যাপ্ত নয়। জৈবিক ক্রমবিকাশের বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে বিকাশমান প্রাণশক্তির প্রগতির প্রধান পর্যায়গুলি ক্রমানুসারে বড়জোর চিহ্নিত করা হয়েছে বলা যেতে পারে। সংস্কৃতি-বিকাশের বিবরণ সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়। প্রাগৈতিহাসিক মানব-সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। যত কথা বলা হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে জৈবিক অভিব্যক্তি এবং

সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের মধ্যে প্রগতির যে ফলগুধারাটি চির-প্রবহমান সেই প্রগতির ধারাকে মূলসূত্র হিসাবে গ্রহণ করে আলোচনা করা হয়েছে বলে পাঠকের পক্ষে মোটামুটি একটা প্রাথমিক ধারণা গঠন করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

এই আলোচনার মধ্যে এমন কোন তত্ত্ব বা তথ্য নেই যা জীববিদ্যা, নৃবিদ্যা কিংবা পুরাবিদ্যার বিশেষজ্ঞ অথবা কৌতূহলী শিক্ষার্থীদের অজ্ঞাত। তাঁদের কেউ যদি নতুন তথ্যের খোঁজে এই বই পড়েন তাহলে নিরাশ হবেন বলেই আমার বিশ্বাস। তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার মত উপাদান এখানে নেই। আমি লিখেছি সাধারণ পাঠকের জন্য। সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখা হয়েছে বলে কোন বিষয়ের বিস্তারিত কিংবা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়নি। বাচনভঙ্গীও সেই কারণে যথাসম্ভব সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। জীববিজ্ঞান ও পুরাবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞেরা সচরাচর দুর্বোধ্য পারিভাষিক শব্দ এবং কটমট নাম ব্যবহার করে থাকেন। ওটা বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রচলিত রীতি। সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁদের বাচনভঙ্গীর তাৎপর্য সম্যক্ উপলব্ধি করা কঠিন। আমি সেই বাচনভঙ্গী যথাসম্ভব পরিহার করে বক্তব্য সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আলোচনা-প্রসঙ্গে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আমাদের ভাষার ভাণ্ডারে বৈজ্ঞানিক শব্দের যথাযথ পরিভাষার দৈন্য থাকা সত্ত্বেও যেসব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি তালিকা ইংরেজি প্রতিশব্দ সহ দেওয়া হল। ব্যবহৃত শব্দের অধিকাংশই 'চলন্তিকা' এবং 'বিজ্ঞানভারতী' অভিধানে পাওয়া যাবে।

বিষয়বস্তুর মৌলিকত্বের দাবি করার স্পর্ধা আমি রাখি না। আমি মূলতঃ মালাকারের দায়িত্ব বহন করেছি বলা যেতে পারে। যত তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে মোটামুটিভাবে তার প্রায় সবই

প্রথিতযশা বিশেষজ্ঞদের প্রামাণ্য আলোচনা থেকে সংগৃহীত। আমি সেই তথ্য-প্রমাণ এক সঙ্গে সাজিয়ে গুছিয়ে মালার আকারে আমার নিজের ভাষায় গেঁথেছি। কাজেই এই আলোচনার বিষয়-নির্বাচন কিংবা তথ্য পরিবেশনের মধ্যে যদি কোন অপূর্ণতা, অসঙ্গতি বা ক্রুটি থাকে তার দায়িত্ব সর্বতোভাবে আমার। সেই ক্রুটি অবশ্যই প্রকাশভঙ্গীর অথবা বাচনভঙ্গীর। তত্ত্ব ও তথ্য-প্রমাণের জন্য যেসব বইয়ের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করেছি তার একটি তালিকাও অন্যত্র দেওয়া হল।

মানব-বিকাশের বিচিত্র কাহিনী পড়তে পড়তে এই কাহিনী লেখার আগ্রহ বছর তিনেক আগে যখন হয়েছিল সেই আগ্রহ কিন্তু সংশয়মুক্ত ছিল না। আগ্রহের পাশাপাশি সংশয়ও জেগেছিল। কারণ আমার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত-ধারণা আমি পোষণ করি না। তবু আগ্রহটা সেদিন প্রবল হয়ে উঠেছিল বলেই হয়ত নিরুৎসাহ বোধ করিনি। লেখা ইদানীং শেষ করেছি, কিন্তু নিঃসংশয় হতে পারিনি।

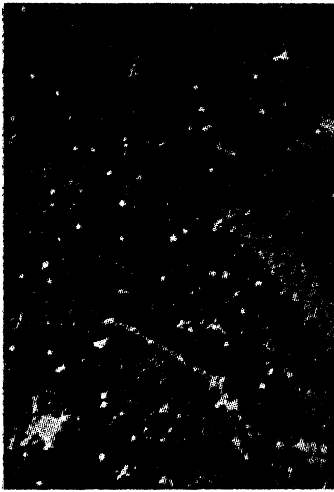
১লা আশ্বিন, ১৩৬৫   প্রফুল্ল চক্রবর্তী

কলিকাতা

॥ বিষয়-সূচী ॥

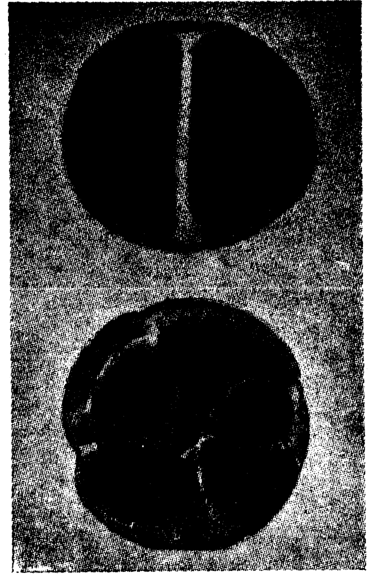
প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারা

॥ চিত্র সূচী ॥



১নং চিত্র—ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট প্রোটোপ্লাজমের বর্ধিত রূপ

[পৃঃ ২০]



২নং চিত্র—মাছের নিষিক্ত ডিম্বের কোষ-বিভাজন : উপরে দ্বি-কোষ ও নীচে আট কোষ

[পৃঃ ২৯]



৩নং চিত্র—ক্যাম্ব্রিয়ান কল্পের সামুদ্রিক জীব : টি লোবাইট ও জেলী মাছ ও শুক্তির প্রাধান্য লক্ষণীয়

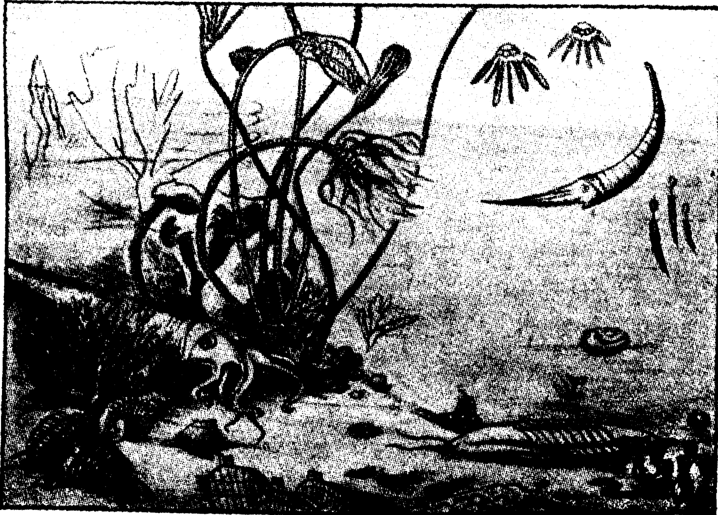
[পৃঃ [illegible]]



৪নং চিত্র—সিলুরিয়ান কল্পের বৃশ্চিক
[পৃঃ ৩৩]



৫নং চিত্র—ডেভোনিয়ান কল্পের মিঠে জলের মাছ [পৃঃ ৩৯]

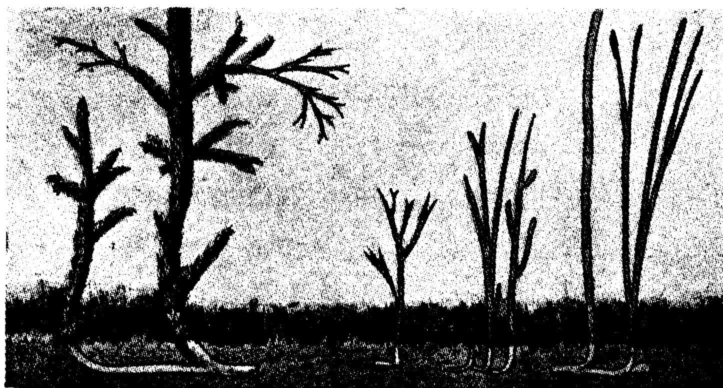


৬নং চিত্র—অরডোভিশিয়ান কল্পের সামুদ্রিক জীব ও গুল্ম
[পৃঃ ৩১]



৭নং চিত্র—ডেভোনিয়ান কল্পের কর্দমচারী মীন : এক সঙ্গে দুই দিকে দেখার জন্য উদ্গত চক্ষু দুটি লক্ষণীয়

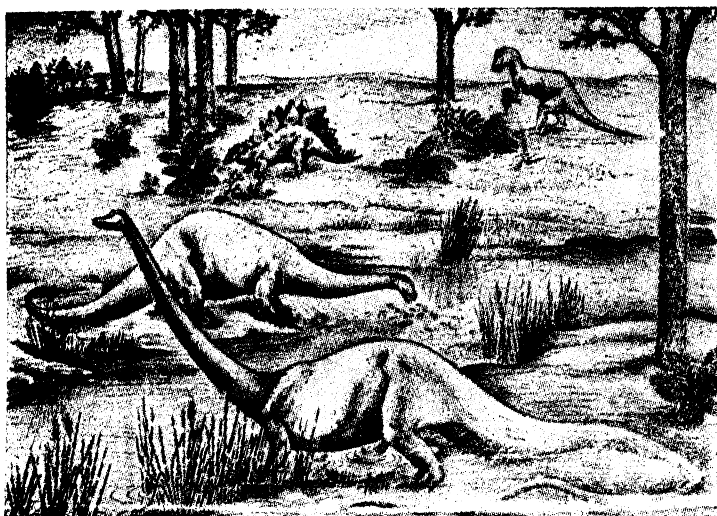
[পৃঃ ৪০]



৮নং চিত্র—প্রথম স্থলজ বৃক্ষের রূপ

(ডেভোনিয়ান কল্প)

[পৃঃ ৩৬]



৯নং চিত্র—জুরাশিক কল্পের ডিনোসার : সামনের ডিপ্লোডোকাস নামে ডিনোসারটি লেজসহ ৬০ হাত লম্বা

[পৃঃ ৫২-৫৪]

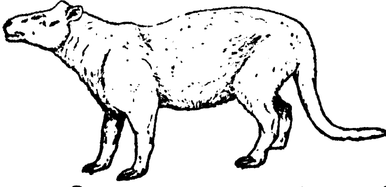


১০নং চিত্র—ত্রিয়াশিক কল্পের নিসর্গ চিত্র : ক্যাঙারু জাতীয় ডিনোসারটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়

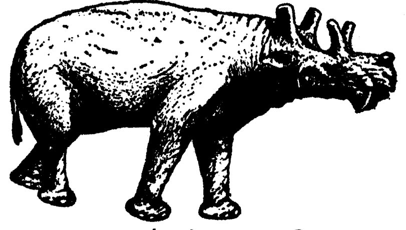
[পৃঃ ৫২-৫৪]



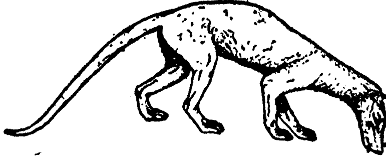
১১নং চিত্র—উড়তে শেখার দ্বিবিধ পদ্ধতির কল্পিত চিত্র (জুরাশিক কল্প [পৃঃ ৫০-৫১]



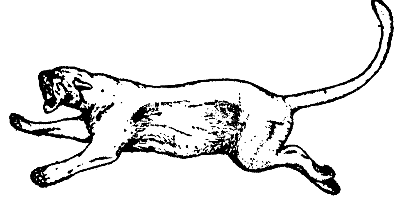
১৩নং চিত্র—আঙুল-জোড়া আদি স্তন্যপায়ী
(কনডিলার্থ—ইওসিন কল্প)



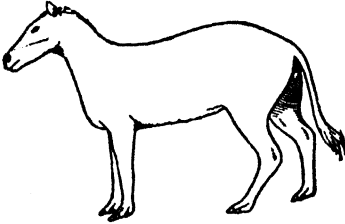
১৪নং চিত্র—ইওসিন কল্পের শিংওয়ালা
এমব্লিপড—থেবড়া পায়ের প্রাণী



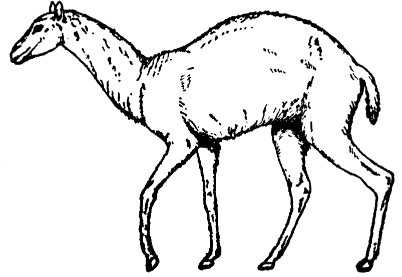
১৫নং চিত্র—আদি মাংসাশী
(ক্রিয়োডোণ্ট—ইওসিন)



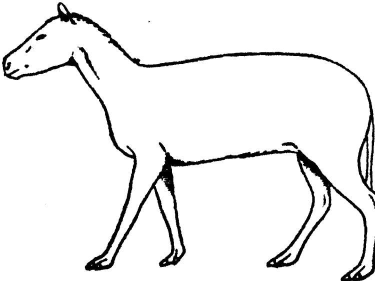
১৬নং চিত্র—আদি বিড়াল
(অলিগোসিন কল্প)



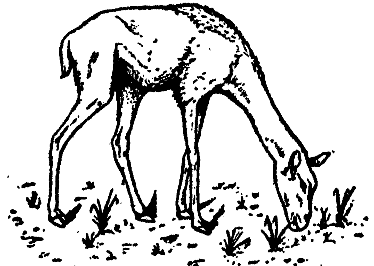
১৭নং চিত্র—ইওসিনের চার
আঙুলওয়ালা ঘোড়া



১৮নং চিত্র—অলিগোসিন কল্পের
আদি উট



১৯নং চিত্র—অলিগোসিনের তিন
আঙুলওয়ালা ঘোড়া



২০নং চিত্র—মাইওসিন কল্পের
গাজেল উট

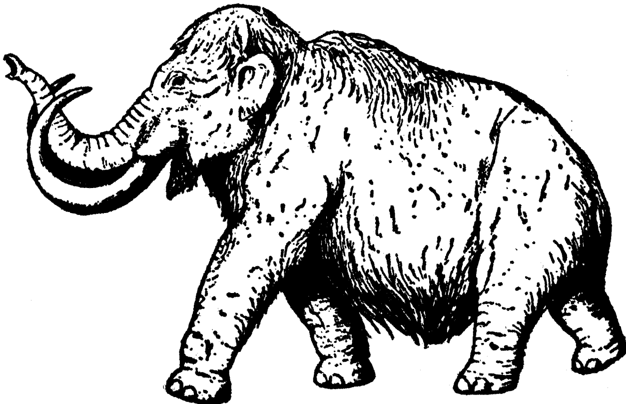
[পৃঃ ৬৩-৬৪]



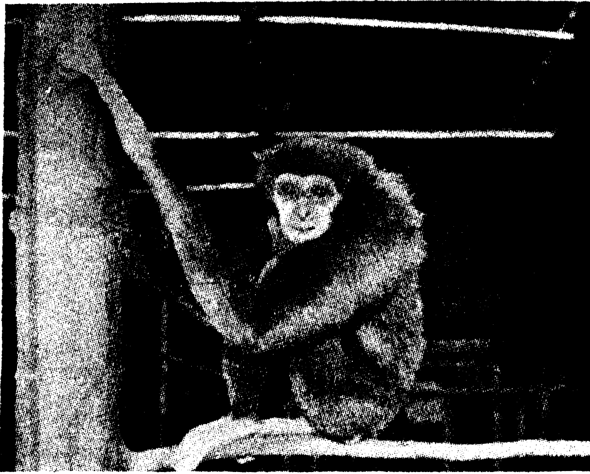
২১নং চিত্র—আদিমতম পতঙ্গাশীর জীবন্ত জীবশাখার প্রতিনিধি (জীমনুরা) [পৃঃ ১০১]



২২নং চিত্র—অপজাম : আদিমতম অঙ্কগর্ভ প্রাণীর জীবন্ত প্রতিনিধি [পৃঃ ৬১]



২৩নং চিত্র—লোমশ হাতী ম্যামথ (প্লিস্টোসিন কল্প)



২৪নং চিত্র—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গিবন [পৃঃ ৯৭-১০০]



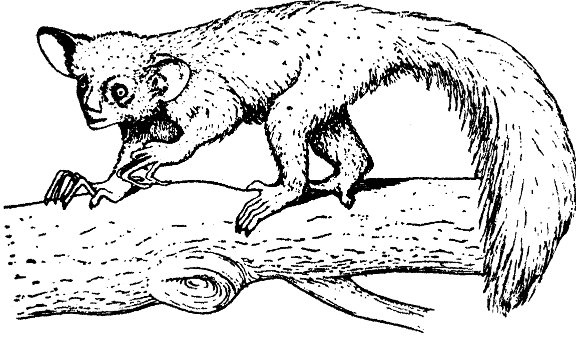
২৫নং চিত্র—দক্ষিণ আবিসিনিয়ার বেবুন [পৃঃ [illegible]]





২৬নং চিত্র—(উপরে) সুমাত্রা-বোর্নিওর ওরাং-উটাং,
২৭নং চিত্র—(ডানদিকে) আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের (মধ্যপশ্চিম) শিমপানজী

[পৃঃ ৯৭-১০০]



২৯নং চিত্র—মাদাগাস্কারের লেমুর

[পৃঃ ১০১]



৩০নং চিত্র— ফিলিপাইন ও ইস্ট ইণ্ডিজের তারসিয়াস

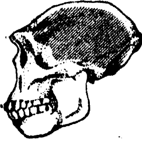
[পৃঃ ১০২]

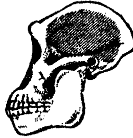
৩১নং চিত্র—বিভিন্ন জাতের মানুষের করোটির তুলনামূলক চিত্র

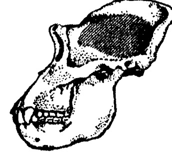

আধুনিক মানুষ


ক্রমান্‌্যঁ


নিয়ানডারথাল

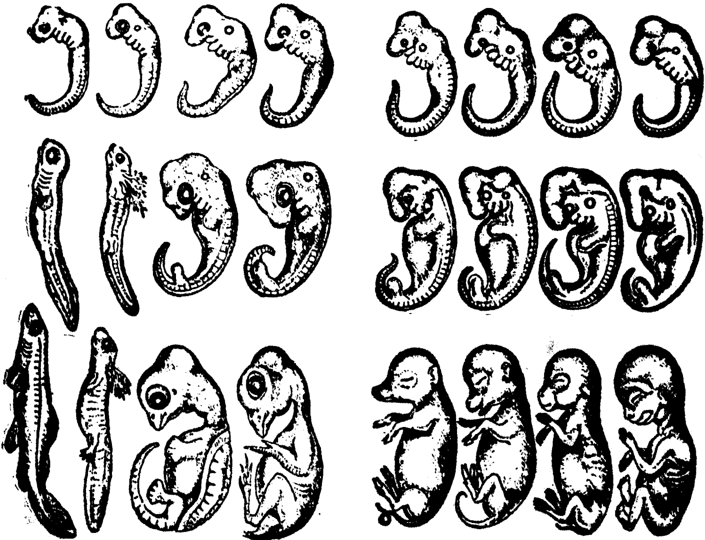

পিথেকানথ্রোপাস


পারানথ্রোপাস
(মানবাকার বনমানুষ)


গরিলা

[পৃঃ ১৭৮-১৮৭]

৩২নং চিত্র—মেরুদণ্ডী ভ্রূণের তিনটি ক্রমবিকাশমান স্তরের তুলনামূলক রূপ



(বাঁ দিক থেকে আরম্ভ—উপর থেকে নীচে) ১. মাছ, ২. সালামান্দার, ৩. কচ্ছপ, ৪. পাখী, ৫. শুয়োর, ৬. গো-বৎস, ৭. বিলাতী ইঁদুর, ৮. মানুষ

[পৃঃ ৮৬-৮৯]

৩৩নং চিত্র—প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের নকশা



পিথেকানথ্রোপাস
(জাভা)



পিল্টডাইনের মানুষ
(বৃটেন)

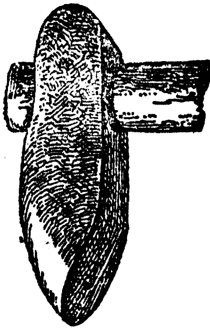


নিয়ানডারথ্যাল
মানুষ



আধুনিক মানুষ
(ক্রমান্যঁ)

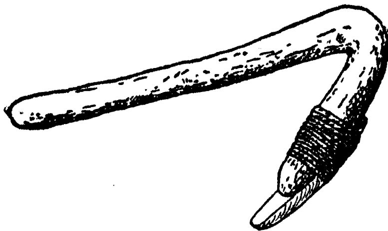
[পৃঃ ১৭৯-১৮৭]

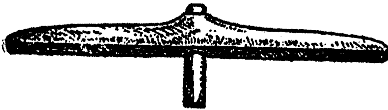




৩৫নং চিত্র—(উপরে) হাড়ের উপর ক্রমান্ত্র্য মানুষের খোদাই করা রেখাচিত্র [ফ্রান্সের দর্দন নামক স্থানের গুহায় প্রাপ্ত]

[পৃঃ ২৬৩-২৬৭]





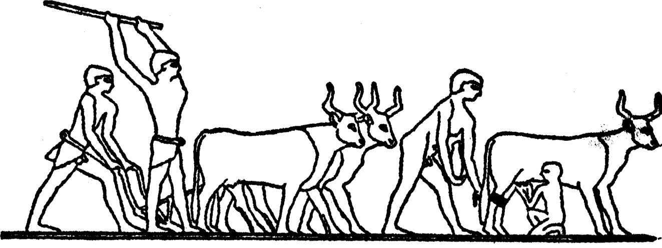
৩৪নং চিত্র—(বাঁ দিকে) নবোপলীয় যুগের কোদাল [পৃঃ ২৮৪]

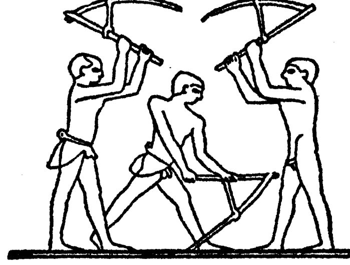




৩৬নং চিত্র—প্রস্তর যুগের হাত-কুঠার (আকুলীয়)

[পৃঃ ২৪৫]





৩৭নং চিত্র—প্রাচীন মিশরে হাল চাষ, দুধ-দোহা ও কোদাল চাষ

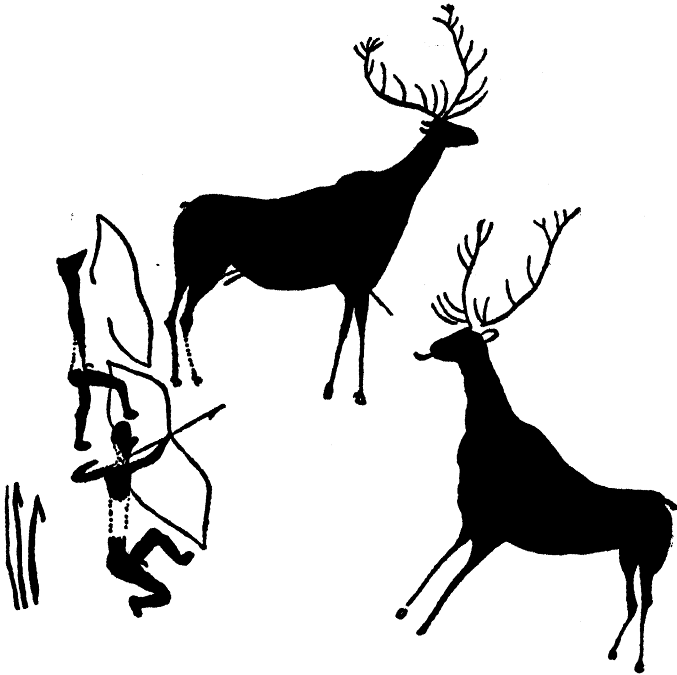


৩৮নং চিত্র— প্রাচীন মিশরের ধাতু কারখানায় কর্মরত মজুর

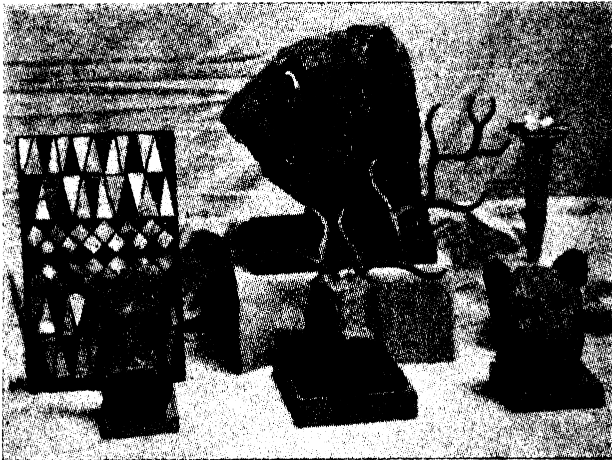


৩৯নং চিত্র—প্রাচীন মিশরের জাহাজ নির্মাণ-পদ্ধতি

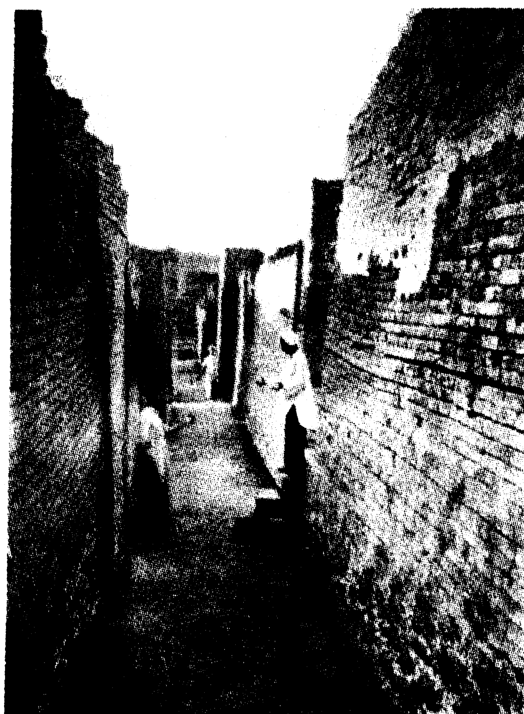
[পৃঃ ৩৩৯-৩৪৬]



৪০নং চিত্র—প্রস্তর যুগের তীর ও তীরন্দাজ (দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনে প্রাপ্ত প্রস্তর-চিত্র) [পৃঃ ২৬৩-২৬৭]



৪১নং চিত্র—প্রাচীন সুমেরের তামার তৈয়ারী পশু-মুণ্ড
(আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর)
[পৃঃ ৩০৬-৩০৭]



৪২নং চিত্র—মহেন-জো-দারোর সরু গলি



৪৩নং চিত্র—মহেন-জো-দারোর চিত্রিত মৃৎপাত্র (খৃঃ পূঃ ২৪০০)

[পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮]



৪৪নং চিত্র—মহেন-জো-দারোর স্নানাগার

[পৃঃ ৩৪৭-৪৮]



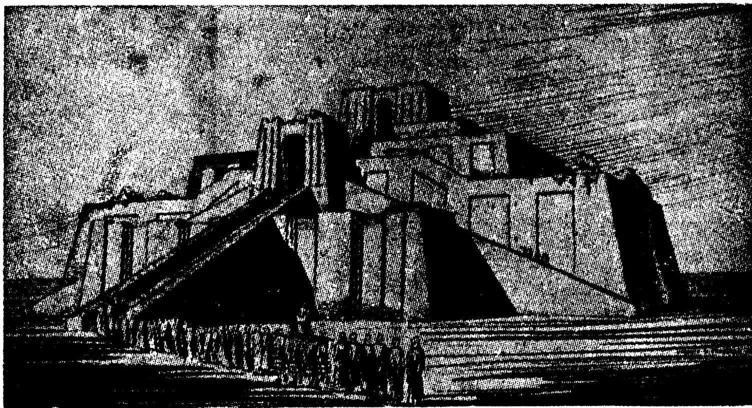
৪৫নং চিত্র—মহেন-জো-দারোর অলঙ্কার

[পৃঃ ৩৪৭-৪৮]



৪৬নং চিত্র—প্রাচীন সুমেরীয় কীলকাকার লিপি

[পৃঃ ৩৪৮-৫৬]



৪৭নং চিত্র—প্রাচীন সুমেরীয় মন্দিরের জিগ্‌গুরাত

[পৃঃ ৩২৮]

sȝ·j ndtj·j Mn-ḫpr-rʿ ʿnḫ dt wbn·j n mr(w)t·k

Son my, avenger my, Men-hepere-re, may he live forever: I shine with love for you.

ḥnm ʿwj·j ḥʿw·k m sȝ ʿnḫ nḏm·wj

(They) protect, hands my, limbs your, with the safeguard of life. How sweet

jȝmt·k r šnbt·j šmn·j tw m

(is) friendship your against breast my. I place you in

bȝj·j n·k

৪৮নং চিত্র—মিশরের প্রাচীন লিপি (হিয়ারোগ্লিফিক)

[illegible] কথা প্রসঙ্গে

দেড়শ' কি দুশ' বছর আগেও মাত্র হাজার তিনেক বছরের ইতিহাস জানা ছিল মানুষের। তার আগেকার দিনের বৃত্তান্ত ছিল নিছক কল্পনা আর অনুমান সর্বস্ব রূপকথার কাহিনীতে গড়া। সভ্য জগতের অধিকাংশ স্থানে, বিশেষতঃ প্রতীচ্যে তখন বিশ্বাস করা হত, এমন কি শেখান হত যে দুনিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল খৃষ্টজন্মের হাজার চারেক বছর আগে। মানুষের উদ্ভব সম্পর্কেও লোকসমাজে অতি সহজ ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। বিশ্বাস করা হত যে আকারে অবয়বে আমাদের মত মানুষ একদিন সৃষ্টি করেছিলেন ভগবান। সেই ঈশ্বরসৃষ্ট আদিমানব থেকেই মানবজাতির সূচনা। এই সহজ সরল ভ্রান্ত ধারণার মূলে ছিল ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত। দুনিয়ার সকল ধর্মশাস্ত্রে মানুষের উদ্ভব সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নের এই জাতের সহজ সমাধান দেওয়া হয়েছে। সর্বত্র বলা হয়েছে যে রহস্যময় এক স্রষ্টা অলৌকিক উপায়ে মানুষ গড়েছিলেন। পবিত্র বাইবেলের অনুসরণ করে খৃষ্টান তত্ত্ববিদ্যাবিদ্‌রা বলেছেন যে ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিরূপে পৃথিবীর ধূলিকণা থেকে মানুষ সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রেও বিভিন্ন বর্ণের কাদামাটি থেকে আদিমানুষ সৃষ্টির উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দুশাস্ত্রেও বলা হয়েছে যে মানুষ সহ চরাচরের জীবজগৎ এক রহস্যময় সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। লোকসমাজেও এই অলৌকিক ব্যাখ্যা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা হত। শুধু তাই নয়। তত্ত্ববিদ্যার ব্যাখ্যায় একথাও বলা হয়েছে যে ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষ এক অদ্বিতীয় জৈবসত্তার অধিকারী। ভগবান তাকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করেছেন; সুতরাং প্রাণীজগতের অপর কোন জীবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক বা কোন আত্মীয়তা নেই।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকপাতে পৃথিবী, উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীজগতের উদ্ভব সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছে। জীবজগৎ সম্পর্কে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা এমন কতগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যা ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষার বিরোধী। যুগ যুগ ধরে যে সংস্কার সভ্যজগতের মানসলোক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা আর পুরাবিদ্যায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার সভ্যসন্ধ

অভিনব আলোকসম্পাতে সেই অন্ধবিশ্বাসের কুজ্ঝটিকা দীর্ণ হল। বিজ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হল যে মানুষের উদ্ভবের মূল আছে প্রাণীজগতে। ইংরেজ নিসর্গবিদ্ চার্লস ডারউইন এই মতবাদের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠাতা। ফরাসী পণ্ডিত জাঁ লামার্কও ইতিপূর্বে প্রচার করেছিলেন যে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর আকৃতি পরিবর্তনশীল। অতি নিম্নপর্যায়ের জীব ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে উচ্চতর জীবে পরিণত হয় এবং মানুষের নিকটতম পূর্বপুরুষ হচ্ছে এক শ্রেণীর দ্বিপদ বানর। সংশয়াতীত তথ্য সংগ্রহ করে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ডারউইনের গবেষণা এই সফলতা অর্জন করল। তথ্য-প্রমাণ সমাবেশ করে তিনি প্রতিপন্ন করলেন যে জীবন-বিকাশের ক্রমপরিবর্তনের বিরামহীন ধারায় মানুষ একটি উচ্চতর যোগসূত্র মাত্র। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলি অপরিবর্তনীয় এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে গণ্য করা হত। ভূরি ভূরি তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করে এই মতবাদ তিনি খণ্ডন করলেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে জীবজগৎ নিত্য পরিবর্তনশীল। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়াসে জীবজগতে আকৃতিগত এবং গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রতিবেশের পরিবর্তন ঘটলে প্রাণশক্তি এমনভাবে তার জৈবিক প্রকৃতি পরিবর্তন করে, যাতে তার পক্ষে বেঁচে থাকা এবং বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অভিযোজন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে অভি-যোজিত করে যে প্রাণী বেঁচে থাকার সংগ্রামে নিজের যোগ্যতা সুপ্রতিপন্ন করতে পারে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে তার উদ্বর্তন হয়। যারা পারে না তারা হেরে যায় প্রাকৃতিক নির্বাচনে। কালক্রমে তাদের বংশলোপ পায়। এই যোগ্যতা অর্জনের প্রয়াসের ফলে বিবিধ প্রকারণ সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর আকৃতি ও প্রকৃতিগত লক্ষণ এবং বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ ও গুণ পরিবর্তিত হয়। জীবজগতের এই পরিবর্তনের ধারাকে বলা হয় অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ।

ডারউইন তাঁর সিদ্ধান্ত শুধু উদ্ভিদ্ আর প্রাণীজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। জীব হিসাবে প্রাণীজগতের সঙ্গে মানুষের অচ্ছেদ্য বন্ধন এবং অন্যান্য প্রাণীর মত ক্রমবিকাশের নিয়মে এই পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে এমন প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করলেন যা উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর তথ্যানুসন্ধানের ফলে স্পষ্ট বোঝা গেল যে এই দুনিয়ার বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষের উদ্ভব আলাদাভাবে হয়নি। বরং তাদের সকলের উদ্ভব হয়েছে প্রাণশক্তির সুদীর্ঘকালব্যাপী এক মন্থর ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে এবং প্রায় সাদৃশ্যবর্জিত এক

পূর্বপুরুষ থেকে। আজকের দুনিয়ায় যত উদ্ভিদ, যত প্রাণীর প্রজাতি আমরা দেখছি, মানুষ সহ তাদের সকলে সুপ্রাচীন কালের জীব-প্রজাতির রূপান্তরিত বংশধারার সৃষ্টি। এই রূপান্তরের কাহিনী কালগণনায় শত কোটি বৎসর পরিব্যাপ্ত। ভূস্তরে বিধৃত শিলীভূত অস্থির নজীর সাক্ষ্য দিচ্ছে এই কাহিনীর সীমাহীন কালব্যাপ্তির।

বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোকপাতে পৃথিবী ও জীবজগৎ সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত সংস্কারের ভিত্তি ভেঙে গেল বটে, কিন্তু অভিব্যক্তির তত্ত্ব মানুষের উদ্ভবের কাহিনীকে বেঁধে দিল জীবনবিকাশের ছেদহীন প্রাকৃতিক নিয়মের বাঁধনে। মানুষের জন্মেতিহাস তাতে পিছিয়ে গেল লাখ কয়েক বছর অতীতে। মানুষের উদ্ভবের কাহিনী আর ঐতিহাসিকের এখতিয়ারে রইল না। প্রশ্নটি প্রত্নপ্রাণীবিদ্যার গবেষণার বিষয় হয়ে পড়ল। তার মানে, মানুষের উদ্ভবের প্রশ্ন প্রাণীজগতের বিভিন্ন প্রজাতির অভিব্যক্তির সমস্যার সমপর্যায়ভুক্ত হল। তাতে তার উদ্ভবের কাহিনী, তার জৈবিক ক্রমবিকাশের কাহিনী রহস্যময় হয়ে পড়ল কালপ্রবাহের অতলগর্ভে। ইতিহাস যুক্ত হল প্রাগিতিহাসের সঙ্গে; আর প্রাগিতিহাসের পটভূমিকায় মেশামেশি হল ইতিহাস ও জীববৃত্তান্তের। ইতিহাস পেছনে প্রসারিত হল, আর জীববৃত্তান্ত এল এগিয়ে। একদিকে মানুষের ইতিহাস আর অপর দিকে প্রাণীবিদ্যা, প্রত্নপ্রাণীবিদ্যা এবং ভূবিদ্যার সেতু রচিত হল প্রাগিতিহাসে। প্রাগিতিহাসের পটভূমির উপর মানুষের ইতিহাস গড়ে উঠল জীববিদ্যা, প্রত্নপ্রাণীবিদ্যা আর ভূবিদ্যার জঠর থেকে। পুরাবিদ্যা উদ্ধার করল আদিম মানুষের লুকান ইতিহাস—তার সংস্কৃতির পরিচয়।

প্রাগৈতিহাসিক কালের দুনিয়াতেও যে মানুষের অস্তিত্ব ছিল এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব সর্বতোভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাপ্য। ডারউইনের অভিব্যক্তির তত্ত্ব প্রকাশিত হবার আগে ইউরোপের বিজ্ঞানসাধকদল মানুষের প্রাগৈতিহাসিক সুপ্রাচীনত্ব সম্পর্কে বহু তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। মানুষের প্রাগৈতিহাসিক অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রধানতঃ দুটি জিনিস থেকে। মানুষের নিজের হাতের তৈরী কালজয়ী স্মারকচিহ্ন, আর মানুষের এবং অধুনালুপ্ত প্রাণীর শিলীভূত অস্থি থেকে। ভূবিদ্যার কালগণনার পদ্ধতির সঙ্গে মিলিয়ে এই সব স্মারকচিহ্নের প্রাচীনত্বের কালনির্ণয় করা হয়।

মানুষের তৈরী পাথুরে হাতিয়ার প্রাচীনকালের মানুষের কাছেও পরিচিত ছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'বাজ'। তার মানে এই সব পাথুরে জিনিস যেন বজ্রপতনের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। এই

বাজকে আবার অতিপ্রাকৃত শক্তিমান বস্তু বলে গণ্য করা হত। ইউরোপের রেনেশাঁ'র যুগে বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দা ভিনচি এই বাজ সম্পর্কে বলেছিলেন:

> অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে যে বজ্রপতনের ফলে বাজ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র জানে যে, লোহা সৃষ্টি হবার আগে প্রচণ্ড আঘাত হেনে পাথর ভেঙে এই বাজ তৈরি করা হয়েছে। কারণ, আদিমতম মানুষ প্রস্তরখণ্ডকেই ছোরা হিসাবে ব্যবহার করত।

তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আদিম মানুষ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন কবি এবং দার্শনিকদের মতবাদের প্রভাব কাটাতে পারেনি। আদিম মানুষের অনুন্নত অবস্থা সম্পর্কে কয়েক শতাব্দী আগে এঁরা যে ভাসা ভাসা অস্পষ্ট উক্তি করে গেছেন, তার বেশী কিছু সুস্পষ্টভাবে বলতে পারেনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান। তবে মানুষের ঐতিহাসিক সভ্যতার পেছনে অ-সভ্য অথবা বর্বর একটি অধ্যায়ের অস্তিত্ব এই সময় স্বীকৃতি পেলেও সে যুগের অস্তিত্ব যে কালবিচারে বিশাল এমন সন্দেহ কেউ প্রকাশ করেনি। কারণ, বাইবেলের তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিহীন মতবাদ তো আর বিশ্বাসযোগ্য নয়! তাতে তো পৃথিবীর জন্মই খৃষ্টজন্মের হাজার চারেক বছর পূর্বে হয়েছে বলে কল্পনা করা হয়েছে।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দেয়। জীববৃত্তান্তের গবেষণা এই শতকে বিশেষ প্রসার লাভ করে। বিভিন্ন দেশের বহু গবেষকের অক্লান্ত চেষ্টায় মানুষের প্রাগৈতিহাসিক অস্তিত্বের তথ্য-প্রমাণ সংগৃহীত হল। মানুষের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আলোকপাতের মুখ্য দায়িত্ব বহন করল ভূবিদ্যা আর প্রত্নপ্রাণীবিদ্যা। ভূবিদ্যার গবেষণা প্রসঙ্গে দেখা গেল যে, সাম্প্রতিক অতীতের আগেকার ভূতাত্ত্বিক কালের পাথুরে হাতিয়ারও পাওয়া যাচ্ছে ধরিত্রীর পললস্তরে এবং তার পাশাপাশি এমন সব জন্তুর শিলীভূত অস্থি আছে যাদের কোন অস্তিত্ব এখন নেই। বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে তখন মানুষের প্রাগিতিহাস সম্পর্কে গবেষণার সাড়া পড়ে গেল। বহু বিজ্ঞানসাধকের তথ্যানুসন্ধানের ফলে যে তথ্য সংগৃহীত হল তার বলে অচিরে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হল যে, ঐতিহাসিক কালসীমার পশ্চাতে প্রাগিতিহাসের এক বিশাল অধ্যায় আছে। তার অপর দিগন্ত হারিয়ে গেছে ভূবিদ্যার কালগণনার অসীম বিস্তারের মধ্যে। এই অধ্যায়ের কালজয়ী যত স্মারকচিহ্নের সন্ধান পাওয়া গেল তার অনুশীলনের ভিত্তিতে গড়ে উঠল প্রাগৈতিহাসিক পুরাবিদ্যা।

সংশয়াতীত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত মানববিজ্ঞানের এই শাখা প্রাগিতিহাস সম্পর্কে শুধু বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করেনি, ইতিহাসের কাহিনী যে-কালের মানুষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব সেই হারান-যুগের মানুষের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী, তাদের সামাজিক ও মানসিক চরিত্রের উপরেও বেশ খানিকটা আলোকপাত করেছে।

মানুষকে বিচার করা হয় দুটি মানদণ্ডে। একটি জৈবিক, অপরটি সাংস্কৃতিক। এই দুটি দিক থেকেই মানুষের আলোচনা করে নৃবিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে এই আলোচনা থেকে বিজ্ঞান হিসাবে নৃবিদ্যার সৃষ্টি। মানুষের ক্রমবিকাশের গবেষক (মানুষ সম্পর্কিত প্রত্নপ্রাণীবিদ্যাবিদ্) প্রধানতঃ মানুষের জৈবিক অভিব্যক্তি, তার ভূতাত্ত্বিক প্রাচীনত্ব, তার অস্থি ও দাঁতের শিলীভূত স্মারকচিহ্ন নিয়ে চর্চা করেন। আধুনিক মানুষের অভিব্যক্তির বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তার কারণ বিশ্লেষণ করা তাঁর মুখ্য কাজ। তার পরের দায়িত্ব মানবীয় জীববিদ্যাবিদের। আধুনিক মানুষকে তিনি দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অনুযায়ী জাতি প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন। তবে এর যে কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জৈবিক নৃবিদ্যাবিদ্‌কে কালগণনার বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে হবে।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে মানুষের বিচার হয় সামাজিক জীব হিসাবে। স্পষ্ট বাক্‌শক্তিসম্পন্ন পরিবার ও গোষ্ঠীজীবন সংগঠনে সমর্থ এবং আবিষ্কারের ক্ষমতাবান প্রাণী হিসাবে তার বিচার করা হয়। এই আলোচনার বিষয়বস্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের সভ্যতা। কালগতভাবে এই সাংস্কৃতিক জীবনের দুটি প্রধান পর্যায় আছে। একটি প্রাগৈতিহাসিক আর অপরটি ঐতিহাসিক। প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়টি পুরাবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

জৈবিক প্রতিবেশের সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্যবিধানের স্বাক্ষর আছে তার নিজের হাতে তৈরী বস্তুসম্ভারের মধ্যে। তার মানে তার বাস্তব সংস্কৃতির মধ্যে। আর, তার মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ পাওয়া যায় তার বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে। ধর্ম, নীতিবোধ আর সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে তার ধ্যান-ধারণায়। আদিম মানুষের বাস্তব সংস্কৃতি উদ্ধার করে লোকচক্ষে তুলে ধরা পুরাবিদ্যাবিদের মৌলিক কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণ রাখতে হবে। অবিনশ্বর কালজয়ী জিনিসের উপর নির্ভর করতে হয় প্রাগৈতিহাসিক পুরাবিদ্যাকে। অতীত ঘটনার কালনির্ণয়ের জন্য ভূবিদ্যাবিদের মত তিনি ভূত্বকের স্তরবিন্যাসের উপর নির্ভর করেন। শিলীভূত অস্থি নিয়ে গবেষণা করেন জীববিজ্ঞানীরা।

শিলীভবনের অর্থে অস্থির পার্থিব ও রাসায়নিক রূপান্তর বোঝায়। এই অবস্থায় অস্থি তার জৈবিক পদার্থের গুণ হারিয়ে খনিজ পদার্থ দ্বারা সমাবিষ্ট হয়ে পড়ে। তার ফলে আরও ঘন হয়। তবে অস্থির এই প্রকৃতি বিচারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শিলীভবনের মাত্রা অনেক ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে প্রভাবিত হতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে কালের সঙ্গে তার সম্পর্ক বজায় থাকে না। সে ক্ষেত্রে এই শিলীভূত অস্থির বিচার করতে হয় ভূস্তরের প্রকৃতি এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

পুরাবিদ্যার গবেষণার উপাদান জীববিজ্ঞানীর উপাদানের সমবৃত্তিসম্পন্ন। একটি মৌলিক পার্থক্যও আছে উভয়ের উপাদানের মধ্যে। পুরাবিদ্যাবিদের কোদালের মুখে ভূগর্ভে যেসব জিনিস আবিষ্কৃত হয় সেগুলি এক কালের মননশীল প্রাণীর হাতে তৈরী। মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা আর বিচারশক্তি ছিল তার। প্রাকৃতিক নিয়মের ধার ধারেন না পুরাবিদ্যাবিদ্। সৃজনশীল শ্রমের বলে নিজের হাতে তৈরী যেসব জিনিসের সাহায্যে মানুষ তার অস্তিত্ব বজায় রেখে বংশবৃদ্ধি করেছে তাই নিয়ে তাঁর কারবার।

মানুষের কাহিনী তাই তার জৈবিক ও সাংস্কৃতিক সত্তার ক্রমবিকাশের কাহিনী। মানুষের জৈবিক সত্তা জীবজগতের সঙ্গে তার নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধ সৃষ্টি করেছে। তার জৈবিক অভিব্যক্তির কাহিনীকে জীবনবিকাশের সর্বব্যাপক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করা যায় না। আদিমতম জৈবশক্তি প্রোটোপ্লাজম, ব্যাকটিরিয়া বা অ্যামিবার মধ্যে যে প্রাণশক্তি বিরাজমান, মানুষের মধ্যেও সেই শক্তি সক্রিয়। পার্থক্য শুধু সংগঠনের জটিলতায়। আকস্মিক এই জটিলতার উদ্ভব হয়নি। এই জটিলতা সৃষ্টির পেছনে আছে কল্প-কল্পান্তব্যাপী ক্রমবিকাশের ইতিহাস। বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে, বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন নতুন গুণ অর্জন করে সরলতম জৈবশক্তি পরিশেষে মানুষের দেহতন্ত্রে জটিলতম সংগঠনের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। জীবদেহের ক্রমোন্নতির একটি ধারা জীবনবিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ক্রমোন্নতি কোন সরল পথরেখা অনুসরণ করেনি। প্রতি স্তরে, প্রতি পর্যায়ে বিচিত্ররূপে বিবিধ ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রাণশক্তি। মানুষ সেই বহুধারাসমন্বিত জীবন-নদীর একটি শাখা মাত্র।

এমন একটি অঙ্গও মানুষের নেই যা অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস, রক্ত, মস্তিষ্ক, পেশী, নার্ভ প্রভৃতি অঙ্গ মনুষ্যেতর স্তন্যপায়ীর তো আছেই, এমন কি মাছ, পাখী আর সরীসৃপদের মধ্যেও দেখা যায়। অন্যান্য

প্রাণীর মত মানুষের জীবনচক্রও জন্ম, বাড়তি, বংশবৃদ্ধি, বার্ধক্য এবং মৃত্যু দিয়ে গড়া। মানুষও শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় অন্যান্য প্রাণীর মত। জল, বায়ু আর খাদ্য তারও প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে দেহতন্ত্রের গঠন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ থেকে বোঝা যায় যে মানুষ প্রাণীজগতেরই অংশ। তার মানুষ হওয়ার কাহিনী, অর্থাৎ মানুষের জৈবিক অভিব্যক্তির ইতিহাস প্রাণীজগতের অভিব্যক্তির ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আবার দৈহিক পার্থক্যও আছে মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে। জীবজন্তুর মস্তিষ্ক থেকে মানুষের মস্তিষ্কের গঠন বহুগুণ জটিল। তাই বুদ্ধির দিক থেকে জীবজগতে সে অনন্যসাধারণ। সকলের চেয়ে উন্নত। তাছাড়া উচ্চস্তরের চিন্তাশক্তি এবং সুস্পষ্ট বাক্‌শক্তিও আছে মানুষের। তার চলার ভঙ্গীও প্রাণীজগতে অনন্যসাধারণ। এ ছাড়া আরও অনেক স্বকীয় বিশিষ্টতা আছে মানবদেহে প্রাণীদেহের সমবৃত্তিসম্পন্ন বিশিষ্টতার পাশাপাশি। তাই মানুষ একাধারে অন্যান্য প্রাণীর মত প্রাণী এবং মানুষ।

প্রাণীজগতের সঙ্গে মানুষের সব চাইতে বেশী পার্থক্য সৃষ্টি করেছে তার সংস্কৃতি। প্রাণীরাজ্য থেকে উদ্ভব হলেও এই সংস্কৃতি মানুষের ও প্রাণীজগতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। মানুষের সংস্কৃতির সংজ্ঞা ব্যাপক। কিন্তু তার সংস্কৃতির সূচনা হয়েছে তার বেঁচে থাকার সংগ্রামের অভিনব পদ্ধতি থেকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যবিধানের পদ্ধতির অভিনবত্ব থেকে। নতুনতর জৈবিক গুণ অর্জন করে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের অভিযোজিত করা প্রাণীকুলের রীতি। মানুষ করেছে তার সংস্কৃতি দিয়ে। তার সৃজনশীল শ্রম, বাক্‌শক্তি আর মননশীলতার প্রয়োগে।

কাজেই মানুষের জৈবিক ক্রমবিকাশ আর তার সংস্কৃতির ইতিহাস উভয়েরই স্থান আছে মানব-বিকাশের কাহিনীতে। মানুষের বিভিন্ন মতবাদ এবং ধ্যানধারণার মধ্যে মানবসংস্কৃতির যে রূপ ফুটে বেরোয় তার আলোচনা করা হয়নি। অভিব্যক্তির ধারায় মানুষের উদ্ভব এবং তার বেঁচে থাকার বিচিত্র সংগ্রামের কাহিনীর মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কালবিচারে প্রাগিতিহাসের সীমা লঙ্ঘন করা হয়নি। যেখানে এসে সভ্যতার অরুণচ্ছটা দেখা দিয়েছে সেইখানে ছেদ টানা হয়েছে। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার তুলনায় এই আলোচনা যে নেহাৎ সংক্ষিপ্ত একথা হয়ত না বললেও চলে।

জীবনবিকাশের ধারা

জীবনের লীলামঞ্চ

মানুষের কথা বলতে বসেছি; বলতে চাই মানুষের উদ্ভব আর তার প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারার কাহিনী। মানুষের ক্রমবিকাশের কথা বলতে গেলে জৈবিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়ে। মানুষের অভিব্যক্তির কাহিনী এই ইতিহাসের অচ্ছেদ্য অংশ। পৃথিবীর বুকে প্রাণশক্তির উদ্ভবের পর যে বিকাশধারার সূচনা হয়েছে কল্প-কল্পান্তের ক্রমপরিবর্তনের ফলে সেই ছেদহীন ধারার একটি পর্যায়ে সেই বিকাশমান প্রাণশক্তি অভিনব বিভঙ্গে মানুষের দেহতন্ত্রে মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। প্রাণবিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে অতি নিবিড় সম্পর্ক আছে অনুবর্তী পর্যায়ের। কাজেই জৈবিক ক্রমবিকাশের আনুপূর্বিক ইতিহাসের খানিকটা আভাস না দিলে মানুষের অভিব্যক্তির তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করা যাবে না। অভিব্যক্তির যে স্তরে মানুষের উদ্ভব হয়েছে তার আগেকার কথা খানিকটা বলে নেওয়া প্রয়োজন। প্রাণবিকাশের বিরামহীন বিচিত্র ধারার পথ বেয়ে এগোতে হবে মূল কাহিনীর দিকে।

যে ঘটনা পরম্পরায় এই পৃথিবীর কোলে সর্বপ্রথম জৈবশক্তির উদ্ভব হয়, কোনদিন আর তার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। ঘটনার মিছিল তবু ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। অতীত হারিয়ে যাচ্ছে অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে। কোন মানুষ জানে না এই মহানাটকের পরিকল্পনা। কারও মতে এই মহানাটকের যবনিকাপাত হবে চরম বিপর্যয়ে। সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী ধ্বংসে। আবার কেউ বা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন ধীর মন্থর ক্রমিক অবক্ষয়ের সম্ভাবনার। কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করতে চান না যে জৈবশক্তির প্রগতি কোন কালে থেমে যাবে। মনে শঙ্কা জাগলেও এই বলে তারা সান্ত্বনা পেতে চান যে অনাগত ভবিষ্যতে যে অবস্থাই দেখা দিক না কেন, স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষমতা সেদিনও প্রাণশক্তির থাকবে। অতীতের ইতিহাস ভরসা যোগাচ্ছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। মানুষ নিজে অন্ততঃ বিশ্বাস করে যে জীবনের মহানাটকের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত। তাই জীবন-কাহিনীর অতীত ঘটনাবলী সম্পর্কে তার কৌতূহল অন্তহীন।

জীবনের জন্ম হয়েছে এই পৃথিবীর জঠরে। জৈবপদার্থও এই পৃথিবীর অংশ। জৈবশক্তির উদ্ভবের কাহিনী তাই পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। সেই গ্রহের ইতিহাস গড়ে উঠেছে একটি নক্ষত্রের ইতিহাস থেকে। আমরা সেই নক্ষত্রের নাম রেখেছি সূর্য। সূর্যের ইতিহাস আবার বিলীন হয়েছে বিশাল এক নীহারিকার রহস্যময় ইতিহাসের গর্ভে।

নাটকীয় উপমাচ্ছলে জীবনের মহানাটকে পৃথিবীকে মঞ্চ আর মহাকাশকে পশ্চাদ্‌পট বলে কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু তুলনাটা যথাযথ নয়। জৈব-পদার্থ সাধারণ পদার্থের একটা বিশেষ সংগঠন মাত্র। মহাজাগতিক বিবর্তনের পথে জীবনের ক্রমবিকাশ বলতে গেলে স্থানীয় এক অস্বাভাবিক ঘটনার মত। অভিনেতা, মঞ্চ আর পটভূমি সব মূলত এক পদার্থে গড়া।

॥ বিশ্বের বৃহত্তর পটভূমি ॥

আমাদের এই বিস্ময়কর ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুপুঞ্জ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, অগণিত দ্বীপসদৃশ বিচ্ছিন্ন বিশ্বজগতে জোট-বাঁধা। এর একটিতে আমাদের বাস। বাকীগুলি আমাদের চোখে নীহারিকাপুঞ্জ, মেঘাকার নক্ষত্র বা নক্ষত্র পরিবার। জেলী মাছ যেমন স্বচ্ছন্দে সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়ায়, দ্বীপাকার অগণিত বিশ্ব-জগতও তেমনি মহা ব্যোমসমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে। কোটি কোটি এদের সংখ্যা। অসীম বিস্তার। স্যার জেম্‌স জীন্‌সের মতে, পাঁচ থেকে আট লক্ষ কোটি বছর আগে আমাদের এই বিশ্বজগতের মূল উৎস বাষ্পময় নীহারিকাটির মধ্যে ঘনীভবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমরা যাকে নক্ষত্র বলে থাকি, এই নীহারিকার ঘনীভূত পদার্থকণা থেকে ক্রমে তাদের উদ্ভব হয়। নক্ষত্রের পদার্থকণার বাঁধুনি নীহারিকার চেয়ে আরও দৃঢ়। ঘনীভবনের ক্রিয়া সমাপ্ত হলে আমাদের নিজস্ব নক্ষত্র পরিবারে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার কোটি নক্ষত্রের সৃষ্টি হল। আমাদের পৃথিবীর সবিতা সূর্য এই নক্ষত্র-পরিবারের অন্যতম সন্তান। সূর্যেরও নিজস্ব জীবনেতিহাস আছে অন্যান্য নক্ষত্রের মত। দীর্ঘকাল পরে সূর্যের জীবনেতিহাসে এক আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে। আর একটি আগুয়ান নক্ষত্রের আকর্ষণে সূর্য দীর্ণ হল। তপন হল পৃথিবীর সবিতা—সৌরজগতের জনক। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে এই দুর্ঘটনা ঘটে আনুমানিক দুশ' কোটি বছর আগে। না হলেও কমপক্ষে একশ' ষাট কোটি বছর আর উর্ধে তিনশ' কোটি বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে পৃথিবীর সৃষ্টিকাল ও বয়স সম্পর্কে অনেক মজার কথা শোনা গেছে। অনুমান এখনও এই সম্পর্কে শেষ কথা। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক

গর্ডন চাইল্ডের একটি উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলছেন, প্রাগিতিহাস সম্পর্কে প্রায় সমস্ত উক্তিকে এক বিশেষ শর্তাধীনে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইদানীং কালের যাবতীয় তথ্যের ভিত্তিতে যে সম্ভাবনা সমধিক বলে মনে হয় তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হচ্ছে। সৌরজগৎ হোক, পৃথিবী হোক আর অন্য যা কিছু হোক, প্রাগিতিহাস সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে এই 'সমধিক সম্ভাবনার' শর্ত প্রযোজ্য। যাই হোক, মোটামুটি সকলে মেনে নিয়েছে যে ঘূর্ণায়মান গ্রহ হিসাবে পৃথিবীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দু'শ' কোটি বছরের কম নয়। এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আগে সূর্য, পৃথিবী আর তার গ্রহমণ্ডলী বিক্ষিপ্ত পদার্থের বিশাল পাকান ঘূর্ণিরূপে মহাশূন্যে অবস্থান করত। মহাকাশের বিভিন্ন অংশে এখনও তেজোময় পদার্থের বহু পাকান মেঘপুঞ্জ দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের ভাষায় এর নাম কুণ্ডলাকার নীহারিকা। বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে সূর্য আর তার গ্রহমণ্ডলেরও এক কালে এই অবস্থা ছিল। কালক্রমে তাদের তেজোময় পদার্থ একত্রীভূত হয়ে বর্তমান আকার পরিগ্রহ করেছে। যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ বছর ব্যেপে চলেছে এই একত্রীভবনের ক্রিয়া। অবশেষে দু'শ' কোটি বছর আগে পৃথিবী আর চন্দ্রের পৃথক সত্তা চেনা গেল। তখন এরা আরও কাছে ছিল সূর্যের। আরও দ্রুত সূর্য পরিক্রমা করত। উভয়ের উপরিভাগ অগ্নিময় আর গলিত ছিল। সূর্যের কিরণবহ্নির দাহও অনেক তীব্র ছিল তখন।

জ্বলন্ত চুল্লীর ভেতরকার অবস্থা অথবা তপ্ত লাভাপ্রবাহের সঙ্গে তুলনা করলে পৃথিবীর প্রথম অবস্থার দৃশ্য কতকটা কল্পনা করা যায়। এক ফোঁটা জলের অস্তিত্ব কোথাও ছিল না। গন্ধক আর ধাতব বাষ্পের ঝড়ো আবহাওয়ায় সব জল দুঃসহ তাপে বাষ্প হয়ে যেত। ভূপৃষ্ঠে ছিল ফুটন্ত গলিত শিলার আবর্তময় মহাসমুদ্র। ঊর্ধ্বে আকাশ-ছাওয়া অগ্নিগর্ভ মহামেঘের আড়ালে অগ্নিবর্ষী সূর্য ও চন্দ্রের খরদীপ্তি লেলিহান শিখা বিস্তার করে অতি দ্রুত আকাশ পথে ছুটে যেত। এইভাবে লক্ষ লক্ষ বছর গড়িয়ে যেতে লাগল আর পৃথিবীর অগ্নিরূপ ধীর মন্থরে প্রশমিত হয়ে এল। কমে এল তার অগ্নিস্রাবী রুদ্ররূপ। আকাশের বাষ্প বৃষ্টি হয়ে পড়তে লাগল নীচে। মাথার উপরে মেঘপুঞ্জ পাতলা হল কিছুটা। অগ্নিময় গলিত শিলার সমুদ্রে মাঝে মাঝে এবড়োখেবড়ো কঠিন শিলাপিণ্ড দেখা দিয়ে অতলে তলিয়ে যেতে লাগল। সূর্য ও চন্দ্র অনেক দূরে সরে যাওয়ায় আরও ক্ষুদ্রাকার হয়ে পড়ল। তাদের আকাশ পরিক্রমার গতিও মন্থর হল আগের তুলনায়। চাঁদ আকারে ছোট বলে তার অগ্নিরূপ ইতিমধ্যে প্রশমিত হল।

॥ লীলামঞ্চের প্রস্তুতি ॥

চন্দ্রকে দূরে নিক্ষেপ করে পৃথিবী যখন শীতল হয়ে এল, তার হালকা উপাদানগুলি চাপ খেয়ে উপরিভাগে উঠে এল। সৃষ্টি করল ভূপৃষ্ঠের ত্বক। ভারী উপাদান তলিয়ে রইল নীচে। যেন আঁকড়ে রইল জঠর। ভূপৃষ্ঠের এই ত্বক আস্তরণের কাজ করল। পৃথিবীর জঠরের তেজস্ক্রিয় ধাতব পদার্থের উত্তাপ আগে যেমন সহজে উপরে উঠে আসতে পারত, ত্বকে বাধা পেয়ে আর তত অনায়াসে উঠতে পারছিল না। তার ফলে ভারী শিলা বারবার গলতে লাগল জঠরের অগ্নিদাহে। এই শিলা মাঝে মাঝে বিস্ফোরিত হয়ে উপরে উঠে আসত লাভাপ্রবাহে। ভূপৃষ্ঠের ত্বকের কোন কোন অংশ এই বিস্ফোরিত ভারী পদার্থের চাপে বসে যায়। আভ্যন্তরিক উৎপাতের অবসান ঘটে তার ফলে। ভূবিদ্যাবিদ্‌দের মতে এই চাপ খেয়ে বসে যাওয়া অংশে পৃথিবীর প্রথম সমুদ্রের অববাহিকা সৃষ্টি হয়। জলীয় বাষ্প আর অন্যান্য গ্যাসও উঠে আসছিল বহুল পরিমাণে। পৃথিবীর আদিমতম আবহাওয়া সৃষ্টি হল তার প্রভাবে। তপ্ত, আর্দ্র, সম্ভবত গন্ধকের গন্ধভারাক্রান্ত ছিল এই আবহাওয়া। এই বাষ্পময় আবহাওয়ার জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে প্রথম দিকে নিরন্ধ্র মেঘের আবরণ সৃষ্টি করেছিল। সেই পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের প্রাচীর ভেদ করে সূর্য-কিরণ কখনও ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করতে পারেনি। বৃহস্পতির মত বিরাট গ্রহে এখনও এই অবস্থা বিদ্যমান। এখনও তার ঘন পৃষ্ঠদেশ দৃষ্টিগোচর নয়। দেখা যায় শুধু মেঘাবরণে প্রতিফলিত আলোর দ্যুতি।

আকাশ-ছাওয়া মহামেঘের বুক থেকে অঝোরে বৃষ্টি হত। কিন্তু সেই জলধারা ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করার আগে দুঃসহ তাপে বাষ্প হয়ে যেত। আরও লক্ষ লক্ষ বছর কাটল এইভাবে। কালক্রমে ভূপৃষ্ঠ এমন শীতল হল যে বৃষ্টির অঝোর ধারা পৃথিবীর বুকে পড়ে আবর্তবেগে ছুটে গিয়ে ঢালু অংশে জমা হতে থাকল। বসুন্ধরার চারপাশে সৃষ্টি হল সমুদ্রের বেষ্টনী। আবহাওয়ার পরিবর্তনে জলীয় বাষ্প যত তরল হতে থাকল তত পাতলা হল মেঘাবরণ। পরিশেষে ছিঁড়ে গেল একদিন। অসূর্যম্পশ্যা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ উদ্ভাসিত হল প্রথম সূর্য-কিরণে।

রঙ্গমঞ্চে আলোকসম্পাত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের আবির্ভাব হল না। ক্রমবিকাশের ধারা এমন নাটকীয়ভাবে কাজ করে না। কিন্তু বৃষ্টিধারা যেদিন ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করতে পেরেছিল সেই দিন থেকে পাললিক শিলা গঠনের সূচনা হল। আর গলিত লবণ ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধুয়ে সমুদ্রের বুকে সঞ্চিত হতে থাকে। জীবনের সামান্যতম আভাস দেখা দেবার পূর্বে ধরাপৃষ্ঠের শিলা বেশ কিছুটা কম

পেয়েছিল সম্ভবত। যাবতীয় তথ্যাদি এই কথা প্রমাণ করে যে লবণ-সমুদ্রের বুকে জীবনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল। অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জীবনের উদ্ভবের পেছনে সূর্য-কিরণের অবদান প্রচুর।

সেকালের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া যদি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হত তাহলে লাভার মত অন্তহীন শিলাপিণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে হত মৃত্তিকাহীন উদ্ভিদ্‌হীন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আকাশ-ঘেরা ধরণীকে। একালের প্রচণ্ডতম ঘূর্ণিবাত্যার চেয়ে অতি প্রচণ্ড উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়া আর অকল্পনীয় ধারাবর্ষণের আঘাতে তাকে ত্রাহি ডাক ছাড়তে হত। অবিরাম ধারাবর্ষণের জলস্রোত উত্তাল প্লাবনের বেগে ধেয়ে আসত তার দিকে। সর্বগ্রাসী প্লাবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে হয়ত দেখতে পেত যে শিলাপিণ্ডের ধোয়ানির আবিলতা-ভরা ঘোলাটে জলস্রোত গিরিখাত কেটে দুর্দম বেগে ছুটে যাচ্ছে ঢালু সমুদ্রের বুকে, নিজের সঞ্চয় জমা করার আশায়। মেঘাবরণের আড়ালে গগনবিহারী বিরাটকায় সূর্য এবং চন্দ্রও তার দৃষ্টিগোচর হত। যে চাঁদের মুখের একদিক মাত্র পৃথিবীর দিকে ঘুরে আছে, আকাশ পরিক্রমণের পথে তার মুখের ঢাকা দিকটাও দেখতে পাওয়া যেত তখন।

বয়স বাড়তে লাগল পৃথিবীর। দিন বড় হতে থাকল। সূর্য হটে যেতে লাগল দূরে। তার অগ্নিদাহও সহনীয় হয়ে উঠল। মন্থর হল চাঁদের আকাশ পরিক্রমার গতি। ঝঞ্ঝা আর বর্ষণের তীব্রতাও হ্রাস পেল কালক্রমে। জল বাড়তে লাগল সমুদ্রের। কিন্তু জীবনের জন্ম তখনও হয়নি। সমুদ্র প্রাণহীন। ভূপৃষ্ঠের শিলাগাত্রে অখণ্ড ঊষরতা।

পৃথিবীই আসল লীলামঞ্চ জীবন-নাটকের। বিবর্তনপন্থী জীববিদ্যা এই শিক্ষা দিয়েছে যে জীবন আর তার প্রতিবেশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রতিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবেরও পরিবর্তন ঘটে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জীবনের কল্পনা করা অর্থহীন। কাজেই মঞ্চ-প্রস্তুতির খোঁজ যদি জানা না থাকে, যদি না জানা থাকে পট-পরিবর্তনের কাহিনী, তাহলে এই নাটকের মর্ম কিংবা তার রহস্য উন্মোচনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে না। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিতে যতটা সুনিশ্চিত জানা গেছে, তাতে দেখা যায় যে মহাব্যোমের অতি বিশাল শূন্যতার মধ্যে জীবনের লীলাখেলা চলেছে শুধু এই পৃথিবীর বুকে। সসাগরা পৃথিবীর গণ্ডীর বাইরে অসীম মহাব্যোম জীবহীন জীবনহীন। শুধু শূন্যতায় ভরা। কোন পাখী পাঁচ মাইল পর্যন্ত ঊর্ধ্বে উড়তে পারে না। ছোট ছোট পাখী আর কীটপতঙ্গকে বিমানে করে উপরে নিয়ে গিয়ে দেখা গেছে যে মাইল পাঁচেকের অনেক আগেই তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে।

বিশ্বজগতের বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে পদার্থের অস্তিত্ব কোথাও বড় নেই। এই গ্রহলোকের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে ভ্রাম্যমান তেজ প্রতিফলনের জন্য। নক্ষত্রের বুকে বস্তুকণার অস্তিত্ব হয়ত আছে। কিন্তু সেখানকার তাপমাত্রা চার কোটি সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীর কাছাকাছি। জীবনের অস্তিত্ব এখানে অকল্পনীয়। জীন্‌স বলেছেন:

> জীবনের কল্পনা করতে গেলে কালবিচারে পদার্থের স্থায়িত্বের প্রশ্ন এসে পড়ে। পরমাণুর সংগঠন যেখানে প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ বার পরিবর্তিত হয়, কোন দুটি পরমাণু যেখানে জোড় বাঁধতে পারে না, জীবনের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না সেখানে। নিষ্ক্রিয় পদার্থের (ইনার্ট ম্যাটার) যে ভস্মাবশেষের (য়্যাশ) উপর জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব, সেই ভস্মের সামান্য একটু তৈরী হতেও লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আদিমতম পদার্থকে অবিরাম আলো ও উত্তাপের মাধ্যমে রূপান্তরিত হতে হবে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীম বিস্তারের তুলনায় জীবনের লীলাভূমির পরিসর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। মহাব্যোমে ছড়িয়ে আছে দ্বীপবৎ লক্ষ লক্ষ বিশ্বজগৎ। তার একটিতে লক্ষ লক্ষ তারকার মধ্যে একটি মাত্র তারকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অংশে বুদবুদের মত নগণ্য একটুখানি পদার্থের পাতলা আস্তরণ সঞ্চিত হয়েছে। সেই পদার্থের বুকে চলেছে জীবনের লীলাখেলা। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কমপক্ষে ৯১ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল থেকে ৯৪ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল। এই দূরত্ব বজায় রেখে পৃথিবী তার নিজের কক্ষপথে সূর্য-পরিক্রমা করছে। আর চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দূরে থেকে। শুধু চাঁদ আর পৃথিবীই ঘুরছে না সূর্যের চারিদিকে। ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরের বুধ আর ৩ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল দূরের শুক্রও এই পরিক্রমণে তাদের সাথী। পৃথিবীর বৃত্তের বাইরে আনুমানিক ১৪ কোটি ১০ লক্ষ মাইল দূরের মঙ্গল গ্রহ, ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল ব্যবধানের বৃহস্পতি, ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরের শনি, আর ১৭৮ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরের ইউরেনসও ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। দূরত্বের এই গাণিতিক হিসাব মাথা ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু মহাব্যোমের যে বিশাল শূন্যতার মধ্যে জীবনের মহানাটক অভিনীত হচ্ছে, তার কিছুটা ধারণা অন্ততঃ হতে পারে এই সংখ্যা থেকে।

জীবনের লীলাভূমির পরিসর শুধু যে ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তারের তুলনায় উপেক্ষণীয় তাই নয়। কাল বিচারেও প্রাণশক্তির বয়স উপেক্ষার যোগ্য। কালগণনায় এই বিশ্ব আর সৌরজগতের জন্মকালের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সে তুলনায় জীবধাত্রী পৃথিবীর বয়সই তো নগণ্য। তারপর পৃথিবীর কোলেও সন্তান জন্মেছে

তার জন্মের বহু লক্ষ কোটি বছর পরে। জীবনের ক্রমবিকাশের স্তর অনুযায়ী ভূবিদ্যায় যে পদ্ধতিতে কালগণনা করা হয়, নীচে তার একটা ছক দেওয়া হল।

ভূবিদ্যার কালগণনা করা হয় অধিকল্পে (এরা) ভাগ করে। এই অধিকল্পের নামকরণ হয়েছে প্রাণবিকাশের সাধারণ অবস্থার তুলনামূলক স্তরবিচারে কয়েকটি গ্রীক শব্দের ভিত্তিতে। প্রথম অধিকল্পের নাম আর্কিওজোইক এরা—আদিমতম প্রাণবিকাশের স্তর। দ্বিতীয় অধিকল্পের নাম প্রোটেরোজোইক এরা—আদিম প্রাণবিকাশের স্তর। তৃতীয় অধিকল্পের নাম পেলিওজোইক এরা—প্রাণবিকাশের প্রাচীন স্তর। চতুর্থ অধিকল্পের নাম মেসোজোইক এরা—প্রাণবিকাশের মধ্য-স্তর অথবা সরীসৃপ অধিকার। আর পঞ্চম অধিকল্পের নাম সেনোজোইক অথবা টারসিয়ারি এরা অর্থাৎ প্রাণবিকাশের আধুনিক স্তর।

এক একটি অধিকল্পের কালব্যাপ্তি এত বিশাল যে সেগুলিকে আবার কতগুলি কল্পে (পিরিয়ড) ভাগ করা হয়েছে।

অধিকল্প ও তার ব্যাপ্তিকাল	কল্প ও তার ব্যাপ্তিকাল	
(৫) সেনোজোইক (৬ কোটি বছর)	সাম্প্রতিক……	
	প্লিস্টোসিন···	১০ লক্ষ বছর
	প্লাইওসিন·· ···	৬০ লক্ষ বছর
	মাইওসিন……	১ কোটি ২০ লক্ষ বছর
	অলিগোসিন···	১ কোটি ৬০ লক্ষ বছর
	ইওসিন………	২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর
(৪) মেসোজোইক (১২ কোটি ৪০ লক্ষ বছর)	ক্রিটেসাস……	৬ কোটি ৯০ লক্ষ বছর
	জুরাসিক……	২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর
	ত্রিয়াসিক……	৩ কোটি বছর
(৩) পেলিওজোইক (৩২ কোটি ৮০ লক্ষ বছ)	পারমিয়ান……	২ কোটি ১০ লক্ষ বছর
	কার্বনিফেরাস···	৫ কোটি ২০ লক্ষ বছর
	ডেভোনিয়ান···	৫ কোটি ৮০ লক্ষ বছর
	সিলুরিয়ান……	৩ কোটি ৭০ লক্ষ বছর
	অরডোভিসিয়ান	৮ কোটি বছর
	ক্যামব্রিয়ান···	৮ কোটি বছর
(২) প্রোটেরোজোইক	পরিজ্ঞাত ভূতাত্ত্বিক কালের দুই-তৃতীয়াংশ সময়।	
(১) আর্কিওজোইক		

বিশ্বের জীবনেতিহাসের অধিকাংশ ঘটনা আমাদের দৃষ্টিতে অর্থহীন। লক্ষ লক্ষ তারকা সঙ্কুচিত হয়ে আলো ও উত্তাপের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। তাদের জঠরের পদার্থকণিকা আণবিক আর ইলেকট্রনিক প্রবাহে পাগলা-নাচন শুরু করে। যুগ যুগ ধরে চলে এই নাচন। তার ফলে মহাকাশে জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা লোপ পায়। বিশ্বজগতের জীবনেতিহাসে কোন গুরুত্ব নেই মানুষের কাহিনীর। মানুষের কাহিনী সেই ইতিহাসের অপরিহার্য অংশও নয়। সে ইতিহাসের বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের আশা-আকাজ্ক্ষা ও ধ্যান-ধারণার মানদণ্ডে বিচার করলে এই বক্তব্য অর্থহীন মনে হবে। মানুষের ধ্যান-ধারণার কোন যৌক্তিকতা বহির্বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার জন্য তাকে নিজের অন্তরে খোঁজ করতে হবে। মানুষের মর্যাদা, মানুষের কর্মপ্রয়াসের কোন সার্থকতা, কোন মূল্য যদি থাকে তো সে মূল্য আছে শুধু মানুষের কাছে। বিশ্বজগতের পটভূমিকায় কোনও সার্থকতা তার নেই।

॥ জীবনের উদ্ভব ॥

লীলামঞ্চের প্রস্তুতির পথে আলোকসম্পাতের কত পরে কি ভাবে পৃথিবী প্রথম সন্তানবতী হয়েছিল অদ্যাবধি তার সঠিক ঠিকানা জানা যায়নি। চিরকাল রহস্যময় থাকবে জীবনের জন্মকথা। মানুষ যদি কোন দিন কৃত্রিম উপায়ে জীবসৃষ্টি করতে পারে তাহলেও একথা সেদিন নিশ্চয়ই করে বলা যাবে না যে প্রকৃতি ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেনি। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে উল্কাপিণ্ডের মধ্যে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় জৈবশক্তি এই পৃথিবীতে বাহিত হয়ে এসেছে। জীবনের উদ্ভব সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তোলে। মূল প্রশ্নের জবাব এতে মেলে না। তার জবাবের জন্য তখন পৃথিবী ছেড়ে উল্কাপিণ্ডের পেছনে ধাওয়া করতে হয়। তার চাইতে বরং এই সম্ভাবনা সমধিক বলে মনে হয় যে, পৃথিবী শীতল হয়ে আসার সময় সাগরের উষ্ণ বুকে এমন প্রতিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল আবার কোন দিন যার পুনরাবৃত্তি হয়নি। সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাপমাত্রা, চাপ, লাবণিক রূপ কিংবা সেদিনের জলের উপরিভাগের বায়বীয় গ্যাসের প্রকৃতি আগের চাইতে আলাদা ছিল। ভবিষ্যতেও তেমন অবস্থার সমন্বয় ঘটেনি কোন সময়। কিমিয়াবিদ্‌রা তাদের মুচিতে বারংবার যে অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস করে ব্যর্থ হন, পৃথিবীতে সেই অবস্থার যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান ছিল এ সময়ে। সমগ্র বিশ্বজগৎ তখন যেন কাচ-নল হয়ে পড়ল। আর তার মধ্যে অনিবার্যভাবে তৈরী হল জৈব পদার্থ। ঠিক যেমন করে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল শিলা, সাগর, আর মেঘ।

ছুটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার। প্রথমতঃ, জৈব পদার্থের মধ্যে এমন কোন অভিনব জিনিস নেই যা পদার্থের জড় প্রতিবেশের মধ্যে দেখা যায় না। জৈব পদার্থের নিয়ামক শক্তিও রহস্যময় জীবনদাত্রী শক্তি নয়। যে শক্তির প্রভাবে ভৌতিক অথবা রাসায়নিক পদার্থের রূপান্তর ঘটান হয় সেই একই শক্তি জৈব পদার্থের মধ্যে সক্রিয়। মনে হয়, জীবদেহের রাসায়নিক পদার্থের যৌগিক রূপ (যার এখনও সমন্বয় হয়নি) আর কাচ-নলের মধ্যে যে রাসায়নিক সংযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব—এই ছুটি জিনিসের পার্থক্য শুধু জটিলতায়। একটি মাত্র অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে জৈব পদার্থের। সে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা। রাসায়নিকেরাও এমন বহু রাসায়নিক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দিতে পারেন নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে যা স্বতঃপুনরাবৃত্ত হবে। তবে অজৈব পদার্থের স্বতঃক্রিয়া শুধু মাত্র নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যেই সম্ভব। জৈবশক্তি পুনরুৎপাদন করতে পারে বাইরের বিবিধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে। তফাত এইখানে।

দ্বিতীয়তঃ, একথাও স্মরণ করতে হবে যে, পৃথিবীর ত্বকে যে অবস্থার জড় পদার্থের সাক্ষাৎ মেলে তার প্রকৃতি অনন্যসাধারণ। পদার্থবিদ্যার গবেষণায় জানা যাচ্ছে যে পদার্থ আর রেডিয়েসন অর্থাৎ আলোকরশ্মি অথবা তাপপ্রবাহের অদৃশ্য বিকিরণ খানিকটা পর্যায় অবধি পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য। একই ভৌতিক সত্তার ভিন্ন রূপ পদার্থ আর রেডিয়েসন। শুধু তাই নয়। এই সত্তার প্রধান অংশের কোন অস্তিত্ব থাকে না পদার্থের আকারে। সেই অস্তিত্ব ধরা পড়ে শূন্যে বিচ্ছুরিত আলো, উত্তাপ অথবা তড়িতের অদৃশ্য রশ্মি কিংবা তরঙ্গ-প্রবাহের মধ্যে। পদার্থের হিসাব নিতে গিয়ে দেখা যায় তার অধিকাংশ সঞ্চিত আছে তারকার তাপদগ্ধ জঠরে। কিন্তু পরমাণু বলতে আমরা যা বুঝি তার অস্তিত্ব এখানে নেই। এখানকার পরমাণুকে বিজ্ঞানী এডিংটন 'বিবসন পরমাণু' অর্থাৎ ইলেকট্রনের বলয়বর্জিত পরমাণু নাম দিয়েছেন। অধিকাংশ তারকার উপরিভাগ এত উত্তপ্ত যে এখানেও পরমাণু জোড় বাঁধতে পারে না। যত পদার্থের সঙ্গে এই পৃথিবীতে আমাদের পরিচয় ঘটে সেই পদার্থ গঠনের জন্য তরল জলকে রাসায়নিক ঘটকের কাজ করতে হয়। তরল জল সমগ্র বিশ্বে মাত্র সামান্য কয়েকটি বিচ্ছিন্ন স্থানে থাকতে পারে।

পদার্থের সংগঠন যে ধরনের হোক—বিবসন পারমাণবিক নিউক্লাইরূপী পদার্থ হোক, পরমাণুরূপী পদার্থ হোক, পদার্থের সাধারণ যৌগিক রূপ হোক, কিংবা জলের সাহায্যে গঠিত পদার্থের বিশেষ যৌগিক রূপ হোক, অথবা

আমরা যাকে জৈব পদার্থ বলি সেই পুনরুৎপাদনক্ষম পদার্থের জটিলতম যৌগিক রূপ হোক, সবই এক পদার্থের ক্রমিক প্রকাশ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। বিশ্ব-জাগতিক অবস্থা অনুযায়ী অনিবার্যভাবে পদার্থের এই ভিন্নরূপ সৃষ্টি হয়।

যাই হোক, অধিকাংশ জীববিজ্ঞানী স্বীকার করেন যে পৃথিবীর যাবতীয় জৈব পদার্থ খুব সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসের নির্দিষ্ট এক পর্যায়ে পৃথিবীর পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আদি জৈব পদার্থের কোন্ আকারে প্রথম দেখা দিল সে সম্পর্কে অবশ্য জীববিজ্ঞানী মহলে মতভেদ আছে। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে পৃথিবীতে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল যাতে চ্যাপটা অথবা বিন্দুর মত প্রোটোপ্লাজম জাতীয় বস্তু প্রথম দেখা দেয়। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন আর নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত এই প্রোটোপ্লাজম জেলীর মত বর্ণহীন স্বচ্ছপ্রায় বস্তু। এদের কিছু পুনরুৎপাদন করতে অসমর্থ হয়ে মারা যায়। কিন্তু যারা প্রকৃতই বেঁচেছিল বলে গণ্য করা যায় এই মৃতেরা তাদের খাদ্য হল। কেউ কেউ আবার মনে করেন যে আদিম প্রাণের পুষ্টিসাধন হয়েছে উদ্ভিদের মত। হয় প্রথম থেকে আদিম জীবের ক্লোরোফিলের (উদ্ভিদের পাতা সবুজ করে যে রঙ) সম্পদ ছিল অথবা সবুজ না হয়েও আধুনিক যুগের ব্যাকটিরিয়ার মত তারা বায়ু, জল আর লবণের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পেরেছে। ইদানীং কালের আরও দুটি আবিষ্কার আদিম কালের জীবসৃষ্টি আর তার প্রাণধারণের উপায় সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেছে। তবে সমস্ত গবেষণা মোটামুটি এই অভিমত সুদৃঢ় করে যে, জড় পদার্থ থেকে এই গ্রহে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে এবং শুধু একটি মাত্র পর্যায়ে জীবের উদ্ভব হয়েছে। খুব সম্ভবত আদিম উষ্ণ পৃথিবীর জলের উপরিভাগে উদ্ভব হয়েছিল প্রাণশক্তির। এই উদ্ভবের পেছনে পৃথিবীর সবিতার আলোকরশ্মির প্রভাব অসামান্য। এই থেকে মনে করা হয় যে মানুষ নিজেও একদিন জৈব পদার্থ সৃষ্টি করতে পারবে। জৈব পদার্থ পদার্থ বটে, কিন্তু বড় জটিল পদার্থ। বিশ্বের যত স্থানে যত পদার্থ আছে তার সব পদার্থের চাইতে বহুগুণ জটিল এর সংগঠন। আজকে একথা জানা গেছে যে বহু কোটি বছরের ব্যর্থ প্রয়াস আর নিষ্ফল পরীক্ষা অন্তে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে পরিস্রুত হয়ে অবশেষে উদ্ভব হয়েছে জৈব পদার্থের। কল্প-কল্পান্তের সাধনায় প্রকৃতি যা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে মানুষ কতদিনে কৃত্রিম উপায়ে তা সৃষ্টি করতে পারবে কে জানে?

।। মঞ্চের পরিবর্তন ।।

জীবসৃষ্টির সময় পৃথিবীতে যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল দীর্ঘদিন সেই প্রতিবেশ চলতে পারেনি বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। জৈব পদার্থ দ্রুত তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে। সেই পরিবর্তিত প্রতিবেশের মধ্যে আবার জৈব পদার্থ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল না। জৈব পদার্থের আদিমতম প্রকৃতি যাই হোক, সবুজ উদ্ভিদের বিকাশ বায়ুমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। আদিমতম বায়ুমণ্ডলে যতটা অক্সিজেন ছিল তার অধিকাংশ নিঃশেষ হয়ে যেত ভূগর্ভের বিপুল লাভাপ্রবাহের সংযোগে এসে অর্থাৎ অক্সিজেনের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত যেসব জিনিস এই লাভাপ্রবাহের মধ্যে থাকত তার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে। কিন্তু নিজেদের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য যতটা প্রয়োজন তার চাইতে বেশী অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে ছড়াতে লাগল সবুজ উদ্ভিদ্। অগ্ন্যুৎপাতের মাত্রা হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের মুক্ত অক্সিজেনের মাত্রা তার ফলে বেড়ে চলল। অধিকাংশ প্রাণীরই বাঁচার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। যে প্রাণী ক্রমবিকাশের ধারায় যত বেশী উন্নত তার তত বেশী অক্সিজেন প্রয়োজন। তাই আদিমতম প্রাণের রাজ্যে সবুজ উদ্ভিদের উদ্ভব ও প্রসার উন্নততর জীবসৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

জীবসৃষ্টির পরে বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন দ্রুত হলেও অচিরে একটা মোটামুটি স্থায়ী অবস্থা দেখা দেয়। সমুদ্রেরও পরিবর্তন হচ্ছিল। ধীর মন্থর পরিবর্তন। ক্রমে লবণাক্ত হচ্ছিল অধিকতর। সমুদ্রেও মোটামুটি একটা স্থায়িত্ব অবশ্য জীবসৃষ্টির সূচনা থেকেই দেখা দেয়। পৃথিবীর গড়পড়তা তাপমাত্রা যদি পঞ্চাশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বাড়ত তাহলে যে ধরনের জীবের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার অস্তিত্ব থাকত না। আর এই তাপমাত্রা যদি বিশ ডিগ্রী কমে যেত তো জীবের প্রসার ও পুষ্টি হতে পারত না। আবার বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন যদি চারগুণ বাড়ত কিংবা এক-চতুর্থাংশ হত তাহলেও অস্তিত্ব থাকত না জীবের। সুতরাং বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডায়কসাইড আর সমুদ্রের লবণত্ব যদি নির্দিষ্ট সীমার গণ্ডী লঙ্ঘন না করে তাহলেই জীবের অস্তিত্ব বজায় থাকা সম্ভব। ভরসার কথা, এই ভৌতিক ও রাসায়নিক অবস্থার সংকীর্ণ গণ্ডী গত একশ' কোটি বছরের মধ্যে কখনও বিপদের গণ্ডী অতিক্রম করেনি। আর পৃথিবীর উপর সূর্যদেবের তাপ বর্ষণ এমন নিয়মিত, সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের তরঙ্গে তাপ ও জলীয় পদার্থের প্রবাহ এমন সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং প্রাণীদেহের মাধ্যমে কঠিন তরল কি গ্যাসীয় পদার্থের সংবহন এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, স্যার জেম্‌স জীন্‌সের মতে, আগামীতে দশ হাজার কি লক্ষ কোটি বছরের মধ্যেও এই গণ্ডী অতিক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই।

জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলো ও তাপমাত্রা, তার আদ্রতা, লবণত্ব ও চাপমাত্রা জীববিকাশের পর থেকে নির্দিষ্ট সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অদল বদল হয়েছে মেনে নিলেও দেখা যায় যে কালের যাত্রাপথে জীবনের পটভূমিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। কখনও দেখা দিয়েছে দুঃসহ উত্তাপ। কখনও বা হিমশীতল নিষ্প্রাণতা। একবার দেখা দিয়েছে দীর্ঘস্থায়ী ধারাবর্ষণ, আবার সৃষ্টি হয়েছে শুষ্ক কনকনে ঠাণ্ডা মরুভূমি। কখনও বা সুউচ্চ পর্বতমালা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আবার কখনও দেখা দিয়েছে সূর্যকরোজ্জ্বল জগদ্ব্যাপী অগভীর জলের বিস্তার। কেন এই ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে তার জবাব পাওয়া যায় ভূবিদ্যায়।

।। ভূ-বিপ্লবের প্রভাব ।।

বহু আগেই জানা গেছে যে গুটিকয়েক ভূতাত্ত্বিক কল্প পর্বত-প্রসবের প্রচণ্ডতম বিস্ফোরণের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আবার কয়েক কল্পে বসুন্ধরা শান্ত এবং নিরুৎপাৎ ছিল। মেসোজোইক অধিকল্পে বসুন্ধরা মোটামুটি শান্ত ছিল। কিন্তু ক্রিটেসাস কল্পের শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে সেনোজোইক অধিকল্পের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আলপ্‌স, রকিজ, পিরেনিজ, ককেসাস, আপেনাইন আর হিমালয় পর্বতমালা সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়ায়। পর্বতসৃষ্টির এই আলোড়নকে ভূ-বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়। এমন ছয়টি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে পৃথিবীর জীবনেতিহাসে। পেলিওজোইক অধিকল্পের ডেভোনিয়ান কল্পে জার্মানীর আপালসিয়ান আর হল্যাণ্ডের হারসিনিয়ান শৈলমালা সৃষ্টি হয়। সিলুরিয়ান কল্পের শেষাশেষি সৃষ্টি হয় ক্যালিডোনিয়ান পর্বতমালা। স্কটল্যাণ্ড আর স্কান্দেনেভিয়ায় আজও তার কালজীর্ণ সাক্ষ্য আছে। ক্যামব্রিয়ান কল্পের প্রাক্কালে আর এক বিশাল পর্বতমালা জেগে উঠেছিল ভূগর্ভ থেকে কানাডা আর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাংশ জুড়ে। এই শৈলমালা আধুনিক কালে অবশ্য সমতল হয়ে গেছে। তারও আগে না কি আরও দুটি ভূ-বিপ্লব ঘটেছে।

বসুন্ধরার বুকে এই সব আলোড়নের ফলে স্থলভাগ বেড়ে যায়। তারপর এমন অবস্থা দেখা দেয় যাতে স্থলভাগের স্তর আরও উঁচু এবং শুষ্ক হয়। আবার আসে নিমজ্জনের পালা। ভূপৃষ্ঠের আধাআধি তখন ডুবে যায়। ভূপৃষ্ঠের বহু সম্পদ এই সময় জলের ধোয়ানিতে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হয়। স্থলভাগের উন্নয়ন তাই ভূমির ক্ষয় বাড়িয়ে দেয়। সুউচ্চ স্থলভাগ তাড়াতাড়ি চিড় খায়, ক্ষয়ে যায় কুয়াশায়। আর মাটির ধ্বংসস্তূপ আশ্রয় নেয় জলের তলায়। কাজেই পর্বতের সমুন্নত শির কালবিচারে অল্পস্থায়ী। পুনরায় বিপ্লব আসার আগেই

তার মাথা সমতল হয়ে ধুয়ে মুছে যায়। স্থলভাগ তখন মোটামুটি সমতল হয়। কুজ্ঝটিকাও কমে আসে। আর কমে আসে ঘোলা জলস্রোত।

এই সব ভূ-বিপ্লব আর তার পরবর্তী নিরুৎপাত শাস্ত যুগ কালের নিয়মিত ব্যবধানে সংঘটিত হয় বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। যে কয়টি বিপ্লবের খোঁজ জানা গেছে তাদের অন্তর্বর্তী কালের ব্যবধান পনেরো কোটি বছর। তার মধ্যে দুই থেকে তিন কোটি বছর যায় শৈলমালা গঠনে। প্রায় সমান সময় লাগে পর্বতের মাথা সমতল হতে। তাছাড়া বাকী সময়টা ধরণী শান্ত তরঙ্গায়িত অবস্থায় থাকে।

স্মরণ রাখা দরকার, জীববিকাশের পথে এই সব বিপ্লব অসীম প্রভাব বিস্তার করে। ধরণী শান্ত হয় এই বিপ্লবের ফলে। আবার তুষার যুগও আসতে পারে। তাছাড়া স্থলভাগের স্তর উন্নত হয়ে আঞ্চলিক বিশিষ্টতামণ্ডিত পৃথক আবহাওয়া দেখা দেয়। ধ্বংস আর অগ্রগতি দুটোই ঘটে একসঙ্গে। যেসব প্রাণী নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে অভ্যস্ত, কিংবা যারা বিশালকায় অথবা বিশেষ আকৃতির জীব এই সব চরম বিপর্যয়ের মুখে তারা বিলুপ্ত কি ঘায়েল হয়ে পড়ে। এদের বিনাশ আবার নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে ক্ষুদ্রকায় কিংবা বিশেষ গুণসমন্বিত প্রাণীর সম্মুখে। আগেকার যুগের বড় বড় প্রাণীর ঘায়েল অবস্থায় তারা নিজেদের উন্নতির পথ খুঁজে নেয়। যারা বেঁচে থাকে তারা বাধ্য হয় নতুন জীবনধারা অবলম্বন করতে। কাজেই বিপ্লবের এই অনুবৃত্তি ব্যাপক ধ্বংসের সঙ্গে নিয়ে আসে নতুন সক্ষম প্রাণী অথবা উদ্ভিদের জয়যাত্রার সুযোগ।

॥ আবহাওয়া পরিবর্তনের গুরুত্ব ॥

এই ব্যাপক আলোড়ন ছাড়া আর এক রকম আন্দোলন আছে। তার ব্যাপ্তিকাল অল্প হলেও প্রাণের উপর তারও প্রভাব প্রচুর। এই আন্দোলনকে স্থলভাগের সামান্য উন্নয়ন ও অবনমনের রীতি বলা যায়। জলভাগ আর স্থলভাগ পৃথিবীর ইতিহাসে মোটামুটিভাবে স্ব স্ব স্তর বজায় রেখেছে। তবে মহাদেশগুলির প্রান্তভাগ কোথাও কোথাও চিরতরে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু মহাদেশগুলির অধিকাংশ জমি সমুদ্রের জলরেখা থেকে বেশী উঁচু নয়। সব সময় রূপ বদলাচ্ছে এই সব অংশের। কখনও বন্যায় এর বৃহৎ অংশ হয়ত অগভীর সমুদ্রে ডুবে গেল। বাকীটা জলের উপরে থেকে গেল। আমরা এখন এমন এক যুগে বাস করছি যখন ডাঙায় জমির পরিমাণ সব চেয়ে বেশী। কিন্তু আবার যেদিন নিমজ্জনের পালা আসবে, পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ যখন ডুবে যাবে, কি দশা হবে

ডাঙার প্রাণীর ? নিমজ্জনের দিন এলে এ তো ঘটবেই বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। তবে ভরসার কথা, আগামী লক্ষ লক্ষ বছরের মধ্যে তেমন সম্ভাবনা নেই।

শুধুমাত্র তাপমাত্রা অথবা বৃষ্টিপাতের পরিমাণের চাইতে আবহাওয়া পরিবর্তনের গুরুত্ব জীবনের ক্রমবিকাশের পক্ষে অনেক বেশী। তথ্যসন্ধানীরা বলেন, পৃথিবীর যে আন্দোলনের ফলে স্থলভাগ ও জলভাগের পরিমাণ নির্ধারিত হয়, আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রধানতঃ সেই আন্দোলনের প্রভাবে ঘটে থাকে। খুব বেশী জমি যখন জলের উপরে থাকে তাপমাত্র সেই সময় সাধারণতঃ কম হয়। স্থলভাগের আবহাওয়াকে তখন মহাদেশীয় আবহাওয়া বলা যায়। অর্থাৎ শীতকালে ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মে গরম আর মোটামুটি শুষ্ক আবহাওয়া। স্থলভাগের স্তর যত বেশী উন্নত হবে আবহাওয়ার উপর সেই উন্নয়নের প্রভাব তত বেশী পড়বে। বিশাল বিশাল ভূখণ্ডের উন্নয়ন পৃথিবীর তাপ-বিকিরণ ব্যাবস্থায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বলে আবহাওয়ার উপর তার প্রভাব পড়ে। এই উন্নয়নের জন্য বায়ুপ্রবাহের ধারা পরিবর্তিত হয়। কেন, কি ভাবে এই পরিবর্তন ঘটে সেই জটিল প্রশ্নের জবাব আবহাওয়াতত্ত্ববিজ্ঞায় পাওয়া যায়।

ভূখণ্ডের উন্নয়ন শুধু যে বায়ুপ্রবাহের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা বদলে দেয় তাই নয়, জলপ্রবাহের রীতিও বদলে যায়। সমুদ্র যখন প্রশস্ততর হয়, কোন মেরুদেশের অস্তিত্ব যখন থাকে না, কিংবা মাটির বেষ্টনী যখন মেরুসাগরকে (পোলার সী) ঘিরে থাকে না, উষ্ণ জলপ্রবাহ তখন উপর দিয়ে মেরুর দিকে এগোতে পারে। সেখানে শীতল হয়ে সেই উষ্ণ জল তখন নীচের দিকে তলিয়ে যাবে এবং সমুদ্রের তলদেশ বরাবর সরে আসবে। কোন মেরুসাগর এই অবস্থায় মেরুমণ্ডলে গড়ে উঠতে পারে না। উষ্ণতাপিয়াসী জীবজন্তু তখন মেরুমণ্ডলের সাগরের দিকে এগোতে ভরসা পায়। আবার মেরু অঞ্চলের জলরাশি যখন মাটির বেড়ায় আটকা পড়ে, জলপ্রবাহ তখন ব্যাহত হয়। উত্তর গোলার্ধের অবস্থা এখন ঠিক এই রকম। তাই মেরুমণ্ডলে বরফ জমতে পারছে। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের মত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডও এই কারণে অনিবার্যভাবে তুষারাস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে। স্থল অথবা জলের যেখানে বরফ জমবে সেখানকার তাপমাত্রা নিশ্চয় হ্রাস পাবে।

মোটামুটি বলা যায় যে পৃথিবীর অনেকটা জমি যখন জলের তলায় ডুবে থাকে, দুনিয়ার আবহাওয়ায় তখন অল্পবিস্তর একটা সমতা আসে। আবার যখন খুব বেশী জমি জলের উপরে থাকে তখন এই পৃথিবীর আবহাওয়া বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ পায়। কোথাও প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, কোথাও শুষ্ক উষরতা, কোথাও নাতিশীতোষ্ণতা, আবার কোথাও বা মেরুমণ্ডলের প্রচণ্ড শীত দেখা দেয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ধীর মন্থর আন্দোলনে পরিবর্তিত হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ। এই আন্দোলন অনিয়মিত নয়। একবার সমুদ্র গ্রাস করে স্থলভাগ, আবার পরিসর বৃদ্ধি হয় ভূভাগের। আবহাওয়া একবার সমুদ্রের মত শীত-গ্রীষ্মের আধিক্যবর্জিত মৃদুরূপ পরিগ্রহ করে, কখনও শীত-গ্রীষ্ম তীব্র হয়, আবার কখনও বা মহাদেশীয় আবহাওয়ার রূপ পায়। কখনও পৃথিবীতে আবহাওয়ার ব্যাপক সমগোত্রত্ব দেখা দেয়। আবার কখনও দেখা দেয় আঞ্চলিক বিশিষ্টতামণ্ডিত পৃথক আবহাওয়া। বারবার পুনরাবৃত্তি হয় এই রীতির। "আবহাওয়ার প্রতিটি পরিবর্তন গভীর প্রভাব বিস্তার করে জীবনের উপর। এই আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর জীবনেতিহাসে জীবশক্তির বহুমুখী অভিযোজনের (এডাপ্‌টেসন) ক্ষমতা বারবার পরীক্ষিত হয়েছে। অতীত যুগের আবহাওয়া পরিবর্তনের পুরো ইতিহাস এখনও জানা যায়নি। তবু স্মরণ রাখতে হবে যে জীবনের ক্রম-বিকাশের পথে বিপদ বড় কম আসেনি। এই গ্রহের জীবনেতিহাসে এমন অবস্থাও দেখা দিয়েছে যখন সর্বগ্রাসী বিনাশ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই চরম পরীক্ষাতেও জৈবশক্তি উত্তীর্ণ হয়েছে। বাধ্য হয়েছে নতুন গুণ আয়ত্ত করে জীবন-সংগ্রামে বেঁচে থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে। আর এই অগ্নি-পরীক্ষা প্রতিবার নতুনতর সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে জীবনের অভিব্যক্তির পথে। জীবনের মিছিল এগিয়ে গেছে বিজয়ীর গর্বে।

প্রাণবিকাশের ধারা

স্মরণাতীত কালের জীবনের ইতিহাস জানতে হলে শিলার সাক্ষী অবলম্বন করে পেছিয়ে যেতে হয়। স্তরীভূত শিলার উপর অঙ্কিত চিহ্ন আর জীবাশ্ম এই যুগের ইতিহাসের একমাত্র উপাদান। শ্লেট, চুনাপাথর আর বেলে পাথরের বুকে রক্ষিত হাড়, খোলস, তন্তু, শাখা, ফল, পদচিহ্ন, আঁচড় প্রভৃতির পাশাপাশি আদিম কালের বানের চিহ্ন আর বৃষ্টির ফোঁটার দাগ সযত্নে পরীক্ষা করে এই ইতিহাস জোড়া দিতে হয়েছে। কিন্তু পাললিক শিলা ঠিক স্তরে স্তরে সাজান অবস্থায় পাওয়া যায় না। বহু সাধনায় এই ভাঙাচুরা, আঁকাবাঁকা বিকৃত ও মিশ্রিত শিলাপিণ্ডের ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে।

।। আজোইক শিলা ।।

এমন শিলাস্তরের সন্ধানও পাওয়া গেছে যার উপর প্রাণের কোন সাক্ষ্য নেই। আদিমতম যুগের শিলাস্তর সংগঠিত প্রাণের চিহ্নবর্জিত। ভূতাত্ত্বিকরা এই শিলাস্তরের নাম দিয়েছেন আজোইক শিলা। উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আজও এই শিলা অবারিত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। এই শিলা এত পুরু যে ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের অর্ধেক কাল এই শিলাস্তরে বিধৃত। স্থলভাগ আর জলভাগ পৃথক হবার পর থেকে আরম্ভ করে ইদানীংকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের অর্ধেক দিনের জীবনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বলে একথা প্রতিপন্ন হয় না যে জীবনের আদি ইতিহাস সম্পর্কে কোন তথ্য জানা সম্ভব নয়। একালের ইতিহাসের জন্য পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করা যেতে পারে। তুলনামূলক শারীরস্থান আর ভ্রূণবিদ্যা যোগায় সেই পরোক্ষ প্রমাণ। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে সাক্ষ্যবর্জিত শিলীভূত অতীত যুগের ঘটনা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা সম্ভব। সেই সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে, জীবনের প্রথম উদ্ভবের দিন থেকে আরম্ভ করে যে কালের জীবনের শিলীভূত প্রচুর সাক্ষ্য পাওয়া গেছে সেই ক্যামব্রিয়ান কল্পের ব্যাবধান কালগণনায় কমপক্ষে পঞ্চাশ কোটি বছর।

আদিমতম শিলা প্রথম যেভাবে সঞ্চিত হয়েছিল তার চাইতে ব্যাপক রূপান্তরিত আকারে আমরা দেখেছি। সংগঠিত জৈবশক্তির কোন সাক্ষ্য নেই তার উপর। অবশ্য যদি আমাদের এই পৃথিবীর সেই তাপদগ্ধ ঝটিকাক্ষুব্ধ যুগে সত্যই জীবনের কোন অস্তিত্ব থেকে থাকে। প্রাচীনতম যুগের শিলার বিশাল স্তূপ স্যাঁকা, তুমড়ান আর কঠিন অবস্থায় পাওয়া গেছে কানাডা ও গ্রীনল্যাণ্ডের খনির আকরে। এই শিলাস্তরের যুগকে আদিমতম প্রাণের কল্প বলা হয়। একথা মনে করার কারণ আছে যে জীবনের অস্তিত্ব কোটি কোটি বছর আগেও ছিল। আদিমতম আর্কিওজোইক শিলা ১৭০ কোটি বছর আগেকার দিনের সাক্ষী। এই শিলাস্তরে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে তার মধ্যে জীবনের চিহ্ন অকিঞ্চিৎকর। গ্রাফাইট (কৃষ্ণসীস) আকারে কার্বনের স্তর আছে এই শিলার মধ্যে। রাসায়নিক জ্ঞান বলে, এই জিনিস কোন-না-কোনও জৈব পদার্থের সূচক। সম্ভবত জলীয় উদ্ভিদের।

॥ প্রোটেরোজোইক শিলা ॥

তার পরেকার অধিকল্পের জীবনের চিহ্নও নগণ্য। এই প্রোটেরোজোইক অধিকল্পের ব্যাপ্তিকাল আর্কিওজোইক অধিকল্পোত্তর সময়ের এক-তৃতীয়াংশ। এ কালের বহু শিলা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আনুমানিক একশ' কোটি বছর আগে এই অধিকল্পের সূচনায় সমুদ্রতরঙ্গ যে দাগ সৃষ্টি করেছিল আজও তা দেখা যায়। তাছাড়া সে কালের শিলাপিণ্ডের অবস্থা মোটামুটি আধুনিক যুগের মত। তার মানে, পৃথিবীর সাধারণ অবস্থা তখন একটা স্থায়িত্ব লাভের দিকে চলেছে। সে কালের অবস্থার সঙ্গে আধুনিক কালের অবস্থার এমন বিরাট কোন পার্থক্য ছিল না।

আর একটি ঘটনা ঘটল এর পরে। এল তুষার যুগ। কানাডায় প্রাপ্ত প্রোটেরোজোইক শিলাস্তরে এই তুষার যুগের চিহ্ন পাওয়া গেছে। অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে কিংবা চীনে তুষার যুগের যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে তা হয়ত আর একটি তুষার যুগের, বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই যুগ আসে প্রোটেরোজোইক অধিকল্পের উত্তরভাগে। দুটির ব্যবধান আনুমানিক বিশ কোটি বছর। আমরাও আজকে আর একটি তুষার যুগের পরে বেঁচে আছি। তুষার যুগোত্তর কালে পৃথিবী ক্রমান্বয় শীতল হয়ে আসবে এমন শঙ্কার কারণ নেই। বরং তুষার যুগ পৃথিবীর ইতিহাসে পর্যায়ক্রমিক আবর্তনমূলক ঘটনা। অবশ্য দীর্ঘকালের ব্যবধানে এই যুগ আসে।

॥ ক্যামব্রিয়ান শিলা ॥

পৃথিবীর ইতিহাসের পরের পাতায় ক্যামব্রিয়ান শিলার কাহিনী লেখা। কালবিচারে এই যুগ প্রাচীন প্রাণের কল্প অর্থাৎ পেলিওজোইক অবিকল্প। এই কালের শিলাস্তরে সহসা প্রাণের প্রাচুর্য দেখা যায়। আগেকার যুগের সঙ্গে তুলনা করলে সত্যই অবাক লাগে। প্রচুর স্পঞ্জ আর ল্যাম্পসেল বিদ্যমান ছিল ক্যামব্রিয়ান কল্পের প্রথম ভাগে। আর ছিল আদিম যুগের অভিনব সন্ধিপদ প্রাণী, বিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম ট্রিলোবাইট। জেলীর মত মাছেরও অভাব ছিল না। সাচ্চা প্রবাল তখনও গড়ে ওঠেনি। জীবাশ্ম থেকে মনে হয়, এ কালের অধিকাংশ প্রাণী সমুদ্র সৈকতের অগভীর জলের তলায় বাস করত। অবশ্য সমুদ্রবক্ষে ভাসমান কিছু প্রাণীর জীবাশ্মও পাওয়া গেছে। এই ক্যামব্রিয়ান কল্পের পরবর্তী প্রতিটি যুগের প্রচুর জীবাশ্মের সন্ধান মিলেছে। পূর্ববর্তী কল্পের শিলাস্তরের সঙ্গে পরবর্তী কালের শিলাস্তরের বৈসাদৃশ্য বিস্ময়কর। প্রোটেরোজোইক অধিকল্প থেকে ক্যামব্রিয়ান কল্পে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনের ইতিহাস যেন ছায়াচ্ছন্ন উপকথার রাজ্য ছেড়ে লিখিত ইতিহাসের যুগে প্রবেশ করল। জীবাশ্মের আকস্মিক প্রাচুর্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনুমান করা হয়েছে যে চুনের সাহায্যে প্রাণীদেহে পোক্ত কঙ্কালসৃষ্টি হয় এই পর্যায়ে। কাজেই এই কালের অস্থি জীবাশ্ম হিসাবে সহজেই রক্ষিত হয়েছে।

॥ এককোষী জীব ॥

জীবনের উদ্ভব যে আকারে হোক না কেন জৈবকণা অচিরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে সংগঠিত হয় এবং সমভাগে বিভক্ত হয়ে বংশবৃদ্ধি করে। সুদীর্ঘ কাল কেটেছে কোষ আর নিউক্লিয়স গঠনে। এই জীবকোষ ঘণ্টায় ঘণ্টায় জীবন-মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচনে। বিজ্ঞানীদের মতে আধুনিক কালের জীবের আদিমতম কুলপতির গড়ন কোষের কিংবা ব্যাকটিরিয়ার মত ছিল। তারপর আহার্য গ্রহণের পদ্ধতির দরুন নিশ্চয়ই পার্থক্য সৃষ্টি হয়। জৈবশক্তির প্রধান প্রধান ধারার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির এইটি অন্যতম কারণ। একদল ক্লোরোফিলের মাধ্যমে সৌররশ্মি আহরণ করেছে (আদিম উদ্ভিদ্), আর দ্বিতীয় দল নিজেরা কিছু তৈরীর চেষ্টা না করে তৈরী জিনিস আহার করে প্রাণধারণ করেছে। এ ছাড়া ব্যাকটিরিয়া (জীবাণু) জাতীয় জীব প্রাণধারণ করেছে নানা অদ্ভুত উপায়ে।

এ বিষয়ে সংশয় নেই যে আদিমতম কৌষিক কিংবা প্রাক্‌কৌষিক জীব যুগ-যুগান্তের মন্থর পরিবর্তনের ফলে সাম্প্রতিক আকৃতি লাভ করেছে। আবার এও সত্য যে একটি মাত্র কোষের মধ্যে নিজেকে নানা বিস্ময়করভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা করে জৈবশক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে। অসংগঠিত জৈবশক্তিকণার মিলনে প্রকৃত কোষগঠন জীবনের অভিব্যক্তির পথে এক বিরাট পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপের ফলে এককোষী জীব পরিশেষে বহুকোষী মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে।

।। কোষের সংহতি সাধন ।।

কোষ পর্যায়ে নিবদ্ধ প্রাণশক্তির যত প্রকারণ থাক না কেন, সে শক্তি দুর্বল না হয়ে পারে না। এর পরবর্তী পর্যায়ে এল বৃহত্তর ইউনিট গঠনের পালা। এজন্য জৈবশক্তি নিশ্চয়ই বহুতর পরীক্ষ-নিরীক্ষা করেছে। কখনও বিভিন্ন কোষ নিজস্ব কলেবর বৃদ্ধি করেছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে তাদের নিউক্লিয়স। কিন্তু এই পদ্ধতির একটা সীমারেখা আছে যা অতিক্রম করা যায় না। অতি সামান্য কয়েকটি কোষ এই পদ্ধতিতে বিন্দুর আয়তন অতিক্রম করতে পেরেছে। সংহতির জোর ঢের বেশী। স্বকীয় সত্তা বিসর্জন না দিয়েও জীবকোষ সংহত হতে পারে। এই সংহতি প্রথম এসেছিল মালার আকারে। উদ্ভিদ্ সম্ভবত এই কোষের মালা থেকে সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ সামুদ্রিক গুল্ম এবং ছত্রাকের (ফাংগাস) দেহে এক একটি কোষের সংযোগে তৈরী তন্তু তাদের প্রাণশক্তির মৌলিক ইউনিট।

উদ্ভিদের কথা থাক। এক কোষ থেকে বহুকোষী প্রাণীর উদ্ভব কেমন করে হল সে রহস্য আজও অপরিজ্ঞাত। এ ক্ষেত্রেও সংহতি সম্ভবত প্রথম পদক্ষেপ ছিল। তবে এই সংহতি শিলা কি গুল্মের গায়ে ঘটেছিল, না এই জোটবাঁধা কোষ সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়াত তা বলা যায় না। প্রথমটার সম্ভাবনা বেশি। জীবকোষের এই জোটবাঁধার মধ্যেও উদ্ভিদের মত কর্মবিভাগ ছিল নিশ্চয়ই।

।। কলা গঠন ।।

বৃহত্তর জৈবশক্তি সৃষ্টির প্রয়াসে জোটবাঁধার যত প্রয়াস জীবকোষ করেছে তার মধ্যে দুটি সফল হয়। একটির ফলে সৃষ্টি হয় স্পঞ্জের, আর অপরটি সৃষ্টি করল কোলেনটোরেট পলিপ্‌স। স্পঞ্জকে জীবনের কানাগলি বলা যায়। স্পঞ্জ থেকে উন্নততর কোন জীবসৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় প্রয়াসের সাফল্য বেশ প্রগতিশীল সম্ভাবনা সৃষ্টি করল। কোলেনটোরেটরা নিজস্ব কলা (টিস্যু) ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আরও উন্নত করল। পাকস্থলীতে খাদ্য প্রেরণের জন্য তারা

মুখও সৃষ্টি করল। আর জালের মত সরল এক নার্ভাস সিসটেমও গঠন করেছিল নিশ্চয়ই। কলাকে দেহের টেলিগ্রাফ তার বলা যায়। এই কলাসৃষ্টির ফলে দেহের বিভিন্ন অংশ ও অঙ্গের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার নতুন সূত্র তৈরী হল। আভ্যন্তরিক এই যোগাযোগ ব্যবস্থা অনিবার্যভাবে মুখের চারপাশের অংশকে আরও বিশিষ্টতামণ্ডিত করে তোলে, যার প্রভাবে কালক্রমে সৃষ্টি হল মাথার, মানুষের মুখমণ্ডল ও মস্তিষ্কের। কোলেনটোরেটের অবশ্য মুণ্ড ছিল না।

॥ দেহের সুষমতার উদ্ভব ॥

আরও কয়েকটি পদক্ষেপে জৈবশক্তি প্রথমতঃ সমুদ্রের শিলা ও শৈবালের বন্ধন মুক্ত হয়ে সাগরের বুকে অবাধে বিচরণ করতে আরম্ভ করল। ঘরকুনো স্বভাব লোপ পেল জীবের। এরপর নিজের দেহে পেট ও পিঠ, উপর-নীচ, ডাইন-বাঁ গঠন করে অঙ্গের উভয় দিকের সুষম অবস্থা সৃষ্টি করল। কারণ, এই সুষমতা (সিমেট্রি) ছাড়া সুষ্ঠুভাবে দেহের গতিসঞ্চার করা যায় না। দুই পার্শ্ববিশিষ্ট প্রথম প্রাণী সম্ভবত বুকেহাঁটা চ্যাপটা পোকার মত ছিল। দেহের একপাশে ভর করে চলত। চলার সময় দেহের এক প্রান্ত সব সময় সম্মুখে থাকত। এতে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আরও বিশিষ্টতামণ্ডিত হল। ইন্দ্রিয়স্থান আর কলার একাগ্রতা সম্মুখভাগে নিবদ্ধ থাকায় মুণ্ড ও মস্তিষ্কের বিকাশের সূচনা হল।

॥ রক্তের সৃষ্টি ॥

চ্যাপটা এই জীবদেহে রক্ত ছিল না। এই জন্যই চ্যাপটা হতে হয়েছে। যাতে চারিদিকের জলের প্রাণদাতা অক্সিজেন থেকে দেহের অভ্যন্তরভাগের কোন অংশ বেশী দূরে না থাকে। পরবর্তী পদক্ষেপে সৃষ্টি হল রক্ত আর রক্তবাহী কলা। রক্ত থাকলে প্রাণীর পক্ষে ত্রিমাত্রিক বাড়তি অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে আর স্থূলতায় বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব হয়। দেহের নিগূঢ়তম প্রান্তে অক্সিজেন সংবহন করতে পারে রক্তপ্রবাহ। জীবদেহে এই নতুন উপাদান সংযোজনের ফলে দেখা দিল গোল পোকা। আর একটি বিশিষ্টতা সৃষ্টি হল গোল পোকার দেহে। নীচু পর্যায়ের জীবদেহে খাদ্য গ্রহণ আর মলত্যাগের দ্বার এক। কিন্তু পাকনালী অচিরে আর একটি দ্বার সৃষ্টি করল। তার নাম মলনালী। এই নতুন অঙ্গ সৃষ্টির দরুন প্রাণীর পক্ষে অনবরত খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হল। পাকনালীও অচিরে খাদ্য গ্রহণ আর হজমের গুণবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে পর্যায়ক্রমে ভাগ হয়ে পড়ল।

॥ দেহকন্দর গঠন ॥

তারপর সৃষ্টি হল দেহকন্দর (সিলম)। আমাদের বুক ও পেটের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে জলীয় কন্দরে ঝুলে থাকে সেই স্থান। দেহকন্দর সৃষ্টি হওয়ায় পাকনালীর সঙ্গে দেহের প্রাচীরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রইল না। দেহের উপরিভাগ যে ভাবেই সঞ্চালিত হোক না কেন, ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকল না। আর এই কন্দরের জলীয় অংশের অন্তর্গত রক্তের শ্বেতকণিকা জাতীয় কোষ প্রহরীর মত দেহরক্ষীর কাজ করতে থাকল। কোন ব্যাকটিরিয়ার সাধ্য রইল না এদের ফাঁকি দিয়ে শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে।

॥ নার্ভতন্ত্রের সূচনা ॥

কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিসটেম, রক্তবাহী নল, মুখ আর মলনালীসম্পন্ন কৃমি জাতীয় প্রাণী থেকে উন্নততর যাবতীয় প্রাণীর শাখা উৎপন্ন হয়েছে। এই প্রধান ধারা থেকে একটি শাখা সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম করডেট (তাম্বুলাকার জীব)। এই করডেট মেরুদণ্ডী প্রাণীর আদি জীব। বেশ পেশল হয়ে ওঠে এরা। পিঠের দিকে এরা নমনীয় একটি দীর্ঘ দণ্ড সৃষ্টি করে। তাছাড়া মলনালীর পেছনে তাদের দেহে লেজের মত একটি উপাঙ্গ সৃষ্টি হয়, যার ফলে তাদের সন্তরণের প্রচুর সুবিধা হল। গোটা দেহ মাছের মত এপাশে ওপাশে কাত করে সাঁতার কাটার গুরুত্ব অভিব্যক্তির দিক থেকে অপরিসীম। অভিব্যক্তির পথে অগ্রগতির জন্য জলজ প্রাণী যত পথ আবিষ্কার করেছে সাঁতার কাটা তার মধ্যে সব চাইতে বেশী ফলপ্রসূ হয়েছে। কোটি কোটি বছর আগে মেরুদণ্ডী প্রাণী জলত্যাগ করে এসেছে। তবু আমাদের মত মেরুদণ্ডীর দেহে সন্তরণের প্রতিক্রিয়া এখনও বিদ্যমান। আমাদের সুষুম্নাকাণ্ড ও মেরুদণ্ডের গড়ন, আমাদের পেশী ও নার্ভের খণ্ডিত প্রকৃতি, আমাদের ইন্দ্রিয়স্থানের পার্শ্বাভিমুখী বিন্যাস, আমাদের কান, সব আমাদের কৌলিক সন্তরণাভ্যাসের স্বাক্ষর বহন করছে।

আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণী সম্ভবত অ-লবণাক্ত জলে বাস করত। মধ্য-অরডোভিসিয়ান কল্প থেকে আরম্ভ করে গোটা সিলুরিয়ান, এমন কি ডেভোনিয়ান কল্পের প্রথম ভাগ পর্যন্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর সমস্ত জীবাশ্ম অ-লবণাক্ত জলের পঙ্কস্তরে পাওয়া গেছে। নদীর মাছ স্রোতের মুখে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। একমাত্র উজানে সাঁতার কাটতে পারলেই স্রোতের টানে তাকে সমুদ্রে ভেসে যেতে হয় না। আমাদের কৌলিক (অ্যানসেস্ট্রাল) জীবও এই ভাবেই সাঁতার কাটতে শেখে হয়ত। তবে লেজটা নদীগর্ভে সৃষ্টি হোক আর নাই হোক, ক্রমবিকাশের পক্ষে

(লেজের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। লেজের কথা ভাবতে আজকে আমাদের লজ্জা হয়। কিন্তু একথা ভোলা উচিত নয় যে আঙুল সহ অঙ্গ সৃষ্টি হবার আগে লেজের সাহায্যে সাঁতার কেটেই আমাদের কৌলিক জীব ক্রম-বিকাশের পথে এগিয়ে গেছে। বলতে গেলে, আজ আমরা যা হয়েছি এই লেজের জন্যই তা হতে পেরেছি।)

॥ ক্যামব্রিয়ান কল্পের জীবের বৈশিষ্ট্য ॥

ক্যামব্রিয়ান কল্পে প্রাণীর প্রাচুর্য থাকলেও সে কালের প্রাণী স্থলে বাস করত না। কোন মেরুদণ্ডী প্রাণী, কোন পতঙ্গ বা মাকড়সা বা মাছ পর্যন্ত ছিল না একালে। তাছাড়া একালের কোন প্রাণীর শ্রবণশক্তি কিংবা রঙ চেনার মত দৃষ্টিশক্তি ছিল বলে মনে হয় না। নিজেদের সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার বাইরে কিছু শেখার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। বীজ বা ফল দূরে থাক, শিকড় বা কাঠবিশিষ্ট কোন কাণ্ডও ছিল না একালের উদ্ভিদের। সমুদ্রবক্ষে প্রাণের প্রাচুর্য ছিল। তার প্রকারণও ছিল। আর প্রতিটি প্রধান দল নানা শাখা-প্রশাখায় বিকশিতও হচ্ছিল। সন্ধিতপদ প্রাণীর মধ্যে কাঠপোকার মত ট্রিলোবাইট নামে প্রাণী ক্যামব্রিয়ান কল্পের সব চাইতে উন্নত জীব।

পেলিওজোইক অধিকল্পের জীবের তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, পরবর্তী কালে বিলুপ্ত বহু প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল একালে। দ্বিতীয়তঃ, একালের অনুন্নতদেহী জীবও অদ্যাবধি অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর তাদের সাধারণ আকৃতি বজায় রেখেছে। তৃতীয়তঃ, একালের উন্নতদেহী জীবের মধ্যেও আকৃতি-গত উন্নতি খুব হয়নি।

অভিব্যক্তির ধারায় জীবনের সবটা বিনষ্ট বা রূপান্তরিত হয় না। পুরানর অনেকটা রক্ষিত হয়। তবে প্রতি যুগের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের জটিলতা নষ্ট হয়ে তার জায়গায় নতুন উন্নত অঙ্গ যোজিত হয়। থলথলে পদার্থে তৈরী জেলীর মত মাছ বা পোকা থেকে যদি ক্যামব্রিয়ান যুগের বিচার করা হয় তো তাকে অনায়াসে আধুনিক যুগ বলা চলে। কিন্তু অভিব্যক্তির বিচার করতে গিয়ে নিশ্চয়ই ক্রম-বিকাশের ধারার সেরা সৃষ্টির কথা ভাবতে হবে। যে পৃথিবীতে ট্রিলোবাইটের মত পোকার মধ্যে জৈবশক্তি চরম বিকাশ লাভ করেছে, অভিব্যক্তির ধারায় তার চলার পথের অনেক বাকী।

অরডোভিসিয়ান কল্পের শেষ ভাগে ট্রিলোবাইটদের নিরাপত্তা ও প্রাধান্যের যুগ শেষ হয়ে আসে। ক্যামব্রিয়ান কল্পে দেড়শতাধিক গণ ছিল জীবের। কিন্তু

সিলুরিয়ান কল্পে মাত্র পঁয়ত্রিশটির খোঁজ পাওয়া গেছে। হটে যাচ্ছিল এরা। নতুন শক্তিশালী জীব তখন সমুদ্রবক্ষে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করেছে। ট্রিলোবাইটদের প্রাধান্য-লুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সামুদ্রিক বৃশ্চিকের উত্থান ঘটে। সিলুরিয়ান কল্পের শেষ ভাগে খাঁটি বৃশ্চিকের আবির্ভাব হয়। আজকের দিনের বৃশ্চিকের সঙ্গে তাদের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য ছিল মোটামুটি। এই বৃশ্চিকেরা স্থলভাগের প্রথম প্রাণী। তবে তারা অগ্রদূত মাত্র। স্থলে বেঁচে থাকার মত দৈহিক সম্পদ এদের ছিল না। কাজেই জল ও স্থলের কিনারায় বসবাস করেছে—আধুনিক কালের কাঁকড়ার মত। ঠিক এই সময়ে শতপদ বৃশ্চিকের সন্ধান মেলে। আজকে এরা ডাঙার বাসিন্দা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সিলুরিয়ান কল্পের শেষ ভাগে জলজ প্রাণী সাময়িকভাবে স্থলাভিযান করে। এই বিশাল শুকনো জমিতে উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রপাত করে। সন্ধিতপদ প্রাণীর মধ্যে যাদের দেহে কঠিন বহিরাবরণ ছিল, কানকো যাদের শ্বাস গ্রহণের অঙ্গের শুকিয়ে যাওয়া রোধ করেছে, মনে হয় তারাই স্থলাভিযাত্রীদের অগ্রগামী দল। স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রথম লক্ষণ দেখা দেয় ডেভোনিয়ান কল্পে। শিলীভূত পদচিহ্ন থেকে ভূতাত্ত্বিকেরা জানতে পেরেছেন যে স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণী ডেভোনিয়ান কল্পের কাদার মধ্যে বিচরণ করত। আদিম মীনের একটি গণ থেকে সৃষ্টি হয় এই নতুন জীবের। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে বসবাসের উপযোগী ফুসফুস আর পা কেমন করে সৃষ্টি হল সে কথা পরে বলা হয়েছে।

প্রাণের নতুন উপনিবেশ

প্রাণহীন ভূপৃষ্ঠের কল্পনা করা কষ্টকর। তবু একথা সত্য যে জীবসৃষ্টির পর থেকে জীবনের লীলাখেলা চলেছে জলের তলায়। স্থলভাগ তখনও উষর। আজকের মরুভূমির চাইতে নেড়া আর উষর ছিল সে যুগের ভূপৃষ্ঠ। সে যুগের নেড়া পাহাড় আর নিষ্প্রাণ সমভূমিতে শুধু বাতাস আর বৃষ্টি শব্দের স্পন্দন সৃষ্টি করত। এমন কি ভূপৃষ্ঠে যেদিন স্থলচর উদ্ভিদ্ সৃষ্টি হল তখনও তারা শুধু জলের কিনারে বসুন্ধরার আদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। ডেভোনিয়ান কল্পের মধ্য ভাগের আগে বসুন্ধরার বুকে সবুজ উদ্ভিদের আভরণ আর জীবনের চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়নি।

॥ উদ্ভিদের রূপান্তর ॥

তখনকার স্থলভাগের চেহারা আজকের মত ছিল না। কারণ, খাঁটি মাটি তখনও সৃষ্টি হয়নি। মাটি প্রধানতঃ উদ্ভিদের জন্য সৃষ্টি হয়। জল ধরে রাখার মত উদ্ভিদের গালিচা কিংবা মূলের জাল তখনও গড়ে ওঠেনি। ভূপৃষ্ঠ যাতে তাপ না হারায়, কিংবা তার বুকে যাতে বেশী তাপ না লাগে তার ব্যবস্থা করার মত উদ্ভিদের আস্তরণ তখনও ছিল না বসুন্ধরার। কাজেই কুয়াশা, বাতাস, বৃষ্টি আর সৌরতাপের প্রকোপ বেশী ছিল। এমন কি, স্থলচর উদ্ভিদের জন্ম হবার পরেও বসুন্ধরার অধিকাংশ স্থান মরুভূমি কিংবা আধা-মরুময় ছিল। কারণ, প্রচুর পরিমাণ আদ্রতা ছাড়া প্রথম যুগের স্থলচর উদ্ভিদের চলত না। শুষ্ক স্তেপভূমিতে যে সব তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মাতে পারে তারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সৃষ্টি। পেলিওজোইক অধিকল্পে তাদের অস্তিত্ব ছিল না। মেসোজোইকে ছিল সামান্য। ত্রিয়াসিক কল্পের উদ্ভিদ্কুল আর তার প্রাণীসম্পদও ছিল মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণীর মত। কোন প্রাণী সেকালে কোথাও যদি থেকে থাকে তো আজকে হয়ত সে অঞ্চল স্তেপভূমি কিংবা নিষ্পাদপ সমভূমিতে পরিণত হয়েছে।

এই পটভূমির কথা স্মরণ রাখলে সেকালের বসুন্ধরা সম্পর্কে ভূতাত্ত্বিকদের মন্তব্য বোঝা সহজ হবে। ভূতাত্ত্বিকরা বলেন, ডেভোনিয়ান আর ত্রিয়াসিক

কল্পের বসুন্ধরা মোটামুটি মরুময় ছিল। কিন্তু যে স্থলভাগ সম্পর্কে এই মন্তব্য করা হয়েছে তার অধিকাংশ আজ সবুজ উদ্ভিদে আস্তীর্ণ। সেকালের নিষ্প্রাণতার দুঃখ প্রাণশক্তির বহুরূপী বিকাশ কালক্রমে ঘুচিয়েছে। সুউচ্চ গিরিশিখর হোক, আর হিমশীতল ধরাপৃষ্ঠ হোক, সর্বত্র প্রাণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। সেদিন এখানে উদ্ভিদ্ জন্মাতে পারেনি। কারণ, এ অঞ্চলের আবহাওয়া তখন প্রাণ-ধারণের উপযোগী ছিল না। আর উদ্ভিদের অভাব ছিল বলে বসুন্ধরার শুষ্কতাও সেকালে বেড়ে গিয়েছিল।

মানবসভ্যতার মত উদ্ভিদ্ও ক্রমান্বয় তার অধিকারের সীমা প্রসারিত করেছে। প্রাণে বাঁচার তাগিদে সূর্যতেজ আহরণের যে ক্ষমতা উদ্ভিদ্ আয়ত্ত করেছিল, সেই ক্ষমতা আশীর্বাদরূপে ধরণীকে সমৃদ্ধ করেছে—বসুন্ধরার আবহাওয়া আর প্রকৃতি স্নিগ্ধ সুষমামণ্ডিত করে পতিত জমির পরিসর সংকুচিত করেছে। প্রাণীর আগেই উদ্ভিদ্ ধরাপৃষ্ঠে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল বলে উদ্ভিদের অভিযান মানুষের অভিব্যক্তির অপরিহার্য প্রাক্-শর্ত। তবু ভাবতে অবাক লাগে যে সমুদ্রগর্ভে প্রাণের বিকাশ এবং উল্লেখযোগ্য উন্নতি সত্ত্বেও বসুন্ধরা নিষ্প্রাণ মরুময় ছিল পঞ্চাশ কোটি বছর। এই দীর্ঘকাল প্রাণের পক্ষে ধরণী অজেয় ছিল। কারণ, জলের সমুদ্র ছেড়ে নতুন বায়ুর সমুদ্রে বেঁচে থাকার মত যোগ্যতা তখনও প্রাণশক্তির আয়ত্তের বাইরে।

স্থলভাগে বাঁচার উপযোগী হবার জন্য উদ্ভিদ্কে তার গড়ন আর প্রজনন-পদ্ধতি সমগ্রভাবে বদলাতে হয়েছে। প্রথমে বদলাতে হল দৈহিক কাঠামো। জলের মধ্যে খাদ্য তার চারপাশে ছিল। কিন্তু ডাঙায় সে সুবিধা রইল না। কাজেই দুটি আলাদা জায়গা থেকে তাকে খাদ্যের প্রধান উপাদান আহরণ করতে হল। কার্বনের জন্য আলো ও বায়ুর মধ্যে তাকে শূন্যে কলেবর বৃদ্ধি করতে হল। আর নাইট্রোজেনসহ জল ও খনিজ লবণ আহরণের জন্য ডুব দিতে হল বসুন্ধরার গর্ভে। তাছাড়া ভিন্ন স্থানে সংগৃহীত খাদ্যের এই উপাদান সংমিশ্রণের ব্যবস্থা করাও আবশ্যক হয়ে পড়ল। তার জন্য প্রয়োজন আভ্যন্তরিক চলাচল ব্যবস্থার। তা না হলে শিকড় যা সংগ্রহ করছে তার সঙ্গে বায়ু থেকে সংগৃহীত কার্বনের যোগাযোগ হবে কি করে? সবুজ ক্লোরোফিলের কলা এই সংমিশ্রণের কেন্দ্র হয়ে উঠল। জল না হলে অতি সাধারণ শর্করাও তৈরি করা সম্ভব নয়। উদ্ভিদের খাদ্যের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে এক অংশ থেকে অন্য অংশে জল প্রেরণ করা সহজতর। তাই পাতার সঙ্গে মূলের সংযোগ সৃষ্টির জন্য নলের যোগসূত্র করতে হল। আর নলের মাধ্যমে শিকড় থেকে ক্লোরোফিল-সমৃদ্ধ পত্র-কোষে জলসহ অন্যান্য লাবণিক

দ্রব্য যাতে উঠে আসে তার জন্য একটা প্রবাহ সঞ্চার করতে হল। উদ্ভিদ্ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন এই প্রবাহ চালু থাকে। কোন্ শক্তি উদ্ভিদের মূল থেকে কয়েক শত হাত উর্ধ্বে পর্যন্ত জল ঠেলে কিংবা টেনে নিয়ে যায় তা আজও সুস্পষ্ট জানা যায়নি। তবে এই শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। তার প্রমাণ গাছের ডাল কাটলেই দেখা যায় যে ফোঁটা ফোঁটা রস গড়িয়ে পড়ছে।

খাদ্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা ছাড়া শাখা-প্রশাখায় কিংবা অন্যান্য স্থানে খাদ্য বণ্টনের নিম্নাভিমুখী আর একটি আলাদা যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হয় উদ্ভিদ্‌কে। উন্নততর সামুদ্রিক গুল্মের দেহেও এই ব্যবস্থা ছিল। খাদ্য বণ্টনের এই কাজ হয় ঝাঁজরির মত কোষের মাধ্যমে। এই কোষের প্রোটোপ্লাজম খাদ্য বিলি করে। মোটামুটি এই হচ্ছে স্থলচর উদ্ভিদের আভ্যন্তরিক তন্ত্র। স্থলজ উদ্ভিদ্‌সৃষ্টির জন্য এই তন্ত্রগঠনের দিকে অভিব্যক্তির ধারা পরিচালিত করতে হয়েছে।

স্থায়ী স্থলবাসিন্দা হবার আগে শুকিয়ে যাবার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হতে হয় জলজ উদ্ভিদ্‌কে। কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার গায়ে পুরু কোষের প্রাচীর (বল্কল) বা বার্নিশের সাহায্যে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলে নিজের ভার বহনের জন্যও তাকে কাঠের ঠেকার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তার মানে শূন্যে মাথা খাড়া করে বাঁচার জন্য মূল ও শাখা, দারু নির্মিত কঙ্কাল আর উর্ধ্ব ও নিম্নগামী চলাচল ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হয়েছে। বায়ুমণ্ডলে বেঁচে থাকার এই কয়টি প্রয়োজন তারা ডেভোনিয়ান কল্পের মাঝামাঝি পূরণ করে। এছাড়া বংশবৃদ্ধির সমস্যাও নতুনভাবে সমাধান করতে হয়েছিল। সমুদ্রের বুকে তাদের জলজ পূর্বপুরুষের যৌন ও অযৌন জননকোষ নগ্ন সন্তরণশীল জৈবকণার মত ছিল। যে কোন স্থানে স্খলিত হলে তারা বেঁচে থাকত। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে স্খলিত হলে এই নগ্ন জননকোষ শুকিয়ে মরে যাবে। প্রজননকোষ বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই শুকিয়ে যাবার বিপদ এড়ান দরকার। ক্রমান্বয় এই সমস্যার সমাধান হয়। প্রথমে রেণু, তারপর বীজ, তারপর পরাগ-নল এবং পরিশেষে ফুলসৃষ্টি করে বংশরক্ষার ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন করা হয়েছে। কমপক্ষে পঁচিশ কোটি বছর লেগেছে এই ক্রমিক পরিবর্তনসাধনে।

বসুন্ধরায় নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলার জন্য জীবকেও সমগোত্রীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নতুন পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য নতুনতরভাবে ঢেলে সাজতে হয়েছে নিজেদের। এই পরিবর্তনসাধনের ব্যাপ্তিকাল কম নয়। তবে উদ্ভিদ্ এসে আগেভাগে সবুজের আশ্রয় সৃষ্টি না করা পর্যন্ত কোন জীব স্থলভাগে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারেনি। তাই বলে এই নতুন বসতির

প্রয়োজনের দাবি মেটাবার জন্যই যে মেরুদণ্ডী প্রাণীর পা ও ফুসফুস অভিব্যক্ত হয়েছে একথা বলা যায় না। এই দুটি অঙ্গ অভিব্যক্ত হয়েছে ভিন্ন কারণে। নির্জলা শুষ্কতার প্রভাবে। ইতিপূর্বে পা ও ফুসফুস গড়ে উঠেছিল, আর বায়ুমণ্ডলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছিল বলে এরা নতুন আবাসে উঠে আসে। তবে জলাভাব আর অক্সিজেনের অভাব যদি না ঘটত, বাসস্থান যদি শুকিয়ে না আসত, তাহলে কৌলিক আবাস ছেড়ে এরা অন্যত্র যেত কি না সন্দেহ।

॥ ফুসফুস ও পা ॥

ফুসফুস আর পা স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেদিন অস্থিবান মাছ নিজের দেহে বায়ুস্থলী বা পটকা সৃষ্টি করল সেই থেকে ফুসফুসের সূচনা। এ বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে না যে পটকা বদ্ধজলার জীবের সম্পদ। পটকাওয়ালা প্রাণী জলের মধ্যে শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জলের উপরেও হাঁ করে বায়ু গ্রহণ করতে পারে। অস্থি দিয়ে গড়া কঙ্কাল আর বায়ুস্থলী সম্ভবত সিলুরিয়ান কল্পের হাঙর জাতীয় কোন আদিম কোমলাস্থিবান মাছের মধ্যে প্রথম দেখা দেয়। অস্থি-দিয়ে-গড়া কয়েক প্রকার মাছের অস্তিত্ব ডেভোনিয়ান কল্পেও ছিল বলে জানা গেছে।

অলবণাক্ত জলের কোথাও দীর্ঘদিন একটানা অক্সিজেনের অভাব ঘটতে পারে না। কাজেই অস্থি-দিয়ে-গড়া মাছের উদ্ভব যে অলবণাক্ত জলে ঘটেছিল এই অনুমান সঙ্গতভাবে করা চলে। ডেভোনিয়ান কল্পের কিংবা সিলুরিয়ান কল্পের মাছের গায়ে আত্মরক্ষার বর্মের অভাব ছিল না। মিনাকরা সুন্দর আঁশের বর্ম ছিল তাদের দেহে। মাথায় ছিল অস্থির মিনাকরা চ্যাপটা বর্ম। এই অস্থি আবার যুক্ত ছিল আঁশের বর্মের সঙ্গে। বেশ লম্বা ছিল তাদের দেহ। কিন্তু দেহের গড়ন আজকের মাছের মত এমন ছিমছাম পরিপাটি ছিল না। এই মাছের সামনের ও পেছনের অঙ্গের বেশ ব্যবধান ছিল। আর তার গড়নও ছিল আদিম ধরনের। কেন্দ্রীয় একটি অস্থিদণ্ড ছিল এদের। তার শেষ প্রান্তে ছিল পাখনার রোশনাই। এই মাছের অধিকাংশ অস্থিই ছিল তাদের বাইরের বর্মে। তবে আভ্যন্তরিক খাঁচাতেও তখন আক্রমণ শুরু হয়েছে। মেরুদণ্ডের কয়েক অংশের কোমলাস্থি ইতিমধ্যে কঠিন হাড়ে পরিণত হয়।

ভেতরে কোমলাস্থিময় কিন্তু বাইরে কঠিন অস্থিবান এই সব আদিম মাছ দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। একদল মৎস-প্রকৃতি বজায় রাখল। আর একদল ক্রমে ক্রমে মৎস্য-স্বভাব ত্যাগ করল। একদল ফিরে গেল সমুদ্রে; আর একদল

অভিযান করল স্থলে। জলে যারা ফিরল সেই মৎস্যদলের অস্থি-দিয়ে-গড়া ভারী আঁশের বর্ম ক্রমান্বয়ে হালকা হয়ে আসে। অবশেষে শক্ত অথচ হালকা এক নমনীয় আঁশের আভরণে রূপান্তরিত হল। ভেতরের খাঁচাও ক্রমে অস্থিতে পরিণত হয়ে কোমল-কঠিন অস্থি-দিয়ে-গড়া কঙ্কালে পরিণত হল। মাথার হাড়ের বর্মটিও নীচু হয়ে মূল মস্তিষ্কাধারের সঙ্গে সংযুক্ত হল। বহুরূপে নানা বিভঙ্গে বিকশিত হয়েছে এই জাতের মাছ। যারা সন্তরণশীল-প্রকৃতি বজায় রেখেছে তাদের দেহের গড়ন ছিমছাম হয়েছে। বহিরঙ্গের অস্থি ক্রমান্বয় তারা অভ্যন্তরে নিয়ে গেছে। পাখনার সঙ্গে গুটি কয়েক কাঁটার মত অস্থি বাইরে রয়েছে মাত্র।

জীবনের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত হামেশা পাওয়া যায় যে কোন জীব নতুন কোন অস্বাভাবিক প্রতিবেশে অভিযান করে যদি কোন নতুন গুণ অর্জন করে, তাহলে সেই নতুন লব্ধগুণের সাহায্যে আবার সে মূল আবাসে ফিরে যেতে পারে এবং ঘরকুনো মামুলি বাসিন্দাদের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিতে পারে।

অস্থিবান মাছ যতদিনে জলজীবনে পুরোপুরি অভ্যস্ত হতে পেরেছে প্রায় ততদিন লেগেছে মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্থলভাগের কঠোর জীবনে অভ্যস্ত হতে। ডেভোনিয়ান কল্পের প্রথম দিকে অভিব্যক্তির ধারায় যত জীব উদ্ভূত হয়েছিল তার অধিকাংশ কার্বনিফেরাস কল্পের প্রারম্ভে মারা যায়। সেই সঙ্গে দেখা দেয় নতুনতর জীব। পারমিয়ান কল্পে আর একবার ব্যাপক বিলুপ্তি ঘটে। তৃতীয় আর একদল মাথা তুলে দাঁড়ায়। ক্রিটেসাস কল্পেও পুনরাবৃত্তি হয় এই বিনাশ ও সৃষ্টির খেলার। এই কল্পেই প্রথম আবির্ভাব হয় আজকের আধুনিক মাছের। আধুনিক স্তন্যপায়ী জীব আর খেচরসৃষ্টি হবার কয়েক লক্ষ বছর আগে।

॥ পাখনা থেকে পা ॥

জল থেকে কোন কৌলিক মেরুদণ্ডী জীব যদি আগেভাগে স্থলে উঠে না আসত তাহলে খেচর বা স্তন্যপায়ী জীবের কল্পনা করা যেত না। কাজেই দুই দল মাছের ভিন্ন পথ অবলম্বনের দিনে ফিরে গিয়ে পায়ের উৎপত্তি এবং বুকে হেঁটে ডাঙায় ওঠার কাহিনীর কথা কিছুটা বলে নেওয়া দরকার।

পা একটা স্বতঃসিদ্ধ জিনিস বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু ক্রমিক বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস আছে পা-সৃষ্টির পেছনে। দুই পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগে চার পায়ে ভর করে গাছে চড়তে হয়েছে। গাছে চড়া শেখার আগে দৌড়োতে হয়েছে। আর দৌড়োবার আগে শিখতে হয়েছে দেহের চারটি

পেয়ালার উপর ভর করে মাটি থেকে পেট উঁচু করে চলতে। হাঁটার আগে অভ্যাস করতে হয়েছে হামাগুড়ি দেওয়া। সাধারণ মাছ হামাগুড়ি দিতে পারে না। যার সাহায্যে তারা জলে সাঁতার কাটে তার উপর ভর করে ডাঙায় দেহের ভার উঁচু করা যায় না—কাতরান চলে, বড় জোর লাফালাফি করে কাত হয়ে পড়ে থাকতে পারে যতক্ষণ না মরে যায়। হামা দিতে পায়ের দরকার। কিন্তু মাছের ছিল শুধু পাখনা। এই পাখনা থেকেই পা গড়ে ওঠে। কেমন করে? ডেভোনিয়ান কল্পের আগেকার অবস্থা সম্পর্কে ভূতাত্ত্বিকদের বক্তব্যটুকু তাহলে বলে নেওয়া দরকার। কারণ স্থলচর সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর এই মীন কুলপতি তখন এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল যে পা-সৃষ্টি করতে না পারলে তার বিনাশ অনিবার্য।

বিশাল বিশাল জলাধার আর হ্রদের অস্তিত্ব ছিল ডেভোনিয়ান কল্পে। চক্রাকারে পরিবর্তিত হত এই সব জলাধারের অবস্থা। কোন সময় জলপথে সমুদ্রের সঙ্গে এদের যোগসূত্র সৃষ্টি হত। তারপর আবার হাজার দশেক বছর হয়ত হ্রদ হয়ে থাকত। ভূমিস্তর উন্নয়নের সময় এগুলি ছোট ছোট জলাধারে ভাগ হয়ে পড়ত। ছোট হয়ে যেত আয়তন। অনেকগুলি আবার শুকিয়ে যেত। এরপর আবার শুরু হত চক্রাকারে বিবর্তন।

সমুদ্রে এই সময় ভিন্ন ধরনের পঙ্ক সঞ্চিত হচ্ছিল। ডেভোনিয়ান কল্পের সাত কোটি বছরের শিলাস্তরে অভিব্যক্তির দুটি সমান্তরাল ধারার ইতিহাস আলাদাভাবে বিধৃত। সামুদ্রিক ইতিহাস লেখা আছে সরুদানার নীলচে চুনা পাথরে। আর অলবণাক্ত জলের ইতিহাস বিধৃত লাল বেলে পাথরে। তাতে প্রমাণ হয় যে সমুদ্রসৈকত থেকে দূরের উঁচু জমি তখন শুষ্ক ছিল।

স্থলবেষ্টিত জল যতবার শুকিয়ে গেছে ততবার অলবণাক্ত জলের বহুবিধ মাছ মরে গেছে। ক্রমবিকাশের দুটি পথ খোলা ছিল এদের সামনে। হয় সমুদ্রে ফিরে যেতে হবে, আর না হয় এইভাবে চলতে হবে। জলে ফিরে যাওয়ার অর্থ ফের সামুদ্রিক জীবন বরণ করা। কিন্তু স্বস্থানে থাকতে হলে বদ্ধতা ও শুষ্কতার অসুবিধা অতিক্রম করতে হবে। মাঝে মাঝে হাঁ করে হাওয়া গিলতে হবে এবং নতুন কোন অঙ্গ সংযোজন করে শুষ্কতার বিরুদ্ধে লড়াই করে আত্মরক্ষা করতে হবে। আর যদি সম্ভব হয় তো সাময়িকভাবে জল ছেড়ে স্থলভাগের অন্যত্র চলে যাবার চেষ্টা করতে হবে।

পূর্বপুরুষেরা অনেক আগে সমুদ্র ছেড়ে এসেছিল। তবু অনেক মাছ চলে গেল। রইল মাত্র দুটি দল। এদের মধ্যে একটি ফুসফুসওয়ালা। বায়ুস্থলীকে

ফুসফুসে রূপান্তরিত করে জলের উপরে কাদার মধ্যে বেঁচে থাকার যোগ্যতা এরা অর্জন করল। ডাঙায় চলার ক্ষমতা ছিল না। সমান্তরাল অভিব্যক্তির অপূর্ব দৃষ্টান্ত এই ফুসফুসওয়ালা মীনদল। যে মৎস্যদল উভয়চর মেরুদণ্ডী প্রাণীতে পরিণত হল তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কর্দমচারী মাছের। কিছুটা পথ উভয়েই চলেছিল একসাথে। একদল সারা পথ গেল না। আধাআধি অগ্রগতিতে শেষ পর্যন্ত কোন কাজ হয় না। যে দল সমুদ্রে ফিরে গেল তারা বাসা বাঁধল জলে। যারা ক্রমাগত এগিয়ে গেল তাদের বংশধর ছড়িয়ে আছে বসুন্ধরাময়। কিন্তু আধাআধি এগিয়ে যারা থেমে গিয়েছিল সেই ফুসফুসওয়ালা মাছ আজ প্রায় নির্বংশ।

ঠিক কি ভাবে পাখনা থেকে পা-সৃষ্টি হয়েছিল তার হদিস পাওয়া যায়নি। মধ্য-ডেভোনিয়ান কল্পের শিলাস্তরে এই খোঁজ একদিন মিলবে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। কয়েক জাতের আধুনিক মাছ এখনও পাখনার সাহায্যে অনায়াসে ডাঙায় উঠে আসে। তাদের পাখনা বেশ পেশল এবং স্থলচর জীবের অঙ্গের মত দেহের নীচে বাঁকান। ডাঙায় চলতে এরা এত ওস্তাদ যে ধরা কষ্টকর। তাছাড়া স্থলজীবনে এরা এত অভ্যস্ত যে বেশীক্ষণ জলের তলায় ডুবিয়ে রাখলে মরে যায়। ডেভোনিয়ান কল্পের উভয়চর মাছও এই ধাঁচে হয়ত তাদের পাখনা ব্যবহার করেছে। তবে বহু তথ্য থেকে জানা গেছে যে তারা লাফিয়ে চলতে ওস্তাদ ছিল না। কাদার মধ্যে কাত হয়ে শুয়ে দেহটা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেত। আধুনিক কালের সালামান্দার নামে মাছের চলার ভঙ্গী মূলত এই ধরনের। এইভাবে চলতে গিয়ে কবজি ও কনুই, হাঁটু আর গোড়ালির ভাঁজ নিশ্চয় দ্রুত গড়ে উঠেছে। না হলে চ্যাপটা পা কাদার মধ্যে যেখানে ফেলা হয়েছে দৃঢ়ভাবে সেখানে আটকে থাকে না। পাখনার ঝিল্লীর যত হাড় ছিল তার মধ্যে পাঁচখানি রইল হাত আর পায়ের আঙুলের জন্য। এই বাঁকান পাখনা থেকে মানুষের সুগঠিত পায়ের গুল, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার ঠ্যাং আর পাখীর ডানা সৃষ্টি হওয়া বহু দূরের ঘটনা। তবু তার সূচনা হয়েছে বাঁকান পাখনায়। এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হল ডেভোনিয়ান কল্পের শেষাশেষি। এই কল্পের কাদার মধ্যে আঙুলসহ পায়ের দাগ পাওয়া গেছে। পরবর্তী কার্বনিফেরাস কল্পের প্রথম দিকে পদবিশিষ্ট মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রাচুর্য দেখা দেয়। তবে একালের অধিকাংশ জীব নতুন অঙ্গ ব্যবহার না করে কৌলিক বাসভূমি জলের মধ্যে বসবাস করত। এর কারণ নিহিত রয়েছে বহু আগের সামুদ্রিক জীবনের অভ্যাসের মধ্যে। সমুদ্রের খুব কম জীব নিরামিষাশী। কারণ সামুদ্রিক উদ্ভিদের অধিকাংশ

ভাসমান এবং আকারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। এই উদ্ভিদ্ ছিঁড়ে খাওয়া যায় না। খেতে হত সবটা গিলে। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব এগুলি খায়, আবার তাদের খায় বড়রা। একদল অলস জীব আবার স্রোতের মুখে জল টানতে টানতে তার মধ্য থেকে বেছে এই ভাসমান উদ্ভিদ্‌কণা গলাধঃকরণ করে থাকে। সামুদ্রিক জীবের আকার যাই হোক না কেন, হয় তারা কাদা খেকো, নয় তো মাংসাশী, আর না হয় স্রোতের জল থেকে যারা খাদ্য গ্রহণ করে তাদের দলের। আদিম সমস্ত মাছ ছিল মাংসাশী। তাদের উভয়চর বংশধরেরাও এই মাংসভুক স্বভাব বজায় রেখেছিল।

ডেভোনিয়ান কল্পের শেষভাগে উদ্ভিদের অভাব ছিল না ধরাপৃষ্ঠে। কিন্তু সামান্য প্রাণীই এই নতুন খাদ্যসম্পদের সদ্ব্যবহার করেছে। কার্বনিফেরাস কল্পের বনভূমির কিছু বৃশ্চিক, বহুপদ বৃশ্চিক কিংবা আদিম কীট হয়ত আদিম উভয়চরদের আহার্যের যোগান দিয়েছে। এই খাদ্যও প্রচুর পরিমাণে থাকতে পারে না। তাছাড়া খুঁজে-পেতে শিকার না করলে খাদ্য পাবার উপায় ছিল না। সেখানে আবার ডাঙায় চলাফেরা করার শক্তির সীমাবদ্ধতা আছে। তাছাড়া খাদ্য সম্পর্কে অধিকাংশ প্রাণী মানুষের মত রক্ষণশীল। কাজেই অধিকাংশ উভয়চর মেরুদণ্ডী জলের মধ্যে আহার-বিহার এবং বংশরক্ষা করেছে। পা ব্যবহৃত হয়েছে শুধু এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে যেতে। তবু এদের মধ্যে যারা সাবেক বাসা ছেড়ে নতুন খাদ্য খাবার অভ্যাস করেছে তারা উন্নত হয়েছে। তাদের বংশ বেড়েছে বেশী। এদের পা নানা কাজে নিয়োজিত হয়ে দ্রুত উন্নতিলাভ করেছে। জীবন-সংগ্রামে নির্ভরযোগ্য সহায়ক হয়েছে। এই দলের সন্তানেরা আজ বসুন্ধরার মালিক।

বয়স্ক উভয়চর প্রাণী জলজীবন ত্যাগ করলেও সম্পূর্ণভাবে জল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। সন্তান লালনের জন্য তাকে জলের আশ্রয়ে যেতে হত। কারণ শিশু উভয়চর শুঁয়ার মত। তাকে শ্বাস গ্রহণ করতে হয় ফুলকা দিয়ে। আর সাঁতার কাটতে হয় লেজের কাছের পাখনার সাহায্যে। এই শুঁয়ার অবস্থা সুদূর অতীতের কার্বনিফেরাস কল্প থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি চলছে। তাই অধিকাংশ উভয়চর আজও সম্পূর্ণভাবে জলের বাঁধন ছিঁড়তে পারেনি। প্রধানতঃ এই কারণেই এরা সরীসৃপ, পাখী কিংবা স্তন্যপায়ী জীবের মত গুরুত্ব এবং সংখ্যা-প্রাচুর্য লাভ করতে পারেনি। সন্তানের বাঁধন চিরকাল এদের জলের সঙ্গে বেঁধে রাখছে।

আদিম উভয়চর প্রাণী ডেভোনিয়ান কল্পের শেষভাগ থেকে ত্রিয়াসিক কল্পান্ত পর্যন্ত টিকে রয়েছে। ইতিমধ্যে তারা এবং তাদের আত্মীয়দল আধুনিক উভয়চর

আর আদি সরীসৃপের জন্ম দিয়ে যাবতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণীর পূর্বপুরুষ সৃষ্টি করে গেছে।

॥ কয়লাসৃষ্টির যুগচিত্র ॥

ডেভোনিয়ান কল্পের জলাভূমি ও স্থলভাগে যত উদ্ভিদ্ জন্মেছিল কোটি দুয়েক বছর তারা নিরুপদ্রবে বংশবৃদ্ধি করে যায়। পৃথিবীর আবহাওয়ায় এই সময় উষ্ণতা ও আদ্রতার দীর্ঘস্থায়ী একটি যুগ আসে। তার ফলে উদ্ভিদ্ জগতের প্রসার ও সমৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এই প্রসারের যুগের পরবর্তী কাল কার্বনিফেরাস কল্প নাম পেয়েছে তার বিশিষ্টতম ঘটনার সুবাদে। এই কল্পে যে বিশাল বনসম্পদ সৃষ্টি হয়েছিল তারা শিলীভূত হয়ে দাহ্য কালো শিলায় পরিণত হয়। আমরা এই দাহ্য শিলাকে বলি কয়লা। পৃথিবীর খনিজ কয়লা সম্পদের অধিকাংশ এই কল্পের সৃষ্টি। যে সব স্থানে এই বিশাল বনভূমি সৃষ্টি হয়েছিল প্রথমে সেখানকার ভূমিস্তরে ব্যাপক অবনমনের লক্ষণ দেখা দেয়। এত দীর্ঘকাল এই ক্রমিক অবনতি চলে যে সমুদ্রোপকূলের কোন কোন স্থানে তার গভীরতা দশ হাজার ফুট বলে জানা গেছে। স্থলভাগের এই অবনতির ফলে বনভূমির উপর বনভূমি ক্রমে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে যায়। আর তার উপর সঞ্চিত হয় বালি কিংবা কাদার আস্তরণ। তার ফলে গোটা অবনমিত এলাকা আবার জলরেখা থেকে উঁচু হয়। আবার বনভূমি সৃষ্টি হয় সেখানে। বন্যাপ্লাবিত এই বনভূমি কালক্রমে ফের সমাধিস্থ হয় ভূগর্ভে। নিয়মিত এই উন্নয়ন ও অবনমনের চিহ্ন কয়লার খনিগর্ভের শিলাস্তরে সাজান রয়েছে।

যাই হোক, উদ্ভিদ্ আর প্রাণী এই কয়লাসৃষ্টির যুগে স্থলভাগের কায়েমী বাসিন্দা হয়ে পড়ে। তখনও তারা উচ্চভূমি বা স্থলভাগের অভ্যন্তরে বেশী দূর বিস্তার লাভ করতে পারেনি। প্রাণশক্তি তখন সমুদ্রসৈকত, জলাভূমি আর ঢালু ভেজা জমি দখল করেছে মাত্র। তবে স্থলচর জীবের যে ছবি আজকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার সঙ্গে বিস্ময়কর পার্থক্য ছিল সেকালের প্রাণীর। বিশ কোটি বছর পেছিয়ে যাওয়া যদি সম্ভব হত তাহলে সেকালের যুগচিত্র দেখে আমরাই হয়ত মনে করতাম যেন ভিন্ন গ্রহে এসে পড়েছি।

কল্পনায় যদি সে যুগে চলে যাওয়া যায় তো দেখা যাবে, আজকের কয়লা-খনি অঞ্চলের ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা কিছুই নেই। সেই জায়গায় আছে শুধু বিস্তীর্ণ আদ্র বিশাল বনভূমি। ক্রমশঃ ঢালু হয়ে জলাভূমির মধ্য দিয়ে এই অখণ্ড অরণ্য সমুদ্রসৈকত অবধি বিসারিত। সেকালের বনভূমির

উচ্চতা অথবা গাছপালার প্রকারণের সঙ্গে আজকের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের জঙ্গলের কোন মিল নেই। তবে ষাট-সত্তর হাত লম্বা কিংবা কৌতূহল বাড়াবার মত অদ্ভুত গাছপালা অবশ্য সেই জঙ্গলেও ছিল। বাতাসের দোলা লেগে রেণুর মেঘাবরণ সৃষ্টি হত সারা বনভূমে। অজস্র ধারায় রেণু গড়িয়ে পড়ত মাটির বুকে। শৈবালের শ্যামল আস্তরণের উপর। ছায়াঘন অরণ্যের নীচে ছিল পাতার পুরু কার্পেট। ভাঙা ডাল পচত ভেজা মাটির বুকে।

এই বনভূমির ছায়াসুনিবিড় আশ্রয়ে কিংবা তার আশেপাশের জলাভূমিতে সাঁতরাত কি বুকে হাঁটত কার্বনিফেরাস কল্পের মেরুদণ্ডী প্রাণী। অধিকাংশই উভয়চর। তবে এই উভয়চরদের যদি ব্যাঙ কি সালামান্দারের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে বিষম ভুল করা হবে। সালামান্দার জাতীয় জীব সেই অগভীর বদ্ধ জলাভূমিতে ছিল না এমন নয়। কীটপতঙ্গও ছিল ঝোপ-জঙ্গলে। তার সঙ্গে কুমীরের মত বৃহদাকার লম্বামুখ মৎস্যাশী জন্তুও ছিল। আর ছিল পদহীন প্রাণী। তারা সাঁতার কাটত কিংবা মোড়ামুড়ি করে কাতরাতে কাতরাতে চলত। কোন কোন প্রাণীর চ্যাপটা মাথা প্রায় ধড়ের সমান ছিল। আর কতগুলি ছিল বিকট-দর্শন বিরাটকায় প্রাণী। তাদের দেহের স্থানে স্থানে কাঁটার মত অস্থির বর্ম ছিল। এদের মধ্যে অনেকে জলের স্থায়ী বাসিন্দা। সামান্য কিছুদিন ডাঙায় ঘর করে আবার ফিরে গেছে কৌলিক আবাসে। তবে এদের মধ্যে কিছু কিছু প্রাণী বড় বড় পেট আর ছোট ছোট পা নিয়ে কয়লার বনের মধ্যে চলাফেরা করত। এরাই সাচ্চা স্থলচর। হোক না সে মাটি জলে ভেজা।

স্থলচরদের মধ্যে সামান্য কিছু সাবেকী সরীসৃপ দেখা যেত। সংখ্যায় বা আকারে যত নগণ্য হোক, এদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ছিল। এ ছাড়া ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যেও অগণিত ছোট বড় আরশোলা, বিছে কি শতপদ বৃশ্চিকের দেখা মিলত। সাবেকী কিছু মাকড়সা আর কিছু স্থলচর শামুকও ছিল। শূন্যের দিকে তাকালে অগণিত পতঙ্গের পাখার ঝাপটানি নজরে পড়ত। এদের মধ্যে কিছু পতঙ্গ আকারে বেশ বড়। ডাঁশের মত একটি পতঙ্গ ডানাসহ প্রস্থে আড়াই ফুটের মত ছিল। এই সব পতঙ্গের শৈশব কেটেছে অমেরুদণ্ডী জীবের সূতিকাগার বদ্ধজলার বুকে।

সত্যিই বিচিত্র এই পৃথিবী। তবে এই বিস্ময়কর বিচিত্রতা হারিয়ে খুব বেশী লোকসান আমাদের হয়নি। কোন পাখীর কাকলি শোনা যেত না সেই বনভূমিতে। ছিল না স্তন্যপায়ী জীবের গর্জন, হাঁকাহাঁকি অথবা কিচিরমিচির। শুঁয়াপোকা ছিল না যে পাতা খেয়ে ফেলবে। ছিল না মৌমাছি আর

প্রজাপতি। চার পায়ে হাঁটতে পারে এমন কোন প্রাণীও ছিল না সেই বনে। কোন ফুলের বাহার কি হেমন্তের পাটল পাতার সমারোহ সেখানে চমক জাগাত না। ছিল শুধু সবুজ আর বাদামির মেলা আর নীচের কালো জলাশয়ে হরিৎ রেণুর ঝরে-পড়া।

শাখা-প্রশাখায় বাতাসের প্রতিধ্বনি, কীট-পতঙ্গের গুঞ্জন আর গাছ পড়ে যাওয়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ ছিল না সেই বনভূমে। যাদের কণ্ঠনালীতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া শুরু হয়েছে, মৈথুনপ্রয়াসী হলে সেই সব জীবের কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে চমক সৃষ্টি করত। তবু এই ছায়াঘেরা জলাভূমির মধ্যেই বুকে হেঁটে বেড়াত সমস্ত খেচর, যাবতীয় স্তন্যপায়ী আর মানুষের পূর্বপুরুষ।

চিরকাল এই কয়লার জলাভূমি স্থায়ী হতে পারল না। বসুন্ধরার গর্ভে আবার শুরু হয় আর এক দফা পর্বতপ্রসবের বেদনা। হাওয়া বদলের সূচনা হল আবার। জলাভূমির বিস্তার সঙ্কুচিত হয়ে এল। সমুদ্র হটে গেল দূর দূরান্তে। সঙ্গে সঙ্গে কয়লাসৃষ্টির বনাঞ্চলও হ্রাস পেল। ক্রমান্বয় কতগুলি প্রচণ্ড আলোড়নে বসুন্ধরার পেট ফুঁড়ে বেরুল আপালসিয়ান পর্বতমালা। ইউরোপের ভূত্বকও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সমব্যথায়। সৃষ্টি হল অধুনাক্ষয়িত হারসিনিয়ান শৈলমালা, ইফেল, তাউনাস আর আর্দেনিস পর্বত। লিখতে গিয়ে কি বলতে গিয়ে মনে হবে যেন আকস্মিক এক ধাক্কায় এই সব ঘটনা ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে এই পর্বত-সৃষ্টির জন্য কমপক্ষে দুই থেকে তিন কোটি বছর লেগেছে।

।। দক্ষিণ গোলার্ধে তুষার যুগ ।।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ গোলার্ধে সূচনা হচ্ছিল বিশাল এক তুষার যুগের। কেন এই তুষার যুগ এল তার কারণ আমাদের আলোচনার গণ্ডীর বাইরে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, দক্ষিণাঞ্চলের ভূমিস্তরের সবিশেষ উন্নয়নের ফলে এই ঘটনার সূচনা হয়। ভূমিস্তর উন্নয়নের ফলে প্রথমে দক্ষিণ মেরুমণ্ডলে বিশাল এক মহাদেশ সৃষ্টি হল। এই মহাদেশ সম্ভবত অস্ট্রেলিয়া থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অস্ট্রেলিয়া, মালয় ও ভারতের মধ্য দিয়ে আফ্রিকা পর্যন্ত স্থলপথের এক বিশাল বলয়রেখা সৃষ্টি হয়েছিল। হয়ত আরও অনেক দূর প্রসারিত হয়েছিল এই স্থল-সেতু। ভূতাত্ত্বিকরা এই অতিকায় মহাদেশের নাম দিয়েছেন গণ্ডোয়ানাভূমি। স্থল-সংযোগের ফলে এই বিশাল মহাদেশের অধিকাংশ স্থান গ্রীষ্মাঞ্চলের উষ্ণ-প্রবাহের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হল। গ্রীষ্মাঞ্চলের সমুদ্রের উষ্ণপ্রবাহের কেন্দ্রীয় তাপসৃষ্টির ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উন্নত দক্ষিণ মেরুমহাদেশ তখন বরফের

টুপি পড়ল। আণ্টার্কটিকার এই সংক্রামক ব্যাধির প্রভাবে কাছাকাছির স্থলঘেরা সাগরের শীতল বক্ষেও হিমশৈল দেখা দিল। তারপর গণ্ডোয়ানা-ভূমির উঁচু জমিতে তুষারের শিরোপা দেখা দিল ক্রমে ক্রমে। সৃষ্টি হল আলাদা আলাদা হিমবাহ।

কারণ যাই হোক, গোটা দক্ষিণ আফ্রিকা তখন বরফের সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল। সেই এক তুষারের আস্তরণ সমাধিস্থ করেছিল মাদাগাস্কার দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত। অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আমেরিকার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলও তুষারে ঢাকা পড়েছিল। তুষারের থান পড়েছিল ভারতের কোন কোন অঞ্চলে। সম্ভবত মধ্য আফ্রিকার নিরক্ষরেখা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল বরফের আস্তরণ। উত্তর গোলার্ধ এই তুষারের আক্রমণ এড়িয়ে গেল। সেখানে দেখা দিল দীর্ঘস্থায়ী শুষ্কতা। পারমিয়ান কল্পের অধিকাংশ সময় জুড়ে এই অবস্থা চলেছে। শুকনো সাগরের বক্ষে লবণ ও জিপসামের (কৃষ্ণসীস) যে বিরাট সঞ্চয় দেখা গেছে তা থেকে বোঝা যায় একালের শুষ্কতার তীব্রতা। ভূমিস্তর উন্নয়নের ফলে কিছু সাগর স্থলবেষ্টিত হয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। সেই শুকনো সাগরের তলায় এই লবণ সঞ্চিত হয়েছে।

পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগ শীতল হওয়ায় নতুন প্রতিবেশে বাঁচার উপযোগী নতুন ধরনের উদ্ভিদ্ সৃষ্টি হল। এই উদ্ভিদ্ আকারে ছোট আর বাড়তিতে কম হলেও বেশ মজবুত আর কষ্টসহিষ্ণু ছিল। তার পাতা ছিল পোক্ত। বাড়তি ছিল ঝোপের মত। দক্ষিণাঞ্চলের তুষারের আস্তরণ যত উত্তরে এগোতে লাগল এই উদ্ভিদ্‌কুলও তত ঠেলা খেয়ে উত্তরে সরতে সরতে নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে গেল। পারমিয়ান কল্পে এই তুষার যুগের দাপট কমে আসে। গলা বরফের পিছু পিছু এই উদ্ভিদ্‌কুল আবার পিছিয়ে গেল দক্ষিণ মেরু অঞ্চল অবধি। তুষার যুগান্তে এল শুষ্কতার যুগ। আগেকার যুগের গাছপালার তুলনায় তুষার যুগের আবহাওয়ায় লালিত নতুন গাছপালা শুষ্কতার যুগে বেঁচে থাকার অনেক বেশী উপযোগী ছিল। তাই ক্রমে ক্রমে তারা উত্তর দিকে এগিয়ে যায়। কয়লা-সৃষ্টির যুগে জলাভূমির প্রতিবেশে যে সব গাছপালা জন্মেছিল তাদের এ সময় মরণদশা উপস্থিত। এই নতুন গাছপালা দখল করল তাদের জায়গা।

তুষার যুগের আবির্ভাব আর তিরোভাব শুধু যে উদ্ভিদ্ জগতে নতুন পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তা নয়। জীবনবৃক্ষের অন্যান্য শাখা-প্রশাখাতেও সূচিত হল ব্যাপক পরিবর্তন।

সমুদ্রবক্ষেও একালে ব্যাপক বিলুপ্তি আর সেই সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তন সূচিত হয়। সামুদ্রিক শালুক কার্বনিফেরাস কল্পে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। এদের

জীবাশ্মে পর্বতের চুনা পাথর কোথাও কোথাও আধ মাইল পর্যন্ত পুরু হয়েছে। কিন্তু এই শালুকের যত প্রজাতি আগে সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে একটি মাত্র প্রজাতি সামুদ্রিক শীত সহ্য করে মেসোজোইক অধিকল্পে টিকে ছিল। আগেকার প্রবাল, শালুক আর সামুদ্রিক আরচিনও (কাঁটাওয়ালা খোলসের প্রাণী বিশেষ) সমূলে বিনষ্ট হল। বিলোপ হল ট্রিলোবাইট পোকার। শুধু কায়ক্লেশে টিকে রইল সামুদ্রিক বৃশ্চিক। কিন্তু এই ব্যাপক বিনাশের সুযোগ নিয়ে আরও কষ্টসহিষ্ণু নতুন জীব আত্মপ্রতিষ্ঠা করল। তার মধ্যে এম্মোনাইট (মাথায় তন্তুর মত শুঁড়ওয়ালা কম্বোজ বিশেষ) এবং আর এক জাতের মাছের নাম উল্লেখযোগ্য। আমিয়া নামে মাছ এই শাখার একমাত্র বংশধর।

তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি আর আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া স্থলভাগে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল সমুদ্রের চাইতে। তাই স্থলচর জীবের মধ্যে আরও বেশী বৈপ্লবিক রূপান্তর দেখা দিল। রেণুপ্রসূ উদ্ভিদের জায়গায় বীজপ্রসূ গাছ আগেই সৃষ্টি হয়েছিল। পতঙ্গকুলও বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হল নতুন জীবনধারা গ্রহণ করতে। আর মেরুদণ্ডী প্রাণীমহলে উভয়চরদের স্থান দখল করল সরীসৃপ।

।। ডিমের তাৎপর্য ।।

সরীসৃপের খোলওয়ালা ডিম আর গাছপালার বীজ অভিব্যক্তির দিক থেকে সমান তাৎপর্যপূর্ণ। প্রজননবিধির এই পরিবর্তনের ফলে জলের সঙ্গে জীবশক্তির অচ্ছেদ্য নির্ভরশীলতার বন্ধন ছিন্ন হল। বীজপ্রসূ গাছপালা যেমন প্রথম সাচ্চা স্থলচর উদ্ভিদের পরে সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি আদিম প্রকৃতির সরীসৃপও দেখা দিয়েছিল কয়লার যুগের আগে। কোন মেরুদণ্ডী প্রাণী তখনও ডাঙায় বাসা বাঁধেনি।

বিশেষ একটা সুবিধা ছিল সরীসৃপের। নতুন লব্ধগুণের বলে জীবনচক্র থেকে সহজেই তারা শুঁয়াপোকার অবস্থা ছেঁটে বাদ দিতে পারল। বাইরের প্রতিবেশের প্রবল আঘাত না পেয়ে তারা এই উন্নতিসাধন করতে পারেনি। আরও একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল খোলওয়ালা ডিমের। যেখানে খোলওয়ালা ডিমের সৃষ্টি হয় সেখানে আভ্যন্তরিক গর্ভাধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। শিশু-মৃত্যুও হ্রাস পেল এই ব্যবস্থায়। আবার গর্ভাধানের জন্য স্ত্রীজাতিকে প্রেমের টানে বশে আনার প্রয়োজনও দেখা দিল। সেই সঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় খুব বেশী সন্তান জন্ম দেবার একান্ত প্রয়োজন থাকল না। তার ফলে জনিতার

মধ্যে সন্তান-পালন এবং সন্তান-বাৎসল্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি হল। কাজেই প্রেম ও পারিবারিক জীবনের অভিব্যক্তির পথে খোলওয়ালা ডিমের অবদান কম নয়।

সাবেক কালের জীবজন্তুর উন্নতির ভবিষ্যৎ সুযোগ খতম হয়ে গেল পারা-মিয়ান কল্পে। আরও কোটিকয়েক বছর তারা বেঁচে ছিল। আবার এও সত্য যে ত্রিয়াসিক কল্পে তাদের বংশধারায় বিশালকায় ভয়াল প্রাণী সৃষ্টি হয়েছিল। তবু তারা তখন হেরে-যাওয়া যুদ্ধে মরিয়া হয়ে লড়ছে।

শুধুমাত্র আকার, আয়তন, বর্ম বা দাঁত অভিব্যক্তির নিয়মে বেঁচে থাকার পক্ষে পরম নির্ভর বলে প্রতিপন্ন হতে পারেনি। জীবনের কারবারে শেষ অবধি জয়ী হয়েছে সর্বতোমুখী যোগ্যতা, নতুন পরিবেশে নতুন গুণ অর্জনের ক্ষমতা। সরীসৃপদল এই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিল খোলওয়ালা ডিম সৃষ্টি করে। ডিমের অভ্যন্তরভাগের ভ্রূণ-আবরক ঝিল্লী, তার আঁটসাঁট পীতাংশ, সঞ্চিত খাদ্যরূপী শ্বেত আলবুমেন, পরিশেষে খোলের শুষ্কতারোধী দৃঢ় রক্ষাবেষ্টনী অপরিণত জীবনরক্ষার নতুন দুর্গ সৃষ্টি করল। এই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে বলে বেঁচে থাকার সংগ্রামে জয়ী হয়েছে সরীসৃপ। শুকনো পৃথিবীর প্রতিকূল পরিবেশে এমন কৃতিত্বের প্রমাণ এত সুষ্ঠুভাবে অপর কোন প্রাণী দিতে পারেনি। তাই তারা হেরে গেল বাঁচার সংগ্রামে। হারিয়ে গেল অভিব্যক্তির শেষ বিচারে নিভান দীপশিখার মত। বীজ আর ডিম মেসোজোইক অধিকল্পের জীবনের বিজয়-কেতন। ফুল আর উষ্ণরক্ত তার অনুবর্তী সেনোজোইক অধিকল্পের। আর মস্তিষ্ক আধুনিক কালের।

॥ সরীসৃপ অধিকার ॥

চলতি কথায় সরীসৃপ শব্দটির একটা কদর্থ আছে। বুকে-হাঁটা থেকে শব্দটির উৎপত্তি। কিন্তু সরীসৃপ বলতে বুকে-হাঁটা প্রাণীর মধ্যে সাধারণতঃ সাপ আর কুমীর এই দুটি শ্রেণীকে বোঝায়। সাপের সঙ্গে বিষ আর বিভীষিকার কল্পনা জড়িত। কুমীরের সঙ্গে কপটতার। কাজেই সরীসৃপ কথাটার মধ্যে কিছুটা দুর্গন্ধ আছে। তবে এই চলতি ধারণাটা ভ্রান্ত। গিরিগিটি, টিকটিকি আর কচ্ছপ জাতীয় শুকনো চামড়ার নিরীহ প্রাণীও সরীসৃপ।

গোসাপ বা ব্যাঙের গায়ের চটচটে ভাবের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। গায়ের পাতলা চামড়ার ফাঁক দিয়ে তারা শ্বাস গ্রহণ করে। সেজন্য এটা সব সময় তৈলাক্ত এবং ভিজা রাখা দরকার। সরীসৃপ এই দৈহিক অসুবিধা বর্জন করতে পেরেছিল বলে বেঁচে থাকার সংগ্রামে জয়ী হতে পেরেছিল। গায়ের চামড়া

শক্ত ও শুকনো করে বায়ুমণ্ডলের স্থল-প্রতিবেশে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল তারা। তাই জয়ী হয়েছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনে। আধুনিক কালের সরীসৃপ হামাগুড়ি দেয় কিংবা বুকে হাঁটে। কিন্তু সকল সরীসৃপ এই দলে পড়ে না। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে সরীসৃপই সবার আগে মাটি থেকে পেট উঁচু করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। জলের মধ্যে দেহের ভার প্রায় থাকে না। কিন্তু স্থলভাগে দেহের ভার-বহনের সমস্যা এড়াবার উপায় নেই। হাওয়ার আজব রাজ্যে বাস করতে এসে আদিম উভয়চর প্রাণী দেহের নিম্নাংশে ভর করে ভার-বহন করত। তার ফলে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাশের দিকে বেড়ে যায়। এই অঙ্গে অবশ্য পায়ের কাজ হত না। পাশের দিকে বর্ধিত অঙ্গ ডাঙার উপর বড় জোর বৈঠার কাজ করেছে। সালামান্দার জাতীয় উভয়চর প্রাণী ত্রিশ কোটি বছর পরেও দেহের ভার বহন করে চলার এই প্রাচীন রীতি বর্জন করতে পারেনি। সরীসৃপ কিন্তু পারমিয়ান কল্পে বুকের দিকে নতুন অঙ্গ সংযোজনা করে ভার-বহনের নতুন স্তম্ভ সৃষ্টি করেছিল। এই অঙ্গ প্রথম দিকে ভারী এবং কুৎসিৎ ছিল নিশ্চয়ই। অচিরে অঙ্গটি উন্নত, হালকা এবং কার্যসাধক হয়ে পড়ল। এটা সাচ্চা সরীসৃপের জাত বৈশিষ্ট্য। এরাই প্রথম বিজয়ী বসুন্ধরার। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে সরীসৃপই প্রথম গোটা ধরণী জয় করে ফেলল।

উভয়চর প্রাণী থেকে উদ্ভব সাচ্চা সরীসৃপের। প্রথমে ক্রমিক অভিব্যক্তি হয় অনুন্নত থেকে উন্নত পর্যায়ে। তবে পারমিয়ান কল্পের আগেই এই পর্যায় শেষ হয়ে যায়। সরীসৃপের দৈহিক অভিব্যক্তি তখন পূর্ণতা লাভ করেছে। দুটি সুবিধা ছিল তার। কড়া চামড়ার জন্য শুকিয়ে মরবার শঙ্কা সে উপেক্ষা করতে পারত। আর ডিমের অভ্যন্তরে ভ্রূণ-আবরক ঝিল্লী থাকায় জলের সাহায্য ছাড়াই সে বংশবৃদ্ধি করতে পারত।

আদিম সরীসৃপ সাধারণতঃ অলস প্রকৃতির ছিল। মাংসাশী অথবা পতঙ্গাশী ছিল সম্ভবত। আকৃতিতে বা প্রকৃতিতে সমকালীন অন্যান্য উভয়চরদের সঙ্গে তাদের খুব পার্থক্য ছিল না। সরীসৃপদের অগ্রগতির তাগিদ আসে বাইরে থেকে। কার্বনিফেরাস কল্পের শেষাশেষি পর্বতসৃষ্টির বিপ্লবের দরুণ স্থলভাগের উন্নয়নের ফলে। আর তার অনুবর্তী ঠাণ্ডা শুকনো যুগের প্রভাবে। জলাভূমির বিস্তার তখন সঙ্কুচিত। বনভূমিও বিলুপ্ত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে আধা-জলচর জীবনের পরিসর ও সুযোগ সংকীর্ণ হয়ে এল। প্রয়োজন দেখা দিল ডাঙার শুকনো জীবন অভিযোজনের। তার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের। এই কারণে পারমিয়ান কল্পে বিভিন্ন আকারের সরীসৃপের

উদ্ভব হয়। অনেকে উদ্ভিদাশী জীবন গ্রহণ করে। এই উদ্ভিদাশী স্বভাবের জন্য তাদের পক্ষে শুকনো ডাঙায় প্রসারলাভের সুবিধা হয়। পারমিয়ান কল্পের এই উদ্ভিদাশী সরীসৃপ ত্রিয়াসিক কল্পেও ক্রমবিকাশের ধারায় এগিয়ে যায়। অভিব্যক্তির ইতিহাসে সরীসৃপদের অগ্রগতির পথে এটা মস্ত বড় পদক্ষেপ। পারমিয়ান কল্পের আদিমতম সরীসৃপের নাম বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় কোটিলোসারস্। সম্ভবত এরাই খেচর, স্তন্যপায়ী জীব আর মানুষের কৌলিক আদি পুরুষ।

সরীসৃপদের বিকাশ ও বিস্তারের আর একটি মজার দিক আছে। এদের একদল আবার জলচর জীবন গ্রহণ করে। স্থলচর প্রাণীর অভিব্যক্তির পথে এমনতর বহু দৃষ্টান্ত আছে। ডাঙায় বাস করতে বেশ শক্তি আবশ্যক। দেহভার বহনের ক্ষমতাও থাকা চাই। তাছাড়া শুকিয়ে যাওয়া রোধ করার জন্য শক্ত পুরু চামড়ার আবরণ আবশ্যক। প্রয়োজন অধিকতর প্রতিরোধ শক্তি আর আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার। কারণ এখানে বাঁচতে হবে দ্রুতপরিবর্তনশীল তাপমাত্রা এবং অপরাপর প্রাকৃতিক প্রতিবেশের তীব্রতার মুখোমুখি হয়ে। বংশবৃদ্ধির জন্যও এখানে বিশেষ ধরনের প্রজননপদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। সেই সঙ্গে প্রয়োজন শৈশব অবস্থায় সন্তান-রক্ষার যথোপযুক্ত বিধিব্যবস্থার। এই সব বিশিষ্ট গুণ অর্জন করে স্থলচর জীব যদি জলে ফিরে যায় তাহলে অনায়াসে তারা সেখানকার মৌরুসী বাসিন্দাদের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিতে পারে। কুমীর ও তিমি এই জলপ্রত্যাগত সরীসৃপদের অন্যতম। তার সাথে সাথে নাম করা যায় সেকালের সবচেয়ে হিংস্র মাংসাশী দাঁতাল তিমি জাতীয় জলচর ইকথাইও সারস আর মোজাসারসের।

কিন্তু ত্রিয়াসিক যুগের সবচাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থলচরের নাম থেরিওডোণ্টস্ বা স্তন্যপায়ী জীবের মত দাঁতাল সরীসৃপ। এই মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যেই বিভিন্ন ক্রিয়াসাধক মাড়ীর আর সামনের দাঁতের বিন্যাস দেখা যায়। যেমনটি আছে স্তন্যপায়ী জীবের। কুকুরের মত দুই পাশে দুটি বড় দাঁতও তাদের ছিল। কৌলিক লেজটাও এদের আধুনিক কালের স্তন্যপায়ী জীবের মত খাটো হয়ে যায়। এই সরীসৃপদল বেশ ছুটতে পারত। আজকের দিনের বাঘ জাতীয় মাংসাশী প্রাণীর সঙ্গে এদের পার্থক্য ছিল মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রত্বে আর চোয়ালের সরীসৃপজাতীয় গড়নে।

আম্মোনাইট, সরীসৃপ বা স্তন্যপায়ী জীবের স্বর্ণ যুগের কথা হামেশা বলা হয়। যেন প্রতিটি দলের উন্নতির একটা ক্রমপর্যায়, চরম বিন্দু আর পতনের নির্দিষ্ট অধ্যায় ছিল। এতে কিন্তু প্রশ্নটি বড় বেশী সহজ করে ফেলা হয়। সাধারণ নিয়ম হিসাবে প্রতিটি দলের অভিব্যক্তির কতকগুলি ক্রমিক পর্যায় দেখা যায়।

সরীসৃপদের বেলাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। কার্বনিফেরাস কল্পের শেষাশেষি থেকে শুরু করে ত্রিয়াসিক কল্পান্তের মধ্যে সরীসৃপদের প্রথম পর্যায়ের উন্নতি শেষ হয়ে যায়। প্রথম পর্যায়ের সব শাখা বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন। ত্রিয়াসিক কল্পে আবার শুরু হয় নতুন বিকাশের। এই পর্যায়ে জুরাসিক আর ক্রিটেসাস কল্প জুড়ে সরীসৃপদল ক্রমবিকাশের পথে চরম উন্নতির শিখরে উঠল। কিন্তু তাদের প্রকারণ বেড়েছিল ত্রিয়াসিক কল্পে যখন তাদের অভিব্যক্তির দুটি ধারা একসঙ্গে মিশেছিল। কচ্ছপ আর আঁশওয়ালা গিরগিটি সম্ভবত দ্বিতীয় পর্যায়ের জীব। স্থলচর প্রধান দলের নাম ডিনোসার। পাখীর প্রায় দুই কোটি বছর আগেই উড়ন্ত সরীসৃপ সম্ভবত শূন্যে অভিযান করেছে। আর একদল সরীসৃপ আশ্রয় নিয়েছে জলে। এটাই অভিব্যক্তির ধারা। মূল প্রজাতি থেকে বহু শাখা-প্রজাতি বেরোয় এবং প্রত্যেকে আলাদা আলাদা জীবনধারা আয়ত্ত করার জন্য নিজ নিজ পথে এগিয়ে যায়। এই রীতি ট্রিলোবাইট আর কংখোজের মধ্যেও আগের কালে দেখা গেছে। কিন্তু সরীসৃপদের শাখা-বিভাগ ঘটেছে অনেক বেশী।

॥ শূন্য অভিযাত্রী জীবন ॥

সামুদ্রিক জীবন প্রসারলাভ করেছে তিন দিকে। কিন্তু স্থলভাগে এসে এই প্রসারের ক্ষেত্র সংকুচিত হল। ডাঙা কি শূন্যে ছাড়া প্রসারের সুযোগ রইল না। যে-ডাঙায় জীব হামাগুড়ি দিত তার উপরেও আর এক মহাসমুদ্র আছে। নাম তার বায়ুসমুদ্র। এই সমুদ্রেও সাঁতার কাটা যায় যদি সঠিক পথের নিশানা বের করা সম্ভব হয়। কিন্তু এ বড় সহজ পথ নয়। লবণ-সমুদ্রের তরল পদার্থের চাইতে এই সমুদ্রের তরল পদার্থ আটশ' ভাগ হালকা, আর জৈবপদার্থ আটশ' গুণ ভারী। তবু প্রাণশক্তি এই অসাধ্যসাধন করেছে। অন্ততঃ পাঁচ পাঁচ বার অতিক্রম করেছে এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। প্রথমে অতিক্রম করেছে পতঙ্গ, তারপর সরীসৃপ, তারপর পাখী, তারপর বাদুড়-চামচিকা আর শেষ বার করেছে মানুষ। মানুষকে অবশ্য যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়েছে।

মানুষের ক্ষেত্রে ছাড়া শূন্য অধিকারের এই অভিযান প্রতিবারে সফলতা অর্জন করেছে সাচ্চা পাখার সাহায্যে। পাখা একপক্ষে যেমন নির্ভর তেমনি আবার সচল অঙ্গও বটে। পতঙ্গের শূন্যে ওড়ার উৎপত্তি সম্পর্কে বহু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু তার সবটা কাল্পনিক। অভিব্যক্তির ধারায় পতঙ্গদল প্রথমে বুকে হেঁটে চলা শুরু করলেও ইতিহাসের এক আদিমতম পর্যায়ে উড়তে শেখে। আজ

যেসব পতঙ্গের পাখা নেই তারাও পক্ষচ্যুত পতঙ্গ মাত্র। কিন্তু মেরুদণ্ডী প্রাণীর ব্যাপার আলাদা। পতঙ্গের তুলনায় তার দেহের আকার বড়। ওজনও বেশী। তার পক্ষে হালকা বায়ুর সমুদ্রে সাঁতার কাটা ঢের বেশী কষ্টকর। পতঙ্গকুলের উড্ডয়নের আধাআধি সাফল্যও ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের সুদূরতম পর্যায়ের কাহিনী। মেরুদণ্ডী প্রাণী আকাশজয়ের সাফল্য অর্জন করেছে আকস্মিকভাবে। তিনটি দল পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে মাত্র। অপরাপর মেরুদণ্ডীর মধ্যে অদ্যাপি আংশিক-সফল দল চোখে পড়ে। আংশিক-সফল মেরুদণ্ডী কার্যতঃ প্যারাসুট-সৈন্যদলের মত। অঙ্গের কোন এক অংশে ভর করে লাফ দেয়। অবলম্বনটির জন্য প্রাণে মরে না। সাধারণতঃ এই সব প্রাণী চ্যাপটা হয়ে যায়। দেহের দুই পাশে ধড় আর অঙ্গ বরাবর চামড়ার-একটি আলের মত সৃষ্টি হয়। ক্ষেত্র বিশেষে এই আল খুব প্রাথমিক অবস্থায় থাকে। আবার কখনও বা বড় হয়ে অগ্রপদ ও পশ্চাদ্‌পদ, কাঁধ ও লেজ একটি ঝিল্লী দিয়ে যুক্ত করে দেয়। প্রাণীটি যখন শূন্যে লাফ দেয় এই বর্ধিত অঙ্গ তখন প্যারাসুট গ্লাইডারের কাজ করে। লেজ সঞ্চালন করে হালের মত তার গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উড়ন্ত লেমুর এই জাতের প্রাণী। উড়ন্ত ব্যাঙ অথবা টিকটিকির শূন্যে লাফাবার আর শূন্যে দেহভার বহনের পদ্ধতি অবশ্য কিছুটা আলাদা।

এই সব প্রাণী বৃক্ষচর। তাদের ওড়া মানে লাফ দেবার সময় শূন্যে দেহের ভার বহন করার কৌশল আয়ত্ত করা। এই থেকেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে পাখী চামচিকা বাদুড় বা উড়ন্ত সরীসৃপ এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে। লাফ দিতে দিতে কোন মধ্যবর্তী স্তর পার হয়ে উড়তে শিখে গেছে। অবশ্য সেই মধ্যবর্তী স্তরটি এখনও জানা যায়নি। পাখীর ডানার উৎপত্তির কাহিনী পুরোপুরি জানার মত ক্রমিক পর্যায়ের জীবাশ্মের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। ডানার সঙ্গে সঙ্গে পালকও পর্যায়ক্রমে গজিয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন না। তারা মনে করেন যে পালকের উৎপত্তি হয়েছে আলাদাভাবে। জুরাসিক কল্পের শেষাশেষি তাপ নিবারক আবরণ হিসাবে। এগুলি আগের কালের পাখনার উন্নত বর্ধিত রূপ। পাখনা থেকে উদ্ভূত। কিন্তু হালকা ডানা সৃষ্টি হওয়ায় ওড়ার নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেল। তবে সেই সম্ভাবনার সুযোগ কি করে প্রথমে গ্রহণ করা হয় তা আজও সুস্পষ্ট নয়। সম্ভবত সমতল ক্ষেত্রের ছুটন্ত সরীসৃপ থেকে, অথবা বৃক্ষচর যে সরীসৃপ লাফ দিয়ে শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করতে পারত সেই দল থেকে উদ্ভব হয়েছে পাখীর। প্রথম যুক্তির সমর্থনে বহু ডিনোসারের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।

যে ভূতাত্ত্বিক বিপ্লবে মেসোজোইক অধিকল্পের অবসান হয় তার পরবর্তী কালে খেচর জীবনের অধিকার পক্ষিকুলের করায়ত্ত হয়। এদের মস্তিষ্ক স্তন্যপায়ী জীবের মত কোনদিন উন্নত হয়নি। তবু চলচ্ছশক্তি আর উষ্ণ-রক্ততার জন্য বসুন্ধরার কোন কোন অঞ্চলে এরা প্রধান মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্থান দখল করেছে। ডাঙার জীবনে-বাঁধা প্রাণীর সংখ্যা ও প্রকারণ মেরু অঞ্চলে কম। কিন্তু হাজার হাজার সামুদ্রিক পাখী প্রতি গ্রীষ্মে এখানকার পাহাড়ের মাথায় খাদ্যের খোঁজে বাসা বাঁধে। আবার শীতের সংকেত পেলে উড়ে চলে যায়।

॥ ডিনোসারের পৃথিবী ॥

লেজওয়ালা একদল সরীসৃপ যেমন শূন্যে অভিযান করেছিল, স্থলভাগেও সরীসৃপ জীবন তেমনি নতুনতর উন্নত ধারায় অভিব্যক্ত হয়েছিল। একদল সরীসৃপ স্থলচর কচ্ছপে রূপান্তরিত হয়েছিল আগেই। কচ্ছপের কঠিন পুরু খোল বাইরের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে তাদের কতকটা নির্বেদী হতে সাহায্য করে। আর ওজনের জন্য চলাফেরার দ্রুততাও তারা অর্জন করতে পারেনি। তাছাড়া প্রাণরক্ষার পোক্ত বন্দোবস্তের জন্য তাদের মানসিক অবস্থায় একটা স্থাণুত্ব সৃষ্টি হয়। জুরাসিক কল্প শেষ হবার আগেই তাদের মধ্যে কচ্ছপের রক্ত পুরোমাত্রায় দেখা দেয়। তার ফলে অর্থাৎ কচ্ছপ হিসাবে পূর্ণতা লাভের পর এমন অবস্থা দেখা দিল যে তারা বেঁচে থাকতে পারত কিংবা মরে যেতে পারত, কিন্তু নতুনরূপে অভিব্যক্ত হবার ক্ষমতা তাদের রইল না। সেই থেকে অদ্যাবধি তারা মোটামুটি এক অবস্থায় আছে।

মেসোজোইক পৃথিবীর সরীসৃপদের মধ্যে একমাত্র ডিনোসার প্রকৃত সফলতা অর্জন করেছে। প্রায় দশ কোটি বছর বসুন্ধরায় এদের প্রভুত্ব স্থায়ী হয়েছে। শেষ অবধি প্রতিটি ডিনোসার ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে গেছে। সাত আটটি শাখা-প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছিল এদের শ্রেণীতে। জিরাফ আর ইঁদুর, হাতী আর সিংহের মধ্যে যে প্রভেদ, ডিনোসারের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যেও সেই ধাঁচের পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

ডিনোসার আর স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে চলার ভঙ্গীর পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডিনোসার প্রধানতঃ পেছনের পায়ে ভর করে চলত। কৌলিক ডিনোসার আর কৌলিক স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে এই বৈসাদৃশ্য পূর্ণমাত্রায় ছিল। যারা বৃহদাকার তারা শুধু চার পায়ে ভর করে চলতে বাধ্য হয়েছে। আদিমতম ডিনোসার দ্বিপদ ছিল। ট্রিয়াসিক কল্পের উন্মুক্ত খোলা জমিতে দ্বিপদত্ব বেশ কার্যকরী হয়েছে। হয় এরা তখন ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে চলত কিংবা লেজের

সাহায্যে ভারসাম্য রক্ষা করে দুই পায়ে ভর করে দৌড়োত। পরবর্তী কালে এদের কিছু বৃক্ষচর জীবন গ্রহণ করে। বাকি কিছু কায়িক বিশালত্ব লাভ করে লেজে ভর করে বসে বসে চিবোত। একটি দল মাত্র দেহের হালকা গড়ন আর চটপটে স্বভাব বজায় রাখতে পেরেছিল। আধুনিক যুগের ওয়ালাবি এই শাখার বংশধর। তাছাড়া পালকহীন লেজ-লম্বা উট পাখী জাতীয় কিছু প্রাণীরও উদ্ভব হয়েছে এই শাখা থেকে।

লাফানে ডিনোসারদের কোনটা কায়িক বিশালত্ব পায়নি। দুটি ঘনিষ্ঠ শাখা আকৃতির বিশালত্বে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। তাদের একদল স্থলচর মাংসাশী আর দ্বিতীয়টি উদ্ভিদাশী। মাংসাশী শাখাটি উদ্ভিদাশী শাখার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কলেবর বৃদ্ধি করেছিল যেন। প্রথমে এদের দাঁত ভয়াল হয়ে ওঠে। সামনের থাবাতেও মারাত্মক নখ সৃষ্টি হয়। পরে এই নখ লোপ পেয়ে বিশাল মুণ্ডে হিংস্র দাঁতের বিভীষিকা সৃষ্টি করে। টিরান্নোসারস্ এই শাখার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। মানুষের মাথা-সমান উঁচু ছিল এদের হাঁটু। আর মাথা উঁচু থাকত মাটির উপরে বার-তেরো হাত। ধ্বংসের কি ভয়াল যন্ত্র!

এদিকে উদ্ভিদাশী শাখাটিও কায়িক বিশালত্ব অর্জন করে চার পায়ে চলতে শুরু করে। এদের বংশেই উন্নততর মেরুদণ্ডী প্রাণী উদ্ভব হয়েছে। তার আকার তিমির মত বিশাল। এই সব বিশালকায় জন্তুর ওজন ত্রিশ থেকে চল্লিশ টন অবধি হয়েছিল।

আকার বা আয়তনে বিশালত্ব অর্জন করলেও একটি বিষয়ে ডিনোসার গোষ্ঠী অনগ্রসর ছিল। তাদের মস্তিষ্ক তেমন উন্নতি লাভ করেনি। শ্বেতকায় মানুষের মস্তিষ্কের গড়পড়তা ওজন সের দেড়েক। কোন ডিনোসার, এমন কি চল্লিশ টনী সারোপডদের মস্তিষ্কের ওজনও সের খানেকের বেশী ছিল না।

মেসোজোইক অধিকল্পকে সরীসৃপদের প্রভুত্বের যুগ বলা হয়। কিন্তু পতঙ্গকুল এতে আপত্তি করতে পারে। মানুষ লিখেছে এই যুগের ইতিহাস। মেরুদণ্ডী সে। তাই মেসোজোইক অধিকল্পের প্রভুত্বের গৌরব সে অপর এক মেরুদণ্ডী, তার নিকট-আত্মীয় সরীসৃপকে দিয়েছে। আর সেনোজোইক অধিকল্পের গৌরব দান করেছে তার আরও নিকট-আত্মীয় স্তন্যপায়ীকে। কিন্তু পতঙ্গ সমাজ থেকেও দাবি করা যায় যে আধুনিক কালে পতঙ্গের প্রজাতির সংখ্যা স্তন্যপায়ী সংখ্যার পঞ্চাশ গুণ। ক্রিটেসাস কল্পেও তাদের প্রাচুর্য ও প্রকারণ সরীসৃপদের চাইতে কম ছিল না।

কথাটা ওভাবে বিচার করা ঠিক হবে না। মেরুদণ্ডীর কুসংস্কারের প্রভাবে পতঙ্গকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়নি। অভিব্যক্তির ধারায় প্রভুত্বের প্রশ্ন মূলত প্রতিযোগিতার প্রশ্ন। বিশালকায় আর বামনের সংগ্রামের প্রশ্ন। মেরুদণ্ডীরা যেমন প্রাণী সমাজে সবচেয়ে কর্মঠ এবং বলশালী তেমন বৃহদাকারও বটে। একটি পতঙ্গের চাইতে একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর ওজন কয়েক শত গুণ বেশী। আর দুনিয়ায় সব বিশালকায় প্রাণীই মেরুদণ্ডী। অপর যে কোন পর্বের প্রাণীর চাইতে মেরুদণ্ডীর ওজন গড়পরতা দশগুণ বেশী।

মেসোজোইক অধিকল্পে বিরাটকায় তার বামনের লড়াইয়ের ফয়সালা হয়ে যায়। অভিব্যক্তির সব কটি লড়াইর মত এই লড়াইর ফলাফলও নির্ধারিত হয়েছে প্রতিযোগী দলের নিজস্ব গুণাগুণের বিচারে। মুখোমুখি কোন সংগ্রাম অবশ্য হয়নি। অভিব্যক্তির সংগ্রামের রীতি তা নয়। সেই বিচারে একটি দল প্রভুত্বের আসনে সমাসীন হয়েছে। ক্রিটেসাস কল্পের শেষাশেষি মেরুদণ্ডী আর যুক্তপদ প্রাণীর সমস্যার নিষ্পত্তি হয়ে গেল। পতঙ্গেরা তখন স্বকীয় অভিব্যক্তির শেষ সীমায় পৌছেছে। তাদের সম্বল তখন যা ছিল এখনও তাই।

কিন্তু বিরাটকায় প্রাণীর সম্বল তখনও শেষ হয়নি। নতুন গুণ অর্জনের নতুনতর শক্তির পরিচয় দিল তারা। স্তন্যপায়ী জীব এই নতুন শক্তির অভিনব সৃষ্টি। মস্তিষ্কের ক্রমিক বৃদ্ধি ও উন্নতির বলে এই নতুন সৃষ্টি সমগ্র অভিব্যক্তির ধারা উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে গেল। সরীসৃপদের তুলনায় এই নতুন পতাকাবাহী দল ক্রিটেসাস কল্পে সংখ্যায় অল্প ছিল সত্য। তবু তারা শুধু আকার বৃদ্ধি করেনি। অভিব্যক্তির ধারা পালটে দিয়ে তারা মানুষের নিকটতম আত্মীয় সৃষ্টি করেছে।

অভিব্যক্তির আধুনিক পর্ব

শিলাস্তরের যাদুঘরে রক্ষিত জীবনের প্রাগিতিহাসের ধারা সহসা যেন থেমে গেছে মেসোজোইক অধিকল্পের শেষাশেষি। জীবনের ইতিহাস যেন আত্মগোপন করেছে দুর্জ্ঞেয় যবনিকার অন্তরালে। এই অন্তর্ধানের ব্যাপ্তি কালবিচারে বেশ কয়েক লক্ষ বছর। শিলালিপির কয়েকটি পাতা শূন্য। আবার যখন পর্দা উঠল জীবন-বিকাশের মধ্যযুগের সরীসৃপ অধিকার তখন শেষ হয়ে গেছে। মেসো-জোইক অধিকল্পের প্রাণ-প্রাচুর্যের ছবি মুছে গেছে জীবনেতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। সে কালের জীবজন্তু ডিনোসার, প্লিসিওসার, ইকথাইওসার আর আম্মোনাইটদের অসংখ্য বিচিত্র প্রজাতি এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে তাদের বংশ পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। এইভাবে বংশলোপের কারণ শীত। শীতের প্রকোপে নির্বংশ হয়েছে। শেষের দিকে অনেক শাখা-প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছিল তাদের বংশে। কোনটাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের অগ্নিপরীক্ষায় উদ্বর্তনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। পৃথিবীতে এই সময় এমন কতগুলি বিপর্যয়কর প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যায়ক্রমে দেখা দিতে থাকল যার ধাক্কা সহ্য করা তাদের ক্ষমতার অতীত। তাই মেসোজোইক অধিকল্পের পরাজিত জীবশক্তি ধীর মন্থরে পর্যায়ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নতুন পটভূমিকায়, নতুনতর প্রাকৃতিক প্রতিবেশে দুনিয়া দখল করেছে কষ্টসহিষ্ণু নতুন প্রাণী কুল আর নতুনতর উদ্ভিদ্। এই অধিকার বদলের ফলে জীবনের মধ্য পর্যায়ের ইতিহাস উত্তীর্ণ হয়েছে আধুনিক পর্বে। মেসোজোইক অধিকল্পের স্থানে সূচনা হয়েছে সেনোজোইক বা টারসিয়ারি অধিকল্পের।

স্তন্যপায়ীর অধিকারের যুগ বলা হয় সেনোজোইক অধিকল্পকে। একপক্ষে এই নামকরণ সার্থক। ভুলে গেলে চলবে না যে স্তন্যপায়ীরা এই যুগের বহু বিচিত্র জীবনধারার একটি ধারা মাত্র। স্তন্যপায়ী আর পাখী যেমন সরীসৃপের স্থান দখল করেছে, বসুন্ধরার সবুজ সন্তানও বদলেছে তার সাবেক অঙ্গসজ্জা। আরও বিচিত্র, আরও মনোরম হয়েছে উদ্ভিদ্ জগৎ। তাই এই যুগকে কেউ কেউ পশম, পালক আর ফুলের যুগ বলতে চান। এতেও সুবিচার হয় না। সকলের প্রতি সমদর্শিতা দেখাতে হলে একালের প্রধান প্রধান প্রাণীর শাখা থেকে সাপ,

গিরগিটি, ব্যাঙ, উন্নতদেহী পতঙ্গ বা কাঁকড়ার নাম বাদ দেওয়া যায় না। সেই সঙ্গে বহু পুষ্পপ্রসূ উদ্ভিদের মধ্যে ঘাস ও তৃণের নাম যোগ করতে হয়। তালিকা এতে ক্রমেই দীর্ঘ হয়ে পড়ে। তাই সবটা মিলিয়ে সংক্ষেপে এই যুগকে ক্রমবিকাশের আধুনিক পর্ব অথবা প্রাণবিকাশের আধুনিক যুগ—বলা ভাল।

মেসোজোইক অধিকল্পান্তের সর্বব্যাপী বিনাশ সরীসৃপকুলকে একেবারে নির্মূল করতে পারেনি। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে এখনও তাদের হাজার পাঁচেক প্রজাতি বেঁচে আছে। এই সংখ্যা স্তন্যপায়ীদের মোট প্রজাতির সংখ্যার অধিক। ডিনোসার জাতের অতিকায় সরীসৃপের অবলুপ্তির ফলে আদিম স্তন্যপায়ীদের মত অন্যান্য সরীসৃপদলও স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। বিভীষিকাময় এই অতিকায় প্রতিযোগীরা লুপ্ত হওয়ায় সরীসৃপের অন্যান্য শাখা সহস্র ধারায় বংশবৃদ্ধি করে উন্নত হল। একমাত্র টিকটিকি-গিরগিটি শাখারই তো কত প্রশাখা কত প্রকারণ আছে। একদল তো দুই পায়ে ভর করে ডিনোসারদের মত খাড়াভাবে চলতেও পারে। বৃক্ষচর গিরগিটি, কাঁটাওয়ালা মরুচর গিরগিটি, গাছে গাছে লাফিয়ে চলা গিরগিটি, গর্ত খুঁড়তে সক্ষম গিরগিটি, শিকার ধরার সময় লম্বা জিভ বার করতে সক্ষম গিরগিটি, বিষধর গিরগিটি—কত প্রকারণ এই একটি শাখার। তাছাড়া আকারের বাড়তিও এদের কম হয়নি। প্লিস্টোসিন কল্পে অস্ট্রেলিয়ায় এক রকম গিরগিটি ছিল যারা কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট লম্বা। মানুষের চেয়েও আকারে বড় গিরগিটি আছে। অস্ট্রেলিয়ার এই লুপ্ত অতিকায় গিরগিটির তুলনায় পনের ফুট লম্বা 'কোমোডো ড্রাগন' তো বামন মাত্র।

সাপের বেলাও ঐ এক কথা খাটে। জলচর সাপের মধ্যে একদল লেজের পাখনার সাহায্যে সাঁতার কেটে বেড়ায়। এমন কি প্রজননও করে জলে। অপরাপর জলচর সাপের বাস অলবণাক্ত জলে। বিষধর সাপেরও দুটি শাখা আছে। তাছাড়া ডিম্বাশী সাপ, বৃক্ষচর সাপ আর গর্তখোঁড়া সাপও আছে। এই সর্পকুলেই আছে বিশহাত লম্বা অতিকায় অজগর। তবে গ্রীষ্মমণ্ডলে ছাড়া সাপের পক্ষে প্রকারণ প্রাচুর্য আর অতিকায়ত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। তাপমাত্রা যত কমে আসে সরীসৃপের তৎপরতা তত হ্রাস পায়। বিষুবরেখা থেকে মেরুর দিকে যত এগিয়ে যাওয়া যায় উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ীর সঙ্গে সরীসৃপের প্রতিযোগিতা তত কমে আসে। সেনোজোইক অধিকল্পে একমাত্র নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই স্তন্যপায়ী আর খেচরের যুগ। উষ্ণতর অঞ্চলে গিরগিটি, সাপ, কচ্ছপ আর কুমীরও তাদের সঙ্গী।

সরীসৃপকে অনেক ক্ষেত্রে বিগত যুগের উন্নত জীব প্রজাতির অধঃপতিত বংশধর বলে অভিহিত করা হয়। কুমীর, কচ্ছপ আর অদ্ভুতদর্শন টুয়াতারার গোত্র সুপ্রাচীন কালের জীব। ত্রিয়াসিক কল্পে এদের দেখা মেলে। কচ্ছপের দেখা পাওয়া যায় তার আগের কল্প পারমিয়ানে। সরীসৃপ অধিকারের স্বর্ণযুগের সাক্ষী তারা। কিন্তু প্রথম গিরগিটির সন্ধান মেলে জুরাসিক কল্পে। আর সাপের খোঁজ পাওয়া যায় ক্রিটেসাসে। এদের বিস্তার ও বিকিরণের কাহিনী স্তন্যপায়ীদের সমকালীন সেনোজোইক অধিকল্পের ঘটনা।

ব্যাঙের অভিব্যক্তির কাহিনীও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। প্রায় সহস্রটি প্রজাতি আছে এদের। এদের উন্নতিও ঘটেছে সেনোজোইক অধিকল্পে। ইওসিন কল্পের শিলাস্তরে খোঁজ মিলেছে আদিমতম ব্যাঙের জীবাশ্মের। স্মরণ রাখতে হবে, লেজহীন পেছনের পা বড় এই অদ্ভুত ছিমছাম প্রাণীটি সম্পূর্ণভাবে জলচর হয়েছে। তারা গর্ত খুঁড়তে শিখেছে আর বাসা বেঁধেছে গাছের ডগায়, এমন কি মরুভূমিতেও। শীতার্ত অঞ্চল ছাড়া দুনিয়ার সর্বত্র ছোটখাট ডোবা স্যাঁৎস্যেঁতে জায়গা এখনও তাদের অধিকারে।

পতঙ্গকুলেরও উন্নতি হয় এই যুগে। সমস্ত জন্তুর সবশুদ্ধ যত প্রজাতি জানা গেছে তার চাইতে বেশী প্রজাতি আছে পতঙ্গকুলের। প্রাণীর চিরসহচর পতঙ্গ। জীবজগতের অন্যতম প্রধান প্রজাতি এরা। তবে আকারে বড় হতে পারেনি বলেই দুনিয়া অধিকারের প্রতিযোগিতায় কোনদিন এরা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেনি।

উদ্ভিদকুল সম্পর্কেও দু'চার কথা বলবার আছে। পতঙ্গ যেদিন ফুলের রেণু বহন করতে আরম্ভ করে সেই থেকে ফুলের মধ্যে জটিলতা দেখা দেয়। সেনোজোইক অধিকল্পে এই জটিলতা আরও বেড়ে যায়। ঘাস ও তৃণের সৃষ্টি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, পুষ্পিত উদ্ভিদ্ প্রথমে বৃক্ষ বা কাঠসমন্বিত গুল্ম ছিল। শাকজাতীয় গাছের বাড়তি পরবর্তী কালের ঘটনা। বিশিষ্টগুণসম্পন্ন শাকজাতীয় গাছের মধ্যে ঘাস আর শস্যের গাছ অন্যতম। শুকনো সমভূমির প্রসার এদের উদ্ভব ও বিস্তারে সাহায্য করে।

শিলীভূত উদ্ভিদ্ থেকে আবহাওয়ার ক্রমিক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। ক্রিটেসাস কল্পের এক সময় ম্যাগনোলিয়া, সাইপ্রেস্ পপলার, ডুমুর প্রভৃতি গাছ গ্রীনল্যাণ্ডে জন্মাত। পরবর্তী ইওসিন কল্পেও এদের কিছু বেঁচেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে মেপল, পাইন প্রভৃতি গাছের অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায় যে আবহাওয়া শীতল হতে আরম্ভ করেছে। নরওয়ের স্পিটস্‌বার্জেন এলাকার সমকালীন

জীবাশ্মে একই চিত্রের আভাস মেলে। ইউরোপও গ্রীষ্মাঞ্চল ছিল ইওসিন কল্পে। লণ্ডনের জমিতে তখন গ্রীষ্মমণ্ডলের নিপা পামগাছ জন্মাত। অলিগোসিন কল্পের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত বেশী ঠাণ্ডা ছিল। তখনও দারুচিনি আর কর্পূরের গাছ জন্মাত ফ্রান্সে। মাইওসিন আর প্লাইওসিন কল্পে এই ঠাণ্ডা বেড়ে যায়। ক্রিটেসাস কল্পের অতি উষ্ণমণ্ডলের উদ্ভিদ তখন উত্তর গোলার্ধ থেকে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণদিকে সরে যায়। আজ সেই উদ্ভিদ্ পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলে বেঁচে আছে। আবহাওয়ার কঠোরতার মধ্যে বেঁচে থাকার উপযোগী উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি উত্তর গোলার্ধে এদের স্থান দখল করল। কিন্তু শীত ক্রমে এত বাড়তে লাগল যে এদেরও হটে যেতে হল দক্ষিণে। দেখা দিল মেরু অঞ্চলের গাছপালা। তুষার যুগ না আসা অবধি এই ক্রমিক পরিবর্তনের পালা চলল।

॥ শেষ তুষার যুগের সূচনা ॥

মেসোজোইক অধিকল্প শেষ হয়েছে পর্বতসৃষ্টির প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে। এই আলোড়ন সেনোজোইক অধিকল্পের প্রারম্ভে আরও কতগুলি পর্যায়ক্রমিক আলোড়নের সূচনা করে। ভূমিস্তর উন্নত হল এই সব আলোড়নে। আবহাওয়ার তীক্ষ্ণতাও বৃদ্ধি পেল। স্থানে স্থানে হিমবাহ দেখা দেয়। উদ্গত পর্বত শিখর ক্রমে ক্ষয় হয়ে আসে। আবার অবনমিত হয় ভূমিস্তর। সেই সঙ্গে আবহাওয়াও ক্রমে মৃদু এবং মহাসাগরীয় জলবায়ুর রূপ ধারণ করে। জীবনের কাহিনী আরও বিস্তার লাভ করে এই সময়। ইওসিন কল্পের শেষ পাদে এবং অলিগোসিন কল্পে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উষ্ণ আর্দ্র নাতিকঠোর আবহাওয়া স্থায়িত্ব লাভ করে। ফের একটি পর্বতসৃষ্টির আলোড়ন দেখা দিল মাইওসিন কল্পে। আবার উন্নত হল ভূমিস্তর। খটখটে শুকনো হয়ে গেল বহু জায়গা। আবহাওয়ায় বেশ শীতলতার লক্ষণ দেখা দিল। তার মধ্যে চলতে থাকল আগ্নেয়গিরির উৎপাত। প্লিওসিন কল্পের প্রারম্ভে ভূমিস্তর কিছুটা অবনমিত ছিল। হলে কি হবে! মাইওসিন কল্পের অসমাপ্ত পর্বতপ্রসবের কাজ শুরু হল আবার এবং অব্যাহতভাবে চলতে থাকল। কল্পান্তে দেখা গেল যে উত্তরের ঢালু জমির উপর তুষারের আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। পৃথিবীর জীবনেতিহাসে যে দুটি বৃহত্তম তুষার যুগ দেখা দিয়েছে তার একটি এগিয়ে এল ধীর মন্থরে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে।

বসুন্ধরার এই সব আলোড়ন আবহাওয়া প্রভাবিত করে—অভিব্যক্তির ধারা পালটে দেয়। এক মহাদেশের সঙ্গে অন্যটির যোগসূত্র পুনঃপুন উপযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন

হবার ফলে দেশান্তর গমনের সুযোগ বা বাধাসৃষ্টি হয়। তাতেও ব্যাহত হয় অভিব্যক্তির ধারা। ক্রিটেসাস কল্পের শেষাশেষি সব কয়টি মহাদেশ যুগপৎ কিংবা পরপর একের সঙ্গে অন্যে স্থলপথে যুক্ত ছিল। প্রথমে বিচ্ছিন্ন হল অস্ট্রেলিয়া। তারপর দক্ষিণ আমেরিকা। পুরানো পৃথিবীর সঙ্গে উত্তর আমেরিকার স্থল-সেতুবন্ধন ইওসিন কল্পের মাঝামাঝির আগে ভেঙে যায়নি। সেনোজোইক অধিকল্পের বাকি সময়ে এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার স্থলপথে যোগাযোগ একবার সৃষ্টি হয়েছে আবার ভেঙেছে। মাইওসিন কল্পের এক সময় দক্ষিণ আমেরিকা আবার যুক্ত হয়েছিল স্থলপথে। তবে আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে মরুময় সাহারার বিস্তার ঘটায় মহাদেশটি এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। দেশান্তর গমনের পথে সমুদ্র যতটা বাধা সৃষ্টি করতে পারে প্লিস্টোসিন কল্পে তার চাইতে বেশী কার্যকর বাধা সৃষ্টি করল উত্তরাঞ্চলের বরফের থান। কামচ্‌কাটকা বা আলাস্‌কায় কোন বরফের আস্তরণ ছিল না। ছিল প্রচণ্ড শীত। কাজেই ইউরোপের সঙ্গে উত্তর আমেরিকার স্থল-বন্ধন ছিন্ন হলেও এশিয়া-আমেরিকার যোগসূত্র শীতজর্জর স্থলপথে অক্ষুণ্ণ ছিল।

পৃথিবীর গায়ে মৃদু উষ্ণ আবহাওয়ার আঁচল জড়ান ছিল ভূতাত্ত্বিক কালের অধিকাংশ সময়। বিষুবরেখা থেকে মেরুমণ্ডল অবধি আজকে যে আবহাওয়া বিদ্যমান তার চাইতে অনেক বেশী সাম্যভাব ছিল এই অঞ্চলের আগেকার আবহাওয়ায়। ভূমিস্তর সাধারণতঃ নীচু ছিল। মহাদেশের প্রান্তভাগ, এমন কি কেন্দ্রস্থলও মাঝে মাঝে অগভীর সমুদ্রের জলে ডুবে গেছে। সুউচ্চ পর্বত মাঝে মাঝে মাথা খাড়া করে উঠেছে বটে, কিন্তু পর্বতসৃষ্টির আর এক দফা আলোড়ন দেখা দেবার আগেই আবার তা ক্ষয় পেয়ে টিলায় বা মালভূমিতে পরিণত হয়েছে। আবহাওয়ার সাধারণ সমতা আর নিসর্গ শোভার চ্যাপটা ভাব পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম। বিভিন্নতা ব্যতিক্রম মাত্র। ভূগর্ভের আন্দোলন ও আলোড়ন কদাচিৎ দেখা দেয়। তুষার যুগের আবির্ভাব আরও বিরল ঘটনা।

কিন্তু এই সব দিক থেকেই সেনোজোইক অধিকল্প অন্যান্য কল্পের তুলনায় অস্বাভাবিকতামণ্ডিত। পর্বতসৃষ্টির প্রচণ্ড আলোড়ন ক্রমপর্যায়ে বহুবার দেখা দিয়েছে এই অধিকল্পের ইতিহাসে। আজকের বসুন্ধরার নিসর্গ শোভা তার জন্যই হয়ত পৃথিবীর জীবনেতিহাসের সব কয়টি যুগের তুলনায় মহিমময় সুষমা-মণ্ডিত। সেনোজোইক অধিকল্পের সূচনা হয় শীতলতর আবহাওয়ায়। তার সমাপ্তিও ঘটে প্রচণ্ডতর শীতলতার মধ্যে। সু-উচ্চ মালভূমি, ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক

আন্দোলন-আলোড়ন আর বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক আবহাওয়া দেখা দেয় এই অধিকল্পের শেষ ভাগে। একালের তুষার যুগের লাখ দশেক বছর হয়ত পৃথিবীর ইতিহাসের কঠোরতম অধ্যায়। মনে রাখতে হবে, আজকে আমরা যে যুগে বাস করছি তার আবহাওয়া তুষার যুগের মত কঠোর না হলেও পৃথিবীর অন্যান্য যুগের তুলনায় অনেক বেশী ঠাণ্ডা এবং বিক্ষুব্ধ। অনেক বড় বড় মরুভূমি এবং তুষারাস্তীর্ণ অঞ্চল পাশাপাশি আছে এই যুগে। তার মধ্যে বাঁচতে হচ্ছে মানুষকে। বেশ কঠোর আবহাওয়ায় বাস করতে হচ্ছে। তবে যুগটি যেমন অস্বাভাবিক কঠোর তেমনি উদ্দীপক।

।। স্তন্যপায়ীর জয়যাত্রা ।।

আবহাওয়া পরিবর্তনের যে খতিয়ান দেওয়া হল তার কারণ এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। বিজ্ঞানের এই সীমাবদ্ধতার জন্য ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। যাই হোক, মেসোজোইক অধিকল্পান্তের অশান্ত পৃথিবীতেই স্তন্যপায়ীর জয়যাত্রা শুরু হয়। পারমিয়ান কল্পের শেষ ভাগ থেকে আরম্ভ করে ত্রিয়াসিকের প্রারম্ভ পর্যন্ত যত জীবাশ্মের সন্ধান মিলেছে তার মধ্যে স্তন্যপায়ীর অগ্রগতির নজীর বড় কম নেই। তবে সে নজীর পূর্ণাঙ্গ নয় নিশ্চয়ই।

আকারে ছোট এবং কষ্টসহিষ্ণু ছিল আদি স্তন্যপায়ী। ক্রিটেসাস কল্পের শেষ ভাগে আবহাওয়া যখন কঠোর হল স্বকীয় অর্জিত গুণের বলে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় চূড়ান্ত সুবিধা লাভ করে স্তন্যপায়ীরা। থেরিয়োডোণ্ট নামে ত্রিয়াসিকের এক শ্রেণীর সরীসৃপের দেহে স্তন্যপায়ীদের বৈশিষ্ট্যের প্রচুর লক্ষণ ছিল। কৌলিক স্তন্যপায়ী সম্ভবত এই শ্রেণী থেকে উদ্ভূত। ত্রিয়াসিকের জীবাশ্মের মধ্যে এমন কিছু দাঁত আর চোয়াল পাওয়া গেছে যা সরীসৃপ অথবা স্তন্যপায়ী যে কোন দলের বলে ধরে নেওয়া যায়। ত্রিয়াসিকের শেষের দিকের কিছু জীবাশ্ম তো সুনিশ্চিতভাবে স্তন্যপায়ীর।

জুরাসিক কল্পের জীবাশ্মের মধ্যে সামান্য যে কয়েকটি চোয়ালের হাড় পাওয়া গেছে তারা গড়ন কিছুটা আলাদা। কোন কোনটার আকার দেখে মনে হয় যেন অস্থগর্ভ প্রাণীর। তবে সেকালের আদি স্তন্যপায়ী ডিম্ব প্রসবের পর্যায় অতিক্রম করে দেহের থলেতে শাবক বহন করতে আরম্ভ করেছে এমন কথা কোন জীববিদ্ জোর দিয়ে বলতে চান না।

॥ জন্মবিধির পরিবর্তন ॥

বিরাটকায় সরীসৃপদের শিকার ছিল আদি স্তন্যপায়ী। বাসা বেঁধে ডিম রক্ষা করার উপায় ছিল না। জুরাসিকের প্রাণীদের অধিকাংশ ডিম-শিকারী। কাজেই ডিম আর শাবক বাঁচাতে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করতে হত। এই ডিম রক্ষার অর্থাৎ বংশ রক্ষার প্রয়াসে স্তন্যপায়ীরা কালক্রমে জরায়ুজ প্রাণী হয়ে পড়ল। বাসার বদলে প্রথমে তারা দেহের মধ্যে ডিম রক্ষার ব্যবস্থা করল। দ্বিতীয়তঃ, প্রসবের পর শাবক রক্ষার জন্য কিছুদিন তারা সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করে। বিপন্ন পক্ষীকুলও প্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করল। দ্বিতীয়টি নয়। ডিম-প্রসূ দুটি স্তন্যপায়ীর শাখা আজও বিদ্যমান। এত দীর্ঘদিন পরেও তারা মেসো-জোইক অধিকল্পের কৌলিক রীতি বজায় রেখেছে। কিন্তু অপরাপর স্তন্যপায়ীর শাখা গর্ভের মধ্যে ডিম্বকোষের পরিপুষ্টির বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করে ফেলেছিল। যাদের অপরিণত শাবক তাড়াতাড়ি ভূমিষ্ঠ হত, তাদের তারা দেহের থলের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করত। আবার অন্যান্য শাখা যত বেশী দিন সম্ভব জরায়ুর মধ্যে সন্তানধারণ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করল গর্ভের মধ্যে ফুল নামে চ্যাপটা বৃত্তাকার একটি অঙ্গ সৃষ্টি করে। নাড়ীর দ্বারা ভ্রূণের সঙ্গে যুক্ত এই স্পঞ্জের মত শিরাময় অঙ্গটি গর্ভের মধ্যে ভ্রূণের পরিপুষ্টিসাধন করে এবং প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে। গর্ভস্থ ভ্রূণের পুষ্টিসাধনের এই অন্যনিরপেক্ষ ব্যবস্থা থাকায় শাবক শেষ অবধি এমন সময় ভূমিষ্ঠ হতে থাকল যখন সে নিজে চলতে, খেতে আর বেঁচে থাকতে সমর্থ। সন্তান রক্ষার এই উভয়বিধ ব্যবস্থার মধ্যে প্রথমটি সহজ। কাজেই পণ্ডিতেরা মনে করেন যে অঙ্কগর্ভ শ্রেণীই অভিব্যক্তির ধারায় প্রথমে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি জটিল হলেও নিখুঁত। তাই ফুলওয়ালা প্রাণীরা যখন অনেক বেশী কার্যকর এই রীতি অনুসরণ করতে থাকল ; তখন তারা অঙ্কগর্ভদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে নিশ্চয়।

ক্রিটেসাস কল্পের প্রথম দিকের স্তন্যপায়ীদের কোন জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি। পণ্ডিতদের ধারণা, যদি পাওয়া যায় তো দেখা যাবে যে সেটি অঙ্কগর্ভ প্রাণীর। আধুনিক অপজামের মত কিছু অঙ্কগর্ভ প্রাণীর জীবাশ্ম অবশ্য ক্রিটেসাসের শেষ ভাগে পাওয়া গেছে। ফুলওয়ালা শাখাতেও তখন বহু প্রকারণ সৃষ্টি হয়েছে। অঙ্কগর্ভ প্রাণীরা যখন প্রাধান্য অর্জন করেছিল সেই সময় তারা অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করে। কোন ফুলওয়ালা প্রাণী তাদের সঙ্গী ছিল না। তারপর অস্ট্রেলিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই এদের কৌলিক শাখা বহু বিচিত্র প্রশাখায় বিকশিত হয়ে আধুনিক কালের কাঙারু থেকে অঙ্কগর্ভ ইঁদুর পর্যন্ত সৃষ্টি

করেছে। দক্ষিণ আমেরিকাতেও গিয়েছিল এরা। পরবর্তী কালে ফুলওয়ালা প্রাণী সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করায় অঙ্কগর্ভদের বংশ লোপ পেয়েছে। ইওসিন কল্পের প্রারম্ভে ফুলওয়ালাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে অঙ্কগর্ভ শাখা। একমাত্র অপজাম ছাড়া অঙ্কগর্ভের কোন শাখা কৌলিক বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখতে পারেনি।

আদি ফুলওয়ালা প্রাণী সম্ভবত উত্তরাঞ্চলের কোন স্থানে উদ্ভূত হয়েছিল। মধ্য-ক্রিটেসাস কল্পের শিলাস্তরে এই জাতের প্রাণীর জীবাশ্ম মঙ্গোলিয়ায় পাওয়া গিয়েছে। ইওসিন কল্পের প্রারম্ভে ফুলওয়ালা প্রাণী প্রধান মহাদেশীয় ভূখণ্ডে স্থলচর জীব হিসাবে প্রাধান্য অর্জন করেছিল। তখন এরা গুটিকয়েক শাখায় বিকশিত হয়েছে। ডিনোসার দল সবে লোপ পেয়েছে তখন। অন্ততঃ উত্তর গোলার্ধের বিশাল ভূখণ্ডে তাদের অস্তিত্ব ছিল না। পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের সমস্ত লক্ষণ তখন ফুলওয়ালা প্রাণীর মধ্যে দেখা দিয়েছে। তাই আগের কালের সরীসৃপদের মত তারাও তখন বহু শাখায় অভিব্যক্ত হল। গোটা ইওসিন আর অলিগোসিন কল্প ধরে চলেছে এই শাখা-বিস্তার। আর অনুপযুক্ত শাখার বিলুপ্তি ঘটেছে তারও অনেক পরে। ইওসিন থেকে মাইওসিন কল্পের মধ্যে।

ধীর মন্থরে অগ্রগতি হয়েছে ফুলওয়ালা প্রাণীর। দুটি প্রধান পর্যায় আছে তাদের অভিব্যক্তির। প্রথম পর্যায়ের সূত্রপাত হয় ক্রিটেসাস কল্পে। সেই পর্যায় চরম পরিণতি লাভ করে ইওসিন কল্পের প্রথম ভাগে। প্রথম পর্যায়ের খুর, নখ আর থাবাবিশিষ্ট প্রাণীর (এমব্রিপড্‌স) আদি জাতিরূপের মধ্যে কিছু প্রাণী ক্ষুদ্রকায়। অর্থাৎ সে যুগের মাংসাশীদের মত ছিল। তাদের দাঁতের গড়ন উদ্ভিদাশী চরিত্রের সূচনা করে। থাবা ছিল এই সব প্রাণীর। এ ছাড়া বাকি সকলে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এবং খুরওয়ালা ছিল। ক্রিয়োডোন্ট নামে আদি মাংসাশী প্রাণী তাদের আদিম সর্বাশীরূপ থেকে খুব বেশী উন্নত হয়নি। এই শাখা থেকেই আধুনিক মাংসাশী, পতঙ্গাশী এবং খুর-নখর-থাবাওয়ালা প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।

আদি স্তন্যপায়ী বলা হয় এই সব প্রাণীকে। এরাই প্রভুত্ব বিস্তার করে ইওসিন কল্পের শেষ ভাগে। ক্ষুদ্রকায় কনড়িলার্থস্ ক্রমে দ্রুত দৌড়াতে আর ভালভাবে চিবোতে শেখে। খুর-নখর-থাবাওয়ালা শ্রেণী ক্রমান্বয় বৃহদাকার হয়ে পড়ল। ষাঁড়ের মত বিরাট জন্তু আর ছোটখাট হাতির মত চার শিঙ আর প্রদন্ত-ওয়ালা জন্তুর সৃষ্টি হল এদের শাখায়। অঙ্কগর্ভদের শাখায় অঙ্কগর্ভ নেকড়ে বাঘ আর

'তাসমানিয়ান ডেভিল' শ্রেণীর জন্তর সৃষ্টি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। ক্রিয়োডোণ্ট শ্রেণীর জীবের প্রজাতি থেকে সৃষ্টি হল নেকড়ে বাঘ, হায়না, মার্জেন, বৃহদাকার বিড়াল আর ভল্লুকের মত জন্তু। এই সব প্রাণী আধুনিক যুগের নেকড়ে, হায়না, বিড়াল বা ভল্লুকের জন্মদাতা না হলেও তাদের অগ্রদূত নিশ্চয়।

॥ স্তন্যপায়ীর প্রধান শাখা ॥

স্তন্যপায়ীদের অভিব্যক্তির ধারা যখন এইভাবে প্রবাহিত হচ্ছে দুনিয়ার কোন এক অজ্ঞাত অঞ্চলে সেই সময় দ্বিতীয় আর একটি অভিব্যক্তির ধারা এগিয়ে যাচ্ছিল। ইওসিন কল্পের শেষ ভাগে খোঁজ পাওয়া গেল আধুনিক স্তন্যপায়ীদের প্রধান প্রধান শাখার। তার মধ্যে যেমন চর্বণকারী তীক্ষ্ণদন্তী ছিল তেমনি ছিল আধুনিক খুর-নখর-থাবাওয়ালা শ্রেণী। আর ছিল মানুষ, বানর ও লেমুরসহ স্তন্যপায়ীদের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণী যার পারিভাষিক নাম, প্রাইমেট্‌স। তখনকার প্রাইমেট্‌রা ছিল লেমুর শ্রেণীর। ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকায় সহসা এদের দেখা মেলে। তবে এখানেই এদের উদ্ভব হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন না। ইওসিন কল্পের প্রারম্ভে অপর কোন অঞ্চলে উদ্ভব হয়েছিল নিশ্চয়। তারপর বন্যাস্রোতের মত ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-দেশান্তরে। আদি স্তন্যপায়ীদের চাইতে এদের দৈহিক গড়ন কিছুটা আলাদা প্রকৃতির। দেহের তুলনায় মস্তিষ্ক ক্রমান্বয় উন্নত হয়েছে। এইটেই এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই সব আধুনিক পর্যায়ের জীবের মধ্যে এমন সব বিশিষ্ট গুণ ছিল যার অভাব ছিল আদি স্তন্যপায়ীদের মধ্যে। ইওসিন কল্পের শেষ ভাগে খতম হয়ে গেল কনডিলার্থ শাখা। এমব্লিপড্‌দেরও সেই দশা হল। অবলুপ্তির আগে এদের বংশধারায় শিঙ আর প্রদন্তওয়ালা প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের কলেবরও বড় ছিল। কিন্তু মস্তিষ্কের কোন উন্নতি হয়নি। আধুনিক খুর-নখর-থাবাওয়ালা প্রাণীরা এই দুইটি অবলুপ্ত ধারার সাক্ষী। দুটি আলাদা দলে ভাগ করা যায় তাদের। জোড়-পায়ের আঙুলওয়ালা দল আর বিজোড়-পায়ের আঙুলওয়ালা দল। দুটি দলের আত্মীয়তা খুব ঘনিষ্ঠ নয়। কাজেই খুর-নখর-থাবাওয়ালা প্রাণী বলতে একই শাখাপ্রসূত জন্তু বোঝায় না। দক্ষিণ আমেরিকার হাতি, সিন্ধুঘোটক, আর অধুনালুপ্ত নোটুনগুলেটদের কৌলিক অভিন্নতা আছে বিজোড়-পায়ের আঙুল-ওয়ালাদের সঙ্গে। অপরপক্ষে জোড়-পায়ের আঙুলওয়ালা বা মাংসাশী আর সম্ভবত প্রাইমেটদের সগোত্র। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক স্তন্যপায়ীদের বিকিরণ মূলত তিনটি ধারায় হয়েছে। মাংসাশী, তিমি আর জোড়-পায়ের-

আঙুলওয়ালারা আছে একদিকে। অপরদিকে আছে বিজোড়-পায়ের আঙুল-ওয়ালা আর তাদের আত্মীয়েরা। আর এই দলের মাঝখানে আছে পতঙ্গাশী, বাদুড়, তীক্ষ্ণদন্তী আর দন্তহীন প্রাণীরদল।

খুরওয়ালা প্রাণীদের মধ্যে বিজোড়-পায়ের আঙুলওয়ালারা প্রথমে অভিব্যক্তির ধারায় এগিয়ে যায়। এদের শাখাতে ঘোড়ার উদ্ভব হয়। গণ্ডার আর টাপির নামে গণ্ডারের মত জন্তুও এদের শাখা থেকে উদ্ভূত; তবে এদের বংশ ক্ষীয়মান। এদেরই শাখায় বালুচিথেরিয়াম নামে যে জন্তুটির সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে হাতি আর জিরাফের সমন্বয় ঘটেছিল যেন। হাতির মত বিশাল দেহ আর জিরাফের মত লম্বা গলা দিয়ে অনায়াসে তারা গাছের উঁচু ডগা থেকে নব পল্লব ছিঁড়ে খেতে পারত। এই বিশালকায় স্থলচর শৃঙ্গহীন জন্তুকে শিকার করার জন্ম তীক্ষ্ণদন্তী শ্বাপদও সৃষ্টি হয়েছিল সেকালে। এনড্রুসারচাস্ নামে যে তীক্ষ্ণদন্তীর জীবাশ্ম মঙ্গোলিয়ায় পাওয়া গিয়েছে তার করোটি দু' হাত লম্বা।

জোড়-পায়ের আঙুলওয়ালাদের অগ্রগতির সূত্রপাত হয় পরে। অভিব্যক্তির পথে চলতে শুরু করে অচিরে তারা বিজোড়-পায়ের আঙুলওয়ালাদের পেছনে ফেলে যায়। এরাই আধুনিক স্তন্যপায়ীদের মধ্যে প্রধান উদ্ভিদাশী হয়ে উঠল। এদের প্রধান ধারার শূকরজাতীয় কয়েকটি শাখা অবশ্য লোপ পেয়েছে। তবু শূকরাকার যে দুটি শাখা বেঁচে আছে, শূকর, জলহস্তী, আমেরিকার শূকরজাতীয় চতুষ্পদ পিক্কারি, আফ্রিকার ওয়ার্ট-হগ অর্থাৎ মুখের উপর আঁচিলের মত মাংস-পিণ্ডওয়ালা শূকর আর রোমন্থক শ্রেণী তাদের বংশধর। উট আর দক্ষিণ আমেরিকার উট লামাস্ আগেই উদ্ভূত হয়েছিল রোমন্থকদের শাখায়। বাকি আর সকল শ্রেণীর—যেমন, গবাদি পশু, ভেড়া, জিরাফ, আধুনিক হরিণ আর শিঙওয়ালা হরিণ মাইওসিন কল্পের সৃষ্টি।

মৃগ-সদৃশ শৃঙ্গহীন কৌলিক এক প্রজাতি থেকে উদ্ভব হয়েছে এদের সকলের। তীক্ষ্ণদন্তীরা মাথায় খাটো ছিল বটে, কিন্তু চিবিয়ে খাবার দাঁতের পাটির বেশ উন্নতি করেছিল। আধুনিক তীক্ষ্ণদন্তীরা যখন ইওসিন কল্পে উদ্ভূত হল সেই থেকে তাদের একটি শাখাও লোপ পায়নি। আধুনিক কালে এদের সংখ্যা আর প্রকারণ—এই দুইটিই প্রচুর। উদ্ভিদাশীরা ছিল মাংসাশীদের শিকার। অভি-ব্যক্তির পথে তারাও পেছিয়ে রইল না। মিয়াসিড্ নামে একটি শাখা থেকে উদ্ভব হয়েছে সমস্ত আধুনিক মাংসাশী স্তন্যপায়ী। মাংসাশীদের এই শাখার মস্তিষ্ক ছিল সব চেয়ে বড়। আকৃতির বিশালত্ব দিয়ে এদের আত্মীয়দল যা লাভ করেছে এরা তাই লাভ করেছে কৌশলে আর চতুরতার সাহায্যে। তার পুরস্কারও মিলেছে।

ইওসিন কল্পের শেষ ভাগে এই একটি মাত্র শাখা থেকে যাবতীয় মাংসাশী স্তন্যপায়ী সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে একটি মাত্র শাখা, ছোরার মতো দাঁতওয়ালা বাঘ-সদৃশ এক শ্রেণীর প্রাণী লোপ পেয়েছে। বাদুড়েরা আকাশচারী হল ইওসিনের প্রথম ভাগে। প্লিসিয়াডেপিস নামে আর এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রকায় জীব সৃষ্টি হয়েছিল এই সময়। অভিব্যক্তির দিক থেকে এদের প্রাইমেটস্ শ্রেণীর লেমুর আর বৃক্ষচর ছুঁচো নামে জন্তুর মধ্যবর্তী পর্যায় বলা যায়। এদের কাহিনী মানুষের রহস্যময় উদ্ভবের কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

।। স্তন্যপায়ীশাখার বৈশিষ্ট্য ।।

এইবার দেখা যাক মেসোজোইক আর সেনোজোইক অধিকল্পের প্রাণবিকাশের মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং কতটা। আদি স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে উদ্ভিদাশী আর মাংসাশী সরীসৃপদের পার্থক্য শুধুমাত্র সামান্য গুটিকয়েক বৈশিষ্ট্যের। এই থেকে মনে হতে পারে যে প্রকৃতি তার খেলার পুনরাবৃত্তি করেছে মাত্র। উদ্ভিদাশী আর মাংসাশী ডিনোসারের বদলে মাংসাশী আর উদ্ভিদাশী স্তন্যপায়ী সৃষ্টি করেছে মাত্র। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় না। এই দুই অধিকল্পের জীবনের পার্থক্য বাহ্যিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও গভীরতর।

এই দুটি যুগের প্রধান মৌলিক পার্থক্য যুগ দুটির মানসিক অবস্থার তারতম্যের মধ্যে নিহিত। সন্তানের সঙ্গে স্তন্যপায়ীদের দীর্ঘ সংযোগ থেকে মূলত এই তারতম্য সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য গুটিকয়েক ক্ষেত্র ছাড়া সরীসৃপ সাধারণতঃ তার ডিম সম্পর্কে কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। জনিতার কোন খোঁজ জানে না সরীসৃপ-শাবক। ফেলে-আসা ডিম থেকে সে ফুটে বেরোয় অনাদরে। তার মানসিক জীবন সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমায়িত। সগোত্রের সঙ্গে মারামারি না করে যদি সে তাদের অস্তিত্ব সহ্য করে তবু তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ তার থাকে না। তাদের কোন অভ্যাস সে অনুকরণ করে না। কিছুই শেখে না তাদের কাছ থেকে। এমন কি তাদের সঙ্গে একযোগে মিলিতভাবে কোন কাজ করার ক্ষমতাও তার নেই। সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট তার জীবন। কিন্তু আধুনিক স্তন্যপায়ী আর কিছু খেচর সন্তানপালনের যে অভ্যাস আয়ত্ত করল তার ফলে অনুকরণের সম্ভাবনা, বিপদসূচক ধ্বনি থেকে পারস্পরিক যোগাযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিল। পারস্পরিক জীবন নিয়ন্ত্রণ আর নির্দেশ পালনের সম্ভাবনাও দেখা দিল সেই সঙ্গে। এক কথায় শিক্ষা গ্রহণের একটি নতুন রীতির সৃষ্টি হল জীবজগতে।

আদি স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্কের আকার মাংসাশী ডিনোসার থেকে সামান্য উন্নত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, স্তন্যপায়ীদের প্রতিটি শাখা-প্রশাখার

মস্তিষ্ক ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পেতে থাকল। আদি স্তন্যপায়ীরা হয়ত স্তন্যদানের পর্যায় শেষ হলে শাবকের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করত। কিন্তু পারস্পরিক সমঝোতার অবস্থা যখন সৃষ্টি হল, তখন এই সংশ্রব দীর্ঘতর করার সুবিধা সকলেই উপলব্ধি করেছিল নিশ্চয়। তার ফলে সাচ্চা সামাজিক জীবনের সূচনা হয়। এক সাথে যূথবদ্ধ হয়ে পরস্পর পরস্পরকে পাহারা দিয়ে, পরস্পরকে অনুকরণ করে আর পরস্পরের ধ্বনি বা আঙ্গিক ভঙ্গী থেকে হুঁশিয়ার হয়ে তারা বাঁচতে থাকে। এই জিনিস পৃথিবীতে আগে কখনও দেখা যায়নি মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে। জোট-বাঁধা সরীসৃপ আর মাছও দেখা যায়। সমান অবস্থার সম্মুখীন হয়ে অনেক সময় তারা এক সাথে থাকে। এই এক সাথে থাকার পেছনে আছে একই রকম বাইরের শক্তির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ ব্যষ্টির উপর বাইরের শক্তির প্রভাব তাদের একসাথ করেছে। কিন্তু স্তন্যপায়ীরা যূথবদ্ধ জীবন বজায় রেখেছে ভেতরের আবেগে। পরস্পরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে তারা একসাথে থাকেনি। পরস্পর পরস্পরকে পছন্দ করে বলেই একজোট হয়েছে।

সরীসৃপ জগতের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এত বেশী যে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এই পার্থক্যের বাধা অতিক্রম করে তাদের আচার আচরণের কারণ উপলব্ধি করা। সরীসৃপের সহজ প্রবৃত্তির তাগিদ, তাদের ক্ষুধা, ভয় ও ঘৃণার রহস্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের মনের গতি জটিল বলে এদের সরলতা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। শুধু প্রবৃত্তির তাগিদে আমরা কাজ করি না। বিচার-বিবেচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় আমাদের আবেগ। আত্মনিয়ন্ত্রণের আর আত্মসংযমের ক্ষমতা আছে স্তন্যপায়ীদের আর পক্ষীকুলের। অন্যের সম্পর্কে কিছুটা বিবেচনা-বোধও আছে। এটা সামাজিক বৃত্তি। এক পক্ষে অতি নীচু পর্যায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও বলা যায়। এই বিবেচনাবোধের বলে প্রায় সব রকম সরীসৃপের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। ব্যথায় তারা আর্তরব করে—ছটফট করে। এই বেদনাবোধের অভিব্যক্তি আমাদের মনেও আবেগ সঞ্চার করে। পারস্পরিক জানা-শোনার ভিত্তিতে আমরা এদের পোষ মানাতে পারি। শিক্ষা দিয়ে ওদের এমন ভাবে পোষ মানান সম্ভব যাতে আমাদের সম্পর্কে ওদের আচরণ সংযত হয়ে যায়। ওদেরও শেখান যায় আত্মসংযম।

জীবজগতে এই যে অভিনবত্ব দেখা দিল তার মূলাধারে আছে একটি মাত্র কারণ। স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও উন্নতি হয়েছিল বলে সেনোজোইক অধি-কল্পের জীবজগতে পারস্পরিক যোগাযোগ ও পারস্পরিক নির্ভরতার নতুন যোগসূত্র সৃষ্টি হতে পেরেছে। মানুষের সমাজ-জীবন এই কোরকের পুষ্পিত রূপ।

অভিব্যক্তির গতিপথ

অভিব্যক্তির কাহিনী পড়তে গিয়ে কখনও যদি ধরে নেওয়া হয় যে জীবনের ক্রমবিকাশের কোন সহজ সরল গতিপথ আছে, যদি মনে করা হয় যে ক্রমোন্নতির সরল পথে পর্যায়ক্রমে অগ্রগতির ফলে মাছের পর সরীসৃপ, সরীসৃপের পর স্তন্যপায়ী, আর স্তন্যপায়ী থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছে তাহলে বাস্তব ঘটনার বিভ্রান্তিকর জটিলতা উপেক্ষা করা হবে। কারণ, অভিব্যক্তিকে কোন দিক থেকে সহজ সরল জীবন-বিকাশের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আমাদের কুলপতিরা যখন হাত, পা আর মাথার উন্নতিসাধন করছিল, জীবনবৃক্ষের অন্যান্য শাখার প্রাণীও তখন নতুন হাতিয়ার তৈরীর জন্য চেষ্টা করছে—শান দিচ্ছে নিজের নিজের হাতিয়ারে। ব্যাঙ উন্নতি বিধান করছিল তার জঙ্ঘার; পাখী তার ডানার। আর তীক্ষ্ণদন্তী শান দিচ্ছিল তার দাঁতে। অগণিত প্রয়াস ও ক্রিয়াকলাপের ফলাফলের সামগ্রিক রূপের মধ্যে ফুটে ওঠে অভিব্যক্তির ছবি। এই প্রয়াসের কোনটি অন্যনিরপেক্ষ, কোন কোনটি পরস্পর-সম্পৃক্ত। অসংখ্য সুতোর জট পাকান গ্রন্থি আছে ক্রম-বিকাশের কাহিনীতে। আমাদের কাহিনী—মানুষের কাহিনী সেই জটিল গ্রন্থিভরা কাহিনীর সহস্র সুতোর একগাছি মাত্র।

এই কথা স্মরণ রেখে বিচার করতে হবে স্তন্যপায়ীদের অভিব্যক্তির কাহিনী। প্রথমেই তাহলে চোখে পড়বে বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন কতগুলি ধারা। এই স্বতন্ত্র ধারার পথ বেয়ে হাতি, ঘোড়া, বাঘ, তিমি প্রভৃতির শাখা নিজস্ব পদ্ধতিতে ক্রমেই ভালভাবে এক একটি স্বতন্ত্র জীবনধারা রপ্ত করে নিয়েছে। কোন শাখা যদি চলতি পথে অবলুপ্ত হয়ে না যায় তাহলে প্রতিটি বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন ধারা শেষ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের পথে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারপর সামান্য খুঁটিনাটি পরিবর্তন ছাড়া ব্যাপক কোন পরিবর্তন তার মধ্যে ঘটে না।

বিশেষ বিশেষ গুণ অর্জন করা কোন বিচ্ছিন্ন অন্যনিরপেক্ষ পরিণতি নয়। প্রতিটি প্রজাতির ক্রমবিকাশ ঘটে অর্জিত গুণ অনুসারে। এই অর্জিত গুণের তারতম্যের জন্য প্রতিটি প্রজাতি একসাথে বিবিধ বিশিষ্টগুণমণ্ডিত শাখায় অভিব্যক্ত হয়। সমস্ত শাখা যত বিশিষ্টতা অর্জন করে তার সমষ্টিফলের মধ্যে

ধরা পড়ে ঐ প্রজাতির পক্ষে সম্ভাব্য গুণার্জনের ক্ষমতা। স্তন্যপায়ীদের মত বৃহৎ প্রাণীগোষ্ঠীর দীর্ঘ ইতিহাসে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে বিশেষ বিশেষ ধারায় ক্রমবিকাশের।

কালনিয়ন্ত্রিত আর একটি রূপ আছে ক্রমবিকাশের। এক এক কালে উদ্ভব হয় এক একটি পর্যায়ের জীব। আবার পরবর্তী পর্যায় শুরু হয় পূর্ববর্তী যুগের উন্নতির স্তর থেকে। মেসোজোইক অধিকল্পে উদ্ভব হয়েছে স্তন্যপায়ীর আদিম রূপের। তারপর আর একটি পর্যায় দেখা দেয় ক্রিটেসাসে। আদিম অঙ্কগর্ভ স্তন্যপায়ীর মধ্যে। ক্রিটেসাস কল্পের শেষভাগে দেখা দিল ফুলওয়ালা প্রাণী। আদি স্তন্যপায়ীদের পর্যায় এইখানেই শেষ। আধুনিক স্তন্যপায়ীর উদ্ভব হল ইওসিন কল্পের শেষাশেষি। এদের প্রতিটি পর্যায় যাত্রা শুরু করেছে পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় উন্নত স্তর থেকে। এই বিকাশধারার প্রতিটি স্তর সুচিস্তিত। প্রথমে ডিম্ব প্রসবের স্তর, তারপর আগাম প্রসূত শাবকের অঙ্কগর্ভাশ্রয়ের স্তর, তারপর ফুল-পরিপুষ্ট শাবকের বিলম্বিত প্রসবের স্তর। চতুর্থ স্তরে দেখা দেয় মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও উন্নতি। ফুলওয়ালা প্রাণীর ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে যেসব স্তন্যপায়ী সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে তখন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। আগের পর্যায়ের অধিকাংশ শাখা তার ফলে অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিছু বেঁচে থাকে তার মধ্যে। এমন কি উন্নতিও লাভ করে। আজকের জন্তু-জানোয়ারের প্রধান প্রধান শাখার সব কয়টি শেষ পর্যায়ের অভিব্যক্তির সৃষ্টি নয়। পতঙ্গাশী আর মাংসাশী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে আদি পর্যায়ের স্তন্যপায়ী থেকে। আধুনিক পর্যায় থেকে নয়।

প্রতিটি প্রধান শাখা যেমন অভিব্যক্তির পথে প্রশাখা সৃষ্টি করে, প্রতিটি প্রশাখার মধ্যে তেমন আবার প্রকারণ দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে মাংসাশী আর খুর-নখর-থাবাওয়ালা প্রাণীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। খুর-নখর-থাবাওয়ালা শ্রেণীর শাখায় প্রথম দেখা দেয় জোড় পায়ের আঙুলওয়ালা প্রাণী। তারপর ঐ শ্রেণীতেই উদ্ভব হয় বিজোড় পায়ের আঙুলওয়ালা উন্নততর জীব।

ক্রমবিকাশের এই রীতি ছাড়া প্রতিটি আগুয়ান শাখার মধ্যে আর একটি লক্ষণ দেখা যায়। ঘোড়ার শাখার মূল কেন্দ্রীয় ধারা আর পার্শ্ব-ধারার মধ্যে পার্থক্য টানা হয়। কিন্তু মূল কেন্দ্রীয় ধারা আসলে পত্র-পল্লবহীন কাণ্ডের মত নয়। মূল কাণ্ডের গায়েও বহু শাখা-প্রশাখা গজায়। ঘোড়ার অভিব্যক্তির মূলে আছে চিবোবার দাঁত আর দৌড়োবার অঙ্গের উন্নতি। অভিব্যক্তির যে পর্যায়ে ঘোড়ার বহু জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গেছে তখন দেখা গেছে যে তাদের কোন কোনটির দাঁত হয়ত অন্যান্যের তুলনায় উন্নত কিন্তু পা কম উন্নত। একটি

অঙ্গ অতি উন্নত আর অপর অঙ্গ কম উন্নত ঘোড়া শ্রেণীর জীব শেষ অবধি কেন্দ্রীয় ধারার সব দিক থেকে উন্নততর জীবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জয়ী হতে পারেনি। তার ফলে অল্পায়ু শাখা-পল্লববেষ্টিত মূল কাণ্ড এগিয়ে গেছে ক্রমবিকাশের পথে।

এইটিই সাধারণ রীতি। কোন প্রজাতির মূলধারার অগ্রগতির পথে একদিকে সেই মূলধারা যেমন পরবর্তী পর্যায়ের দিকে এগোয়, তেমনি সেই মূল কাণ্ড থেকে আরও ডজনখানেক শাখা বেরিয়ে এগোতে থাকে। সেই শাখার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ, বিশেষ বিশেষ গুণ, এমন কি সমান্তরাল অভিব্যক্তির লক্ষণ পর্যন্ত থাকে। হাজার কয়েক বছর এরা বাঁচে, তারপর নির্বংশ হয়ে যায়। কোন একটি বা দুটি বিশেষ গুণ অর্জন করে বেঁচে থাকার চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী হওয়া কষ্টকর। যাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কতগুলি উন্নতির সমন্বয় ঘটে, যারা সার্বিক উন্নতি অর্জন করতে পারে তারাই জয়ী হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনে।

বিশেষত্ব অর্জন আর অগ্রগতি এই দুটি জিনিসই অর্জিত গুণের ফল। প্রতিযোগিতার চাপে, অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে আর ভালভাবে বাঁচার তাগিদে এই দুটি বিশিষ্টতা অর্জন করে বিকাশমান প্রাণশক্তি। বিশেষ গুণ অর্জনের অর্থ বিশেষ কোন পদ্ধতি অনুসারে বেঁচে থাকার জন্য জীবনতন্ত্রের উন্নতিসাধন। আর অগ্রগতির অর্থ বেঁচে থাকার জন্য জীবনতন্ত্রের সার্বিক উন্নতিসাধন। প্রথমটি একপেশে উন্নতি আর দ্বিতীয়টি সার্বিক উন্নতি। সরীসৃপ আর স্তন্যপায়ীদের দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সরীসৃপ শ্রেণীর সব কয়টি প্রধান প্রধান শাখা বিশেষ বিশেষ জীবনধারা অবলম্বন করে বেঁচে থাকার উপযুক্ততা অর্জন করেছিল। কিন্তু তাদের দলের যে শাখাটি উষ্ণ রক্ত, দুগ্ধ আর গর্ভের মধ্যে সন্তানের পরিপুষ্টি সাধনের যোগ্যতা অর্জন করেছিল তারা বেঁচে থাকার সংগ্রামে সার্বিক উন্নতিসাধন করতে পেরেছে। পরবর্তী যুগে এই উন্নততর জীব-শ্রেণী বিবিধ ধারায় বিকশিত হয়। সাবেক ধারার জীব পারেনি। অভিব্যক্তির বিধানে তারা অপ্রধান হয়ে পড়েছে।

কোন এক জীব-প্রজাতির অভিব্যক্তির পক্ষে অন্যান্য প্রজাতির প্রতিযোগিতা বড় কম প্রভাব বিস্তার করে না। একপক্ষের বেঁচে থাকার প্রয়াস আর একপক্ষের উন্নতি, অগ্রগতি এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলতে পারে। শক্তিমান সরীসৃপের দাপট মেসোজোইক অধিকল্পের আদিম স্তন্যপায়ীদের অগ্রগতির পথে প্রচণ্ড বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। স্তন্যপায়ীদের ক্রমবিকাশ এই সময় নিতান্ত দুর্বল, নেহাৎ সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ জীবন-সংগ্রামের প্রতি ক্ষেত্রে তখন সরীসৃপদের অব্যাহত কর্তৃত্ব। এই সব ক্ষেত্রে জীবনের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব

প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য এই প্রভাবের চাপ নিতান্ত আকস্মিক এবং বাইরের জিনিস। আবহাওয়ার বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রভাবে সরীসৃপের প্রাধান্য লোপ পেল। আর তার ফলে উন্মুক্ত হল স্তন্যপায়ীদের অগ্রগতির পথ। উষ্ণরক্ততার জন্য শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ তাদের পক্ষে দুঃসহ হল না। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর উদ্ভিজ্জ খাদ্যের পরিমাণ যদিও হ্রাস পেল তবু স্তন্যপায়ীরা ক্ষুদ্রকায় ছিল বলে তাদের খাদ্যের অভাব হল না। নিজেদের ক্ষুদ্রকায়তা তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে সাহায্য করেছে।

তাছাড়া আবহাওয়া অনেক সময় সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। মেসোজোইক অধিকল্পের শেষভাগের খটখটে শুষ্কতার জন্য বনভূমির বিস্তার সঙ্কুচিত হয়ে তৃণভূমির প্রসার ঘটল। নিসর্গরূপের এই পরিবর্তনের ফলে যেসব প্রাণী গাছের পাতা ছিঁড়ে খেত তাদের জায়গায় তৃণাশী প্রাণীর অভিব্যক্তি অনুপ্রেরণা লাভ করল। শিকার ও শিকারী উভয়ের পক্ষেই দ্রুত ছুটবার প্রয়োজন হ্রাস পেল। সোজা কথায়, রোমন্থক শ্রেণীর উদ্ভবের পক্ষে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করেছে এই প্রাকৃতিক পরিবর্তন। তৃণভূমিতে যারা বিচরণ করত কিংবা ছুটত, শুধু তারাই নয়, আজকে যারা জাবর কাটে অর্থাৎ চটপট খাদ্য পেটে পুরে পরে চিবোবার মত জটিল পাকস্থলী যারা সৃষ্টি করতে পেরেছে তাদের সকল শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে। এই জন্যই জাবরকাটা শ্রেণীর উন্নতি দ্রুততর হয়েছে টারসিয়ারি কল্পে। শুকনো খোলা মাঠ প্রসার লাভ না করা পর্যন্ত এদের পক্ষে অদ্ভুত ধরনের পরিপাকবিধি সৃষ্টি করার বাধা ছিল।

আবহাওয়ার রূপান্তর যেমন বিকাশের সহায়ক তেমনি আবার বিনাশের বাহনও বটে। তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বহু প্রাণীকুল খতম হয়ে যায়। তুষার যুগের প্রভাবে বিলীন হয়ে গেছে বহু শাকাশী জীব। তার অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে মরেছে ছোড়ার মত দাঁতওয়ালা ব্যাঘ্রাকার জীব। অকর্মণ্য অলস জীব শিকার করে এরা বাঁচত। শিকারের বংশনাশ এদেরও সর্বনাশ ঘটাল।

অভিব্যক্তিকে যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয় তাহলে মনে হবে যেন ক্রমবিকাশ কতকগুলি সঙ্গতিহীন বিশৃঙ্খল ঘটনার সমষ্টি। একটির পর একটি আকস্মিক ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেছে তার পরিবর্তন। আর সেই আকস্মিক ঘটনাবলী হঠাৎ ঘটেছে কোন এক ভূতাত্ত্বিক মুহূর্তে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যদি বিচার করা হয় তো ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পারম্পর্যহীনতার খুব অভাব আছে বলে মনে হবে না। জীব-বিকাশের কাহিনীর যতটুকু বিবরণ এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তাতে একথা অন্ততঃ প্রতিপন্ন হয় যে প্রগতি আর উন্নতিই অভিব্যক্তির

মূল কথা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন জিনিস আবিষ্কার করে প্রাণশক্তি। তার বাঁচা-মরা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনে। আর পুরনোকে চিরকাল অতিক্রম করে এগিয়ে যায় নতুন যোগ্যতর উন্নততর জীব।

এই রায় মেনে নেবার আগে প্রগতি আর উন্নতি কথা দুটির তাৎপর্য ভাল-ভাবে জানা থাকা দরকার।

উন্নত জীব আর নীচু স্তরের জীব এই দুটি শব্দ সাধারণতঃ হামেশা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এটা যে কথার কথা নয়, এই পার্থক্য টানার পেছনে যে সঙ্গত যুক্তি আছে একটু চিন্তা করলেই তা ধরা পড়ে। উন্নততর জীব পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অনেক বেশী আয়ত্তাধীনে আনতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর তার নির্ভরশীলতাও অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া ইন্দ্রিয়স্থান আর মস্তিষ্কের সাহায্যে বাইরের জগতের সঙ্গে সে অনেক বেশী যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। তাই তার পৃথিবীর পরিধি অনেক বড়—বহু বিচিত্রতাসম্পন্ন। তৃতীয়তঃ, এই সব জীবের জানার, শেখার, অনুভব করার আর দূরদৃষ্টির ক্ষমতাও অনেক বেশী হয়।

অনেক ক্ষেত্রে শুধু দেহের আকারের জন্যই পারিপার্শ্বিক অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনা সম্ভব হয়। অতি ক্ষুদ্র প্রাণী স্রোত বা বাতাসের বেগ সহ্য করতে পারে না। কিন্তু যে কোন বৃহদাকার প্রাণীর পক্ষে এই বেগের ধাক্কা সহ্য করা সম্ভব। সঠিক ভাবে বলতে গেলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনা আর সে সম্পর্কে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ক্ষমতা দেখা দেয় দৈহিক গড়নের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উন্নতির ফলে। উভয়চরদের পক্ষে যা সম্ভব নয় এমন বহু কাজ করতে পারত উন্নত ধরনের সরীসৃপ অথবা স্তন্যপায়ী। ছিমছাম গড়নের মাছও সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে সাঁতার কাটতে পারে। কিন্তু মেডুসা বা জেলী-মাছের পক্ষে অন্ধভাবে শুধু হাতড়ান সম্ভব। আত্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যসাধক দৈহিকতন্ত্রের জন্যও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর একান্ত নির্ভরশীলতা খানিকটা হ্রাস পায়। স্তন্যপায়ীদের শিরা-উপশিরার রক্তের কথাই ধরা যায়। এই বিশেষ ধরনের তরল পদার্থ টির তাপমাত্রা, তার রাসায়নিক সংমিশ্রণের ধ্রুবকতা বাইরের প্রায় যে কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাপমাত্রা আর রাসায়নিক সংমিশ্রণের ধ্রুবকতার চাইতে অনেক বেশী সুনিয়ন্ত্রিত। তাছাড়া জীবকোষগুলির কাজ করার পক্ষে রক্ত জিনিসটি সব চাইতে বেশী সহায়ক। এ ছাড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্যও প্রাণীর পক্ষে খানিকটা নিরপেক্ষতা লাভ করা সম্ভব। যে যন্ত্র দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে প্রধানতঃ তার উন্নতি অর্থাৎ মস্তিষ্ক আর তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়স্থান, আর

নার্ভতন্ত্রের উন্নতির জন্য এই নিরপেক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয়স্থানের গোয়েন্দাগিরি ছাড়া পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ সম্পর্কে কোন জ্ঞানলাভ করা যেত না। চক্ষু-কর্ণহীন অ্যামিবা বা হাইড্রার কথা চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে দূরের ঘটনা সম্পর্কে কি গভীর অজ্ঞতার মধ্যে তাদের জীবন কাটে। একঘেয়েমিভরা তাদের জগৎ। অন্ধকার বাক্সের মত। স্পর্শ আর রস আস্বাদনের মধ্য দিয়ে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব তার বেশী অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সুযোগ স্পষ্টতই তাদের নেই। কিন্তু সংবাদ-সংগ্রহের ইন্দ্রিয় আর কাজ করার ইন্দ্রিয়ের উন্নতি যখন একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পৌঁছায় তখন যদি আরও বেশী নিরপেক্ষতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনার আরও বেশী ক্ষমতা অর্জন করতে হয় তাহলে মস্তিষ্কের সাহায্যে কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে আরও ভালভাবে চালনা করতে হবে। স্তন্যপায়ীরা ঠিক এই পদ্ধতি অনুসারে কর্মেন্দ্রিয় চালনা করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেক বেশী আয়ত্তাধীনে আনার ক্ষমতা অর্জন করেছে এবং সে সম্পর্কে অনেক বেশী নিরপেক্ষ হতে পেরেছে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অধিকতর নিরপেক্ষতা লাভ আর এই অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনার অধিকতর ক্ষমতা অর্জন যদি জীবজগতের উন্নতির মানদণ্ড বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে অভিব্যক্তির গতিপথ লক্ষ্য করে বলতে হবে যে সে পথ অগ্রগতির পথ—উন্নতির পথ। কারণ অভিব্যক্তির ধারায় ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর জীবের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে এও বলতে হবে যে অভিব্যক্তির অগ্রগতির একটা বিশিষ্ট ধরন আছে। নীচু স্তরের সমস্ত জীব অভিব্যক্তির ধারায় উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছায় না। শুধু যে নীচু স্তরের জীব উন্নততর জীবের পাশাপাশি পরমানন্দে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে তাই নয়, কিছু কিছু জীবের আবার অবনতিও ঘটে। নিজেদের কর্মঠ স্বাধীন প্রকৃতি হারিয়ে তারা স্থাণু বা পরজীবী হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অভিব্যক্তিগত অগ্রগতির আসল অর্থ হচ্ছে, জীবনবিকাশের উন্নত স্তরকে আরও উন্নত করা। সাবেক এবং সরল প্রকৃতির জীব আগের মতে বেঁচে থাকবে, আর সেই সঙ্গে দীর্ঘকালের সাধনায় এমন অভিনব জাতিরূপ সৃষ্টি হবে যারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনার আরও খানিকটা বেশী ক্ষমতা রাখে। সুতরাং প্রগতিশীলতা অভিব্যক্তির রীতি হলেও সে প্রগতির অর্থ সকলের প্রগতি নয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে অভিব্যক্তির মধ্যে এই যে প্রবণতা দেখা দেয় তাকে প্রগতি বলা যায় কি না। এই প্রবণতার ফলে দৈহিক নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়—মস্তিষ্ক বৃহত্তর হয়। মানুষের সমাজে এই ধরনের ঘটনা যখন ঘটে তখন তাকে আমরা

প্রগতির লক্ষণ বলে গণ্য করি। পারিপার্শ্বিক অবস্থার মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তিলাভ আর এই অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনার ক্ষমতাকে আমরা মহৎ গুণ বলে মনে করি। এই দুটির বিপরীত অবস্থা থেকে নিশ্চয়ই মহত্তর। জ্ঞান আর দূরদৃষ্টিও আমাদের বিচারে মহত্তর গুণ। কাজেই একথা সঙ্গতভাবে বলা যায় যে একটি প্রাণী আর একটির তুলনায় উন্নত। অভিব্যক্তির যে প্রবণতা জীবজগতের উন্নত শ্রেণীকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাবান আর স্বাধীনতাসম্পন্ন পর্যায়ে উন্নীত করে দেয়, সাধারণভাবে তাকেও প্রগতি আখ্যা দেওয়া যায়। এই বিচারেই মানুষ আজকের যুগের শ্রেষ্ঠ জীব। কেন না অন্যান্য গুণপনার কথা বাদ দিলেও জীবজগতের উপর, সমকালীন সমস্ত প্রাণীর উপর মানুষের প্রাধান্য সাক্ষ্য দিচ্ছে এই শ্রেষ্ঠত্বের।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণ রাখা দরকার। আমাদের বিবেক অনুসারে আজকে আমরা যাকে প্রগতি বলেছি সেই প্রবণতা মানুষ-সৃষ্টির বহু আগে থেকে জীবনের মন্থর স্বতঃচল গতির মধ্যে বিদ্যমান আছে। পৃথিবীর বাইরে থেকে নিরাসক্তভাবে যদি কেউ অভিব্যক্তির গতিপথ বিশ্লেষণ করে তাহলে তাকেও হয়ত এই প্রগতিমুখী প্রবণতার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে।

এইবার তাহলে দেখা যাক যে অভিব্যক্তির প্রগতিশীলতার যে সংজ্ঞা দেওয়া হল সাধারণ জৈবিক মানদণ্ডে তার হিসাবনিকাশ করা যায় কি না। প্রশ্নটি উপেক্ষণীয় নয়; কারণ, বহু তত্ত্ববিদ্যাবিদ্ মনে করেন—না, তা সম্ভব নয়। এখন অবশ্য আর তাঁরা দাবি করেন না যে স্রষ্টার পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে অভিযোজনের মধ্যে। তাঁরা এখন বিশ্বাস করেন যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে প্রাণীদেহে এক একটি বিশেষ গুণ দেখা দিতে পারে। তবে দীর্ঘস্থায়ী বিশেষ গুণের সহজ সরল ক্রমবিকাশসহ বৈজ্ঞানিকেরা যাকে জৈবিক প্রগতি বলেন সেই সাধারণ প্রবণতাও যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল এতটা স্বীকার করতে তারা কুণ্ঠিত। অথচ জৈবিক প্রগতি বলতে আসলে সর্বতোমুখী অভিযোজন, বহুমুখী বিশিষ্টতা অর্জন বোঝায়। আর বেঁচে থাকার সংগ্রামও স্বভাবতঃ প্রগতির পথ করে দেয়। কারণ এই সংগ্রামের ফলেই আপনা থেকে দীর্ঘস্থায়ী বিশিষ্টতা সৃষ্টি হয়।

যেসব গুণকে আমরা প্রগতিশীল বলে গণ্য করে থাকি স্পষ্টতই সেগুলি বেঁচে থাকার সংগ্রামের পক্ষে সহায়ক। ব্যক্তির মঙ্গলের পক্ষে দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা, পদক্ষেপের দৃঢ়তা, চলনের দ্রুততা, সুনিয়ন্ত্রিত রক্তপ্রবাহ, স্মৃতি ও চিন্তাশক্তি আর আবিষ্কারের ক্ষমতা একান্ত কাম্য। এই সব সম্পদ থাকলে প্রজননের

সাফল্যও সুনিশ্চিত হয়। সেই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হয় যে কোন বিশিষ্টতা যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি পেতে এবং প্রতিবেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সাহায্য করে, তাহলে সে জিনিস জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সাহায্য করছে। এই প্রসঙ্গে এও স্মরণ রাখতে হবে যে কোন দুই শ্রেণীর প্রাণী অথবা উদ্ভিদের জীবন যদি পরস্পর নির্ভরশীল হয়, তাহলে একটির অগ্রগতি স্বভাবতই অপরের অগ্রগতির সূচনা করবে। শাকাশী প্রাণীর ছুটে পালাবার গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিকারী মাংসাশীদের গতিবৃদ্ধি স্তন্যপায়ীদের অভিব্যক্তির বৃত্তান্তে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পরিশেষে বলা যায় জৈবিক অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা নেই। মহাজাগতিক অবস্থার পরিবর্তন যদি উন্নততর জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব করে না তোলে, সম্ভাবনাপূর্ণ প্রকারণ সৃষ্টি যদি অব্যাহত থাকে আর জীবনবৃক্ষের যে শাখার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে তার গড়নের মধ্যে যদি এমন কোন মৌলিক ত্রুটি না থাকে যার ফলে তার অগ্রগতি সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য, তাহলে জৈবিক প্রগতির অনিবার্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। মানুষের কথাই ধরা যাক। মানবীর শ্রোণীদেশের পরিসর মানবশিশুর মস্তিষ্কের আকার সীমাবদ্ধ করে দেবার শর্ত হিসাবে কাজ করতে পারে। তাই যদি হয়, তাহলে মানুষের মস্তিষ্কের প্রসার তথা তার মনের বিস্তারও শ্রোণীর পরিসর দ্বারা সীমিত হতে পারে।

সে যাই হোক, জীবনের অতীত বৃত্তান্ত আলোচনা করলে গত পঞ্চাশ কোটি বছরের পর্যাপ্ত নজীর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে মাঝে মাঝে মন্থর কি অনিশ্চিত হলেও জৈবিক প্রগতির ধারা মোটামুটি অব্যাহত আছে। প্রগতির যে সংজ্ঞা মানুষ দিয়ে থাকে সেই সংজ্ঞানুযায়ী প্রগতি জীবনের অভিব্যক্তির ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিরকাল বজায় আছে। কাজেই জীবনের অভিব্যক্তি যতদিন চলবে ততদিন অভিব্যক্তির এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকবে না এমন শঙ্কা প্রকাশ করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

মানুষের অভিব্যক্তি

প্রাণীসর্গের সঙ্গে জ্ঞাতিত্বের লক্ষণ

মানুষের উদ্ভব যে প্রাণীজগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি-কল্পনা অনুযায়ী হয়েছে সকল ধর্মশাস্ত্র উদাত্তকণ্ঠে এই ঘোষণা করেছে। কিন্তু মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে এই শাস্ত্রোক্তি যে অভ্রান্ত নয়, জীবন-বিকাশের ছেদহীন ধারায় মানুষের উদ্ভব যে প্রাণীসর্গ থেকে হয়েছে—সে যে পূর্বগামী এক জীবশাখার রূপান্তরিত বংশধর, মানব-দেহের গঠন-প্রণালী, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-পদ্ধতি এবং মানুষের দৈহিক বিকাশবিধি বিচার-বিশ্লেষণ করলে সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

যারা এই গবেষণায় ব্রতী হয়েছিলেন বহু কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বাধা তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে। বহু লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে পৌরহিত্যশক্তির কাছে। তবু মানুষের দেহতন্ত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-পদ্ধতি এবং তার পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে প্রাণীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়া-পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করে শেষ অবধি জীববিজ্ঞানীরা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন যে প্রাণীসর্গের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান—মানুষও প্রাণীজগতের সৃষ্টি।

মানুষের দৈহিক বিকাশ-রীতির মধ্যেও এই নিকট-আত্মীয়তার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। উভয়ের বিকাশ-রীতির মধ্যেও মোটামুটি মিল আছে। মানুষ আর নিম্ন পর্যায়ের প্রাণী উভয়ের মধ্যে প্রকারণ সৃষ্টির কারণ ও বিধি-নিয়ম সমধর্মী।

মানুষের দেহে এমন বহু অঙ্গ-লক্ষণ আছে যার অস্তিত্ব প্রাণীদেহেও পাওয়া যায়। আবার এমন কতকগুলি দৈহিক বৈশিষ্ট্য মানুষের আছে যা একান্তভাবে তার নিজস্ব। মানুষের জটিলতর মস্তিষ্ক, স্পষ্ট বাক্‌শক্তি, ঋজু চলার ভঙ্গী এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। বুদ্ধিশক্তিতে জীবজগতে সে অনন্যসাধারণ। উন্নততর চিন্তার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। তাছাড়া আরও বহু বিশিষ্ট দেহ-লক্ষণ আছে মানুষের। কিন্তু এই বিশিষ্টতা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে সে বিধাতার এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। দেহের গড়নের দিক থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর সঙ্গে মানুষের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। মানুষ যখন প্রাণীদশা থেকে মুক্ত হয়ে মানবীয় মর্যাদায়

প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তখন তার মধ্যে এই সব আঙ্গিক বিশিষ্টতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

এমন একটি অঙ্গও মানুষের নেই যা প্রাণীর মধ্যে, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস, রক্ত, মস্তিষ্ক, পেশী প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শুধু স্তন্যপায়ী কেন, বুকে-হাঁটা সরীসৃপ—এমন কি মাছের মধ্যেও আছে। অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষের জীবনচক্রও জন্ম, বৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি, বার্ধক্য আর মৃত্যু দিয়ে গড়া। মানুষেরও শ্বাসক্রিয়া আছে অপরাপর প্রাণীর মত। খাদ্য, পানীয় আর বায়ু তারও জীবনধারণের জন্য আবশ্যক। সেও নিজের পুষ্টিসাধন করে অন্যান্য প্রাণীর মত। এই সব সাদৃশ্যগত তথ্যের কথা বিবেচনা করলে স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে দেহের গড়ন আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-পদ্ধতির দিকে থেকে মানুষ প্রাণীরাজ্যেরই অংশ।

॥ দেহতন্ত্রের মিল ॥

কঙ্কালের গঠনের দিক থেকে মানুষ মেরুদণ্ডী প্রাণী। তার মানে পৃথক পৃথক কশেরুকা দিয়ে গড়া মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবান। স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে মানুষের গভীরতম সম্পর্কের কথা এই মেরুদণ্ডী চরিত্র থেকেও প্রকাশ পায়। মানুষও স্তন্যপায়ী। সেও জননীর স্তন্যপান করে নিজের দেহের পরিপোষণ করে।

মানুষের দেহতন্ত্র আর স্তন্যপায়ীর দেহতন্ত্রের গঠনপদ্ধতি সাধারণতঃ এক। মানুষের কঙ্কালে যে কয়খানা অস্থি আছে—বানর, বাদুড় আর সীল মাছের কঙ্কালেও তার অনুরূপ অস্থি দেখা যায়। মাংশপেশী, কলা, রক্তবাহ আর আন্তর যন্ত্র অর্থাৎ দেহকন্দরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। উভয়ের মস্তিষ্কের গঠনপদ্ধতিও এক। মানুষের মস্তিষ্কের প্রতিটি প্রধান ভাগ ও ভাঁজের সঙ্গে ওরাং ওটাং-এর মস্তিষ্কের ভাগ ও ভাঁজের মিল্ আছে।

মানুষের দেহপ্রান্তগুলির গঠনপদ্ধতি থেকেও সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর সঙ্গে তার জ্ঞাতি সম্বন্ধ বোঝা যায়। ঘোড়ার খুর, পাখীর পাখা, সীল মাছের পাখনা আর ছুঁচোর থাবার সঙ্গে মানুষের হাতের মিল নেই। অথচ সকলের এই সব দেহপ্রান্ত অনুরূপ অস্থিসংযোগে গড়া। এই অস্থিগুলি আবার একই ধরনের সন্ধিল।

দেহের গড়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কয়েকটি বিষয় আছে থেকেও এই জ্ঞাতিত্ব অথবা প্রতিবঙ্গের (করেসপনডেনস্) কথা বোঝা যায়।

জলাতঙ্ক, সিফিলিস, কলেরা, হারপিস্ (দাদ প্রভৃতি চর্মরোগ), গ্লানডারস্ (ঘোড়ার এক রকম সংক্রামক ব্যাধি যাতে চোয়াল ফুলে নাসা দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে) প্রভৃতি ব্যাধি যেমন মানুষ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে, তেমনি আবার স্তন্যপায়ী থেকেও মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা আছে। তাতে উভয়ের কলা ও রক্তের রাসায়নিক গঠনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়। মানুষের যে ধরনের অ-সংক্রমক ব্যাধি হয় সেই ধরনের বহু ব্যাধি বানরের মধ্যে দেখা যায়। ঠাণ্ডা লেগে বানরের বুকে সর্দি জমে। তার স্বাভাবিক সমস্ত লক্ষণও প্রকাশ পায়। বারংবার এই ধরনের অসুখ হতে থাকলে পরিণামে ক্ষয়রোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া সন্ন্যাসরোগ, চোখে ছানিপড়া এবং অন্ত্রফোলার দৃষ্টান্তও দেখা গেছে। শৈশবের দাঁত পড়ে গিয়ে নতুন দাঁত ওঠার সময় বানরশিশু অনেক ক্ষেত্রে জ্বর হয়ে মারা যায়। মানুষ ও বানর উভয়ের দেহে ওষুধ সমান ক্রিয়া করে। বহু জাতের বানর চা, কফি কিংবা মদ খেতে ভালবাসে। তামাক টানার সখও বড় কম নেই। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় মদ খাইয়ে বুনো বেবুন ধরা হত। কড়া বীয়ার মদ ভরতি পাত্র রেখে দেওয়া হত। সেই বীয়ার খেয়ে বেবুনেরা যখন মাতাল হত তখন তাদের ধরা হত। এই সব মাতাল বেবুন খাঁচার মধ্যে অদ্ভুত মুখভঙ্গী এবং হাস্যকর আচরণ করেছে। পরদিন সকালে দেখা গেছে, মাথায় হাত দিয়ে গোমরা মুখে চুপ করে বসে আছে। যেন মাথা কত ভারী হয়েছে। এটিলি জাতের একটি আমেরিকান বানরকে একবার ব্রাণ্ডি খাওয়ান হয়েছিল। একবার মদ খেয়ে মাতাল হবার পর আর কোনদিন সেই বানরটি মদ স্পর্শ করতে চায়নি।

এই সব সামান্য ঘটনা থেকে বোঝা যায়, মানুষ আর বানরের রুচি সংক্রান্ত নার্ভের মধ্যে কত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। উভয়ের নার্ভতন্ত্রই বা কত সমভাবে প্রভাবিত হয়।

মানুষের দেহাভ্যন্তরে পরজীবীর আক্রমণে অনেক সময় বিষময় ফল ফলে। মৃত্যুও হতে পারে। তার দেহের উপরিভাগেও পরজীবীর উৎপাতে নানা চর্মরোগ দেখা দেয়। এই ধরনের পরজীবীর আক্রমণ স্তন্যপায়ীর দেহেও হয়। যে সব পরজীবী উভয়ের দেহ আক্রমণ করে তারা সাধারণতঃ এক গণ থেকে উদ্ভূত।

মানুষের জীবনচক্রেও স্তন্যপায়ীর মতো, এমন কি কীট-পতঙ্গের মতো, গর্ভবাস, বয়ঃপ্রাপ্তি আর রোগের নির্দিষ্ট স্থিতিকাল আছে। ক্ষত সারার পদ্ধতি মানুষ ও স্তন্যপায়ী উভয়ের এক। আবার উভয়ের যে কোন অঙ্গ যদি কেটে দেওয়া হয়, বিশেষতঃ ভ্রূণাবস্থায়, তাহলে সেই মুলো অঙ্গ পরে ক্ষেত্রবিশেষে আবার জন্মাতে পারে।

জন্মবিধির গোটা পর্যায়টি মানুষ ও স্তন্যপায়ীর এক। সহবাস থেকে আরম্ভ করে প্রসব ও সন্তানপালন পর্যন্ত কোন পার্থক্য নেই। বানরশিশু ও মানবশিশুর চেহারা আর বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের চেহারার মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই ধরনের পার্থক্য স্তন্যপায়ীর কয়েকটি গণের শাবক ও বয়ঃপ্রাপ্তের মধ্যেও দেখা যায়।

মানুষের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের দেহের গড়নে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য পুরুষের গড়ন, দৈহিক শক্তি, লোমশতা প্রভৃতির মধ্যে সুপ্রকাশ। মানসিক দিক থেকেও পার্থক্য আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। যাই হোক, মানব-মানবীর মধ্যে যে ধরনের পার্থক্য আছে ঠিক সেই ধরনের পার্থক্য বহু জাতের স্তন্যপায়ীর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে দেখা যায়।

।। ব্যাহত রূপের অঙ্গ-লক্ষণ ।।

মানুষের সঙ্গে প্রাণীজগতের আঙ্গিক সাদৃশ্যের যে সব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল, ব্যাহত রূপের লক্ষণবিশিষ্ট অঙ্গের প্রশ্নটি সাদৃশ্যের দিক থেকে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের এমন একটি প্রাণী নেই যার মধ্যে ব্যাহত রূপের লক্ষণবিশিষ্ট অঙ্গ (রুডিমেণ্টারি ফরম) দেখা যায় না। মানুষের বেলাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ব্যাহত রূপের লক্ষণবিশিষ্ট অঙ্গের সঙ্গে বর্ধমান (ন্যাসেণ্ট) অঙ্গের পার্থক্য আছে। যদিও এই পার্থক্য সব ক্ষেত্রে বোঝা দুষ্কর। ব্যাহত রূপের লক্ষণবিশিষ্ট অঙ্গ হয় সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন অথবা দেহীর পক্ষে অকিঞ্চিৎকর কার্যসাধক। পুরুষ স্তন্যপায়ীর দেহে স্তনের লক্ষণ আর রোমন্থকদের কৃন্তক দাঁত এই জাতের অঙ্গ। বর্তমান অবস্থায় এই ধরনের অঙ্গের উদ্ভব হয়েছে একথা মনে করা যায় না। বর্ধমান অঙ্গ ঠিক ব্যাহত রূপের অঙ্গ নয়। তবে তার পরিণতি সেই দিকে চলেছে। বর্ধমান অঙ্গ পুরোপুরি বিকাশলাভ না করে থাকলেও দেহীর কাছে তার উপযোগিতা আছে। এই অঙ্গ আরও বিকাশলাভ করতে পারে। ব্যাহত রূপের অঙ্গগুলির প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। তার কারণও সুস্পষ্ট। এগুলি ফালতু অথবা প্রায়-নিষ্প্রয়োজন বলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের আওতায় পড়ে না। এই জাতের অঙ্গ-লক্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোপ পেয়ে যায়। আবার পূর্বানুবৃত্তির মাধ্যমে তার পুনরাবির্ভাবও ঘটতে পারে।

ব্যাহত রূপের অঙ্গসৃষ্টি হবার প্রধান কারণ অব্যবহার। জীবনের যে অবস্থায় অঙ্গটির বিশেষ ব্যবহার হবার কথা তখন যদি ব্যবহার করা না হয় তাহলে এই দশা হয়। উত্তরলিক্ষির সূত্রেও ব্যাহত রূপের লক্ষণবিশিষ্ট অঙ্গ সঞ্চারিত হয়।

অব্যবহার বলতে শুধু কম ব্যবহার বোঝায় না। কম রক্ত সংবহনও অব্যবহারের অন্তর্গত বলে ধরে নিতে হবে।

মানুষের দেহে এমন বহু মাংশপেশী আছে যাদের ব্যাহত রূপের অঙ্গ বলা যেতে পারে। নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর দেহের মধ্যে সক্রিয় বহু পেশী সঙ্কুচিত অথবা অকর্মক অবস্থায় মানুষের দেহে বিদ্যমান। বহু প্রাণী ইচ্ছামত গায়ের চামড়া সঙ্কুচিত করতে পারে। যে পেশীর জন্য এই সঙ্কোচন সম্ভব মানুষের দেহেও সক্রিয় এবং সক্ষম অবস্থায় তার চিহ্ন আছে। সেই জন্যই মানুষের পক্ষে কপালের চামড়া সঙ্কুচিত করে ভুরু কোঁচকান সম্ভব।

কোন কোন লোক মাথার খুলির উপরকার পেশী সঙ্কুচিত করতে পারে। এই পেশীকে আংশিকভাবে ব্যাহত রূপের লক্ষণবিশিষ্ট অঙ্গ বলা যায়। মানুষ হয়ত বহুদূরের এক পূর্বপুরুষ থেকে এই বিশিষ্টতা উত্তরলব্ধি সূত্রে পেয়েছে কারণ বহু জাতের বানর মাথার খুলির চামড়ায় ঢেউ খেলাতে পারে।

যে পেশীর জন্য কানের ভেতর ও বাইরের অংশ নাচান যায় মানুষের মধ্যে সেই পেশী কাহিল অবস্থায় আছে। কান খাড়া করে বিভিন্ন দিকে সঞ্চালন করার ক্ষমতা কোন কোন প্রাণীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই ভাবে তারা আঁচ করে নেয় যে কোন দিক থেকে বিপদ আসছে। এমন লোকও আছে যে কান উপরে তুলতে, সামনের দিকে এগিয়ে আনতে কিংবা পেছনে পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কান নাড়িয়ে বিপদের আঁচ করতে পারে এমন মানুষের কথা শোনা যায়নি।

মানুষের কানের বাইরের দিকের 'শেল'টিকেও ব্যাহত রূপে লক্ষণবিশিষ্ট অঙ্গ বলা যেতে পারে। নিম্ন পর্যায়ের প্রাণী এই 'শেলে'র সাহায্যে কান খাড়া করে। কিন্তু মানুষের কোন প্রয়োজনসিদ্ধি এই 'শেল' দিয়ে হয় না। শিম্পাঞ্জি আর ওরাং ওটাং-এর কানের অবস্থাও মানুষের মত। এই সব প্রাণী কখনও কান নাড়ে না অথবা খাড়া করে না। সেই কারণে তাদের কান ব্যবহারের দিক থেকে মানুষের কানের মত কাহিল অবস্থায় আছে। কেন এই সব জন্তু এবং মানুষের পূর্বপুরুষেরা এই ক্ষমতা হারাল তার কারণ জানা যায়নি। তবে খাড়া ভাবে মাথা ঘোরাবার ক্ষমতা অর্জন করে কান নাড়াতে না-পারার অসুবিধা মানুষ এবং বনমানুষেরা খানিকটা দূর করেছে। মাথা নেড়ে প্রায় সব দিকের শব্দই তো আঁচ করা যায়।

মানুষের চোখের মধ্যে একটি সাদা পর্দা আছে যাকে তৃতীয় অক্ষিপল্লব (নিক্‌টিটেটিং মেমব্রেন) বলে। এই অক্ষিপল্লব সংশ্লিষ্ট পেশীও মানুষের আছে। তৃতীয় অক্ষিপল্লবটি পাখীর মধ্যে খুব উন্নত অবস্থায় থাকে। পল্লবটি তাদের

খুব কার্যসাধকও বটে। এই অক্ষিপল্লব প্রসারিত করে অনায়াসে তারা অক্ষিগোলক ঢেকে রাখতে পারে। ওয়ালরাসের মত উচ্চশ্রেণীর স্তন্যপায়ীর মধ্যেও এই অঙ্গটি বেশ উন্নত অবস্থায় দেখা যায়। কিন্তু মানুষসহ অপরাপর স্তন্যপায়ীর মধ্যে এই তৃতীয় অক্ষিপল্লবটি বড় কাহিল অবস্থায় রয়ে গেছে।

ঘ্রাণশক্তি অধিকাংশ স্তন্যপায়ীর পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রোমন্থকেরা গন্ধ শুঁকে বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার হয়। মাংসাশীরাও গন্ধের সাহায্যে শিকারের খোঁজ বার করে। বুনো শুয়োর এই দুই উদ্দেশ্যেই তার ঘ্রাণশক্তি ব্যবহার করে। কিন্তু ঘ্রাণশক্তিটি মানুষের খুব কাজে লাগে না। ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে মানুষ বিপদ সম্পর্কেও হুঁশিয়ার হয় না, আবার তার সাহায্যে খাদ্যও চিনে নেয় না। ঘ্রাণশক্তি থাকা সত্বেও মানুষ পুতিগন্ধময় আবহাওয়ায় ঘুমোয়—অসভ্যেরা আধ-পচা মাংস খায়। ক্রমবিকাশের নীতিতে যাঁরা বিশ্বাসী তারা স্বীকার করবেন যে মানুষ খুব দুর্বল অবস্থায় এই শক্তির উত্তরলব্ধি পেয়েছে। কিন্তু তার কুলপতিদের কাছে এই শক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হামেশা এই শক্তি তারা ব্যবহার করেছে। কুকুর ও ঘোড়া এই শক্তির বলে মানুষ ও স্থান চিনে নেয়। মানুষও গন্ধ থেকে ভুলে-যাওয়া দৃশ্য অথবা স্থানের স্মৃতি মনে করতে পারে।

প্রাইমেটস্ পর্যায়ের অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের দেহ প্রায় উলঙ্গ। তবু মানুষের মূল দেহকাণ্ডের সন্ধিতে এবং মাথায় কিছু লোমের চিহ্ন দেখা যায়। বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে আবার লোমশতার তারতম্য আছে। শুধু বিভিন্ন জাতির মধ্যে কেন, একজাতের বিভিন্ন মানুষের মধ্যেও এই পার্থক্য থাকে। ইউরোপের এক শ্রেণীর মানুষের কাঁধে লোম দেখা যায়, আবার এক শ্রেণীর লোকের কাঁধ লোমহীন। এ বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে না যে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লোম নিম্ন পর্যায়ের এক পূর্বপুরুষের আপাদমস্তক লোমাবৃত অঙ্গ-লক্ষণের ব্যাহত রূপের স্মারক। এই অনুমান খুব সম্ভাব্য। কারণ দেহের বিভিন্ন অংশে জাত এই মিহি খাটো ফিকে রঙের লোম মাঝে মাঝে ঘন লম্বা কর্কশ লোমে পরিণত হয়।

এমন মানুষও দেখা গেছে লোমের প্রাচুর্যের জন্য যাকে বন্য জন্তুর মত দেখাত। রুশ দেশে কামস্ত্রোবাসী আদ্রিয়ান এবতিখিয়েভ আর তার ছেলে ফিওদরের সর্বাঙ্গে, কানে ও মুখের উপর পশুলোমের মত নরম লম্বা লোম ছিল। মেক্সিকোতে জুলিয়া পাবস্ত্রানা নামে এক মহিলা নৃত্যশিল্পী ছিলেন যাঁর সর্বাঙ্গে লোমবাহুল্য ছিল। শোল উপজাতীয় মানুষের দেহ অপর্যাপ্ত লোমাবৃত।

জাপানের 'কুরিল' উপজাতীয়দের দেহে লোমের প্রাচুর্য এত বেশী যে লোকে তাদের ভল্লুকের বংশধর বলে মনে করত।

একটি পরিবারের ভুরুর লোমের কয়েকগাছা অন্যান্য লোমের চেয়ে বড় ছিল। এই নগণ্য বৈশিষ্ট্যটুকুও বংশগত উত্তরলব্ধিসূত্রে সঞ্চারিত হতে দেখা গেছে। ভুরুর উপর এই ধরনের লোম প্রাণীরাজ্যেও দেখা যায়। শিম্পাঞ্জির চোখের উপরে আমাদের ভুরুর জায়গায় লম্বা লম্বা কয়েকগাছি লোম আছে। বেবুনের চোখের উপরেও এই ধরনের লোম দেখা যায়।

তাছাড়া মানবভ্রূণের উপর ষষ্ঠ মাসে যে মিহি লোমাবরণ দেখা যায় তার কথাই ধরা যাক। পঞ্চম মাসে এই লোম মুখমণ্ডল, ভুরু এবং মুখগহ্বরের চার পাশে দেখা দেয়। মাথার চুলের চেয়ে এখানকার লোম তখন লম্বা থাকে। এক মানবীর ভ্রূণে এই লোম দিয়ে গড়া একটি গোঁফের রেখা দেখা গিয়েছিল। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। বাড়তির প্রথম দিকে নরনারীর ভ্রূণের বাইরের আঙ্গিক লক্ষণে সাধারণতঃ সাদৃশ্য থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহগাত্রে যে ধরনের লোম থাকে, ভ্রূণের লোম সেই ধরনের। কপাল ও কানসহ সর্বাঙ্গ লোমাবৃত হয়। তবে করতল আর পদতলে কোন লোম থাকে না যেমন লোম থাকে না নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর চারটি দেহপ্রান্তে। এই সাদৃশ্য আকস্মিক মিল নয়। যে সব স্তন্যপায়ী লোমাবরণসহ ভূমিষ্ঠ হয়, ভ্রূণের গায়ের লোমাবরণ সেই স্থায়ী অঙ্গ-লক্ষণের সূচনা করে।

আক্কেল দাঁতও সুসভ্য মানুষের পক্ষে ফালতু অঙ্গ-লক্ষণ হয়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। মাড়ীর অন্যান্য পেষক দাঁতের চেয়ে এই দাঁতটি ছোট। শিম্পাঞ্জি আর ওরাং ওটাং-এর আক্কেল দাঁতটিও মাড়ীর অপরাপর দাঁতের চাইতে ছোট। সতের বছরের আগে এই দাঁত মাড়ী ফুঁড়ে বেরোয় না। ক্ষয়ও হয় তাড়াতাড়ি। অন্যান্য দাঁতের তুলনায় এই দাঁতটি বিকশিত হবার সময়ের তারতম্য আছে। সুসভ্য মানুষ রান্নাকরা নরম খাদ্য খায়। তাই খাবার জন্য চোয়াল তাদের অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহার করতে হচ্ছে। এই কারণে দাঁতটি ছোট হয়ে এসেছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। বত্রিশটি দাঁত স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাবার মত বড় মাড়ী সব ক্ষেত্রে হয় না বলে যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সময় কয়েকটি পেষক দাঁত শৈশবেই অস্ত্রোপাচার করে তুলে ফেলা হয়।

মানুষের পৌষ্টিক নালীর (এলিমেণ্টারি ক্যানেল) মধ্যেও একটি ব্যাহত রূপের লক্ষণবিশিষ্ট অঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্ত্রের মধ্যে থলির মত একটি অংশ আছে যাকে অন্ত্র-সিকম (কাকুম) অথবা বদ্ধনালী বলা হয়। এই অংশ থেকে

উদ্গত অংশটির নাম উদর-অপাঙ্গ (এপেনডিকস্)। তীক্ষ্ণদন্তী আর তৃণাশী জন্তু উদ্ভিজ্জ খাদ্য খায় বলে অন্ত্র-সিকম তাদের পাচন-ক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। তাদের দেহে এই অঙ্গটি বেশ বড়। কোয়ালী নামে অঙ্কগর্ভ প্রাণীর এই অঙ্গটির দৈর্ঘ্য দেহের দৈর্ঘ্যের তিন গুণ। মনে হয়, খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্তন হওয়ার ফলে অন্ত্র-সিকমটি বিভিন্ন প্রাণীর দেহে ছোট হয়ে গেছে। এটির অবস্থা এখন ব্যাহত রূপের লক্ষণবিশিষ্ট অঙ্গের মত। কোন কোন দেহে এই অঙ্গ-লক্ষণটি থাকে না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অঙ্গটি বেশ উন্নত। রন্ধ্রপথটির অর্ধেক কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। শেষ প্রান্তটি চ্যাপটা ও ছিদ্রহীন। ওরাং ওটাং-এর এই অঙ্গটি বেশ লম্বা এবং প্যাচান। মানুষের দেহে এটির দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি। প্রস্থে এক ইঞ্চির তিন-ভাগের ভাগ। অঙ্গটি মানুষের পক্ষে শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়—প্রাণহানিকরও বটে। এপেনডিসাইটিস্ রোগে এই উদর অপাঙ্গটি যথা সময়ে অস্ত্রোপচার করে অপসারণ করতে না পারলে রোগীর প্রাণ বাঁচান কষ্টকর।

লেমুর, মাংসাশী চতুর্ভুজ আর অঙ্কগর্ভ প্রাণীর প্রগণ্ডাস্থির নিম্ন প্রান্তে সুপ্রা কনডাইলয়েড্ ফোরামেন নামে একটি ছিদ্রপথ আছে। হাতের নার্ভ আর প্রধান শিরা এই ছিদ্রপথ ধরে গেছে। মানুষের প্রগণ্ডাস্থিতেও এই ছিদ্রপথের চিহ্ন আছে। ক্ষেত্র বিশেষে এই ছিদ্রপথটি বেশ উন্নত হয়। দেখা গেছে, এই সব বৈশিষ্ট্য উত্তরলব্ধির সূত্রে সঞ্চারিত হয়। যদি মানুষের দেহে এই ছিদ্রপথটি উন্নত অবস্থায় থাকে তাহলে হাতের মুখ্য নার্ভটিও তার মধ্য দিয়ে যায়। তাতে বোঝা যায় যে মানুষের দেহের এই ছিদ্রপথটি নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর সুপ্রা কনডাইলয়েড্ ফোরামেনের ব্যাহত রূপ।

আরও একটি ছিদ্রপথ মানুষের প্রগণ্ডাস্থিতে মাঝে মাঝে দেখা যায়। তার নাম দেওয়া হয়েছে ইণ্টার-কনডাইলয়েড্। বহু জাতের বনমানুষ আর নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর দেহে এই ছিদ্রপথটি আছে। তবে সব ক্ষেত্রে নয়। আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা গেছে। আধুনিক কালের মানুষের চাইতে আগের কালের মানুষের দেহে এই ছিদ্র অনেক বেশী দেখা যেত। তার কারণ হয়ত এই যে প্রাচীন কালের মানুষের গড়নে নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীদেহের সঙ্গে সাদৃশ্য আধুনিক মানুষের চাইতে বেশী ছিল। উদ্ভবের দিক থেকে পুরাকালের মানুষ সম্ভবতঃ পশুবৎ জন্মদাতার খানিকটা কাছাকাছি ছিল।

মানুষের মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তস্থিত অনুত্রিকাস্থি (ককিক্স্) আর খানকয়েক কশেরুকার কোন দৈহিক ক্রিয়া না থাকলেও এগুলি যে অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর

লেজের চিহ্ন একথা অনস্বীকার্য। ভ্রূণাবস্থায় এই লেজের লক্ষণ আরও সুস্পষ্ট, আরও লম্বা থাকে। জন্মের পরও দুই একটি ক্ষেত্রে এই লক্ষণ স্পষ্টতর থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্মানীতে একটি মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল যার লেজ প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা ছিল। কাঁদার সময় কিংবা রাগ হলে শিশুটির লেজ অনিচ্ছুকভাবে নড়ে উঠত। পরে এই লেজটি অস্ত্রোপচার করে দেহচ্যুত করা হয়েছিল।

এটি অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থা নয়। অনুত্রিকাস্থি আকারে ছোট। মাত্র চারখানি কশেরুকা নিয়ে গঠিত। সব কয়খানি কশেরুকা একত্র হয়ে শক্ত হয়ে গেছে। এগুলি ব্যাহত রূপের লক্ষণবিশিষ্ট কশেরুকা। তার সঙ্গে গুটিকয়েক ছোট ছোট পেশীও আছে। তার একটি পেশী সুনিশ্চিতভাবে অন্যান্য স্তন্যপায়ীর লেজের গোড়ার খুব উন্নত একটি পেশীর ব্যাহত রূপ।

জনন-বিধির মধ্যেও বিবিধ ব্যাহত রূপের লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু এই লক্ষণের সঙ্গে আগে যে সব দেহ-লক্ষণের কথা বলা হয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। এখানে এমন অঙ্গ-লক্ষণের দেখা পাওয়া যায় না যা বেশ সক্ষম অবস্থায় সেই প্রজাতির মধ্যে নেই। তা আছে, কিন্তু পার্থক্য দেখা দিচ্ছে লিঙ্গগত ভাবে। তার মানে, অঙ্গ-লক্ষণটি হয়ত খুব সক্ষম অবস্থায় স্ত্রী-দেহে আছে কিন্তু পুরুষের দেহে সেই অঙ্গ-লক্ষণটি ব্যাহত রূপে বিদ্যমান। তার উল্টোটাও হতে পারে। যাই হোক, বিভিন্ন প্রজাতি আলাদা ভাবে সৃষ্টি হয়েছে এই যুক্তি যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এই পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সব অঙ্গ-লক্ষণের অস্তিত্ব সাধারণতঃ উত্তরলব্ধির উপর নির্ভর করে। তার মানে, স্ত্রী-পুরুষের যে কেউ অঙ্গ-লক্ষণটি অর্জন করেছে, তারপর সেটি আংশিক ভাবে অপর লিঙ্গের মধ্যে বাহিত করেছে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

মানুষসহ সমস্ত পুরুষজাতের স্তন্যপায়ীর মধ্যে স্তনের লক্ষণ থাকে। ব্যাহত রূপেই আছে অঙ্গ-লক্ষণটি। ক্ষেত্রবিশেষে এই ব্যাহত রূপের অঙ্গ বৃদ্ধি পেয়ে দুগ্ধদান করেছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের এই অঙ্গ-লক্ষণটি যে মূলত এক জিনিস তার প্রমাণও পাওয়া যায় যখন দেখি যে হামরোগে উভয়ের স্তনচিহ্ন মাঝে মাঝে বিস্ফারিত হয়। তাছাড়া পুরুষ শ্রেণীর বহু স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে ভেসিকুলা প্রোস্টাটিকা নামে একটি অঙ্গ-লক্ষণ দেখা যায়। একথা সর্বজন-স্বীকৃত যে পুরুষের এই অঙ্গ-লক্ষণটি স্ত্রী-দেহের জরায়ুর (সংযোজক নালীসহ) সমসংস্থ অঙ্গ।

।। ভ্রূণের সাদৃশ্য ।।

স্ত্রী-পুরুষের যৌন-ক্রিয়ার ফলে যৌন কোষের মিলনে সাধারণতঃ জীবের জন্ম হয়। স্ত্রী জননকোষকে ডিম্বাণু আর পুং জননকোষকে শুক্রাণু বলা হয়। শুক্রাণু যখন ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে নিউক্লিয়সের সঙ্গে মিলিত হয়, ডিম্বকোষটি তখন নিষিক্ত হয়। এই নিষিক্ত ডিম্বকোষের বারংবার বিভাজনের ফলে নতুন জীবের উৎপত্তি হয়।

এক ইঞ্চির প্রায় সওয়া-শ'-ভাগের ভাগ একটি ডিম্বক থেকে মানুষের জন্ম হয়। মাতৃজঠরের ভিতরে জরায়ুর প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ ঝিল্লী দ্বারা আবৃত ক্ষুদ্র একটি ভঙ্গুর পিণ্ড আকারে ভ্রূণটি দেখা যায়। তারপর জননীর দেহরসে পুষ্টিলাভ করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ভাবী জাতকের সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন কোন লক্ষণ তখন ভ্রূণের মধ্যে প্রকাশ পায় না। মানুষের ভ্রূণ আর অন্যান্য প্রাণীর ভ্রূণ প্রাথমিক অবস্থায় পরস্পর সদৃশ থাকে। কিছুদিন পরে দেহপ্রান্তগুলি যখন প্রকাশ পায় গিরিগিটি আর স্তন্যপায়ীর পা ও পাখা আর মানুষের হাত-পা তখন একই মূল-কাণ্ডের প্রান্ত থেকে উদ্‌গত হয়। ভ্রূণের পরিণত অবস্থায় তার মধ্যে মানুষ ও বনমানুষের পার্থক্যসূচক আঙ্গিক লক্ষণ প্রকাশ পায়—যেমন প্রকাশ পায় বনমানুষ আর কুকুরের পার্থক্যসূচক লক্ষণ। মন্তব্যটি বিস্ময়কর মনে হলেও পরীক্ষিত সত্য।

শুধু তাই নয়। মানব-ভ্রূণের বাড়তির বিভিন্ন পর্যায়ে তার মধ্যে নিম্ন পর্যায়ের জীবের কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। হৃদপিণ্ডটি প্রাথমিক অবস্থায় স্পন্দনশীল কোষের মত দেখায়। মেরুদণ্ডের প্রান্তীয় অনুত্রিকাস্থিগুলি দেখায় 'সাচ্চা লেজের মত'। পরের দিকেও বহু বিস্ময়কর সাদৃশ্য থাকে মানুষ আর নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর ভ্রূণের মধ্যে। সপ্তম মাসের শেষে মানব-ভ্রূণের মস্তিষ্কের অবস্থা পরিণত বয়সের বেবুনের মত থাকে। পায়ের বুড়ো আঙুলটি খুব সম্ভবতঃ মানুষের দেহলক্ষণের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু ইঞ্চিখানেক লম্বা একটি ভ্রূণে এই বুড়ো আঙুলটি অন্যান্য আঙুলের চেয়ে খাটো ছিল। পরে যদিও এটি অন্যান্য আঙুলের সমান্তরাল হয়ে গেছে, তখন কিন্তু এ অবস্থায় ছিল না। পায়ের এক প্রান্তে বাঁকান অবস্থায় লাগান ছিল। তার মানে চতুর্ভুজ প্রাণীর বুড়ো আঙুলের স্থায়ী অবস্থার রূপ পেয়েছিল। এই সব তথ্য থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে মানুষের উদ্ভবের পদ্ধতি আর তার বিকাশের প্রাথমিক স্তরটি অবিকল তার ঠিক আগেকার পর্যায়ের জীবের মত। জীববিজ্ঞানী হাকস্‌লির ভাষায়, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে

পারে না যে মানুষের সঙ্গে বনমানুষের আত্মীয়তা বনমানুষের সঙ্গে কুকুরের আত্মীয়তার চেয়ে অনেক ঘনিষ্ঠ।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে মানব-ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধির মধ্যে প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশের সমগ্র ধারাটির পুনারাবৃত্তি হয়। পরীক্ষালব্ধ যে সব তথ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা হয় তার খানিকটা আভাস দিচ্ছি।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এককোষী জীব থেকে মানব-ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। নিষিক্ত ডিম্বকোষের প্রাথমিক পরিবর্তনগুলি মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে এক ধরনের। জননীর দেহরসে পুষ্ট হয়ে ডিম্ব-কোষটি বাড়ে। প্রথমে দুই কোষ, পরে চার, আট, ষোল ইত্যাদি কোষে বিভক্ত হয়ে থাকে। এইভাবে এককোষী ডিম্বকোষ বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয় এবং এই বহুকোষী ডিম্বকোষে বিভিন্ন অঙ্গ-লক্ষণ দেখা দেয়। মস্তিষ্ক-হাত-পা সুচিহ্নিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সব অঙ্গ তখন নবজাতকের অঙ্গের মত থাকে না। চোখ, কান আর দেহপ্রান্তের আঙুল ক্রমান্বয় প্রকাশ পেতে থাকে।

ভ্রূণাবস্থায় এমন সব অঙ্গের লক্ষণ দেখা যায় যা পরিণত মানব-দেহে থাকে না। কথাটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মত। ক্রমবৃদ্ধির তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে ভ্রূণটি যেন মাছের মত দেখায়। ভ্রূণের হাত-পা মাছের পাখনার মত থাকে। গ্রীবার পাশে মাছের ফুলকার মত একসারি শিরালা দেখা যায়। লেজও থাকে একটি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সপ্তাহে সেটি লম্বা হয়ে আরও স্পষ্ট হয়। লেজে তখন গুটিদশেক কশেরুকা থাকে। পরে প্রান্ত ভাগের খানকয়েক কশেরুকা বিচ্ছিন্ন হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। লেজটিও ছোট হয়। লেজের কশেরুকা তারপর একত্রে বৃদ্ধি পেয়ে অনুত্রিকাস্থিতে পরিণত হয়।

মানব-ভ্রূণের হৃদপিণ্ডের বাড়তিও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। মানুষের হৃদযন্ত্রে চারটি প্রকোষ্ঠ। দুটি অলিন্দ আর দুটি নিলয়। প্রথম অবস্থায় এই হৃদপিণ্ড মাছের হৃদপিণ্ডের মত দুটি প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ একটি অলিন্দ আর একটি নিলয় নিয়ে গঠিত হয়। তারপর এই হৃদযন্ত্র উভয়চর প্রাণীর হৃদপিণ্ডের আকার ধারণ করে। এই সময় এটি তিনটি প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ একটি নিলয় আর দুটি অলিন্দে বিভক্ত থাকে। তারপর দেখা দেয় সরীসৃপের হৃদপিণ্ডের অবস্থা। মানুষের হৃদযন্ত্রে চারটি প্রকোষ্ঠ থাকলেও ডান-বাঁয়ের ভাগ দুটি বিচ্ছিন্ন নয়। দুই অংশের মধ্যে একটি রন্ধ্রপথ থাকে। রন্ধ্রটি বৃদ্ধি পেলে হৃদযন্ত্রটি মানব-হৃদযন্ত্রের বিশিষ্টতামণ্ডিত হয়।

পঞ্চম মাসে মানব-ভ্রূণকে মানুষ বলে চেনা যায়। কিন্তু হাত বা পায়ের তলা ছাড়া তার সর্বাঙ্গে তখন বর্ণহীন সূক্ষ্ম এক রকম কোমল লোমাবরণ থাকে।

কপালে, গণ্ডদেশে, এমন কি নাকের উপরেও লোম গজায়। এই লোমবিন্যাসের ধরন মানবাকার বানরের গায়ের লোমের ন্যায়। শিম্পাঞ্জির সঙ্গে পুরোপুরি মেলে। এই পর্যায়ে মানব-ভ্রূণটি উচ্চ পর্যায়ের বানরের মত থাকে। ভূমিষ্ঠ হবার কিছু আগে এই লোমাবরণ খসে যায়।

ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধির এই প্রকৃতি জানা থাকলে লেজওয়ালা কিংবা লোমাবৃত মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হতে দেখলে অবাক হবার কারণ ঘটে না। বুঝতে হবে, মানব-ভ্রূণ কোন দোষদুষ্ট ছিল বলে নবজাতকের দেহে এই লক্ষণ স্থায়ী হয়েছে।

মানব-ভ্রূণের এই সব পশুসুলভ দেহ-লক্ষণ থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে মানবজাতির উদ্ভবের মূল প্রাণীরাজ্যে নিহিত, তাই এই সাদৃশ্য প্রকাশ পায়। মানব-ভ্রূণের ফুলকার মত শিরালা দ্যোতনা করে যে মানুষের পূর্বপুরুষের মধ্যে এমন এক জলচর জীব ছিল যে ফুলকার সাহায্যে শ্বাস নিত। লেজের চিহ্ন আর রোমাবরণ লেজওয়ালা রোমাবৃত কুলপতির দ্যোতক। মানব-বিকাশের পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতির সাধারণ রূপটি যেন মানব-ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধির মধ্যে ধরা পড়ে। কেঁচো, মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, সরীসৃপ, শুয়োর, কুকুর, বানর আর মানুষের পরিণত ভ্রূণের মধ্যে কত না পার্থক্য! এর কোনটি অমেরুদণ্ডী আবার কোনটি উচ্চ কি নিম্ন পর্যায়ের মেরুদণ্ডী। কিন্তু ক্রমবৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায় এদের ভ্রূণের সৌসাদৃশ্য এত বেশী যে তার পার্থক্য বোঝা কঠিন। বৃদ্ধির শেষের দিকে আকারগত বৈশিষ্ট্য ও গড়নের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। উচ্চতর পর্যায়ের ভ্রূণ ক্রমান্বয় জটিলতর পথে এমন এক একটি স্তরে পৌঁছায় যখন তাকে নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর ভ্রূণের মত দেখায়। মানুষের ভ্রূণ এক সময় কেঁচোর মত, এক সময় মাছের মত, তার পর ব্যাঙাচি, তারও পরে স্তন্যপায়ীর মত দেখায়। অন্যান্য প্রাণীর চাইতে বনমানুষের ভ্রূণের সঙ্গে মানুষের ভ্রূণের সাদৃশ্য দীর্ঘস্থায়ী।

এই ক্রম-পরিণতি থেকে মনে করা হয় যে সকল প্রাণীই ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধির সময় নিজ নিজ প্রজাতির ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলি সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করে নেয়। কাজেই ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধি প্রমাণ করে যে নিম্ন পর্যায়ের প্রাণী থেকে উচ্চতর পর্যায়ের প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

যে সব প্রাণীর মধ্যে আকৃতিগত বিস্ময়কর পার্থক্য আছে তাদের ভ্রূণের মধ্যে অভিন্ন কুলপতির দেহ-লক্ষণ অবিকৃত অবস্থায় অথবা সামান্য সংশোধিত আকারে দেখা দেয়। কিন্তু তাদের বিকাশ হয় নিজ নিজ স্বতন্ত্র আকারে। এই পরিণতির কারণ প্রকারণসৃষ্টির বিধিনিয়ম অনুসারে বোঝা যায়। এই বিধিনিয়ম ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধির শেষের দিকে প্রভাব বিস্তার করে সদৃশ ভ্রূণের মধ্যে আকারগত বিশিষ্ট

গুণ সৃষ্টি করে। সেই গুণ আবার বংশগতিরূপে সঞ্চারিত হয়। মানুষ, কুকুর, সীলমাছ, বাদুড় প্রভৃতি প্রাণীর ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থার বিস্ময়কর সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য এই যুক্তি ছাড়া অপর কোন যুক্তি দেখান হয় না। ব্যাহত রূপের লক্ষণবিশিষ্ট অঙ্গের রহস্য তখনই বোঝা যাবে যখন ধরে নেওয়া হবে যে পূর্বগামী এক কুলপতির দেহতন্ত্রে এই সব অঙ্গ-লক্ষণ বেশ সক্ষম ও সক্রিয় অবস্থায় ছিল, কিন্তু অভ্যাস পরিবর্তনের ফলে হয় নিছক অব্যবহার অথবা প্রাকৃতিক নির্বাচনের জন্য অঙ্গটি বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হয়ে ফালতু অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

॥ বিকাশ-বিধির সমধর্মিতা ॥

ভ্রূণ-বিকাশের রীতি ছাড়া মানুষ ও প্রাণীসর্গের বিকাশ-বিধির মধ্যে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য আছে যা উভয়ের জ্ঞাতিত্বের সাক্ষী দেয়।

পরিবর্তনশীলতা জৈবশক্তির বিকাশে স্বতঃসিদ্ধির মত। পরিবর্তনশীলতা যদি না থাকত, জৈবশক্তি যদি নতুন গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে না পারত তাহলে এক প্রজাতির জীব থেকে ভিন্ন প্রজাতির বিকাশ কিছুতেই সম্ভব হত না। এই পরিবর্তনশীলতার জন্য প্রজাতিতে প্রজাতিতে আকৃতিগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়, আবার একই প্রজাতির মধ্যে প্রকার-ভেদ ঘটে। প্রতিটি জীবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব দৈহিক গড়ন আছে। কোন দুটি জীব অবিকল এক নয়। একই পরিবারের সন্তান-সন্ততি, এমন কি যমজের মধ্যেও পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য থাকে। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তনশীল বলে জীবজগতে এত প্রকারণ-বৈচিত্র্য।

জীব-বিকাশের পথে প্রকারণ-সৃষ্টি হওয়া যেমন একটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম তেমনি এই বৈশিষ্ট্যের উত্তরলব্ধির আবার ক্রমবিকাশের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। জীবদেহের বহু বৈশিষ্ট্য বংশগতিরূপে উত্তরপুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যে কোন প্রজাতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন সেই প্রজাতির সকলের মধ্যেই বিকশিত হয়, তেমনি জনক-জননীর অঙ্গ-লক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্যেরও সন্তানের মধ্যে পুনরাবর্তন ঘটে। কার্যসাধক বৈশিষ্ট্যও সাধারণতঃ বংশগতির ধারায় সঞ্চারিত হয়ে থাকে। আবার যে কোন অঙ্গের বেশী ব্যবহার কিংবা অব্যবহার জনিত ফলাফলও প্রাণীসর্গে বংশগতির রূপ পায়, তার ফলে বংশগতি ও পরিবর্তনশীলতা মিলিতভাবে যে কোন প্রজাতি গঠনে এক অতি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে।

জীব-বিকাশের এই সাধারণ বিধি প্রাণীরাজ্য ও মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। প্রাণীসর্গে প্রকারণ-সৃষ্টির পেছনে কতকগুলি সাধারণ কারণ আছে। সেই প্রকারণের নিয়ামক কতকগুলি সাধারণ বিধিবিধানও লক্ষ্য পড়ে। জীব-বিজ্ঞানীরা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে মানুষের মধ্যে স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা দেখা দেবার কারণ আর প্রাণীসর্গে বিশিষ্ট গুণ-বিকাশের সাধারণ কারণ মোটামুটি সমধর্মী। প্রকারণের নিয়ামক সাধারণ বিধি-নিয়মের মধ্যেও উভয়ক্ষেত্রে সমধর্মিতা আছে। শুধু তাই নয়, মানুষের বিশিষ্টতাও প্রাণীজগতের মত বংশগতির ধারায় উত্তরপুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

মানুষের মধ্যে এখন যে প্রকারণ-বৈচিত্র্য আছে এ তো প্রত্যক্ষ সত্য। কোন দুটি মানুষের চেহারা অবিকল এক নয়। মানুষের মধ্যে দৈহিক গড়নের তারতম্য অকিঞ্চিৎকর হতে পারে কিন্তু তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। হাজার হাজার মানুষের মুখ পরীক্ষা করলেও দেখা যাবে যে প্রতিটি মুখে কোন-না-কোন স্বতন্ত্র বিশিষ্টতার লক্ষণ আছে। মানব-দেহের অপরাপর অঙ্গের তুলনা করলেও অল্পবিস্তর পার্থক্য ধরা পড়বে। পায়ের দৈর্ঘ্য, দাঁতের গড়ন আর করোটির ছাঁদের তারতম্য খুবই স্পষ্ট। পেশীর মধ্যেও প্রচুর বিশিষ্টতার লক্ষণ দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা এক সময় পঞ্চাশজন লোকের পায়ের পেশী পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে কোন দু'খানি পায়ের পেশী অবিকল ছিল না। মানবদেহের প্রধান প্রধান শিরার গতিপথের মধ্যেও হামেশা পার্থক্য দেখা যায়। আর একজন বিজ্ঞানী ছত্রিশজন লোকের দেহতন্ত্র পরীক্ষা করে ২৯৫টি পেশীগত পার্থক্য আবিষ্কার করেছিলেন। নতুন ছত্রিশজনের আর একটি দলের দেহতন্ত্র পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে তাদের পেশীগত পার্থক্য কমপক্ষে ৫৫৮টি।

এই পার্থক্য শুধু দেহতন্ত্রের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। মানুষের পারস্পরিক মানসিক শক্তির তারতম্যও সুবিদিত। সেই তারতম্যও প্রাণীকুলে আছে। খাঁচায় ভরে যারা জীবজন্তু পোষেণ এই অভিজ্ঞতা নিশ্চয় তাঁদের হয়েছে। কুকুর প্রভৃতি পোষমানা জন্তুর মানসিক শক্তির তারতম্যের কথাও সকলেরই জানা।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যে যেমন পরস্পরের দৈহিক গড়নে পার্থক্য আছে, তেমনি পার্থক্য মানুষের মধ্যেও আছে। এই সব পার্থক্য নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যে যেমন বংশগতির রূপ পায়, মানুষের মধ্যেও তেমনি বংশগতির ধারায় সঞ্চারিত হয়। তাছাড়া, নিম্ন পর্যায়ের প্রাণী আর মানুষের প্রকারণ শুধু সমধর্মী বিধি-বিধান অনুযায়ী দেখা দেয় না, উভয় ক্ষেত্রে এই বিকাশ-ব্যঞ্জনা প্রায় সমভাবে উভয়ের অঙ্গ-বিশেষ প্রভাবিত করে।

॥ প্রকারণ সৃষ্টির কারণ ॥

প্রাণীজগতে প্রকারণ সৃষ্টির কারণ কিংবা তার বিধি-বিধান সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত এবং সুনির্দিষ্ট কোন চূড়ান্ত জবাব এখনও দেওয়া যায়নি। তবে পোষমানা প্রাণীদেহে প্রকারণ সৃষ্টি হবার পেছনে যে সব জিনিসের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থা অন্যতম। পরিবর্তনশীল অবস্থা কখনও প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও বা পরোক্ষ-ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই অবস্থার ফলে যে বিশিষ্টতা দেখা দেয় সেগুলি প্রজাতির অন্তর্গত সকলের মধ্যে সমভাবে পরিস্ফুট হয়। যদি অবশ্য তাদের সকলেই ঐ পরিবর্তনশীল অবস্থার আওতায় বাস করে। অভ্যাসও প্রকারণ সৃষ্টির কম সহায়ক নয়। কোন অঙ্গের বেশী ব্যবহারের ফলে সেটি শক্তিশালী হয়। আবার অব্যবহার কোন একটি অঙ্গকে শক্তিহীন করে তাকে খর্ব করে দেয়। প্রকারণ সৃষ্টির পেছনে এই বেশী ব্যবহার ও অব্যবহারের প্রভাবও যথেষ্ট। এছাড়া, কোন অঙ্গের বিকাশ ব্যাহত হলে এবং প্রাণীদেহে পূর্বপুরুষের অঙ্গরূপের পূর্বানুবৃত্তির লক্ষণ দেখা দিলেও প্রকারণ সৃষ্টি হতে পারে। কোন অঙ্গের যদি রূপান্তর ঘটে তাহলে অপর একটি কিংবা একাধিক অঙ্গেরও রূপান্তর ঘটে বলে দেখা গেছে। পারস্পর্যের সম্পর্কযুক্ত এই পরিবর্তনের ফলেও প্রাণীদেহে প্রকারণের উদ্ভব হয়ে থাকে।

নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যে প্রকারণ সৃষ্টির এই যে সব কারণ ও বিধি-নিয়মের উল্লেখ করা হল মানুষের ক্ষেত্রেও সেগুলি সমভাবে প্রযোজ্য।

॥ পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব ॥

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন সমস্ত প্রাণীদেহের উপর যে খানিকটা প্রভাব বিস্তার করে একথা অস্বীকার করা যায় না। ক্ষেত্রবিশেষে বেশ ব্যাপক প্রভাবও দেখা দিতে পারে। তাছাড়া প্রতিবেশের পরিবর্তন প্রাণীদেহে এত প্রকারণ সৃষ্টির সূচনা করে যে তার ফলে গোটা দেহ যেন নমনীয় হয়ে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের লাখখানেক সৈনিকের দেহতন্ত্র পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে প্রতিবেশের পার্থক্য দৈহিক উচ্চতার উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। ভাল খাওয়া-পরার সুযোগ-সুবিধাও যে দেহের গড়ন প্রভাবিত করে এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। ইংলণ্ডের এক বিজ্ঞানী বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে শহরে বসবাস এবং বিশেষ কয়েক ধরনের বৃত্তি অবলম্বনের জন্য বৃটেনবাসীর

উচ্চতার গড় হ্রাস পেয়েছে। এই প্রভাব বংশগতির ধারায় সঞ্চারিত হয়েছে বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এই জাতের প্রভাব ছাড়া বাইরের প্রকৃতি আর কোন সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে কি না সঠিক জানা যায়নি। তবে আবহাওয়ার তারতম্য স্বভাবত আলাদা প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, শীতের দেশে ফুসফুস আর বৃক্কের ক্রিয়া প্রবল হয় আবার উষ্ণমণ্ডলে প্রবল হয় যকৃত আর চামড়ার ক্রিয়া।

।। ব্যবহার-অব্যবহারের ফলাফল ।।

সমস্ত প্রাণীদেহের পেশী যে বেশী ব্যবহারের ফলে শক্তিশালী হয় আবার সম্পূর্ণ অব্যবহারের ফলে অথবা সংশ্লিষ্ট নার্ভ বিনষ্ট হয়ে গেলে হীনবল হয়ে পড়ে এ তো জানা কথা। চোখটি নষ্ট হয়ে গেলে চোখের শিরা-উপশিরাও নির্জীব হয়ে পড়ে। একটি বৃক্ক যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে দ্বিতীয়টির আকার বাড়ে। একলাই সেটি তখন ছুটি বৃক্কের কাজ করে। ভারী ওজন যারা বহন করে তাদের অস্থি সাধারণতঃ অন্যের তুলনায় বেশী পুরু আর লম্বা হয়। বৃত্তির বিভিন্নতার জন্যও অঙ্গের অনুপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এই সব পরিবর্তন বংশগতির রূপ পায় বলে বিজ্ঞানীরা রায় দেন।

ভূমিষ্ঠ হবার বহু পূর্বে শিশুর পায়ের তলার চামড়া গায়ের অপর যে কোন অঙ্গের চামড়ার তুলনায় পুরু থাকে। শত সহস্র পুরুষ ধরে চাপ লাগার ফলে পায়ের তলার চামড়া যে রূপ পেয়েছে গর্ভস্থ শিশুর পায়ের তলার চামড়াতেও তার বংশগত লক্ষণ সুপ্রকাশ।

আমেরিকার পেরু দেশের সুউচ্চ এক মালভূমির উপর কুইচুয়া নামে এক রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতি বাস করত। সুউচ্চ মালভূমির পরিস্রুত হালকা হাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে হত বলে তাদের ফুসফুস আর বক্ষদেশের পরিসর অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এদেরই সগোত্র আর একটি উপজাতির অঙ্গ-লক্ষণ থেকে নির্দিষ্টভাবে বোঝা গেছে যে কয়েক পুরুষ ধরে সুউচ্চ কোন স্থানে বসবাস করলে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাতের মধ্যে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বংশগত পরিবর্তন দেখা দেয়। আইমারা নামে এই উপজাতিটি সমুদ্রের জলরেখা থেকে দশ-পনর হাজার ফুট উঁচু জায়গায় বসবাস করত। তাদের ধড়ের দৈর্ঘ্য ও পরিধি সব জাতের মানুষের চেয়ে আলাদা ছিল। স্পেনিয়ার্ডরা তাদের সোনার খনিতে কাজ করার লোভ দেখিয়ে সমভূমিতে নিয়ে আসে। এখানে পুরুষ ছুয়েক বসবাস করার পর দেখা গেল যে তাঁদের মূল

দেহ-কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য হ্রাস পেয়েছে। মেপে দেখা গেল, ধড়টা আর সুউচ্চ মালভূমির অধিবাসীদের মত লম্বা নেই। অন্যান্য অঙ্গ-লক্ষণেরও সেই সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছিল।

মানব-বিকাশের আধুনিক পর্যায়ে অর্থাৎ আজকের দিনের আকার-অবয়ব-বিশিষ্ট মানুষ দেখা দেবার পর বেশী ব্যবহার অথবা অব্যবহারের ফলে মানুষের অঙ্গ-লক্ষণের তেমন বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তবে সুদূর অতীতে মানুষের কুলপতিরা যখন পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে ছিল, চতুষ্পদ থেকে তারা যখন দ্বিপদ প্রাণী হচ্ছিল, দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেশী ব্যবহার কিংবা অব্যবহার জনিত ফলাফলের বংশগত প্রভাব তখন তাদের প্রাকৃতিক নির্বাচনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে বলে ডারউইন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

॥ ব্যাহত বিকাশের দৃষ্টান্ত ॥

কোন অঙ্গের বিকাশ ব্যাহত হলেও যে মানুষের মধ্যে প্রকারণ সৃষ্টি হয় তার দৃষ্টান্ত ভগট্ নামে এক বিজ্ঞানীর স্মৃতি কথায় পাওয়া যায়। এই বিজ্ঞানী এমন একদল ছোট-মাথার ইডিয়টের উল্লেখ করেছেন যাদের মস্তিষ্কের বাড়তি ও বিকাশ ব্যাহত অবস্থায় ছিল। এই লোকগুলির মাথার খুলির আকার ও আয়তন যেমন ছোট ছিল, তেমনি তাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াও সাধারণ মানুষের মত অত জটিল ছিল না। বুদ্ধি কিংবা মানসিক শক্তির দিক থেকেও এরা নিকৃষ্ট ছিল। গায়ে শক্তি বেশ ছিল। কর্মঠও ছিল, কিন্তু বাক্‌শক্তি ছিল না। কোন বিষয়ে বেশীক্ষণ মনঃসংযোগ করার ক্ষমতারও অভাব ছিল। তবে অণুকরণে বেশ পটু ছিল মানুষগুলি। এত চঞ্চল প্রকৃতি ছিল যে সব সময় লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করত আর মুখ ভ্যাঙচাতো। এছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য ছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে আগে গন্ধ শুঁকে খেতে দেখা গেছে। একজন তো উকুন বাছার সময় হাতের সঙ্গে সঙ্গে মুখও ব্যবহার করত। এদের আচার-আচরণ যেমন কদর্য ছিল তেমনি জনকয়েকের গায়ে লোমশতার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা গেছে।

॥ পূর্বানুবৃত্তির প্রমাণ ॥

মানুষের মধ্যে পূর্বানুবৃত্তির দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষ যে পর্যায়ের জীব সেই প্রাণীকুলের নিম্ন পর্যায়ের কিছু অঙ্গ-লক্ষণ মানব-ভ্রূণের মধ্যে সচরাচর দেখা না গেলেও উত্তরকালে মাঝে মাঝে প্রকাশ

পায়। আবার এই জাতের অঙ্গ-লক্ষণ যদি ভ্রূণের মধ্যে থাকে তবে পরবর্তী কালে তার হয়ত অতি-বৃদ্ধি হয়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

বিভিন্ন স্তন্যপায়ীর জরায়ু একটি অঙ্গরূপে বিকশিত হয়। কিন্তু তার মূলে থাকে দুটি আলাদা ছিদ্রপথ এবং দুই-নালীবিশিষ্ট দুটি অঙ্গ। সমস্ত স্তন্যপায়ীর জরায়ু মূলত দুটি আলাদা নল থেকে উদ্ভূত। তার নিকৃষ্ট অংশ দিয়ে 'করনুয়া' গঠিত হয়। এই দুটি করনুয়া গোড়ার দিকে মিলিত হয়ে মানুষের জরায়ু গঠন করে। জরায়ুর ক্রমবিকাশের পথে করনুয়া দুটি হ্রস্ব হয়ে যেন মানুষের জরায়ুর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে করনুয়া দুটি মিলিত হয় না। নারীদেহেও মাঝে মাঝে এই অবস্থা দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে পরিণত জরায়ুর মধ্যে করনুয়ার অস্তিত্ব থাকে। কিংবা জরায়ুটি দুটি অঙ্গে আংশিকভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। উভয় অংশ গর্ভাধানের কাজ করতে পারে। এই অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা জরায়ুর ব্যাহত বিকাশের দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করেন। কিন্তু মানবীর দেহে আংশিকভাবে দুটি জরায়ুর অস্তিত্বকে কেউ আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করেন না। পূর্বানুবৃত্তির দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করলেই তার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

মানুষের ছেদক দাঁত চিবোবার পক্ষে বেশ কার্যকর হাতিয়ার। এই ছেদক দাঁত কৃন্তক দাঁতের চেয়ে অনেক বেশী পোক্ত। কুকুর প্রভৃতি জন্তুর কাছে এই দাঁত শত্রুকে আক্রমণ করার প্রধান হাতিয়ার আর শিকার ঘায়েল করার প্রধানতম সম্বল। কিন্তু মানুষ এই ছেদক দাঁতকে শত্রু কিংবা শিকার ঘায়েল করার কাজে ব্যবহার করে না। কার্যকারিতার দিক থেকে ছেদক দাঁত এখন ব্যাহত রূপের অঙ্গ-লক্ষণের পর্যায়ে এসে গেছে। তবে মানুষের করোটি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে কিছু কিছু করোটিতে এই দাঁত কয়টি অন্যান্য দাঁতের তুলনায় বেশ বড়। বনমানুষের ছেদক দাঁত তো আরও বড়। কাজেই মানুষের মুখে ছেদক দাঁতের বাড়তি দেখে সেই লক্ষণকে বনমানুষাকার কুলপতির স্বাভাবিক অঙ্গ-লক্ষণের পূর্বানুবৃত্তি বলে গণ্য করা হয়।

মানুষের সঙ্গে নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর পেশীগত সাদৃশ্যও প্রচুর। চতুর্ভুজ প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পেশীগত সাদৃশ্য এত বেশী যে তার উল্লেখ করতে গেলে লম্বা ফিরিস্তি পেশ করতে হয়। একটি মাত্র মানুষের দেহ পরীক্ষা করে তার মধ্যে চতুর্ভুজ প্রাণীর সঙ্গে সাতটি পেশীগত সাদৃশ্য পাওয়া গিয়েছিল।* অকারণে বা আকস্মিক কারণে মানুষের দেহে সাত সাতটি বনমানুষের দেহ-লক্ষণ পাওয়া যায়নি। উভয়ের মধ্যে উদ্ভবগত মিল যদি না থাকে তাহলে এতটা সাদৃশ্য প্রকাশ পেতে পারে না। আবার মানুষের উদ্ভব যদি সত্যই বনমানুষাকার

কোন জীবের কুলে হয়ে থাকে তবে কয়েক হাজার পুরুষ পরেও মানুষের দেহে সাবেক কালের কুলপতির অঙ্গ-লক্ষণ দেখা দেবার কোন যুক্তিসঙ্গত বাধা নেই। এইভাবেই তো হাজার হাজার পুরুষ পরেও ঘোড়া, গাধা কিংবা খচ্চরের পায়ে কি কাঁধে মাঝে মাঝে কালচে ডোরা দেখা দেয়। এই জাতের সব প্রকারণই তো পূর্বানুবৃত্তির স্মারক।

।। পারম্পর্যের সম্পর্কযুক্ত প্রকারণ ।।

নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যে আর এক ধরনের প্রকারণ দেখা যায়। দেহতন্ত্রের বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত যে কোন একটি অঙ্গের পরিবর্তন দেখা দিলে অপর একটি বা একাধিক অঙ্গের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। মানুষের মধ্যেও এই ধরনের প্রকারণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এক বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেছেন যে বাহুর পেশীর স্বাভাবিক রূপ যখন পালটে যায়, পায়ের পেশী তখন প্রায় সব ক্ষেত্রে তার অনুকরণ করে। সেই পেশীরও স্বাভাবিক গড়ন পালটায়। আবার পায়ের পেশীর গড়নের পরিবর্তন হলে হাতের পেশীর গড়ন বদলায়। দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির অঙ্গ, দাঁত আর চুলের পারম্পর্যের সম্পর্ক আরও স্পষ্ট।

তাছাড়া, অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ কিংবা বিসদৃশ গড়নের জন্যও প্রাণীদেহে প্রকারণ সৃষ্টি হয়। সে রীতি মানুষের বেলাও প্রযোজ্য।

প্রাণীসর্গের সঙ্গে মানুষের অঙ্গ-লক্ষণের ও বিকাশ-বিধির এই সব দৃষ্টান্তের অভ্রান্ততা সংশয়াতীত। যে কোন জাতের সমস্ত প্রাণীর সমসংস্থ দৈহিক গড়নের তাৎপর্য তখনই বোঝা যায় যখন স্বীকার করে নেওয়া হয় যে তারা অভিন্ন পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং পরবর্তী কালে বিভিন্ন প্রতিবেশের সঙ্গে নিজেদের অভিযোজিত করেছে। অপর কোন ভিত্তিতে মানুষ অথবা বানরের হাত, ঘোড়ার পা, সীলমাছের পাখনা আর পাখীর ডানার গড়নের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এদের সকলেই এক আদর্শ পরিকল্পনা অনুযায়ী আলাদাভাবে সৃষ্ট হয়েছে এই ধারণার পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা নেই।

জীববিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই বোঝা যায় কেন এক সাধারণ ছাঁচে মানুষসহ সমস্ত স্তন্যপায়ীর দেহতন্ত্র গঠিত হয়েছে, ভ্রূণ-বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে কেন তাদের সকলের দেহে ব্যাহত রূপের অঙ্গ-লক্ষণ থাকে আর কেনই বা তাদের বিকাশ-বিধির মধ্যে সমধর্মিতার লক্ষণ সুপ্রকাশ। প্রাণীসর্গ থেকে জীবন-বিকাশের ধারায় এদের সকলের উদ্ভবের অভিন্নত্ব অকুণ্ঠে স্বীকার করে নিয়ে অনায়াসে

এই সব জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যায়। সমগ্র প্রাণীসর্গের দিকে চোখ ফিরিয়ে যদি তাদের সাদৃশ্য ও শ্রেণীবিন্যাস, তাদের ভৌগোলিক বিলি-বণ্টন আর তাদের ভূতাত্ত্বিক ক্রমবিন্যাসের সাক্ষ্য-প্রমাণ বিচার-বিবেচনা করা হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্ত আরও জোরদার হয়। উদ্ভবের রহস্য সম্পর্কে অপর কোন মত পোষণ করলে ডারউইনের ভাষায় প্রকারান্তরে এই কথা স্বীকার করতে হয় যে 'আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করার জন্যই যেন আমাদের নিজেদের এবং আমাদের আশপাশের জীবজন্তুর দেহতন্ত্র গড়া হয়েছে।'

স্বাভাবিক কুসংস্কারের বশে দম্ভভরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এক সময় দাবি করেছিলেন যে আমরা দেবাংশসম্ভূত—দেবতার সন্তান। তাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে স্বভাবতঃ আমাদের মনে কুণ্ঠা জাগে। তথাপি মানুষ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহতন্ত্র আর তাদের বিকাশ-বিধি সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে জীবজগতের কোন প্রাণীশাখা আলাদাভাবে উদ্ভূত হয়নি। অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর মত মানুষেরও উদ্ভব হয়েছে প্রাণীসর্গ থেকে—জীব-বিকাশের অমোঘ নিয়মে। ইতালীয় বিজ্ঞানী ডাঃ ফ্রান্সেস্কো বারাগো উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন যে মানুষ ভগবানের প্রতিকৃতি অনুসারে সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সে যে বনমানুষের প্রতিকৃতি অনুসারেও সৃষ্টি হয়েছে এ বিষয়ে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

মানুষের কুলজি

জীবনমঞ্চে মানুষের আবির্ভাব এমন কোন বিস্ময়কর ঘটনা নয় বটে, কিন্তু সবল সক্ষম পরাক্রমশালী কিংবা পরিচিত জীব হিসাবেও অকস্মাৎ একদিন সে মঞ্চে আবির্ভূত হয়নি। তার উদ্ভবের পেছনে ঘোড়া বা উটের মত ক্রমিক উন্নতির মন্থর বৃত্তান্তও নেই। বরং তার উদ্ভব হয়েছে অলক্ষ্যে। কিছু কিছু পূর্ব লক্ষণের আভাস পাওয়া গিয়েছিল মাত্র। উদললগ্নে প্রথম সে হয়ত বিরল প্রাণী ছিল। এক বিরল কুলপতির বংশেই হয়ত তার জন্ম হয়েছে।

আজকের দুনিয়ার সর্বত্র গিসগিস করছে ক্রমবিকাশের এই অভিনব সৃষ্টি। কিন্তু দশ-বিশ হাজার বছর আগে মানুষের এই অবস্থা ছিল না। নির্বান্ধব নিঃসঙ্গ প্রাণী ছিল মানুষ। প্রকৃতির যাদুঘরে তার জীবাশ্ম রক্ষিত হবার সম্ভাবনাও কম ছিল। আদি পর্যায়ের মানবাকার কিছু প্রাণী যদি আশ্রয়ের আশায় কিংবা অন্যান্য কারণে গুহাকন্দরে বসবাস করতে না আসত তাহলে সেদিনের মানুষ সম্পর্কে কোন তথ্য জানা সম্ভব হত কি না সন্দেহ। গরিলা, শিম্পানজি কিংবা ওরাং ওটাং-এর জীবাশ্ম প্রকৃতির জাদুঘরে পাওয়া যায়নি বললেই চলে। বনচর এরা। নদীর প্লাবন সমভূমির বুকে পলির যে আস্তরণ সৃষ্টি করে তার গর্ভে এদের মৃতদেহ সমাধিস্থ হবার সম্ভাবনা কম। আবার বেনোজলে বাহিত হয়ে মৃতদেহ যে মোহনার মুখে সমাধিস্থ হবে এমন সম্ভাবনাও নেই। আজ যদি এদের বংশধর বেঁচে না থাকত তাহলে আমাদের পিতামহেরা হয়ত অনুমানও করতে পারতেন না যে মানবসদৃশ স্তন্যপায়ী থাকতে পারে। সামান্য গুটিকয়েক দুর্ঘটনা হয়ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে মানুষের জ্ঞাতি-ভাইদের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারত।

মানুষের পূর্বপুরুষের খোঁজ করতে গিয়ে আগেই তাহলে জানতে হবে, স্তন্যপায়ীর কুলে কোন্ বিরল প্রাণীর শাখায় উদ্ভব হতে পারে মানুষের? আর কাদেরই বা মানবসদৃশ স্তন্যপায়ী বলা যায়।

প্রাণীসর্গের এক পূর্বগামী জীবশাখা থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছে শুধুমাত্র এই কথা বললে যেমন তার কুলপরিচয় বোধগম্য হয় না, তেমনি স্তন্যপায়ীর কুলে তার

উদ্ভব হয়েছে একথা বলাও কুলপরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বহু শাখা আছে স্তন্যপায়ীর কুলে। এমন শাখাও আছে যার সঙ্গে মানুষের কোন বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘোড়া, গরু, উট প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। কাজেই মানুষের সুনির্দিষ্ট কুলপরিচয় জানতে হলে খোঁজ করতে হবে যে স্তন্যপায়ীর কোন্ শাখার সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা নিকটতম। কোন্ শাখার সঙ্গে তার সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। তার মানে, মানবসদৃশ স্তন্যপায়ী কারা।

বানরের আকৃতি ও প্রকৃতির বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে বানরের সঙ্গেই মানুষের সাদৃশ্য নিকটতম। এই বানরকুলেই উদ্ভব হয়েছিল মানবসদৃশ স্তন্যপায়ীর এবং তারই বংশধর আমাদের পূর্ব-পুরুষ।

বানরের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের এক শ্রেণীর বানর দেখা যায়। মানুষের সঙ্গে এদের আকৃতিগত সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশী। গরিলা, শিম্পানজি, ওরাং ওটাং আর উল্লুক (গিবন) এই উচ্চতর বানরশ্রেণীর পরিজ্ঞাত প্রতিনিধি। গরিলা আর শিম্পানজি আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের প্রাণী, ওরাং ওটাং বোর্নিও এবং সুমাত্রা দ্বীপের আর উল্লুক মালয় দ্বীপপুঞ্জের। মানুষ ও বাদুড়সহ এই উচ্চ পর্যায়ের বানরশ্রেণীর পারিভাষিক নাম প্রাইমেট্স।

এ ছাড়া আর যে সব বানর আছে, যেমন মারমোসেট, ম্যাকাও কি হনুমান (বেবুন), তাদের বলা হয় নিম্ন পর্যায়ের বানর অথবা 'কুকুরমুখো বানর'।

উচ্চ পর্যায়ের বানরের লেজ নেই। চেহারা এবং আভ্যন্তরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়নে মানুষের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য খুব বেশী। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মানুষের দেহতন্ত্রে ওরাং ওটাং-এর ৫৬টি, উল্লুকের ৮৬টি, গরিলার ৮৬টি, আর শিম্পানজির ৯৮টি অঙ্গ-বৈশিষ্ট্য আছে।

মানুষ আর উচ্চ পর্যায়ের বানরের কঙ্কালের গড়ন প্রায় এক ধরনের। পেশী, রক্তবাহ, নার্ভ অথবা আভ্যন্তরিক দেহতন্ত্রের পার্থক্যও বেশী নয়। মানুষের মত এদের হাত-পায়ের আঙুলে নখরের বদলে নখ আছে। হাত ও পায়ের তালুতে আছে মানুষের মত রেখা ও ভাঁজ। পায়ের তলার গড়ন অবশ্য পৃথক। বানরের পায়ের তলা সমতল আর মানুষের পায়ের তলা বাঁকান। তবে বানরের হাত-পায়ের গড়ন মোটামুটি মানুষের হাত-পায়ের গড়নের মত। তাই যে কোন জিনিস তারা মুঠা করে ধরতে পারে। আবার খানিকটা পার্থক্যও আছে। বানরের হাত পায়ের তুলনায় লম্বা—বুড়ো আঙুলটি ছোট। পা দুখানি আবার দেহের অনুপাতে খাটো। তাছাড়া পায়ের আঙুলও বেশ লম্বা। বুড়ো আঙুলটি বাঁকান। এই অঙ্গ-লক্ষণ অবশ্য বানরের বৃক্ষচর জীবনের পরিণতি।

মানুষের মত বত্রিশটি দাঁত আছে বানরের। তার ছাঁদও মানুষের দাঁতের ছাঁদের মত। নাকের গড়ন, কর্ণকম্বু আর চোখের বিন্যাসের দিক থেকেও মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বানরের। বিশেষতঃ শিম্পানজির। সারা গায়ে লোম থাকলেও মুখমণ্ডল অথবা আঙুলে কোন লোম এদের থাকে না। পায়ের লোমবিন্যাসও মানুষের গায়ের লোমের মত।

উভয়ের আয়ু প্রায় সমান। উচ্চতর বানরেরও মানুষের মত একসময় একটির বেশী সন্তান হয় না। কদাচিৎ যমজ সন্তান জন্মে। মানুষের গর্ভকাল সাধারণতঃ ২৮০ দিন। এদের গর্ভকালও ২১০ দিন থেকে ২৭০ দিন। উভয়ের ভ্রূণের সাদৃশ্যের কথা আগেই বলেছি। নবজাত মানব-শিশুর সঙ্গে নবজাত শিম্পানজি-শাবকের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য থাকে।

প্রাণীসর্গের মধ্যে একমাত্র মানুষই খাড়াভাবে চলতে পারে। উচ্চতর বানরের মধ্যেও এইভাবে চলার প্রবণতা দেখা যায় এবং খানিকটা দূর পর্যন্ত দুই পায়ে ভর করে তারাও চলতে পারে। তবে তাদের দেহের ভঙ্গিমাটি খাড়া নয় বলে দুজ পায়ে চলার সময় অদ্ভুত দেখায়—কুঁজো ভাবে, হাতে ভর করে কিংবা দেহকাণ্ডের ভারসাম্য রক্ষার জন্য দুই হাত দুলিয়ে চলতে হয়।

নিকট সম্পর্কের প্রাণীর রক্তের রাসায়নিক সংযুতি আর ধর্ম সাধারণতঃ সমপ্রকৃতির হয়। এই দিক থেকেও মানুষের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বানরের নিকট সম্পর্ক ধরা পড়েছে।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ঘনিষ্ট সম্পর্কের প্রাণীর রক্তের ধর্ম অনুরূপ। আবার দূর সম্পর্কের প্রাণীর রক্তের ধর্ম আলাদা। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রাণীর মধ্যে একটির রক্ত যদি অপরের মধ্যে সঞ্চালিত করা হয় তবে কোন ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দেয় না। কিন্তু সম্পর্ক যদি দূরতর হয় তবে একের রক্ত অন্যের মধ্যে সঞ্চালিত করলে যার দেহে রক্ত সঞ্চালন করা হয় তার রক্তে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়। তার ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

মানুষের রক্ত নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যে সঞ্চালিত করলে ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দেয়; কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের বানরের দেহে কোন ক্ষতিসাধন করে না। তার মানে রক্তের রাসায়নিক সংযুতি ও ধর্মের দিক থেকে মানুষ ও উচ্চ পর্যায়ের বানরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এই বিষয়ে শিম্পানজির সঙ্গে মানুষের জ্ঞাতিত্ব নিকটতম।

বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায় যে অপরাপর প্রাণীর তুলনায় বানরের বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ ও প্রখর। বানরও কাঁদে হাসে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ক্রুদ্ধ হয়। রাগ হলে হাতের কাছে ঢিল, পাথর, লাঠি যা পায় তাই বিপক্ষের দিকে

তাক করে ছুঁড়ে মারে। প্রশংসা কিংবা বিদ্রূপ বোঝার ক্ষমতাও এদের আছে। চিড়িয়াখানার বনমানুষ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা একথা স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই। উচ্চ পর্যায়ের বানরের স্মৃতিশক্তিও দীর্ঘস্থায়ী। তারা যে সব শব্দোচ্চারণ করে সমজাতের মধ্যে তার তাৎপর্য সকলেই উপলব্ধি করে এবং তদনুসারে সাড়া দেয়। বানরের সন্তান-বাৎসল্য যেমন লক্ষ্যণীয় তেমনি পরস্পরকে সাহায্য করার প্রবৃত্তিও এদের মধ্যে প্রবল।

উচ্চ পর্যায়ের বানরের অনুকরণের ক্ষমতা এমন বিস্ময়কর যে অনায়াসে তারা মনুষ্যোচিত আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। মানুষের দেখাদেখি এরা টেবিলে বসে খেতে, বালিশ-বিছানা ব্যবহার করতে, বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজতে কি জল দিয়ে আগুন নেভাতে শিখে গেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ওদের মধ্যে অনেকে আবার চা, কফি কিংবা তামাক খেতে পর্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বানরের স্বাদ-বোধও মানুষের মত।

উচ্চতর পর্যায়ের বানরের সঙ্গে মানুষের সবচেয়ে বেশী পার্থক্য হল করোটির গঠনে। বানরের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। তাদের করোটির মূল অস্থি খুব ছোট আর কপাল ঢালু। বানরের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের মত অত পরিণত নয় বলে মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে তার বুদ্ধির তুলনা হয় না। তবু কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণীর চেয়ে তার বুদ্ধি অনেক বেশী। এইজন্যই পোষা শিম্পানজিকে খানিকটা গুণতে শেখান যায়, তার পক্ষে বস্তুর আকারগত পার্থক্য চেনা সম্ভব হয়, এমন কি দু'চারটে দ্রব্যও ব্যবহার করতে পারে।

রুশ বিজ্ঞানী প্যাভলভ একটি শিম্পানজির উপর বহু পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। একবার তার খাবারের সামনে আগুন জ্বেলে রাখা হয়েছিল। দেখা গেল যে, বালতি যোগাড় করে জল দিয়ে আগুন নিভিয়ে শিম্পানজিটি তার খাদ্য সংগ্রহ করল। আর একবার চৌবাচ্চার জলের মধ্যে খাবার রেখে দেওয়া হয়েছিল। চওড়া একটি তক্তা এনে চৌবাচ্চার উপর আড়াআড়িভাবে ফেলে শিম্পানজিটি একটি সাঁকো তৈরি করে সেই খাবার সংগ্রহ করেছিল।

মানুষ ও উচ্চ পর্যায়ের বানরের মধ্যে এইসব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে মানবসদৃশ বানরের মধ্যেই মানুষের নিকটতম আত্মীয়ের অনুসন্ধান করতে হবে এবং সেই প্রসঙ্গে মানুষের কুলপরিচয় জানা যাবে। দেখা যাবে, মানুষ আর উচ্চতর বানর মূলতঃ অভিন্ন সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

তাহলেই প্রশ্ন ওঠে, কে এই সাধারণ পূর্বপুরুষ যার কুলে মানবসদৃশ বানর ও মানুষ বিকশিত হয়েছে ? অভিব্যক্তির কোন্ কোন্ স্তর তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে মানবাকার বানর আর মানুষের স্তরে উন্নীত হতে ? ক্রমবিকাশের কোন্ কোন্ শক্তি তাকে চালনা করেছে অগ্রগতির পথে ?

॥ লেমুর থেকে বানর ॥

আগেই বলেছি, প্রাইমেট্‌স পর্যায়ের প্রাণী মানুষ আর বানর। এই অভিনব প্রাণীর চেহারার গড়ন থেকে অনায়াসে বলা যায় যে তিমি বা বাদুড়ের কুলে এদের জন্ম হতে পারে না। নখওয়ালা হাত-পায়ের আঙুল থেকে বলা যায় যে জোড় বা বিজোড় পায়ের আঙুলওয়ালা স্তন্যপায়ী এদের পূর্বপুরুষ নয়। মাংসাশী আর তীক্ষ্ণদন্তিরাও যে পূর্বপুরুষত্ব দাবি করতে পারে না তা বোঝা যায় এদের দাঁতের ছাঁদ ও গড়ন থেকে। এইভাবে একটির পর একটি দৈহিক লক্ষণের কথা ভেবে তুলনামূলক বিচার করলে একটিমাত্র পতঙ্গাশী স্তন্যপায়ীর শাখা ছাড়া স্তন্যপায়ী কুলের সমস্ত শাখাকে প্রাইমেট্‌সদের সম্ভাব্য কুলপতিত্ব থেকে বাদ দিতে হয়। ফুলওয়ালা স্তন্যপায়ীর মধ্যে এই স্তন্যপায়ী শাখাটি নেহাত আদি পর্যায়ের জীব। বিশিষ্ট গুণবর্জিত ছিল এরা। মানুষ আর লাঙ্গুলহীন বনমানুষের কুলপতি যেমন এক পর্যায়ের জীব, বনমানুষ আর লেজওয়ালা বানরের কুলপতি নিশ্চয়ই তেমনি সম-পর্যায়ের। তুলনামূলক শারীরস্থান আর স্বভাবের বিচার করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এদের সকলের কুলপতি আবার লেমুরসদৃশ একই জীবের বংশোদ্ভূত। সমস্ত প্রাণী-বিদ্যাবিদ একমত এই বিষয়ে। একথাও তাঁরা স্বীকার করেন যে পতঙ্গাশী জীবশাখাটির সঙ্গে লেমুরের সম্পর্ক অতি নিবিড়।

পতঙ্গাশীরা ক্ষুদ্রকায় প্রাণী। ছুটত চার পায়ে ভর করে। তাছাড়া তাদের মস্তিষ্কও মোটামুটি ছোট ছিল। কিন্তু মস্তিষ্কের বড়ত্ব উচ্চ পর্যায়ের প্রাইমেট্‌সদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অগ্রপদকে এরা ধরার, নানাভাবে চালনা করার মত অঙ্গে পরিণত করেছিল। এখন দেখা যাক, কি কি কারণে এই পরিবর্তন ঘটতে পারে।

নিশ্চয় বহু কারণ আছে। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে বৃক্ষচর জীবন এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ। বৃক্ষশাখায় সচল জীবনযাপন করতে হলে এমন বহু গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন ভূমিচারী জীবনে যার বহু গুণের আবশ্যক হয় না। বহুবিধ অঙ্গ-সঞ্চালনের আবশ্যক হয় এখানে। অগ্রপদ আর পশ্চাদ্‌পদ সামনে-পেছনে চালনা করতে শিখলে ঘোড়া বা শিঙওয়ালা হরিণের কাজ চলে। কিন্তু অঙ্গ-সঞ্চালনের এইটুকু মাত্র কৌশল আয়ত্ত করে গাছের শাখায় বাস করা

যায় না। হাত-পা এখানে গ্রাহী হওয়া চাই। হাত আর পা দিয়ে ধরতে শিখতে হবে। খুর বা নখর যদি থাকে তাহলে বৃক্ষশাখায় অনায়াসে চলাফেরার অসুবিধা। হাত-পায়ের আঙুলের সংখ্যা হ্রাসের খুব প্রয়োজন হয় না। আর চাই চটপট দূরত্ব পরিমাপ করার ক্ষমতা। তার মানে ঘ্রাণশক্তির বদলে দৃষ্টিশক্তির উপর বেশী নির্ভর করতে হবে। অথচ ঘ্রাণশক্তি স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্যতম প্রধান নির্ভর।

টুপাইয়া আর বৃক্ষাশ্রয়ী ছুঁচো নামে দুই শ্রেণীর কিছু পতঙ্গাশীর মধ্যে এই হাতের উন্নতির প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয়। ছুঁচোরা খুব চটপটে। সাধারণ পতঙ্গাশীদের চাইতে তাদের মস্তিষ্কের আকারও বড়। তাছাড়া এদের মস্তিষ্কের দৃষ্টি-সংশ্লিষ্ট বলয় বেড়ে গিয়েছিল। আর ঘ্রাণশক্তি সংশ্লিষ্ট অংশ হ্রাস পেয়েছিল। কয়েকটি বিষয়ে লেমুরদের সঙ্গে এদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। বহু প্রাণী-বিত্তাবিদের মত এই যে লেমুর যে-কুলে জন্মেছে এরাও সেই শাখার রূপান্তরিত বংশধর।

লেমুর গোষ্ঠীর মধ্যে তারসিয়াস্ নামে এক জাতের ছোট্ট প্রাণী আছে। মানুষের পূর্বপুরুষের প্রধান ধারার সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতা সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী। সাধারণ লেমুর এখনও প্রধানতঃ ঘ্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে। কাজেই তারা কুকুরমুখো। কিন্তু তারসিয়াস্ প্রধানতঃ দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভর করে। তাই তাদের মুখমণ্ডল বানরের মত। মুখ আর নাক সামনে বাড়িয়ে খাত্ত গ্রহণ করে লেমুর। হাতের ব্যবহারও জানে। তাছাড়া আর একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে লেমুরের। মাথা ঘুরিয়ে তাকাতে পারে। ক্ষমতাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বোঝা যায়, দুচোখে আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা দুখানি সমতল ছবিকে এরা মস্তিষ্কের সাহায্যে ঘনত্বগুণ সম্পন্ন একখানি ছবিতে মিলিয়ে দিতে শিখেছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই দৃষ্টিশক্তির নাম স্টিরিওস্কোপিক দৃষ্টিশক্তি। তারপর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে একমাত্র উচ্চতর পর্যায়ের বানর, বনমানুষ আর মানুষসহ লেমুরদের চোখের মণিতে হলদে একটি দাগ আছে। অক্ষিগোলকের এই হলদে দাগটি দৃষ্টিশক্তি স্বচ্ছ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। কোন প্রাণীকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করতে হলে তার দিকে এই হলদে দাগ নিবদ্ধ করতে হয়। এই স্থির দৃষ্টি আবার একাগ্রতার অন্যতম ভিত্তি। তারসিয়াসের হলদে দাগটি ছড়ান। তেমন ভালভাবে দানা বাঁধেনি। বানর থেকে সমস্ত উচ্চ পর্যায়ের প্রাইমেটসদের মধ্যে লক্ষণটি পুরোপুরি বিকাশ লাভ করেছে।

অগ্রগতির প্রথম পদক্ষেপের পর অপরাপর অর্জিত গুণ স্বভাবতঃ পরস্পরকে শক্তিশালী করে তোলে। গ্রাহী সচল হাত থাকলে তাই দিয়ে খাওয়া যায়, খপ

করে যে কোন জিনিস ধরাও যায়। প্রয়োজন মত অন্যান্য কাজেও লাগান যেতে পারে। হাত দিয়ে নাড়া-চাড়া করার, এটা-সেটা পরীক্ষা করার সুযোগ যত বাড়ে মস্তিষ্কও বিভিন্ন পদার্থের খুঁটিনাটি সম্পর্কে ততটা সচেতন হয়ে ওঠে। একবার যদি মস্তিষ্কের উন্নতি সাধিত হয় তাহলে হস্ত চালনার নানাবিধ কৌশলও আয়ত্ত করা সম্ভব। তার উন্নতিও অনিবার্য। তাছাড়া হাতের দেওয়া সংবাদ চোখের বার্তার সঙ্গে যুক্ত করে যে কোন জিনিস সম্পর্কে পূর্ণতর সাচ্চা জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। খুর বা নখর যে সব স্তন্যপায়ীর সম্বল, কিংবা যারা প্রধানতঃ ঘ্রাণ-শক্তির উপর নির্ভরশীল তাদের পক্ষে দৃষ্টি ও স্পর্শের সহযোগে জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। মোটামুটিভাবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একটি অঙ্গের উন্নতি অপর অঙ্গের উন্নতির পথ খুলে দেয়। তাছাড়া ক্রমবিকাশের বিভিন্ন প্রবণতাও পরস্পরের উদ্দীপক। তাই মস্তিষ্ক, হাত আর চক্ষুর উন্নতি প্রাণী-জগতে এক নতুন অবস্থা সৃষ্টি করল। বৃক্ষচর ছুঁচো থেকে আদি পর্যায়ের প্রাইমেট্সদের নিয়ে এল কুকুরমুখো আদি লেমুরের পর্যায়ে। তারপর বানরমুখো লেমুরের স্তর উত্তীর্ণ করে সৃষ্টি করল সাচ্চা বানর। বিভিন্ন জিনিস নাড়া-চাড়া করার কৌতূহল আর সেই সম্পর্কে মস্তিষ্কের আগ্রহ এই পর্যায়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। তার ফলে অন্তহীন কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসার আকারে এই প্রাণীটির মধ্যে এক অভিনব জৈবিক লক্ষণ দেখা দিল। তারসিয়াসের মধ্যে দৃষ্টিশক্তির যতটা উন্নতি হয়েছিল তার চাইতে অনেক বেশী উন্নতি হল বানরের মধ্যে।

॥ হনুমান ও বনমানুষ ॥

বানর আর বনমানুষের পর্যায়ের মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। লেজওয়ালা বানরের মধ্যে হনুমানের মত ভূমিচারী বানরের আকার কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু সমস্ত সাচ্চা বনমানুষ, এমন কি হালকা ছোট্ট উল্লুক পর্যন্ত বৃক্ষচর যে কোন বানরের চাইতে আকারে বড়। আর এরা সকলেই লেজ হারিয়েছিল। বৃক্ষচারিতার এই নতুন কৌশল অভিযোজনের ফলে এই লাঙ্গুলহীনতা দেখা দেয়। ডালের উপরিভাগ ধরে ছুটে বেড়াবার আর লেজটিকে দেহের ভারসাম্য রক্ষার কাজে নিযুক্ত করে কাঠবিড়ালীর মত লাফ দেবার অভ্যাস এরা বর্জন করেছিল। হাতের সাহায্যে ঝুলতে আরম্ভ করল তার বদলে। লেজওয়ালা বানরের বক্ষদেশ চ্যাপটা বা চওড়া নয়। কুঁজো। হাতের সাহায্যে ঝুলতে ও দুলতে আরম্ভ করায় বক্ষদেশ চ্যাপটা ও প্রশস্ত হয়ে ওঠে। হাতের গ্রাহীতাও অনেক বেশী দরকার এইভাবে ঝুলতে কি দোল খেতে। অনেক বেশী সুবেদিতা প্রয়োজন। তার মানে হাত

আর চোখের যোগাযোগ এই অবস্থায় প্রাণীর জীবনে অনন্যসাধারণ গুরুত্ব লাভ করে। প্রতিটি দোল খাবার সময় হাত ও চোখের সহযোগিতা আবশ্যক হয়। লেজের উপযোগিতা আর থাকে না। দেহটা স্বভাবতঃ খাড়া থাকে বলে প্রাণীটি যখন মাটিতে নেমে আসে তখনও তার দেহে খাড়া-লক্ষণ বজায় থাকে।

দৈহিক লক্ষণের এই সব বিশিষ্টতা বৃক্ষচর জীবনের পরিণতি। মানুষ যদি এককালে বানর বা মানুষসদৃশ বানরের স্তরে না থাকত তাহলে তার দৈহিক গড়ন কখনও আজকের মত হতে পারত না। এমন কি যে কারণে সে মানুষ, যে বুদ্ধির গৌরবে প্রাণী-জগতে সে অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা অর্জন করেছে সেই বুদ্ধিদীপ্ত স্বভাবও হয়ত সম্ভব হত না বৃক্ষলগ্ন জীবনের শিক্ষানবিসী না থাকলে। তাছাড়া মানবসদৃশ বানরের মত বৃক্ষশাখায় ঝুলন্ত জীবনযাপনের শিক্ষা যদি না থাকত তাহলে যখন সে ভূমিচারী জীবনযাপন করতে এল তখন তার পক্ষে হাতে ভর না করে দুই পায়ে খাড়াভাবে চলাফেরা করা সম্ভব হত কি? পারত কি সে হাত দুখানাকে চলার বাহন না করে মুক্তভাবে শুধু ধরার বা নাড়া-চাড়া করার কাজে নিযুক্ত করতে? তার মানে মানুষের দ্বিপদত্ব, তার দেহের খাড়াভাব তার পূর্বপুরুষের বৃক্ষলগ্ন জীবনের পরিণতি।

অভিব্যক্তির এই পর্যায়ের জীবাশ্ম বড় পাওয়া যায়নি। লেমুরসদৃশ বিবিধ প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে ইওসিন কল্পের শেষ ভাগে। কিন্তু 'পুরান পৃথিবীর বানর' যাদের বলা হয় অর্থাৎ যে শাখায় বনমানুষের উদ্ভব হয়েছে তাদের জীবাশ্মের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। মিশরের দক্ষিণাংশে প্রোপ্লাইওপিথেকাস নামে একটি জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এটি অলিগোসিন কল্পের প্রাণী। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, এটি লাঙ্গুলহীন মানবসদৃশ বানরের আদিম জাতিরূপের সাক্ষী।

মাইওসিন কল্পের শেষ ভাগে বানরকুলে প্রকারণ সৃষ্টি হবার লক্ষণ দেখা দেয়। প্লাইওপিথেকাস নামে যে জীবাশ্মটি আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে সমকালীন উল্লুকের পূর্বগামী জীব বলে গণ্য করা হয়। আর ড্রাইওপিথেকাস নামে যেটি পাওয়া গেছে তাকে অন্যান্য বনমানুষগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ বলে মনে করা হয়।

ড্রাইওপিথেকাস শব্দটি গ্রীক শব্দ। তার অর্থ ওক বৃক্ষবাসী বানর। এই প্রাণীটির শুধু চোয়াল, দাঁত আর করোটির টুকরো পাওয়া গিয়েছে। তাহলেও এই শ্রেণীর প্রাণীর অকিঞ্চিৎকর পরিচিতির সন্ধান মিলেছে বহুস্থানে। পুরান পৃথিবীর বহুস্থানে ছড়িয়ে আছে এই জীবাশ্ম। তাদের বিভিন্ন প্রজাতির আকারও বিভিন্ন। কোনটি ছোট্ট উল্লুকের মত। আবার কোন কোনটি বা মানুষের মত বড়। আমাদের কুলপতিদের চেহারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ছিল এই জীব-

শাখাটির। মানুষ, গরিলা, শিম্পানজি আর ওরাং ওটাং-এর পূর্বপুরুষের চোয়াল যে ধরনের হওয়া উচিত বলে মনে হয় এদের চোয়ালের গড়নও সেই ধরনের। বৃক্ষবাসের ফলে এদের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ, হাত দুখানি বেশ নিপুণ ও সচল ছিল। বৃক্ষবাসী হলেও সমকালীন বানরের মত এদের দেহ কেবল ঝুলবার উপযোগী ছিল না। আরও বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ সংযোজিত হয়েছিল এদের দেহে।

॥ সাধারণ কুলপতিত্বের আভাস ॥

সমকালীন বনমানুষের বংশধারার স্মারক পুরাকালের কোন জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি। অস্ট্রালোপিথেকাস নামে মানবসদৃশ বানরের একটি জীবাশ্ম বেচুয়ানাল্যাণ্ডে পাওয়া গিয়েছে। আফ্রিকার অরণ্যহীন অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল এরা। দেহের উচ্চতা শিম্পানজির চাইতে খানিকটা বেশী। চলত দুই পায়ে ভর করে। এই প্রাণীটির মধ্যে বনমানুষের লক্ষণ পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। তথাপি জীবাশ্মটির মধ্যে শাখামৃগত্বের লক্ষণের চাইতে মানুষের দেহলক্ষণের সাদৃশ্য স্পষ্টতর। অন্যান্য জীবন্ত বনমানুষের সঙ্গে তুলনা করলে তাই মনে হবে। সেই কারণে একদল বিজ্ঞানী মনে করেন যে অস্ট্রালোপিথেকাস থেকে মানুষের কুলক্রমের সূচনা হয়েছে। মানুষ ও উচ্চ পর্যায়ের বানরের সদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট যে বৃক্ষবাসী বানরের রূপ ড্রাইওপিথেকাসের মধ্যে সূচিত হয় ক্রমবিকাশের ধারায় সেই প্রাণী-শাখাতেই উদ্ভব হয়েছে ভূমিচারী এবং দ্বিপদত্বের লক্ষণবিশিষ্ট অস্ট্রালোপিথেকাসের। প্রাণীটিকে সেই ধারার শেষ গ্রন্থি বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ তার পরের পর্যায়ে মানুষের প্রাচীনতম জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায়।

জীববিজ্ঞানীদের বিশ্বাস যে পতঙ্গাশী প্রাণী থেকে লেমুরসদৃশ প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে সম্ভবতঃ ক্রিটেসাস কল্পের শেষ ভাগে। লেমুর থেকে বানরের উদ্ভব হয় ইওসিন কল্পের আদি ভাগে। আর বানর থেকে বনমানুষের আদি জাতিরূপের উদ্ভব হয় ইওসিন কল্পের শেষ ভাগে গ্রীষ্মমণ্ডলের অরণ্য অঞ্চলে। তারপর গোটা অলিগোসিন আর মাইওসিন কল্প জুড়ে বনমানুষের শাখায় নানা বিশিষ্ট গুণ-লক্ষণ সংযোজিত হয়। মাইওসিন কল্পের শেষ ভাগে অথবা মধ্য প্লাইওসিন কল্পের আগে মানুষাকার আর বনমানুষাকার শাখার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারেনি।

বানর শাখার ক্রমবিকাশের পথে পৃথিবীর বুকে এককালে এমন এক শ্রেণীর বানরের উদ্ভব হয়েছিল যাদের দেহলক্ষণের মধ্যে মানুষের দেহলক্ষণের আভাস

প্রকাশ পায়। ভূমিচারী এই প্রাণী-শাখার মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের বানর আর মানুষের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। মানুষ ও বনমানুষ উভয়ের সাধারণ কুলপতি এরা। এই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে একদিকে সৃষ্টি হল বানরসদৃশ মানুষ আর অপরদিকে সৃষ্টি হল মানুষসদৃশ বানর। অভিন্ন সাধারণ কুলপতির বংশে যুগল শাখার মত উদ্গত হয়ে আদি মানুষ আর মানুষসদৃশ বানর তারপর জীবনধারণের স্বতন্ত্র অবস্থার প্রভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তবে ভূমিবাসী এক জাতের বানর থেকেই যে বানরসদৃশ নতুন একটি জীব-প্রজাতি অর্থাৎ আদি মানুষের উদ্ভব হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বানর ও মানুষের যুগ্ম-লক্ষণবিশিষ্ট জীবাশ্ম পরীক্ষা করে অপর কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়।

॥ বৃক্ষচর জীবন ত্যাগের কারণ ॥

বানর আর বনমানুষসদৃশ প্রাণীর স্তর অতিক্রম না করে মানুষ কখনও খাড়া-চেহারার মানুষ হতে পারত না সত্য, কিন্তু মানুষের পাশাপাশি আজও বনমানুষের অস্তিত্ব আছে; কাজেই এই সব আবশ্যিক স্তর অতিক্রম করলে আবারও যে মানুষ অভিব্যক্ত হবে একথা প্রমাণ হয় না। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, কি কারণে আমাদের প্রাক্-মানবীয় কুলপতি বৃক্ষলগ্ন জীবন ত্যাগ করে মাটির বুকে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন? আকারের বিশালত্বের জন্য নয় নিশ্চয়ই। বনমানুষের মধ্যে গরিলার আকার সবচেয়ে বড়। বয়স্ক পুরুষ গরিলার ওজন ছয় মণের মত। তাছাড়া প্রায়শঃ এরা মাটিতে চলাফেরা করে। তবু সামান্যতম উত্তেজনার কারণ ঘটলেই গাছে চড়ে বসে। একমাত্র বয়স্ক পুরুষ গরিলা ছাড়া। তাদের ওজন সবচেয়ে বেশী। কাজেই আকারের বিশালত্বের জন্য প্রাক্-মানবীয় কুলপতি ভূমিচারী জীবন গ্রহণ করেছিলেন, মানুষের অভিব্যক্তির বৃত্তান্ত থেকে এই যুক্তি অনায়াসে বাদ দেওয়া যায়। পায়ের গড়ন থেকে বোঝা যায় যে মানুষের বনমানুষসদৃশ কুলপতি সমকালীন উল্লুকের মত আকার থাকতেই ভূমিতে বসবাস আরম্ভ করেছে।

অভিব্যক্তির বৃত্তান্তে আমরা দেখেছি যে প্রয়োজনের তাগিদে পারিপার্শ্বিক অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনের প্রভাবে অন্যান্য জীব নতুন নতুন গুণ আয়ত্ত করেছে। সহজে বা অনিবার্যভাবে তাদের অগ্রগতি ঘটেনি। প্রতিটি বিরাট পদক্ষেপের পেছনে গুরুতর প্রয়োজনের তাগিদ থাকে। অন্যান্য প্রাণীর জীবনবৃত্তান্তের এই দৃষ্টান্ত থেকে স্বভাবতঃ অনুমান করা যায় যে প্রাক্-মানবীয় কুলপতির পক্ষে বৃক্ষচর জীবন ত্যাগ করে ভূমিচারী

জীবন গ্রহণের পেছনেও নিশ্চয়ই কোন অনিবার্য বাধ্যতামূলক কারণ দেখা দিয়েছিল।

এই সম্পর্কে যত কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণটি সবিশেষ যুক্তিযুক্ত।

মাইওসিন কল্প থেকে আরম্ভ করে সেনোজোইক অধিকল্পের আবহাওয়া তুষার যুগ অবধি ক্রমান্বয় শীতল ও শুষ্ক হয়ে আসে। বনভূমির পরিসর হ্রাস পায়। অধিকাংশ স্থানের বনচর প্রাণী দূরে হটে যেতে পেরেছিল বনের সঙ্গে সঙ্গে। হিমালয় গিরিশ্রেণী তখনও উন্নত হচ্ছে। তার উত্তরের মধ্য এশিয়া অঞ্চলের সব বনভূমিবাসীরা দক্ষিণে সরে যেতে পারল না। সুউচ্চ মালভূমি আর পর্বতচূড়া পথরোধ করে দাঁড়াল। এদিকে বনভূমি লুপ্ত হওয়ায় এরা সাবেক বাস্তু হারাল। বাধ্য হল উন্মুক্ত ভূমিতে বাস করতে। খাদ্যেরও অভাব ঘটল। এই পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় জয়ী শুধু তারাই হতে পারে যাদের পক্ষে চটপট জীবনধারা পরিবর্তন করা সম্ভব। তাই অনুমান করা হয়, বৃক্ষলগ্ন বনচর মানবসদৃশ বানর মাটির বুকে উন্মুক্ত স্থানে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। বনভূমির সহচর হয়ে যারা দক্ষিণ দিকে সরে গিয়েছিল তাদের জীবনে রূপান্তরের তাগিদ দেখা দেয়নি। প্রয়োজনের চাপ ছিল না বলে তারা বনমানুষ থেকে গেল। এই কারণে বহু পণ্ডিত মধ্য এশিয়াকে মানবের সূতিকাগার আখ্যা দেন।

অভিমতটি যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নেই। তবে মানুষের কুলপতি খুব সম্ভবতঃ আদিমকাল থেকে তার অন্যান্য জ্ঞাতিভাইদের তুলনায় অনেক বেশী ভূমিচারী ছিল। বনের কিনারে কিংবা বনভূমির ফাঁকা জায়গায় জীবনযাপনের অভ্যাস তারা রপ্ত করে নিয়েছিল। এইভাবে জীবনযাপনের উপযোগী বিশেষ গুণাবলী অর্জন করতে করতে অবশেষে একদিন তারা মানুষ আখ্যা পাবার মত ভূমিচর বৃহদাকার মস্তিষ্কবান খাড়া চেহারার প্রাণী হয়ে পড়ল। গরিলাও অধিকাংশ সময় মাটিতে কাটায়। লেজওয়ালা বানরের মধ্যে হনুমানদল (বেবুন) আর তাদের সগোত্রেরাও বহুদিন গাছ ছেড়েছে। বানরশ্রেণীর মধ্যে এই বৃক্ষত্যাগী শাখাটি সব চাইতে বুদ্ধিমান আর মারাত্মক। কাজেই বনের আশ্রয়ে থাকলেও মানুষের অভিব্যক্তি হতে পারত বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। সেই দিক থেকে বিচার করলে আফ্রিকা কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অনায়াসে মানুষের সূতিকাগার হতে পারে। অনেকে এই সিদ্ধান্ত করেছেন।

আসল কথা, সঠিক জানি না আমরা। নতুন তথ্য যদি জানা যায় তাহলেই জোর করে মানুষের সূতিকাগারের ঠিকানা বলা সম্ভব।

যাই হোক, বানরসদৃশ মানুষের উদ্ভবের পরেও বনমানুষেরা তাদের গাছে ঝোলার অভ্যাস অব্যাহতভাবে চালিয়ে গেছে। তার ফলে ঐ দিক থেকে তাদের উন্নতি হয়েছে। নিজেদের বৃক্ষাশ্রয়ী জীবনের বিশিষ্টতাকে আরও উন্নত করতে পেরেছে। হাত আরও লম্বা হয়েছে। হাতের আঙুলও লম্বা হয়েছে গাছের ডাল ধরতে ধরতে। বৃক্ষচর জীবনের বিশিষ্ট গুণাবলী মানুষের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ক্রমেই বাড়িয়ে দিয়েছে। তবু স্মরণ রাখতে হবে, মানুষ হিসাবে আমরা যেমন উন্নত হয়েছি, তাদেরও উন্নতি হয়েছে বনমানুষ হিসাবে। আগের কালের তুলনায় আজকে তারা অনেক উন্নত বনমানুষ। আর তারই পাশাপাশি আমাদের বনমানুষত্বের হয়েছে অধোগতি।

রূপান্তরের রীতি

যিনি যে মতই পোষণ করুন না কেন কয়েকটি বিষয়ে বিজ্ঞানীমহল একমত। যেমন আমাদের প্রাক্-মানবীয় কুলপতির সর্বাঙ্গে লোম ছিল। সম্ভবতঃ কালো লোম। কারও কারও মতে অবশ্য লাল। তার হাত আর আঙুলও ছিল এখনকার চেয়ে লম্বা, পা হ্রস্ব, পেটের দিকে বাঁকান। তার মানে যে ডালে বসবে সেই ডাল ধরবার উপযোগী। তাছাড়া মাথাটি ছিল কাঁধের উপর সামনের দিকে ঝুঁকে বসান। গলার উপর সোজাসুজি খাড়াভাবে বসান মাথা ছিল না। আর সেই মাথা ছিল বনমানুষের স্তরের।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই কুলপতি থেকে মানুষের উদ্ভব হল কি ভাবে। কি ভাবে এই কুলপতির বংশধারায় লোমহীন, দ্বিপদ, ঊর্ধ্বমুখী, বৃহৎ মস্তিষ্কবান, স্পষ্ট বাক্-শক্তিসম্পন্ন নতুন জীব-প্রজাতির বিকাশ হল? প্রাণী বংশোদ্ভূত হয়েও কি ভাবে আপন বিশিষ্টগুণের বলে সে নিজেকে প্রাণী-দশা থেকে মুক্ত করে মানুষের অনন্য-সাধারণ মর্যাদায় উন্নীত হল?

পৃথিবীর বুকে যত প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে মানুষ তার মধ্যে সবচেয়ে প্রতাপশালী। কোন প্রাণী তার মত এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। অপর সকল প্রাণী তার কাছে হার মেনেছে। স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে তার প্রভুত্ব, তার শ্রেষ্ঠত্ব। এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে আছে মানুষের মানসিক শক্তি, তার সামাজিক অভ্যাস, তার দৈহিক গড়নের বৈশিষ্ট্য আর তার শ্রম। জীবনযুদ্ধে বারবার এই সব বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষা হয়ে গেছে। মানুষ স্পষ্ট বাক্শক্তি অর্জন করেছে। এই বিস্ময়কর ক্ষমতাকে আশ্রয় করে সে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়েছে। তাছাড়া, আত্মরক্ষা, শিকার ধরা কিংবা খাদ্য সংগ্রহের জন্য সে নানাবিধ হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র আর ফাঁদ আবিষ্কার করেছে। জলপথে চলাচলের বাধা অতিক্রম করেছে নৌকা, ভেলা আর ক্যানো তৈরি করে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যাত্রা করেছে। আগুন জ্বালাতে শিখে দুষ্পাচ্য কঠিন খাদ্যসামগ্রীকে সহজপাচ্য করেছে। এমন কি বিষাক্ত ফল-মূলও গ্রহণের উপযোগী করেছে। এই যে সব ক্ষমতার জন্য প্রাণী-রাজ্যের মধ্যে মানুষ এক অতুলনীয়

শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন সেই ক্ষমতা তার পর্যবেক্ষণশক্তি, স্মৃতিশক্তি, কৌতূহল, চিন্তাশক্তি আর তার বিচারশক্তি ও শ্রমের প্রত্যক্ষ ফল। মানুষের মানসিক শক্তি আর সামাজিক অভ্যাস তার পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। তাই বলে তার দৈহিক গড়নের গুরুত্বও খাটো করে দেখা যায় না। মস্তিষ্কের বাড়তি ও উন্নতি অবশ্যই মানুষের অগ্রগতির প্রধানতম কারণ। কিন্তু মস্তিষ্কের উন্নতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উন্নতি।

।। হাতের উন্নতি ।।

হাতের উন্নতির তাৎপর্য এই দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথাযথ-ভাবে হাতুড়ি পেটানও বড় সহজ কাজ নয়। ছুতোরের বৃত্তি-শিক্ষার্থীদের সে অভিজ্ঞতা আছে। তাক করে ঢিল ছুঁড়তে হলে হাত, বাহু আর কাঁধের পেশীকে পরস্পর যুক্তভাবে কাজ করতে হয়। সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম স্পর্শশক্তিরও প্রয়োজন। ঢেলা কিংবা বর্শা ছুঁড়তে গেলে পায়ে ভর করে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হয়। এজন্যও বহু পেশীর পারস্পরিক সহায়তা আবশ্যক। হাত যদি নিখুঁত না হয় তাহলে সেই হাত দিয়ে আনাড়ী পাথুরে হাতিয়ারও তৈরি করা যায় না। আবার যে হাত পাথুরে হাতিয়ার তৈরি করতে পারে সেই হাত দিয়েই উপযুক্ত অভ্যাসের পর যে কোন কারিগরী কাজ করান সম্ভব।

মানুষের নিকটতম আত্মীয় বানরের হাতের গড়ন সাধারণভাবে মানুষের হাতের মত। উভয়ের হাতের গড়নের ছাঁদ সমধর্মী। তবে বানরের হাত মানুষের হাতের মত এমন নিখুঁতভাবে বিবিধ ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী নয়। বানরও অবিকল মানুষের মত গাছের সরু ডাল বা দড়ি ধরতে পারে। একদিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে অপরদিকে অন্যান্য আঙুল আর করতল দিয়ে মুঠা করে ধরে। তারাও বোতলের গলা ধরে মুখে লাগাতে পারে। আমাদের মত হাত দিয়ে আকারে বড় জিনিস ধরে মুখে পুরতে পারে। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর সাহায্যে তারাও পোকামাকড় ধরে। অনেক জাতের বানর ডালের উপর বুনো লেবু ঠুকে ফাটিয়ে নেয় তারপর আঙুল দিয়ে খোসা ছাড়ায়। পাথর দিয়ে ঠুকে খোসা ভাঙার কায়দাও বানরের আয়ত্তাধীন। বহু জাতের বানর বুড়ো আঙুলের সাহায্যে খোসা ছাড়ায়, আঙুল দিয়ে কাঁটা তোলে কিংবা পরস্পরের পোকা উকুন বাছে। হাতের সাহায্যে তারা শত্রুকে লক্ষ্য করে পাথরও ছুঁড়ে মারতে পারে। তথাপি তাদের হাতের কাজ আনাড়ী ধরনের। সঠিক তাক করে ছুঁড়ে মারার ক্ষমতা তাদের নেই।

বানরের হাতের এই ধরনের কাজ করার ক্ষমতা মানুষের হাতের উন্নত অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় নয়। মানুষের হাতের নিপুণতার সঙ্গে বানরের হাতের কর্মদক্ষতার তুলনাই হয় না। বানরের চাইতে বহুগুণ উন্নত, অনেক বেশী নিখুঁত গড়নের হাত মানুষের। তবে যে নিখুঁত হাত দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করা যায় কিংবা তাক করে ঢিল কি বল্লম ছুঁড়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করা যায় সেই নিখুঁত হাত কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না যদি তাকে প্রতিনিয়ত চলাচলের কাজে কিংবা দেহের ভার বহনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ব্যবহারে হাতের স্পর্শশক্তি ভোঁতা হয়ে যায়। অথচ এই স্পর্শশক্তির উপরে হাতের সূক্ষ্ম ব্যবহার প্রধানতঃ নির্ভরশীল। কাজেই মানুষের হাত গড়ে তোলার জন্য প্রথমেই মানবাকার প্রাণীকে দ্বিপদত্বের গুণ অর্জন করতে হয়েছে। তার মানে চলাচলের জন্য দুই পায়ের উপর দেহভার বহন করার যোগ্যতা অর্জন করে দেহের উপরিভাগ আর হাত দুখানিকে মুক্তি দিতে হয়েছে। তার ফলে পদতল চ্যাপটা করতে হয়েছে। পায়ের বুড়ো আঙুলটিরও পরিবর্তন হয়েছে। আর পা দুখানি গ্রাহী গুণ হারিয়েছে।

॥ দ্বিপদত্ব অর্জন ॥

মানুষের পূর্বপুরুষরা যতদিন বৃক্ষাশ্রয়ী জীবনযাপন করেছে ততদিন হাতের বন্ধনমুক্তি ঘটেনি। কিন্তু ঐ জীবনেই হাত ও পায়ের মধ্যে খানিকটা কর্মবিভাগ দেখা দেয়। বৃক্ষাশ্রয়ী জীবনের প্রভাবে তাদের দেহের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন প্রান্তগুলি বিবিধ কাজ করার উপযোগী করে তুলতে হয়। গাছের ডালের উপর দিয়ে চলার সময় দেহের ভার প্রধানতঃ পশ্চাতের দেহপ্রান্তের উপর পড়ে। হাতের ব্যবহার হয় মুখ্যতঃ ধরার জন্য—খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য গ্রহণের জন্য। তারপর প্রধানতঃ ঝুলে ঝুলে চলবার অভ্যাস যখন দেখা দিল তখন সম্মুখের দেহপ্রান্ত আরও নিপুণ হয়ে উঠল। আরও বিশিষ্ট গুণ অর্জন করল।

কিন্তু প্রাইমেট্স শাখার প্রাচীনকালের এক বংশধর যখন জীবনযাত্রার পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে বৃক্ষাশ্রয়ী জীবন ত্যাগ করে মাটির বুকে নেমে এল তখন তার বৃক্ষচর জীবনের কর্ম-বিভাগগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠল। সমভূমির উপর চলাচলের জন্য হাত দুখানি নিয়োজিত রাখা নিতান্ত আবশ্যক নয়। তাই চলাচলের পূর্বাভ্যাস ত্যাগ করার সূচনা হয়। চলাফেরার জন্য হাত দুখানি নিযুক্ত না করে খাড়াভাবে চলার পদ্ধতি অবলম্বন করা হতে থাকে। চলাচলের অভ্যাসের এই পরিবর্তন বনমানুষ

থেকে মানুষে রূপান্তরিত হবার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে চলার জন্য হাতের বন্ধনমুক্তি ঘটেছে এবং তাকে নানাভাবে নানা কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে।

সমস্ত জীবিত বনমানুষ দুই পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারে। জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে ঐ ভাবে চলতেও পারে। তবে তাদের হাঁটার ভঙ্গীটি আনাড়ী ধরনের। এদের স্বাভাবিক চলার ভঙ্গীকে আধ-খাড়া ভঙ্গী বলা যেতে পারে। হাতও ব্যবহার করা হয় এইভাবে চলার জন্যে। তবে চার পায়ে চলার রীতি থেকে যেভাবে দুই পায়ে হাঁটার রীতি দেখা দিয়েছে, সেই ক্রমপরিবর্তনের পদ্ধতির সব কয়টি অন্তর্বর্তী পর্যায় এখনও বিভিন্ন শ্রেণীর বনমানুষের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এদের কোন শ্রেণীর মধ্যেই দুই পায়ে চলার ভঙ্গী কোনক্রমে কাজ চালাবার মত ব্যবস্থার স্তর অতিক্রম করেনি।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে হাতের উপর বিবিধ কার্যনির্বাহ করার দায়িত্ব অর্পিত না থাকলে এবং সেই দায়িত্ব ক্রমান্বয় বৃদ্ধি না পেলে খাড়াভাবে চলার রীতি কখনও আমাদের লোমশ পূর্বপুরুষদের মধ্যে চালু হতে পারত না। হাত ও পা আলাদা কার্যসাধনে নিয়োগ করার রীতি বনমানুষের মধ্যে প্রচলিত সে কথা ইতিপূর্বে খানিকটা বলা হয়েছে। বনমানুষ হাত দিয়ে মুখ্যতঃ খাদ্য ধরার ও খাদ্য সংগ্রহের কাজ করে। অনেক বানর হাতের সাহায্যে গাছের উপর বাসা বাঁধে। শিম্পানজি চাল পর্যন্ত তৈরি করতে পারে। বন্দীদশায় মানুষের অনুকরণে হাতের সাহায্যে এরা বেশ কয়েকটি কাজ করতে পারে। তথাপি মানব-সদৃশ অনুন্নত হাত আর মানুষের নিখুঁত হাতের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। শত সহস্র বছরের শ্রম নিখুঁতভাবে গড়েছে মানুষের হাত। তাই বনমানুষ আর মানুষের হাতের গড়ন সাধারণভাবে এক ধরনের হলেও অতি বর্বর মানুষের হাত দিয়ে যত রকম কাজ করা সম্ভব মানবাকার বানরের হাত দিয়ে তার অনুকরণ করা সম্ভব নয়। কোন বানরের হাতে কোন কালে খুব আনাড়ী ধরনের পাথুরে ছুরিও তৈরী হতে পারেনি।

কাজেই বনমানুষ থেকে মানুষে রূপান্তরিত হবার পথে অর্থাৎ শত সহস্র বছর ব্যাপী পরিবর্তনের কালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের মুক্ত হাতকে অতি সাধারণ কয়েকটি কার্যসাধনে নিয়োজিত করতে শিখেছিল। অতি বর্বর মানুষের হাতও পরিবর্তনকালীন প্রাণীর হাত থেকে অনেকগুণ উন্নত। মানুষের হাত দিয়ে যে সময় পাথুরে হাতিয়ার তৈরি করা গেছে তার আগেকার কালব্যাপ্তির তুলনায় ঐতিহাসিক কালব্যাপ্তি নগণ্য। তথাপি ঐ সময়েই চূড়ান্ত পদক্ষেপ করা হয়েছে—

হাত দুখানি মুক্তিলাভ করেছে। তারপর হাতের পক্ষে ক্রমান্বয় অধিকতর দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা অর্জনের সুযোগ দেখা দেয়। এই অর্জিত দক্ষতা আবার বংশগতিরূপে পুরুষানুক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে।

তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে মানুষের হাত শুধু শ্রমের বাহন নয়, শ্রমের সৃষ্টিও বটে। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট মতবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এফ. এঙ্গেল্‌স বলেছেন, মানুষের নিখুঁত হাত তৈরী হয়েছে শুধু শ্রমের জন্য। হাত দুখানি অনবরত নতুন নতুন কার্যসাধনে প্রয়োগ করে, তার মধ্য দিয়ে পেশী, সন্ধিবন্ধনী আর অস্থির উন্নতিবিধান করে এবং সেই অর্জিত গুণ বংশগতিরূপে আয়ত্ত করে ক্রমান্বয় উন্নত হতে হতে মানুষের হাতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই শ্রমের গুণে মানুষ নিজেকে প্রাণী-দশা থেকে মুক্ত করতে পেরেছে। প্রাগৈতিহাসিক মানবসদৃশ বানর ছিল পশু। শ্রম সেই পশুকে মানুষে রূপান্তরিত করেছে। এই কারণে মানুষ ও বানর সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হলেও মানুষের ক্রমবিকাশের পদ্ধতিটি অন্যান্য উচ্চতর বানরের ক্রমবিকাশের পদ্ধতি থেকে মূলতঃ ভিন্ন।

কিন্তু হাতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। হাত এক জটিল দেহতন্ত্রের অংশ মাত্র। কাজেই হাত যার ফলে উপকৃত হয়েছে তার ফলে সেই হাত যে দেহতন্ত্রের সেবক তারও উপকার হয়েছে। দুইভাবে হয়েছে এই উপকার।

জীববিকাশের বিধিবিধানের মধ্যে পারম্পর্যের সম্পর্কবিশিষ্ট বিকাশের একটি রীতি আছে। তার সহজ অর্থ এই যে কোন অঙ্গের পরিবর্তন হলে অপর একটি বা একাধিক অঙ্গের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। মানবাকার জীবের হাতের ক্রমোন্নতি এবং সেই সঙ্গে ঋজুভাবে চলার জন্য পায়ের পরিবর্তনও নিশ্চয়ই এই রীতি অনুসারে অন্যান্য অঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ডারউইন বলেছেন যে মানুষের পূর্বপুরুষ যত বেশী খাড়া হয়েছে, যত তার হাত গ্রাহীতা ও অন্যান্য কার্যসাধনের জন্য সংশোধিত হয়েছে, দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার এবং চলার জন্য যত তার পায়ের পরিবর্তন হয়েছে, ততই গোটা দেহতন্ত্রে অসংখ্য পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেজন্য শ্রোণীচক্র প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন, মেরুদণ্ডের বিশিষ্ট বক্রভাব প্রয়োজন, আর প্রয়োজন মস্তিষ্কটির পরিবর্তিত বিন্যাসের। মানুষের দেহে এই সব কয়টি পরিবর্তনের চিহ্ন আছে। এই কয়টি পরিবর্তন ছাড়া আরও বহু পরিবর্তনের লক্ষণ মানুষের দেহে আছে যা তার ঋজুতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে হয়। তবে তার মধ্যে কয়টি যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল আর কয়টি যে অঙ্গবিশেষের অতিরিক্ত ব্যবহারের বংশগত ফল কিংবা এক অঙ্গের উপর অন্য অঙ্গের প্রভাবের পরিণতি তা ঠিক বলা যায় না।

।। মুখমণ্ডলের পরিবর্তন ।।

অবাধে হাত ব্যবহার করার জন্য পরোক্ষভাবেও দেহতন্ত্রের উপর প্রভাব পড়েছে। মানুষের পূর্বপুরুষের খুব সম্ভবতঃ বড় বড় ছেদক দাঁত ছিল। কিন্তু যখন তারা শত্রুর বিরুদ্ধে পাথরের চাকা কিংবা অন্যান্য হাতিয়ার ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই তাদের চোয়াল আর দাঁতের ব্যবহার কমতে থাকে। এই অবস্থায় দাঁতসহ চোয়াল আকারে ছোট হয়ে আসবে। প্রাণী-জগতে এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত আছে। চোয়ালের পেশীর প্রভাবেই মানুষের করোটির সঙ্গে বনমানুষের করোটির এতটা পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই মানুষের পূর্বপুরুষের চোয়াল আর দাঁত যখন থেকে আকারে ছোট হতে আরম্ভ করেছে তখন থেকে তার করোটি আজকের দিনের মানুষের করোটির রূপ পেতে শুরু করেছে। আর দাঁত, বিশেষতঃ ছেদক দাঁত ছোট হয়ে আসার দরুন উপর ও নীচের চোয়াল বনমানুষের মত আটকে যাবার শঙ্কা আর রইল না। শুধু দাঁত কেন, পেশীগুলি পর্যন্ত ছোট করা সম্ভব হল। কাজেই নাক-মুখসহ মাথার উদ্গত অংশ সংকুচিত হয়ে মানুষের মুখমণ্ডলে পরিণত হল। আত্মরক্ষা আর আক্রমণের নানা কাজ থেকে চোয়াল আর তার সংশ্লিষ্ট অংশের অব্যাহতির অর্থ তাকে ললিতগুণসম্পন্ন অন্য কোন কাজে লাগাবার সুযোগ দেওয়া। কামড়াবার জন্য চোয়ালের পেশীগুলির আক্ষেপের প্রয়োজন হ্রাস পাওয়ায় পেশীগুলি অন্যদিকে উন্নত করা সম্ভব হল।

মুখগহ্বরের পেশীর পরিবর্তনের ফলে মানুষ তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ স্পষ্ট বাক্‌শক্তি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু এই গুণার্জনের পেছনে হাতের উন্নতির অর্থাৎ শ্রমের প্রচুর প্রভাব আছে বলে একদল পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করেছেন।

তাঁদের মতে, মানুষের বানরসদৃশ পূর্বপুরুষ দলবদ্ধভাবে বাস করত। প্রাণী-সর্গের মধ্যে সব চাইতে সামাজিক জীব মানুষ। এই মানুষ দলবদ্ধ জীব ছাড়া অপর কোন প্রাণীর বংশধারায় উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে করা যায় না। দলবদ্ধ বংশপতির সঙ্ঘপ্রিয় বংশধরের হাত যত উন্নত হতে থাকল তত তারা প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে থাকল। প্রতি নতুন অগ্রগতি তাদের জীবনের দিগন্ত প্রসারিত করতে লাগল। কারণ, প্রতিনিয়ত তারা প্রাকৃতিক বস্তুর অজ্ঞাত রহস্য উদ্ঘাটন করে যাচ্ছিল। অপরপক্ষে শ্রমের উন্নতির জন্য স্বভাবতই পারস্পরিক সাহায্য, যৌথ কর্মোদ্যম আর তার সুবিধার কথা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তার ফলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহচর্যের প্রবণতা দেখা দেয়। শ্রম তাদের সম্মিত হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে মানুষ হবার পথে মানুষের পূর্বপুরুষেরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়েছিল যখন পরস্পরকে জানাবার মত বক্তব্য তাদের মনে সঞ্চিত হয়েছে। এই জানাবার অনুপ্রেরণা ও আগ্রহ বাক্‌যন্ত্রের পরিবর্তনসাধনে সহায়তা করে। তার প্রভাবে মানুষের পূর্বপুরুষের স্বরযন্ত্র ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত এবং সুনিশ্চিতভাবে উন্নত হয়ে কালক্রমে স্পষ্ট অক্ষর উচ্চারণ করতে সক্ষম হল।

এঙ্গেল্‌স বলেছেন, বাক্‌শক্তির উৎপত্তির সঙ্গে শ্রমের এই সম্পর্কের যৌক্তিকতা অপরাপর প্রাণীর শব্দোচ্চারণের দৃষ্টান্তের সঙ্গে তুলনা করলে সুসঙ্গত বলে মনে হয়। শব্দোচ্চারণের ক্ষমতা বহু প্রাণীর আছে। স্বকীয় চিন্তাশক্তির গণ্ডীর মধ্যে মনের ভাব প্রকাশের জন্য স্পষ্ট বাক্‌শক্তির প্রয়োজন তাদের হয় না। প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত কোন প্রাণী কথা বুঝতে না পারার অসামর্থ্যের জন্য অসুবিধা বোধ করে না। মানুষের কথা না-বোঝার জন্যও তাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু বন্যজন্তু যখন মানুষের সাহচর্যে বাস করে তার তখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের অনুষঙ্গে এসে কুকুর বা ঘোড়ার শ্রুতিশক্তি এমনভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠে যে অনেক কথার অর্থ তাদের বোধগম্য হয়। তাছাড়া মায়া-মমতা কিংবা কৃতজ্ঞতার মত মানসিক বৃত্তিও তাদের মধ্যে স্ফুরিত হয়। এই সব বৃত্তির অস্তিত্ব বন্যজীবনে থাকে না। তবু তারা কথা বলতে পারে না। কারণ তাদের স্বরযন্ত্র এমন বিশেষ গুণসমন্বিত হয়ে পড়েছে যে তার সাহায্যে স্পষ্ট বাক্যোচ্চারণ করা অসম্ভব। অথচ স্বরযন্ত্র এইভাবে বিশেষিত না হলে মনুষ্যেতর প্রাণীও যে কথা বলতে পারে তার প্রমাণ ময়না আর কাকাতুয়া।

।। মস্তিষ্কের বাড়তি ।।

দেহতন্ত্রের প্রতিটি পরিবর্তন পরস্পরকে শক্তিশালী করে—ক্রমবিকাশের পারম্পর্যের রীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের পরিবর্তন উদ্দীপিত করেছে—মস্তিষ্কের বাড়তির সহায়ক হয়েছে।

গাছে গাছে বাস করার অভ্যাস হ্রাস পেয়েছিল ভূমিবাসে। তার ফলে দৃষ্টি-শক্তির একাগ্রতা, চিন্তা ও কার্যের দ্রুততা আর প্রতিনিয়ত সতর্ক থাকার প্রয়োজন হ্রাস পেল। ভূমিচারী জীবনের বিপদ এড়াবার জন্য দেখা দিল পারস্পরিক সাহচর্য আর পারস্পরিক সহযোগের প্রবণতা। তাছাড়া খাদ্য

বিষয়ে সর্বাশী স্বভাব গড়ে উঠল এই জীবনে। মানবাকার প্রাণী যেদিন তার পুরোপুরি ফলাশী স্বভাব ত্যাগ করে খাদ্যের জন্য শিকার করতে আরম্ভ করল সেইদিন থেকে তার মধ্যে পর্যবেক্ষনের ক্ষমতা আর কৌশলী স্বভাব গড়ে ওঠার সূত্রপাত হয়। সর্বাশী অভ্যাস তার দেহতন্ত্র আর মস্তিষ্কের উন্নতির বিশেষ সহায়ক হয়।

বিভিন্ন মানসিক শক্তি যত উন্নতিলাভ করেছে তত মস্তিষ্ক বড় হয়েছে। গরিলা বা শিম্পানজির মাথার আকারের সঙ্গে দেহের আকারের তুলনা করলে দেখা যায় যে দেহের অনুপাতে মানুষের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত বড়। এই আনুপাতিক বড়ত্ব আবার উচ্চতর মানসিক শক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অবশ্য শুধুমাত্র বড় মাথা হলেই সেটি মানুষের মাথা হয় না। করোটির আয়তন থেকে কোন দুটি প্রাণী অথবা মানুষের বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় না। যা হোক, মানুষের মস্তিষ্ক আর করোটির ক্রমবর্ধমান ওজন সুনিশ্চিতভাবে শিরদাঁড়ার বিকাশ প্রভাবিত করেছে—বিশেষতঃ মানুষের দ্বিপদত্ব আর খাড়াভাব অর্জনের সময়। দেহতন্ত্রের এই পরিবর্তনের সময় মস্তিষ্কের আভ্যন্তরিক চাপ অবশ্যই করোটির আকার পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করেছে।

মানুষের মস্তিষ্কের বাড়তি আবার তার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের দীর্ঘতর অসহায় অবস্থার পর্যায়ের সঙ্গে—তার শৈশবের সঙ্গে সংযুক্ত।

লেজওয়ালা বানর আর লেজহীন বনমানুষের পর্যায়ের মধ্যে দেহতন্ত্রের সাধারণ বাড়তির গতি মন্থর হয়েছে। সাধারণ লেমুর জাতের বানর যৌনজীবনে সাবালকত্ব অর্জন করে মাত্র চার-পাঁচ বছর বয়সে। সাড়ে পাঁচ মাস সন্তান গর্ভে ধারণ করে বানরী। তিন থেকে সাড়ে তিন মাসের মধ্যে বানরশিশুর দাঁত ওঠে। আবার বছর খানেকের মধ্যেই সেই দাঁত পড়ে গিয়ে নতুন দাঁত গজায়। মানব-শিশুর দাঁত উঠতে লাগে আঠারো মাস। বনমানুষের বাড়তির ধরন অনেকটা মানুষের মত। শিম্পানজির মত ছোট প্রাণীর গর্ভধারণের কাল আট মাস। চৌদ্দ মাস থেকে আঠার মাস অবধি সন্তান লালন করে শিম্পানজি। শাবকের প্রথম দাঁত পড়ে গিয়ে নতুন দাঁত ওঠে তিন-চার বছর বয়সে। তার মানে মানব-শিশু থেকে মাত্র বছর দুয়েক আগে। শিম্পানজির দেহে যৌবন-লক্ষণ দেখা দেয় আট থেকে দশ বছরের মধ্যে। গ্রীষ্মাঞ্চলের মানুষের মধ্যে যৌবনোদ্‌গমের বয়স এই বয়স থেকে সামান্য বেশী। এদের আয়ু সম্বন্ধে বেশী তথ্য জানা যায়নি। অনুমান করা হয় যে লেজওয়ালা বানর বাঁচে কয়েক দশক। শিম্পানজির আয়ু

প্রায় মানুষের মত। গরিলারা শতায়ু হলে একজন বিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার সম্ভাবনা কম।

বাড়তির মন্থরগতি মস্তিষ্কের বাড়তির সহায়ক। তাতে শিক্ষা গ্রহণের সময় দীর্ঘতর হয়। মানুষ আরও এক ধাপ এগিয়েছে। মানবশিশুর বাড়তির গতি আরও মন্থর। তার অসহায় অবস্থার মেয়াদ আরও দীর্ঘ। অপরিণত অবস্থা দীর্ঘতর হওয়ায় শুধুমাত্র দৈহিক বংশগতির প্রভাবের আওতায় মানবশিশুর ক্রমবৃদ্ধি সমাপ্ত হয় না। প্রাকৃতিক আর সামাজিক প্রতিবেশের অভিজ্ঞতাও বাড়তির পথে তাকে প্রভাবিত করে। সেই কারণে তার মস্তিষ্কের ক্ষমতা অনেক বেশী উন্নত ও বুদ্ধিদীপ্ত হয় বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

উচ্চতর পর্যায়ের প্রাণীর শিশুকালীন অপরিণত অবস্থা কিন্তু দেহতন্ত্রের কোন গুরুতর অপূর্ণতার মধ্যে প্রকাশ পায় না। মাংসাশী জন্তু, বনমানুষ অথবা মানুষের সন্তান কোন কোন নিম্ন পর্যায়ের মেরুদণ্ডী প্রাণীর নবজাত সন্তানের আকারে অর্থাৎ লার্ভা'র (শূয়া) মত ভূমিষ্ঠ হয় না। সামান্য গুটিকয়েক খুঁটিনাটি বিষয় ছাড়া জনকজননীর আকার অবয়ব নিয়েই তারা জন্মগ্রহণ করে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-পদ্ধতিও জনকজননীর অঙ্গের মত থাকে। ব্যতিক্রম থাকে মাত্র দুটি ক্ষেত্রে—জননতন্ত্র আর কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে। যৌবনকাল না আসা পর্যন্ত জননতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ বিলম্বিত হয়। শৈশবে দেহতন্ত্রের মধ্যে যত পরিবর্তন সাধিত হয় তার মধ্যে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের গঠনবিধির পরিবর্তন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। শাকাশী প্রাণীর সন্তান পূর্ণ বিকশিত কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাই জন্মের অব্যবহিত পরে তারা বেশ চটপটে হয়ে ওঠে। মাংসাশী প্রাণী, বনমানুষ আর মানবসন্তানের মস্তিষ্ক বিভিন্ন উপাদানের সংযোগে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয় বলে তাদের শিশু কিছুকাল অসহায় অবস্থায় থাকে। এক বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেছেন যে মানুষ, কুকুর, বিড়াল কি ইঁদুর জাতীয় প্রাণী অর্থাৎ যারা অসহায় অবস্থায় সন্তান প্রসব করে— তাদের সন্তানের মস্তিষ্কের নার্ভগ্রন্থি (গ্যাংগ্লিয়ন সেল) জন্মলগ্নে পুরোমাত্রায় বিকশিত হয় না,— এমন কি তার অব্যবহিত পরেও অপূর্ণ থাকে। অথচ ঘোড়া, গরু, ভেড়া কিংবা গিনিপিগের বাচ্চার গ্যাংগ্লিয়ন সেল জন্মলগ্নের আগেই মস্তিষ্কের সর্বত্র পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে মানবশিশুর মস্তিষ্কের জন্মকালীন অপূর্ণতা অনেক বেশী স্পষ্ট। মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের সেরিব্রাল কোরটেক্স নামক অংশে পিরামিড আকারের কতকগুলি কোষ থাকে। মানবশিশুর জন্মলগ্নে এই কোষগঠনের পদ্ধতি অর্ধেকের বেশী সম্পূর্ণ হয় না। মস্তিষ্কের বাড়তি অবশ্য অন্যান্য অঙ্গ অথবা কলার মত শুধু

কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে হয় না। মস্তিষ্কের বিকাশমান কোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে মস্তিষ্কের মধ্যে যে ক্রিয়াপদ্ধতি চালু করে দেয় সেই ক্রিয়াপদ্ধতি বৃদ্ধি পাবার ফলে মস্তিষ্কের ক্রমবৃদ্ধি ঘটে।

দেহের অন্যান্য অংশের তুলনায় মস্তিষ্কটি জন্মলগ্নে অপেক্ষাকৃত বড় ও ভারী থাকে। শৈশবে যতটা বড় আর ভারী থাকে পরিণত বয়সে দেহের অনুপাতে ততটা ভারী বা বড় থাকে না। কিন্তু জন্মের পর মস্তিষ্কের বাড়তি অপর যে কোন অঙ্গের চাইতে দ্রুত হয়। নবজাতকের দেহের ওজন প্রথম তিনমাস বয়সের মধ্যে এক পঞ্চমাংশের বেশী সাধারণতঃ বাড়ে না। কিন্তু মস্তিষ্কের ওজন ঐ সময়ের মধ্যে শতকরা নব্বুই ভাগ বাড়ে। নয়মাস বয়সের মধ্যে মস্তিষ্কের ওজন দ্বিগুণ হয়, তিন বছরের মধ্যে হয় তিনগুণ। কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কিংবা পুষ্টির জন্য দেহের অন্যান্য কলার বৃদ্ধি হয়। কিন্তু মস্তিষ্কের বাড়তি সে ভাবে হয় না। এই বাড়তি সম্পূর্ণভাবে বৃত্তিগত—ফাংশনাল। অভিজ্ঞতা আর শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাবে এই বাড়তি হতে থাকে। ইন্দ্রিয়স্থান, চোখ কি কান যদি বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা যদি এই সব ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে—মস্তিষ্কের বাড়তিও তাহলে বাধা পাবে। কোন শিশু যদি কালপূর্ণ হবার আগে প্রসূত হয় তাহলে তার মস্তিষ্কের বাড়তির গতি দ্রুততর হবে।

তার অর্থ তাহলে এই দাঁড়ায় যে মস্তিষ্কের বাড়তি শিশুকালীন অপরিণত অবস্থা দীর্ঘ হওয়া—বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। মানুষের মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে এ দুটি জিনিস মৌলিক শর্তের মত। দেহের খাড়াভাব অথবা অপর যে কোন জৈবিক বিশিষ্টতার চাইতে এই দুটি শর্তের প্রভাব মস্তিষ্কের বাড়তির পক্ষে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

সন্তানের অসহায় অবস্থার মেয়াদ দীর্ঘ হলে জননীর পক্ষে দলের সঙ্গে ছুটে বেড়ান কষ্টকর। তার ফলে সাময়িকভাবে বাসা বাঁধার আবশ্যকতা দেখা দেয়। পুরুষ আর নারীর মধ্যে কর্মবিভাগের প্রয়োজনও উপস্থিত হয়। পুরুষ শিকার করে, নারী আগলায় নীড়। সন্তানের সঙ্গে জননীর সম্পর্ক তার ফলে নিবিড় হয়। সেই সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের কাল যেমন দীর্ঘ হয়, তার আবশ্যকতাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনও মস্তিষ্কের বাড়তির বিশেষ সহায়ক হয়েছে। মানুষের বানর-কুলপতি যখন বৃক্ষলগ্ন জীবনযাপন করত তখন সে প্রধানতঃ ফলাশী ছিল। কিন্তু অরণ্যের আয়তন হ্রাস পাওয়ায় এবং সংখ্যা-বৃদ্ধি হেতু বৃক্ষজাত খাদ্য সকলের পক্ষে পর্যাপ্ত না হওয়ায় মানবসদৃশ বানরকে যখন মাটিতে নেমে আসতে হল তখন

তাকে ফলের সঙ্গে নানা জাতের মূল, এমন কি ছোটখাট প্রাণীর মাংস খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে। খাদ্যাভ্যাসের এই পরিবর্তনের পরিণতি ভাল হয়েছে। বহুবিধ খাদ্য গ্রহণ করায় রূপান্তরের পদ্ধতি সহজ হয়েছে। খাদ্যের মারফত বিবিধ রস দেহের মধ্যে প্রবেশ করায় মানবাকারে রূপান্তরের রাসায়নিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে। নানা খাদ্যের প্রভাবে রক্তের রাসায়নিক সংযুতি পরিবর্তিত হয়েছে আর গোটা দেহতন্ত্র ক্রমে ক্রমে বদলে গেছে।

মস্তিষ্কের উন্নতির পক্ষে মাংসাহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যেদিন শিকার করতে আর মাছ ধরতে আরম্ভ করল সেদিন থেকে তার নিরামিষাশী খাদ্যের সঙ্গে আমিষ সুনিশ্চিতভাবে যুক্ত হল। দেহতন্ত্রের বিপাকের পক্ষে যে সব উপাদান একান্ত প্রয়োজন মাংসের মধ্যে তার প্রায় সব কয়টি উপাদান তৈরী অবস্থায় পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সঙ্গে মাংসাহার মানুষের পূর্বপুরুষের দেহে প্রভূত শক্তিসঞ্চার করেছে এবং তাকে স্বাধীনতা দিয়েছে। মাংসাহারের ফলে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের পুষ্টি ও উন্নতির জন্য যে সব উপাদান আবশ্যক মাংসের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে সেই সব উপাদান বিদ্যমান। কাজেই মস্তিষ্ক আগের চাইতে অনেক দ্রুত উন্নতিলাভের সুযোগ পেয়েছে।

মস্তিষ্কের উন্নতির পাশাপাশি তার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ইন্দ্রিয়স্থানের উন্নতি হয়েছে। বাক্‌শক্তির ক্রমোন্নতি স্বভাবতই যেমন শ্রুতিশক্তির অংশের উন্নতিবিধান করে, সামগ্রিকভাবে মস্তিষ্কের উন্নতিও তেমনি সর্বেন্দ্রিয়ের উন্নতি-সাধন করেছে। ঈগল পাখীর দৃষ্টিশক্তি মানুষের চাইতে অনেক দূরপ্রসারী। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি যে কোন বস্তুর মধ্যে যত গুণ লক্ষ্য করতে পারে ঈগলের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক কম। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি মানুষের ঘ্রাণশক্তির চাইতে অনেক তীক্ষ্ণ। কিন্তু মানুষ যেমন গন্ধের সামান্য ইতরবিশেষ থেকে বিভিন্ন দ্রব্য চিনতে পারে কুকুর তা পারে না। অতটা পার্থক্যবোধ তার নেই। বনমানুষের স্পর্শশক্তি বোধ নিতান্ত প্রাথমিক পর্যায়ের। কিন্তু মানুষের স্পর্শশক্তি বোধ শ্রমের মাধ্যমে হাতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চরমে উঠেছে।

।। লোমহীনতার কারণ ।।

লোমহীনতা মানুষ ও নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বাহ্য পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। তিমি বা হিপ্পোপটেমাস জাতীয় জলচর স্তন্যপায়ীর দেহে লোম নেই। তার জন্য তাদের পক্ষে জলের মধ্যে চলাচল করার সুবিধা হতে পারে। এদের দেহে চর্বির যে পুরু পরদা আছে তার জন্য দেহের উত্তাপ হ্রাস পাবার

সম্ভাবনা কম। এই চর্বিই সীলমাছ বা উদ্‌বিড়ালের গায়ে পশমের কাজ করে। হাতি আর গণ্ডারের দেহও প্রায় লোমহীন। অথচ এই প্রজাতি দুটি সাবেককালে যখন মেরু অঞ্চলের আবহাওয়ায় বসবাস করত তখন তাদের দেহে ঘন লোমাবরণ ছিল। এ থেকে মনে করা হয় যে গ্রীষ্মমণ্ডলে বসবাস করতে এসে এরা গায়ের লোম হারিয়েছে। ভারতের সমভূমিতে যে সব হাতি বসবাস করে তাদের চাইতে পাহাড়ের ঠাণ্ডা অঞ্চলে বসবাসকারী হাতি বেশী লোমশ। এই পার্থক্য থেকে যুক্তিটি সত্য বলে মনে হয়। তদনুযায়ী মনে করা হয় যে মানুষের আদি বাস গ্রীষ্মাঞ্চলে ছিল বলে তার মধ্যে লোমহীনতা দেখা দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলা হয় যে পুরুষের মুখ ও বুকে আর স্ত্রী-পুরুষের ধড়ের সন্ধি-স্থানে লোমের প্রাচুর্য এখনও আছে। মানুষের পূর্বপুরুষ যখন চতুর্ভুজ ছিল ধড়ের এই সব সন্ধিস্থানে সৌরতাপ তেমনভাবে লাগতে পারত না। কিন্তু এই যুক্তি দিয়ে মাথার চাঁদিতে চুলের অস্তিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। চতুর্ভুজ থাকার সময়েও সৌরতাপ সেখানে লেগেছে আবার দ্বিপদ হওয়ার সময়েও লেগেছে। অথচ লোমাবরণ সেখানে আগেও ছিল, এখনও আছে। কাজেই সৌরতাপের প্রভাবে লোমহীনতা দেখা দেবার যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

লোমহীনতার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে ডারউইন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে অলঙ্করণের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নর, বিশেষতঃ নারীর দেহে লোমহীনতার উদ্ভব হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে প্রাইমেট্‌স পর্যায়ের অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে লোমহীনতার দিক থেকে মানুষের পার্থক্য তেমন বিস্ময়কর মনে হবে না। কেন না যৌন নির্বাচনের প্রভাবে যে সব বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয় তার জন্য অতি ঘনিষ্ঠ জীবের মধ্যেও বিস্ময়কর পার্থক্য দেখা দেয়।

বলক্ নামে এক ওলন্দাজ বিজ্ঞানী কিন্তু লোমহীনতার কারণ সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বনমানুষের ভ্রূণ একটি পর্যায়ে প্রায় লোমহীন থাকে। প্রথম কেশভার ঝরে যাবার পর মাথার চাঁদিতে কয়েক গুচ্ছ লোম ছাড়া সর্বাঙ্গে কোথাও লোম থাকে না। তাঁর মতে, বনমানুষের পরিণত ভ্রূণের এই সাময়িক অবস্থাকে স্থায়ীরূপ দেবার কৃতকার্যতা থেকে মানুষের দেহে লোমহীনতার উদ্ভব হয়েছে। এই ধরনের বিশিষ্ট লক্ষণের এক দীর্ঘ তালিকা তৈরি করে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বনমানুষের পরিণত ভ্রূণের বিভিন্ন অবস্থা মানুষের অভিব্যক্তিতে স্থায়ী রূপ পেয়েছে।

এই ধরনের রীতির দৃষ্টান্ত প্রাণীসর্গে বিরল নয়। মেক্‌সিকোর সালামান্দার জাতীয় একপ্রকার সরীসৃপ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেঙাচির লক্ষণ এক্‌সোলোটল

নামে এই সরীসৃপের দেহে স্থায়ী রূপ পেয়েছে। মানুষের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তার মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ বলয়ের বর্ধিত আকারের কারণ এই বিকাশ-পদ্ধতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে মানুষের বাড়তির মন্থর গতি করোটির হাড় জোড়া লাগার সময় বিলম্বিত করেছে। তাতে ভূমিষ্ঠ হবার পরেও মস্তিষ্কের বাড়তির সুযোগ পাওয়া গেছে। সে যাই হোক, ভ্রূণাবস্থার বিভিন্ন পর্যায় যে মানুষ গড়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে একথা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। লোমহীনতা সেই প্রভাবের অন্যতম পরিণতি। বাস্তব সুবিধা আর কান্তিবোধ উভয় দিক থেকে এই পরিণতির তাৎপর্য দূরপ্রসারী।

এইভাবে মানুষের মধ্যে এমন একটি প্রাণীর বিকাশ হল যে বুড়ো হয় না। শুধু শৈশব নয়, মানুষের পরনির্ভরতার কালও দীর্ঘতর। জীবনের এক দীর্ঘ অধ্যায় কেটে যায় শিক্ষা গ্রহণে। অতি বর্বর মানুষ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। শিশুসুলভ কৌতূহল, খেলা-ধূলার আকাঙ্ক্ষা আর সব কিছু পরীক্ষা করে দেখার নেশা লোমহীনতার মত মানুষের আজীবনের সঙ্গী। এক্‌সোলোটলের দৈহিক অবস্থা মানুষের মানসিক অবস্থার সমতুল। এক্‌সোলোটলের শৈশবের চিহ্ন তার আজীবনের সঙ্গী; আর মানুষের শৈশব বাসা বেঁধেছে তার মনে। চিরস্থায়ী যৌবন এই মনোরাজ্যের অধীশ্বর। এই মানসিক অবস্থাই মানুষের মধ্যে মানবিকতা সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে।

লাঙ্গুলহীনতাও মানুষের অন্যতম দৈহিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়। মানুষের নিকটতম পূর্বপুরুষ মানবাকার বানরের মধ্যেই লাঙ্গুলহীনতা দেখা দেয়। মানুষ হবার আগেই মানুষ লেজ হারিয়েছে। তবে বাহ্যত লেজ না থাকলেও লেজের অস্তিত্ব মানুষের দেহতন্ত্রে আছে। মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তের অনুত্রিকাস্থি তার সাক্ষী। কিন্তু সেই সাক্ষীর আর কোন কার্যসাধকতা নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষের পূর্বপুরুষের যদি লেজ থেকে থাকে তাহলে সেই লেজ ক্ষয়প্রাপ্ত হল কি করে। এ সম্পর্কে ডারউইনের মত যে হাস্যকর বলে বিবেচিত হতে পারে এই শঙ্কা তিনি নিজেই করেছিলেন। তথাপি তিনি বলেছেন, শত শত বৎসরব্যাপী ঘর্ষণের ফলে লেজের গোড়ার প্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মানুষ আর বনমানুষের মধ্যে লাঙ্গুলহীনতা দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে গোড়ার অংশটুকু রূপান্তরিত এবং সঙ্কুচিত হয়ে দেহের খাড়া অথবা আধখাড়া অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মত উপযোগী হয়েছে।

মানুষের দেহতন্ত্র গড়তে গিয়ে ক্রমবিকাশের ধারা মোটামুটি এইভাবে পরিচালিত হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন। তবে পুরাকালের মানুষের খুব বেশী জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি। যে কয়টির সন্ধান মিলেছে তা থেকে মনে হয়, মানুষ গড়তে গিয়ে অভিব্যক্তির ধারা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়ে শেষ অবধি মানবদেহ সৃষ্টি করেছে। তাই আমরা দেখি যে আদিমতম মানবাকার কিংবা অর্ধ-মানবাকার জীবাশ্মের কোনটির থুতনি, চোয়াল আর দাঁত অবিকল বনমানুষের মত কিন্তু মস্তিষ্কের আধারটি মানবীয়। আবার কোন জীবাশ্মের মুখাবয়ব আর দাঁত মানবাকার হলেও মস্তিষ্কটি ছোট। কোনটির চোয়াল বিরাটাকার হলেও দাঁত মানবসদৃশ। দুটি জীবাশ্মের মস্তিষ্ক আকারে-আয়তনে বড় হলেও ভুরু মানবসদৃশ নয়। আর একটি জীবাশ্মের পা ঋজু। কিন্তু তার চাইতেও প্রাচীন একটি জীবাশ্ম আধুনিক মানুষের মত খাড়া বলে মনে হয়।

অশ্বের বিভিন্ন শাখার অভিব্যক্তির বৃত্তান্তে দেখা যায় যে কোনটি দাঁত, কোনটি পায়ের খুর, আবার কতকগুলি খুর ও দাঁত এই উভয় অঙ্গ উন্নত করে ক্রমবিকাশের পথে এগিয়েছে। বানরাকার কুলপতি সৃষ্টি করতে গিয়ে আমাদের দাঁত, গ্রীবা, পা, মুখমণ্ডল, ভুরু এই সব কিছুর উন্নতি করতে হয়েছে। আদি মানুষের জীবাশ্মের মধ্যে এই সার্বিক উন্নতির আভাস পাওয়া যায়। তবে এই প্রয়াস সার্থক হয়ে আধুনিক মানুষ খুব বেশী দিন সৃষ্টি হয়নি। তার আগে যারা ছিল তারাও মানুষ। স্বহস্তে তারা হাতিয়ার তৈরি করেছে। শ্রমের সাহায্যে নিজেদের তারা প্রাণী-দশা থেকে মুক্ত করেছে। তবু আধুনিক মানুষের জাতিরূপ সৃষ্টি হয়েছে মাত্র হাজার বিশেক বছর আগে।

মানসিক শক্তি

দেহলক্ষণের সাদৃশ্য ও সমধর্মিতা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে জীবনবিকাশের ছেদহীন ধারায় ক্রমপরিবর্তনের পথ বেয়ে প্রাণিরাজ্য থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু মানসিক শক্তি মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ। যে দ্বিপদ খাড়া প্রাণীটি মানুষ নামে পরিচিত তার মানবত্বের দাবির পেছনে এই সম্পদের তাৎপর্য অপরিসীম। মানুষের এই বিশিষ্ট গুণের পেছনে যদি ক্রমবিকাশের ইতিহাস থাকে, মানবেতর প্রাণীর মধ্যে যদি এই শক্তির অস্তিত্ব থাকে এবং সেই শক্তি যদি মূলতঃ ভিন্ন প্রকৃতির না হয় তাহলে ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষের উদ্ভবের সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের মানসিক শক্তির পার্থক্য এমন বিপুল বিস্ময়কর যে এই শক্তির ক্রমবিকাশের কোন ইতিহাস আছে বলে মনে করা কষ্টকর।

ক্রমবিকাশের তত্ত্ব প্রথম যখন আবিষ্কৃত হয়, প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে মানবজাতির বিকাশের তথ্য ও প্রমাণের দিকে তখন বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়েছিল। ডারউইন তাঁর আলোচনা মুখ্যতঃ জৈবিক ক্রমবিকাশের মধ্যে নিবদ্ধ রেখেছিলেন। এই তত্ত্বের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত অর্থাৎ মানুষের মনের বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত কোন আলোচনা তিনি করেননি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতি সম্পর্কে ডারউইনের সহ-আবিষ্কারক মিঃ ওয়ালেস মনের বিকাশ প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতি প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তথ্য ও প্রমাণের চাপে সেকালে একদল পণ্ডিত জীবকোষের নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশ এবং দেহতন্ত্রের ক্রমপরিবর্তনের তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন সত্য; কিন্তু মানুষের উদ্ভব প্রসঙ্গে এই তত্ত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও মানুষের মন সম্পর্কে ক্রমবিকাশের যুক্তি মেনে নিতে তাঁরা কুণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের যুক্তি মেনে নেবার 'অলঙ্ঘ্য বাধা' আছে বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

ডারউইন তাঁর উত্তরকালীন লেখায় অবশ্য এই সংশয়ের জবাব দিয়েছেন। সংশয়বাদীদের সিদ্ধান্তগুলি যে তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয় এই মৌলিক সত্য তিনি

প্রত্যয়যোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর মানসিক শক্তি সম্পর্কে তাঁর তুলনামূলক আলোচনার চাইতে বিস্তারিত আলোচনা অদ্যাপি হয়নি। কি কি কারণে মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ হতে পারে অর্থাৎ খাড়াভাবের গুরুত্ব, হাত ব্যবহারের তাৎপর্য, ফলাশী থেকে মাংসাশী হওয়ার গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা অবশ্যই হয়েছে; কিন্তু জৈবিক ক্রমবিকাশের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অর্থাৎ মানুষের মনের বিকাশ সম্পর্কে ডারউইনের বক্তব্যের উপর খুব বেশী নতুন কথা শোনা যায়নি।

ডারউইন তাঁর আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে মানুষের মানসিক শক্তির মধ্যে এমন শক্তি নেই বললেই চলে যার অস্তিত্ব প্রাণিকুলের মধ্যে অঙ্কুরিত অবস্থায় নেই, অথবা সদৃশ প্রবণতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেনি। বিভিন্ন প্রাণীর আচার-আচরণ ও বিভিন্ন প্রবণতা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে মানসিক শক্তি মানুষের মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করলেও এই শক্তি শুধুমাত্র তার একান্ত নিজস্ব সম্পদ নয়। মানুষের মানসিক শক্তির মূল প্রকৃতির মধ্যে অন্যনিরপেক্ষ কোন মৌলিক বিশিষ্টতা নেই। বরং যুক্তি ও তথ্যের বলে তিনি প্রমাণ করেছেন যে মানবেতর প্রাণীর মানসতার সঙ্গে মানুষের মানসতার কতকগুলি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সমধর্মিতা আছে। তিনি বলেছেন:

> মানবেতর প্রাণীর মধ্যে মানসিক শক্তির অস্তিত্ব যদি একেবারে না থাকত, কিংবা তাদের মানসিক শক্তি যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হত তাহলে মনে করা যেত যে মানসিক শক্তির পেছনে ক্রমবিকাশের কোন ইতিহাস নেই। তেমন মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর মানসিক শক্তির মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু পার্থক্যের বিপুলতাকে ডারউইন মৌলিক পার্থক্যের প্রমাণ বলে গণ্য করেননি। মানুষ আর বনমানুষের মানসিক শক্তির পার্থক্য যেমন বিপুল, তেমন বনমানুষ আর নিম্নতর পর্যায়ের মাছের মানসিক শক্তির পার্থক্যও বিশাল। তাছাড়া এই পার্থক্য যে শুধুমাত্র বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যেই আছে তা নয়, সমজাতের প্রাণীর মধ্যেও এই পার্থক্য আছে। সামান্য ত্রুটির জন্য যে মানুষ অবলীলাক্রমে পাহাড়ের চূড়া থেকে নিজের সন্তানকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করতে পারে, কিংবা যে বর্বর মানুষ অবাধে নরমুণ্ড শিকার করে, তার সঙ্গে সুসভ্য মানুষের নীতিবোধের পার্থক্য নেই কি? যে সব বর্বর মানুষ শুধুমাত্র চার পর্যন্ত গণনা করতে পারে, কোন বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা যাদের নেই, তাদের সঙ্গে নিউটন বা আইনস্টাইন, সেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিগত পার্থক্যের বিপুলতা অস্বীকার

করা যায় কি ? অথচ এই পার্থক্য সত্ত্বেও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে অসভ্য বর্বর মানুষের মানসিক শক্তির সঙ্গে সুসভ্য সুশিক্ষিত সাধারণ মানুষের মানসিক শক্তির মূলগত মিল আছে। আদিম ফিজিদ্বীপবাসীরা আধুনিক যুগের সবচেয়ে বর্বর মানুষ বলে গণ্য হয়। তবু তাদের মানসিক শক্তির সঙ্গে সাধারণ সভ্যমানুষের মানসিক শক্তির বহু মিল আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিমানব গোষ্ঠীর মানবিক শক্তির যে পরিচয় বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার প্রভৃতি প্রস্তুতির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে জোর করে একথা বলা যায় না যে তাদের মানসিক শক্তি মূলতঃ আধুনিক যুগের সাধারণ মানুষের চাইতে খুব নিকৃষ্ট ছিল। মানবেতর প্রাণীর মানসতার বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় যে মানুষের সঙ্গে তাদের মানসিক শক্তির বহু ক্ষেত্রে মৌলিক সমধর্মিতা আছে। কাজেই বাহ্য পার্থক্যের অন্তরালের মৌলিক সমধর্মিতা প্রমাণ করে যে মানসিক শক্তিরও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে এবং 'অগণিত সূক্ষ্ম পর্যায় একের সঙ্গে অন্যের মানসিক ব্যবধানের মধ্যে সেতু রচনা করেছে।'

মনোবিদ্যা সম্পর্কে যাঁদের মতামত আজকাল প্রামাণ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে, ডারউইনের সিদ্ধান্তের মৌলিক সত্যতা তাঁরা অস্বীকার করেন না। আধুনিক যুগের বহু মনোবিদ্যাবিদ্ এই দাবি করে থাকেন যে ক্রমবিকাশের নীতি জীববিদ্যার ক্ষেত্রে যতটা আলোকপাত করেছে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে তার চাইতে নেহাত কম আলোকপাত করেনি। তাঁরা স্বীকার করেন, প্রাণীসর্গের সর্বজৈবিক মৌলিক আবেগ আর প্রাণিকুলের আচরণ-নিয়ামক সহজ প্রবৃত্তির উপর মানুষের মনের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

মানুষের মনের মূলভিত্তি সম্পর্কে এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও আধুনিক মনোবিদ্যাবিদেরা স্বীকার করেন না যে প্রাণীর মানসতার সঙ্গে মানুষের মানসতার পার্থক্যের সবটা মাত্রাগত। প্রাণিকুলের মধ্যে যে সব মানসিক শক্তি অঙ্কুরিত অবস্থায় আছে, কিংবা তাদের আচার-আচরণের মধ্যে যে ধরনের প্রবণতার আভাস পাওয়া যায়, মানুষের মধ্যে সেই সব শক্তি চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে এবং তার ফলে উভয়ের মানসতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে—মানুষের মানসতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্ত তারা যথেষ্ট বলে গণ্য করেন না। ডারউইন বলেছেন উচ্চ পর্যায়ের বনমানুষের সঙ্গে মানুষের মানসতার কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। এই সিদ্ধান্তও সর্ববাদীসম্মত নয়। আধুনিক মনোবিদ্যাবিদ্‌দের মধ্যে অনেকের মতে মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মানসতার মধ্যে যেমন মাত্রাগত প্রভেদ আছে তেমন খানিকটা প্রকারগত প্রভেদও আছে। এই

দুই ধরনের প্রভেদ মিলিয়ে মানবেতর প্রাণী ও মানুষের মানসতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এই পণ্ডিতমহলের মতে মানবমনের ধারণাশ্রয়ী চিন্তাশক্তিকে কেন্দ্র করে মূলতঃ এই প্রকারভেদ গড়ে উঠেছে। মানবেতর প্রাণীর মধ্যে ধারণাশ্রয়ী চিন্তাশক্তি আছে একথা এই পণ্ডিতমহল স্বীকার করেন না। রবার্ট ব্রিফল্ট বলেছেন, প্রাণীর বুদ্ধির অনেক কাহিনী শোনা গেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ধারণাশ্রয়ী চিন্তাশক্তির ছিটেফোঁটাও নেই।

উদাহরণ হিসাবে ডাঃ কোহলার বলছেন যে শিম্পানজির বুদ্ধি খুব প্রখর হলেও তাদের মধ্যে ধারণাশ্রয়ী চিন্তাশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য অবশ্যই তারা চমৎকার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু যে বস্তু দিয়ে সমস্যা সমাধান করা হবে তা যদি শিম্পানজির চোখের সামনে না থাকে তাহলে তাদের পক্ষে উপস্থিত বুদ্ধির প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয় না। তার কারণ হিসাবে ডাঃ কোহলার বলতে চান যে মানসিক প্রতিরূপের সাহায্যে কাজ করার ক্ষমতা এদের খুব সামান্য, কাজেই দৃষ্টির পাল্লার বাইরের কোন সামগ্রীকে কার্যসাধনে প্রয়োগ করতে পারে না। অথচ মানসিক প্রতিরূপের সাহায্যে অসাধ্যসাধনের ক্ষমতা আছে মানুষের।

ব্রিফলটের মতানুসারে মানুষ আর মানবেতর প্রাণীর মানসতার প্রকারগত পার্থক্যও মূলতঃ এই শক্তির মধ্যে নিহিত। তার মানে মানুষের মনের শ্রেষ্ঠত্ব মানসিক প্রতিরূপের সাহায্যে কাজ করার একান্ত বৈশিষ্ট্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

যাই হোক, মানুষের কয়েকটি মানসিক শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণিকুলের আচার-আচরণ ও প্রবণতার তুলনামূলক বিচার করলে অনেকটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যে উভয়ের মানসিক শক্তির মধ্যে কতটা এবং কি ধরনের মিল বা পার্থক্য আছে। তবে সেই তুলনামূলক আলোচনার আগে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে কি ভাবে অতি নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যে মানসিক শক্তির উদ্ভব হয়েছিল তার সন্ধান এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি যেমন জানা যায়নি জীবনের জন্মকথা।

॥ সহজ প্রবৃত্তি ॥

মানুষ আর মানবেতর প্রাণীর জ্ঞানেন্দ্রিয় (সেনসেস্) সমপ্রকৃতির একথা সকলে স্বীকার করে। জ্ঞানেন্দ্রিয় যদি সমপ্রকৃতির হয় তবে উভয়ের মৌলিক প্রজ্ঞার (ইনটুইশান) মধ্যেও সমধর্মিতা থাকবে। তাছাড়া মানুষের মধ্যে যেমন আত্মরক্ষার বৃত্তি, যৌনপ্রেম, নবজাত সন্তানের প্রতি বাৎসল্য,

মাতৃস্তন্যপানেচ্ছা 'জাতীয় কয়েকটি সহজ প্রবৃত্তি আছে। মানুষের ঠিক আগের পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যেও এই জাতের প্রবৃত্তিগুলি দেখা যায়। তবে মানুষের সহজ প্রবৃত্তির সংখ্যা মানবেতর প্রাণীর তুলনায় কম।

ওরাং ওটাং আর শিম্পানজির আদি বাসভূমি আলাদা। একটি পূর্ব-এশিয়ার প্রাণী, অপরটি আফ্রিকার। তবু ভিন্ন দেশ এবং ভিন্ন পরিবেশের হলেও এই দুটি জীব-শাখা ঘুমোবার জন্য মাচা বেঁধে নেয়। আশ্রয় নির্মাণের এই স্বভাব সহজ প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে করা যায়। কিন্তু সমপ্রকৃতির অভাববোধ থেকে এবং সমধর্মী বিচার-বিবেচনাবোধ থেকে তারা যে কাজটি করে না, জোর করে একথা বলা যায় না। অন্ততঃ ডারউইন তাই মনে করেন।

এই পর্যায়ের প্রাণী আবার গ্রীষ্মমণ্ডলের বহুজাতের বিষাক্ত ফল খায় না। কিন্তু মানুষের গৃহপালিত জন্তুকে যদি নতুন কোন দেশে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে প্রথম তারা নির্বিচারে লতাপাতা খেয়ে যায়। পরে অবশ্য খায় না। বাছ-বিচার করতে শেখে। এই খাদ্য নির্বাচন অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। কাজেই জোর করে একথা বলা যায় কি যে ওরাং ওটাং অথবা শিম্পানজি শ্রেণীর বনমানুষ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করে না; কিংবা জনক-জননীর কাছ থেকে খাদ্য বাছাই করতে শেখে না?

অধ্যাপক লয়েড মরগ্যান অবশ্য বলেছেন যে আমাদের সামনে যত তথ্য আছে তার বলে একথা প্রমাণিত হয় না যে ভালমন্দ বিচারবোধ জাগ্রত হবার মত মানসিক অবস্থায় মানবেতর কোন প্রাণী পৌঁছেছে।

প্রাণিকুলের সহজ প্রবৃত্তির তুলনা করতে গেলে দেখা যায় যে নিম্নতর প্রাণীর চাইতে উচ্চতর পর্যায়ের প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত সরল আর তাদের সহজ প্রবৃত্তির সংখ্যাও কম। কোন কোন জীববিজ্ঞানী মনে করেন, যে-সব প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তি প্রবলতর তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম। আবার যাদের মধ্যে বুদ্ধি প্রবলতর তাদের সহজ প্রবৃত্তি কম। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির সম্পর্ক যেন এমনই যে একটি বাড়লে অপরটি কমে যাবে।

এই যুক্তি ডারউইন স্বীকার করেন না। কারণ জীবজগতে এমন দৃষ্টান্ত আছে যে বিস্ময়কর সহজ প্রবৃত্তিসম্পন্ন কীটপতঙ্গ আবার সবচেয়ে বুদ্ধিমানও বটে। মেরুদণ্ডী প্রাণিকুলে মাছ বা উভয়চর প্রাণী বিশেষ বুদ্ধিমান নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব জটিল সহজ প্রবৃত্তিও নেই। স্তন্যপায়ী প্রাণিকুলের বীভর নামে প্রাণীটির সহজ প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি উভয়ই প্রবল ও প্রখর। এই দৃষ্টান্ত দুটি প্রমাণ করে যে জটিল সহজ প্রবৃত্তির পাশাপাশি উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধির সহ-অবস্থিতি সম্ভব।

সহজ প্রবৃত্তিগত ক্রিয়া আর বুদ্ধিগত ক্রিয়ার পার্থক্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞা নির্ণয় করা মোটেই সহজ নয়। তবে সহজ প্রবৃত্তি বলতে প্রকৃত পক্ষে কোন্ ধরনের মানসিক ক্রিয়া বোঝায় সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা সকলেরই আছে।

সহজ প্রবৃত্তি বলতে সাধারণতঃ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মানসিক ক্রিয়া বোঝায়। সহজ প্রবৃত্তির আবেগে কোকিল অন্য প্রাণীর বাসায় ডিম পাড়ে, বলাকা দেশান্তরী হয়, একথা বললে তার অর্থ এবং তাৎপর্য সকলেই বোঝে। যে কাজ করার জন্য আমাদের পক্ষে খানিকটা অভিজ্ঞতা প্রয়োজন কোন প্রাণী অথবা তার শাবক যখন অভিজ্ঞতা ছাড়া এবং উদ্দেশ্য না বুঝে সেই কাজ করে—শুধু একটি প্রাণী নয়, এক জাতের সকল প্রাণী যখন একভাবে কাজ করে, তখন সেই কাজকে আমরা সহজ প্রবৃত্তিসঞ্জাত কাজ বলে গণ্য করে থাকি। এই কাজের প্রকৃতি মোটামুটি সুনির্দিষ্ট। এজন্য কোন শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। সহজাত আবেগ অনুসারে এই কাজ করার সাড়া জাগে। বংশগতির ধারায় সঞ্চারিত হয়ে এই আবেগ স্বভাবে পরিণত হয়। তবে সহজ প্রবৃত্তিসঞ্জাত কাজের মধ্যেও খানিকটা যুক্তি ও বিচারবোধের আভাস থাকে। তার সুনির্দিষ্ট এবং স্বতঃপ্রণোদিত প্রকৃতি সব সময় বজায় থাকে না।

একথা সর্ববাদীসম্মত যে নির্দিষ্ট প্রতিবেশের মধ্যে দৈহিক গঠন যেমন প্রতিটি প্রজাতির অস্তিত্বের পক্ষে মঙ্গলকর, তেমন তার সহজ প্রবৃত্তিও বেঁচে থাকার পক্ষে মঙ্গলকর। প্রতিবেশের পরিবর্তনের ফলে দেহতন্ত্রের পরিবর্তন হয় একথা আমরা জানি। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে সহজ প্রবৃত্তির সামান্য পরিবর্তনও জীব-প্রজাতির ক্রমবিকাশের পক্ষে মঙ্গলকর হয়েছে এই অনুমান স্বভাবত করা হয়। এই ধরনের পরিবর্তনের প্রভাবে চরম বিস্ময়কর সহজ প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়েছে বলে ডারউইন মনে করেন। অভ্যাস-অনভ্যাস আর ব্যবহার-অব্যবহারের ফলে জীবদেহে পরিবর্তন সূচিত হয়। তার ফলে যেমন নতুন অঙ্গলক্ষণের উদ্ভব হয়, আবার দেহতন্ত্রের কোন কোন অঙ্গলক্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধিও ঘটতে পারে। জৈবিক ক্রমবিকাশের এই রীতি সহজ প্রবৃত্তির ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে সাহজিক বৃত্তিরও পরিবর্তনসাধন করেছে বলে ডারউইন দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু বুদ্ধির কাজের আবেগ ভিন্ন প্রকৃতির। অভিজ্ঞতা এবং বিচারবোধের প্রভাবে সজ্ঞানে এই কাজ করা হয়। তবে বুদ্ধিগত কিছু কাজ কয়েক পুরুষ ধরে করে যাবার পর কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়ে যায় এবং উত্তরলব্ধি হিসাবে

সঞ্চারিত হয়। উদাহরণ হিসাবে সামুদ্রিক দ্বীপবাসী পাখীর কথা বলা যেতে পারে। মানুষ দেখার আগে মানুষকে এড়িয়ে চলার কোন প্রবণতা এরা প্রথম দেখাত না। কিন্তু পরে এড়িয়ে চলতে শিখেছে। এই এড়িয়ে চলার প্রবণতা শেষ অবধি বংশগত স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তখন কিন্তু এই অভ্যাসে আর বুদ্ধির কাজ থাকে না। কেন না, তার পেছনে যুক্তি বা অভিজ্ঞতা কাজ করে না। এই অভ্যাস তখন সহজ প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়ে যায়।

তাছাড়া এ কথাও সত্য, মানুষ যে-সব বুদ্ধির কাজ সাধারণতঃ করে থাকে তার অধিকাংশ কাজের পেছনে যুক্তি বা বিচারবোধের চাইতে অনুকরণের প্রভাব প্রবলতর। তথাপি মানুষের কাজ আর জন্তুর বহু কাজের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। মানুষ শুধু অনুকরণ ক্ষমতার বলে প্রথম চেষ্টাতে ডিঙি কিংবা পাথুরে কুড়াল তৈরি করতে পারেনি। এই কৌশল তাকে অভ্যাস করে শিখতে হয়েছে। কিন্তু বাসা বাঁধার জন্য বীভর, পাখী বা মাকড়সার মত প্রাণীর অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। বড় এবং অভিজ্ঞ হলে প্রথম চেষ্টাতেই বীভর তার বসবাসের বাঁধ বেঁধে ফেলবে, পাখী তার বাসা বাঁধবে আর মাকড়সা বুনবে তার চমক-লাগান জাল।

মানুষ আর উচ্চতর পর্যায়ের স্তন্যপায়ী প্রাণীর মানসিক শক্তির তুলনামূলক বিচার করার সময় এই সব কথা যদি স্মরণ থাকে তাহলে বিভিন্ন প্রাণীর মানসিক শক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করার শঙ্কা থাকে না। পূর্বস্মৃতি, দূরদৃষ্টি, বিচারবুদ্ধি এবং কল্পনাশক্তি অনুসারে মানুষ যে সব কাজ করে, বিভিন্ন প্রাণীও সাহজিক প্রবৃত্তির আবেগে সেই ধরনের কাজ করে থাকে। তাদের কাজ সজ্ঞান বুদ্ধি প্রণোদিত নয়। মানসিক তন্ত্রের গঠন এবং তার ক্রিয়াপদ্ধতির পুরুষানুক্রমিক পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে একটু একটু করে এই কর্মক্ষমতা তারা অর্জন করেছে।

॥ অনুভূতি ॥

মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর মানসিক শক্তির মিল-অমিলের কথা বলতে গেলে উভয়ের অনুভূতির সাদৃশ্যের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। দেখা যায় যে নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীরও মানুষের মত আনন্দ এবং বেদনাবোধ আছে। সুখবোধ এবং দুর্দশাবোধেরও সুস্পষ্ট প্রমাণ তাদের আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। বিড়াল ছানা, কুকুরের বাচ্চা, ভেড়ার ছানা কিংবা গরুর বাছুরের লাফালাফি মাতামাতি দেখে কে বলবে যে নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর আনন্দবোধ কিংবা সুখানুভূতি নেই?

এই ধরনের ক্রীড়া-কৌতুকের রীতি কীটপতঙ্গের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। পরস্পর পিছন পিছন ধাওয়া করে এবং কামড়াবার অভিনয় করে তারা আনন্দ প্রকাশ করে থাকে।

নিম্নতর পর্যায়ের প্রাণীও যে মানুষের মত আবেগে উদ্দীপ্ত হয় তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ভীতি বা ত্রাস উভয়ের দেহে সমান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ত্রাসে উভয়ের হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করে। পেশীর কাঁপুনি শুরু হয়। লোম খাড়া হয়ে ওঠে। আর নালীমুখে যে সব পেশী আছে সেগুলি ঢিলে হয়ে যায়, যার ফলে পায়খানা-প্রস্রাব করার বেগ সৃষ্টি হয়। ভয় থেকে শঙ্কার উদ্ভব হয়। বন্য জন্তুর মধ্যে সন্দেহবৃত্তি খুব ব্যাপক ও প্রবল। তারপর কপটতার ভান করার ক্ষমতাও প্রাণী-জগতে আছে। পোষা হস্তিনী দিয়ে বুনো হাতি ধরার কাহিনী যারা পড়েছেন তারা কি অস্বীকার করতে পারেন যে জন্তুর পক্ষে কপটতা দেখান অসম্ভব? স্বেচ্ছাকৃত কপটতার অভিনয় ছাড়া পোষা হস্তিনী বুনো হাতিকে বাগে আনতে পারত কি? আবার এক জাতের প্রাণীর মধ্যেও সাহস এবং ভীরুতার মাত্রায় প্রভেদ থাকে। কুকুরের মধ্যে জিনিসটি বেশ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। কুকুর বা ঘোড়ার মধ্যে কোন কোনটা বদমেজাজী আবার কোনটা শান্ত প্রকৃতির হয়। এই সব গুণ স্পষ্টত উত্তরলব্ধিক্রমে সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

সকলেই জানে যে জীবজন্তু সহসা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং অসংকোচে তাদের ক্রোধ প্রকাশ করে। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা যে নানা কৌশল অবলম্বন করতে পারে তার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই সম্পর্কে ডারউইন একটি কৌতুককর কাহিনী উল্লেখ করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে তিনি কাহিনীটি শুনেছিলেন। গল্পটি এই রকম: দক্ষিণ আফ্রিকার এক সেনানী প্রায়শঃ একটি বেবুনকে ভারী উত্যক্ত করত। এক রবিবার সেই সেনানীটি প্যারেড করতে আসছিল। তাই দেখে বেবুনটি হঠাৎ গাছ থেকে নেমে আসে এবং সেনানীটির যাবার পথের পাশে একটি গর্তের মধ্যে জল ঢেলে খানিকটা কাদা সৃষ্টি করে। তারপর সেনানীটি পাশ দিয়ে যাবার সময় সেই কাদা তার গায়ে ছিটিয়ে দেয়। আশপাশের লোকজন তো অবাক। এই ঘটনার পর যখন সেনানীটির সঙ্গে বেবুনটির দেখা হয়েছে তখনই বেবুনটি যেন এই কাহিনীর কথা স্মরণ করে আনন্দ প্রকাশ করেছে।

ভালবাসার ক্ষমতাও যে জীবজন্তুর আছে তার প্রমাণ কুকুর। তাছাড়া প্রাণী-জগতের মাতৃস্নেহের গল্প শুনে একথা বলতেই হয় যে, মানুষ হোক আর জীবজন্তুই হোক, জননীর মধ্যে সন্তান-স্নেহের স্ফুরণ মূলতঃ সমপ্রকৃতির হৃদয়বৃত্তি থেকে

হয়েছে। মানবী আর বানরী উভয়েই সন্তানবাৎসল্যের দিক থেকে সমধর্মী আবেগ দ্বারা চালিত।

বানরীর মাতৃস্নেহের খুঁটিনাটি দৃষ্টান্তও বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন। চিড়িয়াখানা আর বন্য জীবনে বানরীর হালচাল লক্ষ্য করে তার সন্তানবাৎসল্যের বহু দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হয়েছে। দেখা গেছে, মশা-মাছির উৎপাত থেকে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য সে মশা-মাছি তাড়াচ্ছে, স্রোতের জলে মুখ ধুইয়ে দিচ্ছে সন্তানের—সন্তানহারা হয়ে শোকে উন্মাদপ্রায় হয়েছে। মাতৃহারা শিশুকে মাতৃস্নেহে পালন করার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। শুধু নিজের জাতের শিশু নয়, বিড়ালের ছানাকেও চুরি করে এনে একটি বেবুনকে পালন করতে দেখা গেছে। একদিন এই পালিত বিড়ালছানাটি স্নেহময়ী পালিকার গা আঁচড়ে দেয়। বেবুনটি তৎক্ষণাৎ তার পায় নখর দেখতে পেয়ে নখর কয়টি দাঁত দিয়ে কেটে দেয়।

॥ জটিলতর প্রক্ষোভ ॥

জটিলতর প্রক্ষোভের (ইমোশান) মধ্যে অধিকাংশ প্রক্ষোভ মানুষ ও উচ্চ পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। প্রভুর ভালবাসার অপর কোন ভাগীদার আছে দেখতে পেলে কুকুর স্বভাবত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। বানরের বেলাও একথা খাটে। এতে বোঝা যায়, বিভিন্ন প্রাণী যেমন ভালবাসতে পারে তেমন ভালবাসা পেতেও চায়। গর্বানুভূতির সুস্পষ্ট প্রমাণও এরা দেয়। প্রশংসা এবং সমর্থনেও খুশী হয়। কোন কুকুরকে যদি প্রভুর জন্য কোন জিনিস কেউ বয়ে নিয়ে যেতে দেখে থাকেন তাহলে তিনি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই যে কাজটি করতে সে সুস্পষ্ট গর্ব অনুভব করছে। তাছাড়া মস্ত জোয়ান কোন কুকুরকে দেখে রাস্তার কোন খেঁকি কুকুর যদি ঘেউ ঘেউ করে ওঠে তাহলে সেই বড় কুকুরটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনে চলে যায়। এই আচরণকে মহানুভবতার লক্ষণ বলা যায় না কি?

জীবজন্তুর আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে কয়েকজন প্রাণী-বিদ্ লক্ষ্য করেছেন যে বানরকে উপহাস করলে তারা চটে যায়। মাঝে মাঝে কাল্পনিক অপরাধ আবিষ্কার করেও ক্রোধ প্রকাশ করে থাকে। ডারউইন তাঁর নিজের চোখে দেখা একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছেন, চিড়িয়াখানার একটি বেবুনের সামনে গলা ছেড়ে যখন বই পড়া হত বেবুনটি রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। একদিন ক্রোধের বশে বেবুনটি নিজের পা কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছিল।

কুকুর মাঝে মাঝে এমন ভাব প্রকাশ করে যাকে কৌতুকবোধের দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করা যায়। কোন পোষা কুকুরকে লক্ষ্য করে যদি খেলাচ্ছলে লাঠি বা বল ছুঁড়ে মারা যায় তাহলে কুকুরটি সেই ছুঁড়ে-মারা জিনিসটি মুখে করে আরও খানিকটা দূরে নিয়ে যাবে এবং সেখানে গুটি মেরে অপেক্ষা করবে যে পর্যন্ত প্রভু সেটিকে নেবার জন্য খানিকটা এগিয়ে না আসছেন। প্রভুকে এগোতে দেখে বল বা লাঠি কামড়ে ধরে এমন ভঙ্গীতে সে এগিয়ে আসবে যেন কৌতুকের অর্থ সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই আচরণ এবং বিজয়ীর গর্বে তার ফিরে আসার ভঙ্গীটি স্পষ্টত খেলার মনোবৃত্তি থেকে আলাদা।

বুদ্ধি থেকে উদ্ভূত যে সব প্রক্ষোভ মানুষের মধ্যে উচ্চমার্গের মানসিক শক্তি সৃষ্টি করে সেই ধরনের প্রক্ষোভের আভাসও মানবেতর প্রাণীর আচরণের মধ্যে বিরল নয়।

উত্তেজনা ও মানসিক ক্লান্তিবোধ প্রাণীসর্গেও আছে। কুকুরের মধ্যে এই দুই ধরনের মানসিক অবস্থার দৃষ্টান্ত সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। বিস্ময়বোধের প্রকাশ সকল প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। অনেক প্রাণী কৌতূহলও প্রকাশ করে থাকে। এই কৌতূহলবৃত্তি প্রাণীসর্গে আছে বলে শিকারীদের পক্ষে অনেক সময় শিকার করা সহজ হয়। শিকারীর ফাঁদে আকৃষ্ট হয়ে তারা সহজেই ধরা পড়ে। উদাহরণ হিসাবে হরিণ, বুনো কৃষ্ণসার মৃগ এবং কয়েক জাতের বুনো হাঁসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়।

বানরের মধ্যেও কৌতূহলবৃত্তি আছে। সাপ সম্পর্কে একটা সাহজিক ভীতিও আছে। কিন্তু চিড়িয়াখানার বানরের খাঁচায় একবার ঝাঁপির মধ্যে একটা সাপ রেখে দেখা গিয়েছিল যে ভীতি সত্ত্বেও তারা কৌতূহলবৃত্তির আকর্ষণ কাটাতে পারেনি। সাপটি রাখার সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার মধ্যে অদ্ভুত ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে বানরগুলি অস্থির হয়ে পড়ল। তারপর কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, শশঙ্কিত বানরদল ঝাঁপির চারপাশে জড়ো হয়েছে এবং এক একবার ঝাঁপির ডালা ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখে যাচ্ছে যে ভেতরে কি আছে। আর একবার বড় একটা খাঁচার মধ্যে তুলোভরা একটা সাপের খোলস রেখে দেখা গিয়েছিল যে সব কয়টি বানর নার্ভাস হয়ে পড়েছে। তারা এত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে খড়কুটোর মধ্যে তাদের খেলার বলটি নড়তে দেখেও আঁতকে উঠেছিল। এই খাঁচার মধ্যেই মাছ, কচ্ছপ আর ইঁদুর রেখে দিয়ে দেখা গেছে যে বানরদের মধ্যে কোনরকম ভীতির সঞ্চার হয় না।

॥ অনুকরণের বৃত্তি ॥

অনুকরণের প্রবণতা মানুষের মধ্যে খুব প্রবল—অসভ্যদের মধ্যে প্রবলতর। মস্তিষ্কের কতকগুলি অসুখে এই প্রবণতা অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে যায়। মস্তিষ্কের আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগী তার সামনে উচ্চারিত দেশীবিদেশী যে কোন শব্দ অনুকরণ করে থাকে। মানবেতর প্রাণী স্বভাবতঃ মানুষের আচরণ নকল করে না। কিন্তু বানর পর্যায়ে এই রীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। মানুষের আচরণ নকল করার অদ্ভুত ক্ষমতা এদের আছে। তবে বিভিন্ন জাতের প্রাণী মাঝে মাঝে পরস্পরের আচরণ নকল করে থাকে। কুকুর লালিত নেকড়ের বাচ্চাকে কুকুরের মত ডাকতে শোনা গেছে। তবু একে ঠিক স্বেচ্ছাকৃত অনুকরণ বলা যায় না। পাখীর ছানা স্বভাবতঃ জনক-জননীর কণ্ঠধ্বনি অনুকরণ করে। এমন কি ভিন্ন জাতের পাখীর রবও অনুকরণ করতে পারে। তোতা পাখীর সামনে বারংবার যে শব্দ উচ্চারণ করা হোক না কেন, অনায়াসে সেই শব্দ তারা নকল করতে পারে। বহু জাতের প্রাণীর জনক-জননী সন্তানের অনুকরণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে তাদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করে। বিড়াল অনেক সময় জ্যান্ত ইঁদুর ধরে এনে সন্তানকে শিকার ধরা শেখায়। বাজপাখী সম্পর্কে এক বিজ্ঞানী বলেছেন, শাবককে দূরত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য অর্থাৎ ছোঁ মারার কৌশল শেখাবার জন্য তারা প্রথমে মরা ইঁদুর বা চড়াই পাখী শূন্য থেকে ফেলে দেয়। তারপর জ্যান্ত পাখী ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করে যে শাবক নির্ভুলভাবে ছোঁ মেরে শিকার ধরতে শিখেছে কি না।

এই সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অনুকরণ শক্তির উপর নির্ভর করা হয় না। অনুকরণ-বৃত্তির সঙ্গে সন্তানের সহজ প্রবৃত্তি আর বংশগত স্বভাবের উপরেও বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

॥ মনযোগ ॥

মানুষের বুদ্ধির উন্নতির ক্ষেত্রে যেসব মানসিক শক্তি সহায়ক হয়েছে মনোযোগ তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানবেতর প্রাণীর মধ্যেও এই শক্তির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। বিড়াল যখন একদৃষ্টে গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকে কিংবা শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তার আচরণের মধ্যে একাগ্রতা সুপ্রকাশ নয় কি? বানরের মধ্যে এই শক্তির তারতম্য আছে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বানর নিয়ে যে সব লোক খেলা দেখায় তাদের একজন বিলেতের চিড়িয়াখানা থেকে গভগড়তা

পাঁচ পাউণ্ড দরে কয়েকটি বানর কিনে নিয়ে যেত। তাকে যদি তিন চারটি বানর এক সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কয়েকদিন রাখার পর একটিকে বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে সে দ্বিগুণ দাম দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছিল। এই প্রস্তাবের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে লোকটি বলেছিল, যে সব বানরের মধ্যে একাগ্রতা আছে তারা ভাল খেলোয়াড় হয়। দুই একদিন পরীক্ষা করার সুযোগ পেলে সে বুঝে নিতে পারবে যে কোনটির মধ্যে এই গুণ বেশী। লোকটি আরও বলেছিল যে খেলা দেখাবার সময় কোন বানরের মন যদি এদিকে-ওদিকে যায় তাহলে তাকে শেখান যায় না, শাসন করে শেখাতে গেলে গোমরা হয়ে থাকে। কিন্তু যে বানরটি মন দিয়ে তার কথা শুনবে সহজেই তাকে শেখান সম্ভব।

॥ স্মৃতিশক্তি ॥

স্মৃতিশক্তিও যে মানবেতর প্রাণীর মধ্যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। অধ্যাপক লয়েড মরগ্যান বলেছেন, 'মানবেতর প্রাণীর স্মৃতিশক্তি অসংলগ্ন প্রকৃতির।' তাহলেও ব্যক্তি এবং স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাণী প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে।

এক বিজ্ঞানী বলেছেন, উত্তমাশা অন্তরীপের একটি হনুমান নয় মাস অনুপস্থিতির পর তাকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছিল। ডারউইন তাঁর নিজের কুকুরটির স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করার জন্য একবার তাকে অন্যত্র পাঠিয়েছিলেন। কুকুরটি না কি বদমেজাজী ছিল। অপরিচিত লোক দেখলে তেড়ে আসত। পাঁচ বছর দুই দিন পরে কুকুরটি আবার যখন ফিরে এল তখন সে আগের মত ডারউইনের আদেশ পালন ও পশ্চাদনুসরণ করে। ফিরে এসে কুকুরটি এমন ভাব দেখিয়েছে যেন আধঘণ্টাখানেকের জন্য তাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। এই আচরণ থেকে মনে হয় যেন কুকুরটির পুরান স্মৃতি আবার মনে জাগ্রত হয়েছে।

॥ ধারণাশ্রয়ী চিন্তাশক্তি ॥

কল্পনাশক্তি মানুষের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই শক্তির বলে সে ভাবের সঙ্গে প্রতিরূপের যোগাযোগ ঘটায়; এবং এই যোগাযোগের ফলে অভিনব এবং বিস্ময়কর ইষ্টলাভ করে। স্বপ্নের মধ্যে এই শক্তির তাৎপর্য সুপ্রকাশ। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণী যে ধরনের অঙ্গভঙ্গী করে অথবা সে জাতের শব্দোচ্চারণ করে তা থেকে বোঝা যায় যে তারাও স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন

দেখার ক্ষমতা যখন আছে তখন খানিকটা কল্পনাশক্তিও এদের আছে বলে ডারউইন মনে করেন।

জ্যোৎস্না রাত্রে কুকুরকে মাঝে মাঝে কেমন যেন করুণ সুরে ডাকতে শোনা যায়। নিশীথরাতের এই ডাকেরও বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে ডারউইনের বিশ্বাস। কারণ সব কুকুর এইভাবে ডাকে না, হোজো নামে এক বিজ্ঞানী বলেছেন, কুকুরগুলি চাঁদের দিকে চেয়ে ডাকে না—ডাকে দিগন্তের কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চেয়ে। তিনি মনে করেন, চারপাশের বিভিন্ন বস্তুর অস্পষ্ট রূপরেখা কুকুরের কল্পনাশক্তিকে আলোড়িত করে তোলে বলে নিশীথরাতে তারা ডেকে ওঠে।

আগেই বলা হয়েছে যে এক শ্রেণীর মনোবিদ্যাবিদের মতে মানবেতর প্রাণীর মধ্যে ধারণাশ্রয়ী চিন্তাশক্তির অস্তিত্ব নেই। মানসিক প্রতিরূপের সাহায্যে কাজ করার ক্ষমতা প্রাণিকুলের আছে বলে তাঁরা স্বীকার করতে চান না। কারণ হিসাবে বলা হয় যে ধারণাশ্রয়ী চিন্তাশক্তি ঠিক জৈবিক ক্রমবিকাশের উত্তরলব্ধি নয়। সামাজিক ঐতিহ্যের উত্তরলব্ধি হিসাবে এই শক্তি মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মানুষের মনের বিকাশকে শুধুমাত্র জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই পণ্ডিতমহলের মতে ভুল করা হবে। এই মন মূলতঃ মানুষের সামাজিক সত্তার সৃষ্টি। মানুষের মন গড়ে ওঠার পেছনে দেহতন্ত্র এবং অপরাপর জৈবিক বিশিষ্টতার ক্রমপরিবর্তন যত না প্রভাব বিস্তার করেছে তার চাইতে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে বিভিন্ন সমাজবদ্ধ গোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সেই সব গোষ্ঠীর গঠনরীতি আর গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক।

এই সম্পর্কে ব্রিফল্ট বলছেন :

মানসিক প্রতিরূপের সাহায্যে কাজ করার ক্ষমতা অক্ষমতার মধ্যে মানবমন এবং প্রাণীর মানসতার পার্থক্য নিহিত। মানুষের এই ক্ষমতা আছে কিন্তু মানবেতর প্রাণীর নেই। এই পার্থক্য উভয়ের মানসতার মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। কারণ ব্যক্তিসত্তার ক্ষণস্থায়ী অনুভব এই মানসতা অর্থাৎ ধারণাশ্রয়ী চিন্তাশক্তি সৃষ্টি করতে পারে না। তার জন্য চিরস্থায়ী মৃত্যুহীন সামাজিক গোষ্ঠীজীবনের অস্তিত্ব প্রয়োজন। কেন না, গোষ্ঠীজীবনের মাধ্যমে এই সামাজিক ঐতিহ্য সঞ্চারিত হবার সুযোগ যদি না থাকে তাহলে মানুষ ও প্রাণীর মানসতার পার্থক্য লোপ

পায়। সামাজিক ঐতিহ্যবঞ্চিত মানুষের মধ্যে যেমন মানবীয় বুদ্ধির অভাব থাকে তেমন তাদের মধ্যে মানবীয় প্রক্ষোভ, সামাজিক রসবোধ এবং আকর্ষণবোধেরও অভাব দেখা যায়। অশিক্ষিত মূক-বধির মানুষ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

॥ বিচারশক্তি ॥

মানুষের মানসিক শক্তি মধ্যে বিচারশক্তির স্থান বোধ হয় সকলের ঊর্ধে। অধ্যাপক লয়েড মরগ্যান বলেছেন, বিচারবোধ জাগ্রত হবার মত মানসিক অবস্থায় কোন মানবেতর প্রাণী পৌছোয়নি। ডারউইন কিন্তু এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, খানিকটা বিচারবোধ প্রাণীসর্গেও আছে। প্রায়শ দেখা যায় যে কোন কাজ করার আগে বহু প্রাণী থমকে দাঁড়ায়, একটু যেন ভেবে নিয়ে মনস্থির করে। বিভিন্ন প্রাণীর আচরণের এই প্রকৃতি দেখে মনে করা হয় যে নগণ্য হলেও কিছুটা বিচারবোধ তাদেরও আছে।

এই ধরনের আচরণকে সহজ প্রবৃত্তিসঞ্জাত আচরণও বলা যেতে পারে। তবে নিসর্গবেত্তারা যত গভীরভাবে বিভিন্ন প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন, তত তারা মানবেতর প্রাণীর আচরণের মধ্যে সহজ প্রবৃত্তিগত আবেগের চাইতে বিচারবোধের বেশী আভাস পাচ্ছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। অবশ্য সহজ প্রবৃত্তি আর বিচারশক্তির পার্থক্য উপলব্ধি করা দুরূহ কাজ। অনেক ক্ষেত্রে গোলমাল বাধে। একটিকে অন্যটি বলে ভ্রম হয়। একজন বিজ্ঞানী বলেছেন যে তার স্লেজটানা কুকুরগুলি যখন পাতলা বরফের আস্তরণের সম্মুখীন হয়েছে তখন ঘেঁষাঘেষি করে না চলে ফাঁক ফাঁক হয়ে গেছে যাতে তাদের দেহের ভারে এক জায়গায় বেশী চাপ না পড়ে। একে যদি কুকুরের বিচারশক্তির উদাহরণ হিসাবে ধরা যায় তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে কুকুরগুলি এই বিচারশক্তি পেল কি ভাবে। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে, না বুড়ো অভিজ্ঞ কুকুরের দৃষ্টান্ত থেকে? আবার একে তো বংশগতিও বলা যেতে পারে। তার মানে এটা ওদের সহজ প্রবৃত্তিও হতে পারে। কোনটা যে সত্য বলা কঠিন।

কোন কাজ বিচারবুদ্ধিপ্রসূত না সহজ প্রবৃত্তিসঞ্জাত তার বিচার কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে করা সম্ভব। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কাজটি নিষ্পন্ন হয়েছে শুধুমাত্র তারই পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। এক ফরাসী বিজ্ঞানী বলেছেন, টেকসাসের মরুভূমিপ্রায় প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলার সময় তার সঙ্গী তৃষ্ণার্ত কুকুরগুলি ঢালু জায়গা দেখলেই জলের সন্ধানে ছুটে

গেছে, বারংবার ব্যর্থ হয়েও নিবৃত্ত হয়নি। কুকুরগুলির আচরণ দেখে স্বভাবতঃ মনে হয়, ঢালু জায়গা যে জল পাবার সম্ভাব্য স্থান এ যেন তারা জানে। কিন্তু ঢালু জায়গায় যে জল পাওয়া যায় এই বোধ যদি তাদের নাও থাকে তবু তাদের এই আচরণের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিচারবোধের আভাস পাওয়া যায় না কি? তা না হলে ভিজা মাটির গন্ধ পাবার সম্ভাবনা যেখানে একেবারে নেই সেখানে তারা বারবার ছুটে যাচ্ছিল কেন?

হাতির সামনে খানিকটা দূরে যদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দেওয়া হয় তাহলে শুঁড় বাড়িয়ে খাদ্যদ্রব্যের ওপাশে ফুঁ দিয়ে তারা খাদ্য কাছে আনার চেষ্টা করে। চিড়িয়াখানার একটি ভালুক একদিন থাবা দিয়ে ঢেউ সৃষ্টি করে জলে ভাসান রুটির টুকরো কাছে এনেছিল। বিজ্ঞানী পাভলভের পোষা শিম্পানজিটি তক্তা পেতে সাঁকো তৈরি করে জলে ভাসান খাবার সংগ্রহ করেছে। এই সব আচরণের মধ্যে খানিকটা বিচারবুদ্ধির আভাস আছে সন্দেহ নেই। যদিও এদের কেউ জানে না যে কোন নিয়ম অনুসারে খাদ্য তাদের কাছে এল।

সামান্য অভিজ্ঞতার পর বানরের মধ্যেও যে খানিকটা বিচারবোধ জাগ্রত হয় তার দৃষ্টান্তও দেওয়া যেতে পারে। একবার একদল বানরকে ডিম খেতে দেওয়া হয়েছিল। খোসা ভাঙতে গিয়ে প্রথম দিন তারা ভেতরের কুসুমের বেশীটা নষ্ট করে ফেলেছিল। কিন্তু পর পর দিনকয়েক ডিম দেবার পর দেখা গেল, আস্তে আস্তে ঠুকে খোসা ভেঙে নখ দিয়ে ফুটো করে ডিম খাবার কায়দা তারা শিখে গেছে। আর একদল বানরের খাবারের ঠোঙার মধ্যে বোলতা ভরে পরীক্ষা করা হয়েছিল। বানরগুলি প্রথম দিন বোলতার হুলের জ্বালা সহ্য করলেও দ্বিতীয় দিন হুঁশিয়ার হয়েছে। ঠোঙা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কানের কাছে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে যে তার মধ্যে বোলতা আছে কি না। অভিজ্ঞতা থেকে এই যে শিক্ষা তারা লাভ করল তার মধ্যে বিচারবুদ্ধির আভাস আছে নিশ্চয়ই।

বানরের ভীমরুল খাওয়া যারা দেখেছেন তারা এ বিষয়ে আরও নিঃসংশয় হবেন। ভীমরুলের চাকে দুটি দ্বার থাকে। মাটির গর্তে চাক হলে মুখ থাকে একটি। ভীমরুললোভী বানর হাত দিয়ে এই মুখ চেপে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে চাকের মধ্যে প্রবল গুঞ্জন শুরু হয়। বানর তখন হাতের আঙুল সামান্য ফাঁক করে দেয়। সেই ফাঁক দিয়ে এক একটি ভীমরুল মাথা বার করার সঙ্গে সঙ্গে নখ দিয়ে মাথার অর্ধেক ছিঁড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে। এমন সুনিপুণভাবে সে কাজটি করে যে একটি ভীমরুলেরও হুল ফোটাবার উপায় থাকে না।

এইভাবে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত থেকে নিসর্গবেত্তারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে মানুষ আর উচ্চ পর্যায়ের প্রাণিকুলের মধ্যে শুধু সমধর্মী সহজ প্রবৃত্তিই নেই, সমধর্মী জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা আর অনুভূতিও উভয় পর্যায়ের মধ্যে আছে। উভয়ের মধ্যে সমপ্রকৃতির আবেগ ও মায়া মমতা দেখা যায়। এমন কি ঈর্ষা, শঙ্কা, গর্ববোধ জাতীয় জটিল মনোবৃত্তির আভাসও প্রাণীসর্গে পাওয়া যায়। প্রতিহিংসাপরায়ণতা আর কপটতাও আছে উভয়ের মধ্যে। বিদ্রূপ বোঝার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কৌতূহলবোধও সকলের মধ্যে আছে। এছাড়া মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি আর বিচারবোধের দৃষ্টান্তও বিভিন্ন প্রাণীর আচরণের মধ্যে পাওয়া যায়। কল্পনাশক্তি সম্পর্কে অবশ্য মতভেদ আছে। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যে যেমন এই সব শক্তির তারতম্য আছে, তেমন সমপর্যায়ের প্রাণীর মধ্যেও যে কোন মানসিক শক্তির মাত্রাগত প্রভেদ দেখা যায়। মানুষের মধ্যেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

॥ উচ্চতর মানসিক শক্তি ॥

তবে মানুষের মানসিক শক্তির মধ্যে এছাড়া আরও বহু শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কতকগুলি উচ্চতর মানসিক শক্তির বিকাশ মানুষের মধ্যে হয়েছে যার আভাস মানবেতর প্রাণীর মধ্যে তেমন স্পষ্ট নয়। এই সব মানসিক শক্তির মধ্যে ক্রমোন্নতি লাভের ক্ষমতা, হাতিয়ার ব্যবহার করার ক্ষমতা, বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা, আত্মসচেতনতা, আত্মোপলব্ধি, সৌন্দর্যবোধ, ধর্মবোধ, বিবেক প্রভৃতি অন্যতম। ভাষা সৃষ্টির ক্ষমতাও মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই সব মানসিক শক্তিকে মানুষের একক বৈশিষ্ট্য বলে দাবি করা হয়। এই দাবির সত্যতা কিংবা অসারতা যাচাই করা সম্ভব নয়। কারণ মানবেতর প্রাণীর মনের ঠিকানা আমরা বড় বেশী জানি না। তাদের মনের মধ্যে কোন্ ভাবের উদয় হয় তা জানা সম্ভবও নয়। প্রাণিকুলের আচরণের মধ্যে যেগুলি এই সব মানসিক শক্তির দ্যোতক বলে অনুমান করা যেতে পারে উদাহরণ হিসাবে শুধুমাত্র সেই সব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়।

উৎকর্ষ লাভের অসাধারণ ক্ষমতা আছে মানুষের। এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। তবে ফাঁদ পেতে যারা শিকার ধরেন তারা জানেন, জীবজন্তু প্রথম দিকে যত সহজে ফাঁদে ধরা পড়ে, পরে তত সহজে ধরা দেয় না। আবার ফাঁদ পেতে জন্তুর বাচ্চা ধরা যত সহজ বয়স্ক শিকার ধরা তত সহজ নয়। তাছাড়া ক্রমাগত এক ধরনের ফাঁদ পেতে নতুন নতুন শিকার ধরা ক্রমেই কঠিন

হয়ে পড়ে। এ থেকে মনে করা যায় না কি যে স্বজাতের কয়েকটিকে ফাঁদে পড়তে দেখে আর সকলে অভিজ্ঞতা থেকে হুঁশিয়ার হতে শিখেছে? তা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে অভিজ্ঞতা তাদের বুদ্ধিকে উন্নত করেছে।

কুকুরের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। নেকড়ে আর শেয়ালের বংশধারায় কুকুরের জন্ম। গৃহপালিত কুকুরের মধ্যে পূর্বপুরুষের গুণ হিসাবে শঠতা হয়ত বৃদ্ধি পায়নি। বংশপতির সদাসতর্ক সন্ধানী প্রকৃতিও হয়ত খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু মমতা, বিশ্বস্ততা জাতীয় নৈতিক গুণ তারা অর্জন করেছে। এ কি উন্নতির লক্ষণ নয়?

॥ হাতিয়ার ব্যবহার ॥

হামেশা বলা হয় যে মানুষ ছাড়া আর কেউ হাতিয়ার ব্যবহার করতে জানে না। কিন্তু শিম্পানজি যখন পাথরের টুকরো দিয়ে ঠুকে ঠুকে বাদামের খোসা ভাঙে, তাকে কি হাতিয়ার ব্যবহার করা বলা হবে না? আবিসিনিয়ার বেবুনদের লড়াই দেখে বহু পর্যটক স্বীকার করেছেন যে পাথরের ঢিল-পাটকেল ছুঁড়ে এবং পাহাড়ের ঢালু গা দিয়ে বড় পাথরের চাঙড় গড়িয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষকে তারা এমনভাবে বিব্রত করে তোলে যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। গাছের ডাল ভেঙে হাতি অনেক সময় তাই দিয়ে গায়ের মশা-মাছি তাড়ায়। এই সব জিনিসকে হাতিয়ার বলা হবে না কি?

হাতিয়ার তৈরি করার ক্ষমতা অবশ্য একমাত্র মানুষের আছে। কিন্তু আদি-মানব কি তার আদি হাতিয়ার সচেতন ইচ্ছানুসারে তৈরি করতে পেরেছিল, অথবা আকস্মিকভাবে ভাঙা পাথরের টুকরোর কার্যসাধকতা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করে ক্রমে ক্রমে হাতিয়ার তৈরি করতে শিখেছিল? এই জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব আমরা জানি না। তবে আদিমানবের আদি হাতিয়ার নামে পরিচিত পাথুরে জিনিসের আনাড়ি গড়ন দেখে এই অনুমান করা যায় যে প্রাকৃতিক কারণে আকস্মিকভাবে ভাঙা পাথরের টুকরোই হয়ত তার প্রথম হাতিয়ার ছিল। তার পরে অবশ্য উন্নততর হাতিয়ার তৈরী হয়েছে। আন্তপলীয় যুগের পাথুরে হাতিয়ার দেখে অনেক পুরাবিদ্যাবিদ্ সংশয় প্রকাশ করেছেন যে আদিমানবের আদি হাতিয়ার নামে পরিচিত পাথুরে দ্রব্য প্রকৃতই মানুষের হাতে তৈরী কি না। এই যুগের পর পাথুরে হাতিয়ার যখন মানুষের হাতে তৈরী হতে শুরু হয়েছে সেই অন্তবর্তীকালের ব্যবধান বহু সহস্র বছর।

সঙ্গে জটিল ধ্যান-ধারণা জড়িত। এই রুচির সঙ্গে অসভ্য কিংবা অশিক্ষিতের রুচি মিলবে না। অসভ্য মানুষ যে ধরনের বীভৎস অলংকার পরে কিংবা যে বীভৎস সঙ্গীতে তারা আনন্দবোধ করে সুসভ্য মানুষের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তার মিল নেই। আবার একথাও সত্য যে রাত্রির আকাশের মহিমময় অতল রহস্যের সৌন্দর্য, কোন নিসর্গশোভার রূপ-রহস্য কিংবা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসবোধ মনুষ্যেতর কোন প্রাণীর নেই। তবু সৌন্দর্য সম্পর্কে খানিকটা অনুভূতি, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির রূপরসবোধ মানুষ ছাড়া অপর কোন প্রাণীর নেই একথা বোধ হয় বলা যায় না।

কয়েকটি বর্ণ, কয়েক ধরনের রূপরেখা এবং ধ্বনি মধুর আনন্দবোধ জাগিয়ে তোলে। আনন্দের এই অনুভূতি সৌন্দর্যরসোপলব্ধির দ্যোতক। এই সব বর্ণ, রূপরেখা বা ধ্বনির সৌন্দর্য সম্পর্কে খানিকটা বোধশক্তি না থাকলে মনে আনন্দের সাড়া জাগতে পারে না। প্রাণীসর্গেও এই জাতের সৌন্দর্যবোধ আছে। পক্ষী তার রঙীন পুচ্ছের বাহার পক্ষিনীর সামনে মেলে ধরে। আবার যে সব পাখীর তেমন পুচ্ছ নেই তারা ধরে না। এই আচরণ থেকে বলা যেতে পারে যে পক্ষিনী তার সাথীর পেখমের সৌন্দর্যের তারিফ করতে জানে। পাখীর পেখমের বাহার নিশ্চয় পক্ষিনীর নয়নানন্দকর। মানুষও এই পালককে সুন্দর বলে গ্রহণ করে। তা না হলে দেশ-দেশান্তরের নারী অঙ্গসজ্জার জন্য এই পালক অলংকার হিসাবে ব্যবহার করত না। এই পালক মানুষেরও নয়নানন্দকর বলেই না অলংকরণের জন্য তার কদর। আবার বহু জাতের পাখীর বাসা রঙ-বেরঙের পালক দিয়ে সাজান থাকে। তাতে বোঝা যায়, এই সব রঙীন জিনিস অবশ্যই তাদের মনে কোন-না-কোন আনন্দের সাড়া জাগায়।

তবে প্রাণী-রাজ্যের রূপরসবোধের একটা বিশিষ্ট প্রবণতা আছে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আকর্ষণের মোহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই যেন এই সৌন্দর্যবোধকে প্রধানতঃ চালিত করা হয়। মিলন-ঋতুতে পক্ষীর সুরেলা কণ্ঠ-ঝঙ্কার নিশ্চয় পক্ষিনীকে উদ্দীপিত করে, তার মধ্যে আকর্ষণের মোহ সৃষ্টি করে। তা যদি না করত, পক্ষিনী যদি পক্ষীর বিচিত্র বর্ণের পালক, তার বিবিধ অঙ্গসজ্জা আর কণ্ঠসঙ্গীতের মোহে আকৃষ্ট না হ'ত, তাহলে মিলন-প্রয়াসী পক্ষীর এত সাজসজ্জা, এত শ্রম, এত উৎকণ্ঠা অর্থহীন হয়ে পড়ত। তবে নির্দিষ্ট কয়েকটি রঙ কেন যে নন্দনবোধ জাগ্রত করে, কেন যে সেই রঙ দেখে মন আনন্দে সাড়া দেয় তার কারণ বলা শক্ত। অভ্যাসের সঙ্গে এই প্রক্ষোভের সম্পর্ক আছে সন্দেহ নেই।

আর অভ্যাসও উত্তরলব্ধ রুচি হিসাবে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। যাই হোক, চোখে দেখে আর কানে শুনে নন্দিত বোধ করার পেছনে যে কোন কারণই থাক না কেন, মানুষ এবং বহু জীবজন্তু যে এক জাতের বর্ণবৈচিত্র্য, রূপরেখা এবং একই ধরনের ধ্বনি শুনে প্রীত হয় তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়।

॥ ঈশ্বর ভক্তি ॥

সর্বত্র বিরাজমান বিধাতার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন বিশ্বাস শুধু প্রাণীসর্গে নেই তা নয়, মানুষের মধ্যেও এই অস্তিত্ববোধ সার্বজনীন নয়। অন্ততঃ তেমন প্রমাণের অভাব আছে। বহু জাতের বর্বর মানুষের ভাষায় ঈশ্বরবাচক কোন শব্দ নেই। একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বর অথবা দেবতা সম্পর্কে কোন ধারণা তাদের নেই। তবে ধর্মবিশ্বাস বলতে যদি অশরীরী অদৃশ্য আত্মার প্রতি বিশ্বাস বোঝায় তাহলে সেই বিশ্বাস সভ্যাসভ্য সকল মানুষের মধ্যে আছে।

সেই বিশ্বাসের কারণ অনুমান করা খুব কঠিন নয়। কল্পনাশক্তি, বিস্ময়, কৌতূহল আর সেই সঙ্গে খানিকটা বিচারবোধজাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মানসিক শক্তি বিকাশলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্বভাবতঃ তার চারপাশের অবস্থা এবং ঘটনার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করেছে। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে খানিকটা ভাসাভাসা অনুমান সে করতে চেয়েছে। সেই সঙ্গে স্বপ্নের ঘোরে সে বহু ছবি দেখেছে। বাস্তব ও কাল্পনিক ধারণার মধ্যে যে কোন পার্থক্য আছে বর্বর মানুষ সহজে একথা মনে করতে চায় না। তাই স্বপ্নের ঘোরে যে সব ছায়াছবি সে দেখেছে তাকে সে দূরাগত সত্তার মূর্তি বলে গ্রহণ করেছে। অথবা মনে করেছে যেন তার নিজের আত্মা পর্যটনে গিয়েছিল এবং সেই পর্যটনের স্মৃতি নিয়ে গৃহে ফিরেছে। তাই পণ্ডিতেরা মনে করেন, অশরীরী আত্মা সম্পর্কে প্রথম প্রত্যয় হয়ত স্বপ্ন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। তবে কল্পনাশক্তি মানুষের মধ্যে বেশ খানিকটা বিকাশলাভ না করা পর্যন্ত স্বপ্ন থেকে সে অদৃশ্য আত্মা সম্পর্কে আস্থাবান হতে পারেনি।

একবার যদি ভৌতিক সত্তা সম্পর্কে আস্থা জন্মে তাহলে সেই আস্থা অনায়াসে এক বা একাধিক দেবতার আস্তিক্যতায় রূপান্তরিত হতে পারে। কারণ বর্বর মানুষ স্বভাবতঃ বিশ্বাস করতে চাইবে যে তাদের নিজেদের মত এই সব ভৌতিক সত্তারও রিপুবশতা, প্রতিহিংসাবৃত্তি, ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ এবং অপরাপর হৃদয়বৃত্তি আছে।

ঈশ্বরভক্তি অতি জটিল মনোবৃত্তি। তার মধ্যে ভালবাসা, শঙ্কা, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, আশাবাদিতা জাতীয় মনোবৃত্তির পাশাপাশি নিশ্চিন্তে শরণলাভের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মহীয়ান এক রহস্যময় শক্তির কাছে বিনীত আত্মনিবেদনের প্রবণতা আছে। বুদ্ধিশক্তি ও মানসিক শক্তি বেশ উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত না হলে এই ধরনের প্রক্ষোভ অনুভব করা সম্ভব নয়। বুদ্ধি ও মানসিক শক্তির এতটা বিকাশ মানুষ ছাড়া অপর কোন প্রাণীর মধ্যে হয়নি। তবে কুকুরের প্রভুভক্তির মধ্যে এই জাতের দু'-একটা প্রবণতার ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায় বলে ডারউইন অনুমান করেন। তার প্রভুভক্তির মধ্যেও গভীর ভালবাসা, সম্পূর্ণ নতি স্বীকার, খানিকটা ভয় এবং হয়ত আরও কয়েক ধরনের মনোভাব আছে।

ভাষার বিকাশ

মানুষ আর মানবেতর প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যসূচক যতগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে ভাষা নিঃসন্দেহে তার অন্যতম। অসংকোচে একথা বলা যেতে পারে। এই ভাষার মাধ্যমে মানুষ যেমন মনোভাব প্রকাশের এবং মনোভাব বিনিময়ের অপার ক্ষমতা অর্জন করেছে তেমন ভাষা তাকে সমাজের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেছে। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে মনোগত ভাব প্রকাশের জন্য কণ্ঠ-সংকেত ব্যবহার করার ক্ষমতা এবং অপরে যে মনোভাব প্রকাশ করে মোটামুটিভাবে সেই ভাব উপলব্ধি করার ক্ষমতা প্রাণী হিসাবে একমাত্র মানুষেরই আছে তা নয়।

দক্ষিণ আমেরিকার পারাগুয়ে নামে এক দেশে এক শ্রেণীর বানর আছে যারা উত্তেজিত হলে সুস্পষ্ট বোধগম্য ছয় রকম কণ্ঠধ্বনি করতে পারে। তাদের স্বজাতের সমস্ত বানর এই ধ্বনির অর্থ বোঝে। এই ধ্বনি তাদের মধ্যে সাদৃশ প্রক্ষোভও সৃষ্টি করে। বানরের অঙ্গভঙ্গীর অর্থ যেমন মানুষের বোধগম্য তেমন বানরও মানুষের অঙ্গভঙ্গীর তাৎপর্য খানিকটা বোঝে। কুকুরের বন্য বংশপতি অবশ্যই কণ্ঠ-সংকেতের সাহায্যে মনোগত ভাব প্রকাশ করত। গৃহপালিত হবার পর কুকুর কমপক্ষে চার-পাঁচরকম সুরে ডাকতে শিখেছে। তার প্রতিটি ডাক সুস্পষ্ট অর্থব্যঞ্জক। কুকুরের উল্লাসধ্বনি, হতাশার ডাক, ক্ষুব্ধ কুকুরের ডাক আর তার অনুনয়ের ডাক ও নিশীথরাতের ডাকের পার্থক্য সুস্পষ্ট। গৃহপালিত কুক্কুটও দশ-বারোরকম কণ্ঠধ্বনি করতে পারে বলে হেজো নামে এক ফরাসী বিজ্ঞানী বলেছেন। কাজেই এই থেকে দেখা যায় যে মনোভাব প্রকাশের জন্য বিবিধ ধ্বনি একমাত্র মানুষেই উচ্চারণ করে না। আর সেই কণ্ঠ-সংকেত বোঝার ক্ষমতাও মানুষের একক বৈশিষ্ট্য নয়।

ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ সচরাচর স্পষ্ট ভাষা প্রয়োগ করে। এই অভ্যাস তার একক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এইভাবে মনোভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বোঝাবার জন্য মানবেতর প্রাণীর মত মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী করে সে অস্পষ্ট ধ্বনিও উচ্চারণ করে থাকে। ভয়, বিস্ময়, বেদনা কিংবা ক্রোধজাতীয় ভাব

প্রকাশের জন্ম অঙ্গভঙ্গী সহকারে যে সব ধ্বনি মানুষ ব্যবহার করে, কিংবা সন্তানকে আদর করার জন্ম মা যে সব অস্ফুট ধ্বনি উচ্চারণ করেন তার ব্যঞ্জনা কি স্পষ্ট কথার চেয়ে কম ?

অবশ্য মানুষের এই সব ধ্বনি সচরাচর এমন সব সরল ও স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশের জন্ম ব্যবহার করা হয় যার সঙ্গে উচ্চ মার্গের বুদ্ধির খুব যোগাযোগ নেই। তবু স্পষ্ট কথা ছাড়াও যে ভাব প্রকাশ করা যায় এবং মানুষও যে মাঝে মাঝে সেইভাবে ভাব প্রকাশ করে থাকে তার প্রমাণ এই দৃষ্টান্ত থেকে পাওয়া যায়।

মানুষ আর মানবেতর প্রাণীর পার্থক্য তাহলে কোনখানে ? স্পষ্টোচ্চারিত ধ্বনির অর্থ বুঝতে পারা না-পারার মধ্যে এই পার্থক্য নিহিত কি ? তাও বা কি করে বলা যায় ? একথা তো সুবিদিত যে গৃহপালিত কুকুর বহু শব্দের ও ছোট ছোট বাক্যের অর্থ বুঝতে পারে। এই দিক থেকে কুকুরের অবস্থা দশ-বারো মাসের মানবশিশুর সঙ্গে তুলনীয়। সেও বহু শব্দ এবং ছোট ছোট বাক্যের অর্থ বোঝে কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারে না।

আবার স্পষ্ট বাক্শক্তিও তো মানুষের একক বৈশিষ্ট্য নয় ! কারণ তোতা, ময়না, শালিক প্রভৃতি পাখীরও এই ক্ষমতা আছে। সুনির্দিষ্ট শব্দের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট ভাবের যোগাযোগ ঘটাবার ক্ষমতাও শুধুমাত্র মানুষের আছে বলে মনে করা যায় না। এক্ষেত্রেও তোতা পাখীর মধ্যে সমান্তরাল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এঙ্গেল্‌স বলেছেন, তোতা পাখী শুধুমাত্র শব্দ নকল করে না, নিজের কথার তাৎপর্যও সে বোঝে। ডারউইন এই প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। এক ইংরেজ নৌ-সেনাপতির বাড়িতে বহুদিনের পোষা একটি আফ্রিকার তোতা পাখী ছিল। এই পাখীটি ঘরের লোকজনকে, এমন কি আগন্তুকদেরও নাম ধরে ডাকতে শিখেছিল। প্রাতরাশের সময় সকলকে সে 'সুপ্রভাত' বলে সম্ভাষণ জানাত আবার রাত্রে 'গুড ইভনিং' বলে বিদায় সম্ভাষণ জানাত। অচেনা একটি কুকুরকে জানালা দিয়ে উঁকি মারতে দেখে একদিন সে না কি কুকুরটিকে ভর্ৎসনাও করেছিল !

তাহলে মানুষের বিশিষ্টতা কোথায় ? ডারউইন বলেছেন, ভাবের সঙ্গে ভাষার যোগসাধনের অপার ক্ষমতা আছে মানুষের। মানবেতর প্রাণীর সেই ক্ষমতা নেই। এইখানেই হচ্ছে মানুষের বৈশিষ্ট্য। বহু বিচিত্র ভাবের সঙ্গে বহু বিচিত্র ধ্বনির যোগসাধনের এই ক্ষমতা স্বভাবতঃ মানুষের মধ্যে সামাজিক জীবন ও উচ্চতর মানসিক শক্তির বিকাশের উপর নির্ভরশীল। জন্তুর মানসতা থেকে তার মানসতা বহুগুণ উন্নত বলে সে অভিনব কথার জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছে।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে ভাষা ঠিক সহজ প্রবৃত্তির পর্যায়ে পড়ে না, কারণ ভাষা শিখতে হয়। আবার আর্ট বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় তার সঙ্গেও ভাষার পার্থক্য আছে। কেন না, কথা বলার একটা সাহজিক প্রবণতা সমস্ত মানুষের আছে। শিশুর কথা বলার প্রয়াসের মধ্যে এই প্রবণতা সুপ্রকাশ। কথা বলার প্রবণতা দেখালেও কোন শিশু লেখার সাহজিক বৃত্তির পরিচয় দেয় না। ডারউইন ভাষাকে তাই 'অর্ধেক আর্ট এবং অর্ধেক সাহজিক বৃত্তি' বলে অভিহিত করেছেন।

এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের মধ্যে এই ভাষার উদ্ভব হল কি ভাবে। কেমন করে আদিমানবের মধ্যে কিংবা তার বংশপতির কণ্ঠে স্পষ্ট বাক্‌শক্তির উদ্ভব হল।

প্রথমে বলে রাখা দরকার যে স্বেচ্ছাকৃত আবিষ্কারের ফলে ভাষার উদ্ভব হয়েছে এই দাবি কোন ভাষাবিদ্ করেন না। ভাষাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে গণ্য করার দাবিও এখন আর তেমন সোচ্চারে উঠছে না। বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তার মধ্যে ভাষার উদ্ভব হতে পারে বলেও মনে করা হয় না। বরং এই অভিমত মোটামুটি সমর্থিত হচ্ছে যে ক্রমে ক্রমে ধীর-মন্থরে ভাষার বিকাশ হয়েছে। ভাষার বিকাশ-পদ্ধতি সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে মতভেদ থাকলেও তার অঙ্কুর যে মানবেতর প্রাণীর প্রক্ষোভব্যঞ্জক ধ্বনির মধ্যে নিহিত এই অনুমান অনেক ভাষাবিদ্ পণ্ডিত করে থাকেন।

পাখীর কাকলির সঙ্গে বেশ কয়েকটি বিষয়ে ভাষার তুলনা করা যেতে পারে। কাকলিধ্বনির মধ্যে যেন ভাষার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কারণ ভাব প্রকাশের জন্য এক জাতের সমস্ত পাখী এক ধরনের সহজ প্রবৃত্তিগত রব করে থাকে। গায়ক পক্ষিদলও সহজ প্রবৃত্তির প্রেরণায় তাদের গান গাইবার শক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু স্বজাতের আসল গান বা ডাকার রবটি জনিতা অথবা পালক-জনিতার কাছ থেকে শিখে নিতে হয়।

কথা বলা মানুষের পক্ষে যতটা সাহজিক বৃত্তি কাকলিধ্বনি করার প্রবণতাকে তার চাইতে বেশী সাহজিক বৃত্তি বলা যায় না। তার কারণ হিসাবে এক পক্ষিবিদ্ বলেছেন, পক্ষিশাবকের প্রথম গান গাইবার প্রচেষ্টাকে মানবশিশুর কথা বলার অক্ষম প্রয়াসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মদ্দা শাবকগুলি দশ-এগারো মাস এইভাবে গানের মহড়া দিয়ে যায়। সেই গান-সাধার সঙ্গে তাদের ভাবী গানের কোন মিল প্রথম দিকে থাকে না। পক্ষিশাবকের বয়স যত বাড়ে তার গলা-সাধার মধ্যে ভাবী গানের সুর তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশেষে সত্যাই একদিন সে স্বজাতির

গান গেয়ে ওঠে। এই দৃষ্টান্ত থেকে মনে করা যায় যে আর্টের অনুশীলনবৃত্তি প্রাণী-জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই আছে তা নয়।

মানুষের কণ্ঠে স্পষ্ট বাক্‌শক্তির উদ্ভব প্রসঙ্গে বলা যায়, জিহ্বা আর স্বরযন্ত্রের পেশীর উপর চেষ্টীয় নার্ভের সুনিয়ন্ত্রিত প্রভাব এবং এই সব অঙ্গচালনার ফলে পেশীর মধ্যে যে সংবেদন সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে শ্রবণশক্তির অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগের ফলে স্পষ্ট বাক্‌শক্তির স্ফুরণ হয়েছে। মস্তিষ্কের এক সুনির্দিষ্ট অংশে, বিশেষতঃ কানের ঠিক উপরে বাক্‌শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি চেষ্টীয় এবং সংবেদন নার্ভের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। আদিমমানুষের জীবাশ্মের কয়েকটির রগে স্ফীতির লক্ষণ দেখে অনুমান করা হয় যে বাক্‌শক্তি তাদেরও ছিল। তবে আধুনিক মানুষের মধ্যে মস্তিষ্ক এবং নার্ভতন্ত্রের উন্নতি প্রায় যুগপৎ হয়েছে। আর জিহ্বার উন্নতিও হয়েছে সেই সঙ্গে। তার ফলে আধুনিক মানুষের পক্ষে বহু বিচিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করা সম্ভব।

এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কি কারণে এই পরিবর্তন হল। কোন্ প্রেরণার ফলে আদিমানব বা তার বংশপতির স্বরযন্ত্র পরিবর্তিত হয়ে বাঙ্ময় হয়েছিল। এই সম্পর্কে যত মতামত প্রকাশিত হয়েছে তার কোনটি চূড়ান্ত বলে স্বীকৃতি পায়নি। সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিই মোটামুটি অনুমানের উপর নির্ভর। সেই সুদূর অতীতে প্রাগৈতিহাসিক কালের এক দূরতম পর্যায়ে মানুষ বা তার বংশপতির কণ্ঠে কোন্ প্রেরণার ফলে স্পষ্টোচ্চারিত বাক্‌শক্তির বিকাশ হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন সংশয়াতীত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। বর্তমানে এই তথ্য জানাও সম্ভব নয়। কাজেই পণ্ডিতেরা এই প্রসঙ্গে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বক্তব্য পেশ করেছেন। সংক্ষেপে, কয়েকটি মতামত উল্লেখ করছি।

॥ এঙ্গেল্‌সের বক্তব্য ॥

কমিউনিস্ট মতবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মনীষী ফ্রেড্‌রিখ এঙ্গেল্‌সের মতামতের খানিকটা আভাস ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে ভাষার উদ্ভবের প্রশ্নটি শ্রমের সঙ্গে জড়িত। তিনি মনে করেন, শ্রমের উন্নতির ফলে সমাজের সভ্যেরা পরস্পর ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ পারস্পরিক নির্ভরতা এবং যৌথ কর্মোদ্যমের সুবিধাবোধ তাদের একত্রিত করেছে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলতে চলতে মানুষের বংশপতিরা এক সময়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছোয় যখন তাদের মধ্যে বক্তব্য প্রকাশের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। এই প্রেরণার ফলে বাক্‌শক্তি সংশ্লিষ্ট অঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে এবং বনমানুষের অনুন্নত স্বরতন্ত্র ধীর-মন্থরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে

স্বর-ঝংকার সৃষ্টি করার সামর্থ্যের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হয়েছে এবং মুখযন্ত্র ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি স্পষ্টোচ্চারিত অক্ষর উচ্চারণ করতে শিখেছে।

শ্রম থেকে এবং শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টোচ্চারিত ভাষার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে এই ব্যাখ্যাকে তিনি 'একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা' বলে মনে করেন। তিনি বলেছেন, পরস্পরকে জানাবার মত সামান্য যেটুকু বক্তব্য বিভিন্ন প্রাণীর আছে সেই বক্তব্য উচ্চতর পর্যায়ের প্রাণীও স্পষ্টোচ্চারিত ভাষা ছাড়া কণ্ঠ-সংকেতের সাহায্যে জানাতে পারে। কথা বলতে না পারার জন্য অথবা মানুষের কথা না-বোঝার অক্ষমতার জন্য কোন প্রাণী প্রাকৃতিক প্রতিবেশের মধ্যে অসুবিধা বোধ করে না। কিন্তু মানুষের অনুষঙ্গ লাভের পর সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা দেখা দেয়। মানুষের অনুষঙ্গ লাভ করে ঘোড়া ও কুকুরের শ্রুতিশক্তি এমনভাবে শিক্ষিত হয়েছে যে স্পষ্টোচ্চারিত অনেক শব্দের অর্থ তারা বুঝতে পারে। এমন কি এই সব গৃহপালিত জন্তু মাঝে মাঝে এমন ভাব প্রকাশ করে যেন কথা বলতে না পারার অক্ষমতাকে তারা ত্রুটি বলে অনুভব করছে। কিন্তু এই ত্রুটি সংশোধনের উপায় এখন আর নেই। কেন না তাদের স্বরযন্ত্র অন্যদিকে বিশেষভাবে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। অর্থাৎ প্রতিবেশের পরিবর্তন নতুন প্রেরণা সঞ্চার করলেও সংশ্লিষ্ট অঙ্গের ভিন্নমুখী বিশিষ্টতার জন্য কথা বলার অক্ষমতা দূর করা সম্ভব হয়নি। তবে ভিন্নমুখী বিশিষ্টতা যদি না থাকে, স্বরতন্ত্র যদি স্পষ্ট শব্দোচ্চারণের ক্ষমতাবান থাকে তাহলে কিন্তু নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে এই অক্ষমতা দূর করা যায়। পাখীর বাক্‌যন্ত্র মানুষের বাক্‌যন্ত্র থেকে আলাদা। তবু প্রাণীসর্গের মধ্যে একমাত্র পাখীরা কথা বলতে শিখতে পারে এবং যেটির কণ্ঠস্বর সবচেয়ে বিকট সেই তোতা পাখী সবচেয়ে ভাল কথা বলে।

॥ সামাজিক পটভূমির গুরুত্ব ॥

ভাষার ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে এঙ্গেল্‌সের অভিমতের মধ্যে শ্রমের ভূমিকার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হলেও সামাজিক জীবনের পটভূমির আবশ্যকতার কথাও বলা হয়েছে। শ্রমের উন্নতি সামাজিক জীবনেরও উন্নতিসাধন করেছে। ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্পর্কবিশিষ্ট গোষ্ঠীজীবনের অস্তিত্ব না থাকলে ভাষার বিকাশ যে সম্ভব নয় বহু পণ্ডিত জোর দিয়ে একথা বলে থাকেন। আদিমতম মানব-পরিবার বলতে যে সংকীর্ণ গোষ্ঠীজীবন বোঝায় তার মধ্যেও ভাষার বিকাশ সম্ভব নয় বলে মনে করা হয়। অধ্যাপক কারভেথ রীড বলেছেন, মুষ্টিমেয় ব্যক্তি নিয়ে গড়া গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থাৎ আদিমানব-পরিবার বলতে যা বোঝান হয় তার মধ্যে

ভাষার বিকাশ সম্ভব হতে পারে না। তাঁর মতে ভাষার বিকাশের জন্ত ব্যাপক-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অতি ঘনিষ্ঠ সামাজিক জীবনের পটভূমি প্রয়োজন। মিঃ রবার্ট ব্রিফল্ট বলেছেন, ভাষার মূল সামাজিক বৃত্তির মধ্যে নিহিত। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সামাজিক বৃত্তি দৃঢ় হয়, সমাজের সংহতি বৃদ্ধি পায়, ভাষার বিকাশের পক্ষেও সেই অবস্থা অনুকূল।

আমরা যাকে শব্দ বলি সেই শব্দ এক একটি নির্দিষ্ট ধ্বনি অথবা একাধিক ধ্বনির সমষ্টি। এই শব্দ যেমন ব্যক্তির আবেগ বা রস প্রকাশক তেমনি আবার হয়ত বাইরের জগতের কোন-না-কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা ঘটনার দ্যোতক। কিন্তু বাইরের কোন বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে কোন ধ্বনি বা শব্দের যোগাযোগ শুধুমাত্র সামাজিক সমঝোতার ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সমাজের সকলের যদি সম্মতি থাকে, শব্দের যদি সর্বজনবোধ্য এবং সর্বজনস্বীকৃত সামাজিক অস্তিত্ব থাকে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি শব্দ যে নির্দিষ্ট একটি বস্তু বা ঘটনার দ্যোতক একথা সকলে যদি মেনে নেয়, তাহলেই শব্দের অর্থ থাকতে পারে অথবা শব্দ দিয়ে কোন বস্তু বা ঘটনাকে বোঝান যেতে পারে।

তাছাড়া ভাষা শুধু বোধগম্য শব্দোচ্চারণের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ নয়। ভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে নির্বাক্ অঙ্গভঙ্গী, এমন কি চিত্রাঙ্কণও ভাষার সম্পূরক। অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যেও মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করা যেতে পারে। কিন্তু এই অঙ্গভঙ্গীরও একটা সামাজিক তাৎপর্য থাকা আবশ্যক। কি রকম অঙ্গভঙ্গী করলে কি বোঝাবে সে সম্পর্কে একটা সামাজিক সমঝোতা থাকা চাই। তা না হলে ইঙ্গিত অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাজেই কথার মত এই অঙ্গভঙ্গীরও সর্বজনস্বীকৃত একটা নির্দিষ্ট সামাজিক তাৎপর্য আছে যা সকলের বোধগম্য।

এই সব কারণে মনে করা হয় যে সামাজিক জীবনের পটভূমি ছাড়া স্পষ্ট বাক্শক্তির বিকাশ সম্ভব নয়। সোজা কথায়, মানুষের ভাষা মূলতঃ তার সমাজ-জীবনের সৃষ্টি।

তাছাড়া ভাষা জিনিসটি শিখতে হয়। কাজেই মানব-বিকাশের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের যে পর্যায়টি আছে তার সঙ্গেও ভাষার বিকাশের গভীর সম্পর্ক আছে।

মানবশিশুর পরনির্ভরশীল অসহায় অবস্থা দীর্ঘতম। তাছাড়া জন্মলগ্নে তার করোটি আলগাভাবে জোড়া লাগান থাকে। মাথার খুলি শক্ত হতেও অনেক বেশী সময় লাগে। কাজেই মানবশিশুর মস্তিষ্কের বাড়তির সুযোগ অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বেশী। আবার তার মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনাও সমধিক। তাছাড়া সামান্য গুটিকয়েক সাহজিক বৃত্তি নিয়ে সে ভূমিষ্ঠ হয়। এই সাহজিক

বৃত্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কয়েকভাবে সাড়া দেবার ক্ষমতা তার থাকে—কয়েক প্রকার স্বতঃক্রিয় অঙ্গচালনাও করতে পারে।

এই অবস্থায় মানবেতর প্রাণীর শাবকের মত মানবশিশুকেও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখতে হয় যে বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়লে কি ভাবে সাড়া দিতে হবে। কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ সাড়া যথাযথ হবে। আবার বাইরের কোন ঘটনার সম্মুখীন হলে কি ভাবে অঙ্গচালনা করতে হবে সেই শিক্ষাও নিতে হয়। সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের মধ্যে সংবেদ ও চেষ্টীয় নার্ভের সংযোগসাধন করে মনে রাখার ব্যবস্থা পোক্ত করে নিতে হয়। এই ধরনের শিক্ষা গ্রহণের রীতি মানবকুল ও প্রাণিকুল উভয়ের মধ্যে আছে। কিন্তু মানুষের শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতির মধ্যে খানিকটা বিভিন্নতা আছে। প্রাণিশাবক শুধু দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। বিড়াল-জননী জ্যান্ত ইঁদুর বা আরশোলা ধরে এনে শাবককে শিকার ধরা শেখায়। মানবশিশুর শিক্ষা শুধু দৃষ্টান্তের মারফত হয় না। তাকে উপদেশও দেওয়া হয়। এই উপদেশ সে বাক্‌শক্তির মাধ্যমে পায়।

শিশুকে কথা বলতে শেখান মানুষের শিক্ষার অন্যতম মূল ভিত্তি। কথা বলতে শেখান মানে নির্দিষ্ট ছাঁদে কিছু ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত করা। সেই ধ্বনি বা শব্দ যে বস্তু বা ঘটনার দ্যোতক তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। একবার যদি কথা শেখান যায় তাহলে ভাষার সাহায্যে অনায়াসে বলে দেওয়া যায় যে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পড়লে কি করতে হবে। বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে সব কথা শেখান যায় না। বাঘে আক্রমণ করলে কি করতে হবে একথা বোঝাবার জন্য শিশুকে বাঘের আক্রমণ দেখান যেমন সম্ভব নয় তেমন বিপজ্জনকও বটে। এই সব ক্ষেত্রে ভাষার সাহায্য নেওয়া হয়। আগে থাকতে বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে বিপদকালে যথোচিত কর্মপন্থা কি হবে বলে দেওয়া হয়।

ভাষার মাধ্যমে শিশুকে যখন শেখান হয় (জনিতাই যদিও তার আদি শিক্ষক) তখন শিক্ষক তার মধ্যে শুধু নিজের অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেন না। শিশুকে তখন সমাজের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার মন্ত্রে দীক্ষিত করা হয়। এক একটি ভাষা এক একটি মানবগোষ্ঠীর ভাব-বিনিময়ের যোগসূত্র। তার মানে উচ্চারণের পদ্ধতি এবং শব্দের অর্থ সম্পর্কে যারা অভিন্ন ধারণা পোষণ করে তাদের যোগসূত্র। যে কোন একজন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলে সকলের পক্ষে তার অর্থ বা তাৎপর্য বোঝা সম্ভব। এইভাবে সকলের অভিজ্ঞতা ভাষার মধ্যে সঞ্চিত হয়। কাজেই ভাষার মধ্য দিয়ে মানবশিশু সমাজের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় লাভ করে। পুরুষানুক্রমে এই ঐতিহ্য উত্তরপুরুষের কাছে সমর্পিত হচ্ছে।

ভাষার মারফত ঐতিহ্য হস্তান্তরের এই রীতি মানবসমাজের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। মানুষের অগ্রগতির পথে তার তাৎপর্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

।। ম্যাক্সমুলারের মত ।।

মনীষী ম্যাক্সমুলার কিন্তু ভাষা এবং চিন্তার অভেদত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এমন কোন চিন্তা থাকতে পারে না যার ভাষা নেই। আবার এমন কোন শব্দও নেই যা কোন-না-কোন চিন্তার সূচক নয়। কাজেই ভাষা ছাড়া চিন্তা করা একেবারেই অসম্ভব। তাঁর মতে সাধারণ ধারণা গঠন করার ক্ষমতা ব্যতীত ভাষার ব্যবহার সম্ভব নয়। এই ক্ষমতা মানবেতর প্রাণীর নেই বলে তাদের সঙ্গে মানুষের অনতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে।

ম্যাক্সমুলারের বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে স্পষ্ট বাক্‌শক্তির উদ্ভবের সঙ্গে মানুষের সাধারণ ধারণা গঠন করার ক্ষমতার প্রশ্ন জড়িত। এই অভিমতের সমালোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিতমণ্ডলী কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। প্রথমতঃ, কুকুরের যে দৃষ্টান্তটি ডারউইন দিয়েছেন তার কথা স্মরণ করলে একথা জোর করে বলা যায় না যে মানবেতর প্রাণী সাধারণ ধারণা গঠনের ক্ষমতাহীন। তাছাড়া সাধারণ ধারণা গঠন করার ক্ষমতা ব্যতীত ভাষা ব্যবহার করা যদি সম্ভব না হয় তবে দশ-এগারো মাসের মানবশিশু যখন দু'-একটি কথা বলে তখন তার মধ্যে সাধারণ ধারণা গঠন করার ক্ষমতার উন্মেষ হয়েছে স্বীকার করতে হয়। এই ক্ষমতাকে যদি সহজাত শক্তি বলে গণ্য না করা হয় তাহলে দশ-এগারো মাসের শিশু কতকগুলি সাধারণ ধারণার সঙ্গে কতকগুলি নির্দিষ্ট শব্দের চটপট যোগসাধন করতে পারে এই অনুমান খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা যায় না।

বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক হুইটনি বলেছেন, ভাষা সম্পর্কে ম্যাক্সমুলারের সংজ্ঞা মেনে নিলে, যে মানবশিশুর কথা ফোটেনি তাকে ঠিক মানুষ বলা যায় না। আবার মূকবধীর মানুষ যে পর্যন্ত আঙুল নাড়তে না শেখে, অর্থাৎ হাতের ইশারায় ভাব প্রকাশ করতে না শেখে, সে পর্যন্ত তার মধ্যে বিচারশক্তির উন্মেষ হয়েছে বলা যায় না। চিন্তা সম্পর্কে ম্যাক্সমুলারের সংজ্ঞাকে 'অদ্ভুত সংজ্ঞা' আখ্যা দিয়ে অধ্যাপক হুইটনি বলেছেন, ভাষা যে চিন্তার অত্যাবশ্যকীয় সহকারী সে বিষয়ে সংশয় নেই। চিন্তাশক্তির উন্নতির পক্ষেও ভাষা অপরিহার্য। তবু এই সিদ্ধান্ত যদি করা হয় যে ভাষা ব্যতীত চিন্তা করা একেবারে অসম্ভব তাহলে চিন্তা তার বাহনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। এই যুক্তি অনুসারে একথাও তাহলে বলতে হবে যে হাতিয়ার ছাড়া মানুষের হাত কাজ করতে অসমর্থ।

।। ডারউইনের অভিমত ।।

ভাষার বিকাশ প্রসঙ্গে ডারউইন মনে করেন যে অন্যান্য প্রাণীর বিচিত্র কণ্ঠ-সংকেত, প্রাকৃতিক শব্দ আর মানুষের সহজ প্রবৃত্তিসঞ্জাত ধ্বনি এবং অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করতে করতে এবং সেই সব অনুকৃত ধ্বনির ক্রমপরিবর্তনের ফলে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। তাঁর ধারণা, আদিমানব অথবা মানুষের প্রাক্‌মানবীয় বংশপতি খুব সম্ভবতঃ ইদানীং কালের কোন কোন জাতের গিবনের মত সুরের ঝংকার সৃষ্টি করার জন্য অর্থাৎ গান গাইবার উদ্দেশ্যে তার কণ্ঠ ব্যবহার করেছিল। স্ত্রী-পুরুষের প্রেমোৎসবেও এই কণ্ঠ ভালবাসা, ঈর্ষা এবং উল্লাসজাতীয় আবেগ প্রকাশের জন্যে ব্যবহার হয়ে থাকবে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যও কণ্ঠ ব্যবহৃত হয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। কাজেই ডারউইন এই সম্ভাবনাকে সমধিক বলে মনে করেন যে স্পষ্টোচ্চারিত শব্দের মাধ্যমে সুরেলা ধ্বনি অনুকরণ করতে করতে বিভিন্ন জটিল প্রক্ষোভব্যঞ্জক ভাষার ক্রমান্বয়ে উদ্ভব হয়েছে।

মানুষের যারা নিকটতম আত্মীয় সেই বানর এবং অসভ্য মানুষের মধ্যে অনুকরণবৃত্তি খুব প্রবল। যা শোনে তাই নকল করার চেষ্টা করে। বানরকে লক্ষ্য করে মানুষ যা বলে তার অনেকটা সে বুঝতে পারে। আবার বিপদের সম্ভাবনা টের পেলে জঙ্গলী বানর বিপদ-সংকেতধ্বনি করে দলের সকলকে হুঁশিয়ার করে দেয়। এই সংকেতধ্বনির তাৎপর্য দলের সকলেই বোঝে। তা যদি হয় তাহলে অসাধারণ বিচক্ষণ বনমানুষাকার কোন প্রাণীও যে হিংস্র শ্বাপদের গর্জন নকল করতে পেরেছে এবং সেইভাবে দলের সকলকে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে পেরেছে এই অনুমান করা যায় না কি? এই সম্ভাবনাকে ডারউইন ভাষা সৃষ্টির প্রথম সোপান বলে অভিহিত করেছেন।

তারপর কণ্ঠস্বর যত ব্যবহৃত হয়েছে, কণ্ঠ সংশ্লিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহারের ফলে ভাষা তত শক্তিশালী হয়েছে এবং ব্যবহারের উত্তরলব্ধ প্রভাব অনুযায়ী ক্রমোন্নতি লাভ করেছে। বাক্‌শক্তির উপর এই প্রভাবের প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে ডারউইন মনে করেন।

তবে নিরবচ্ছিন্ন ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার সঙ্গে মস্তিষ্কের উন্নতির সম্পর্ক অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক কালের বনমানুষের চাইতে অনেক বেশী উন্নত মানসিক শক্তির অধিকারী না হলে মানুষের প্রাক্‌মানবীয় বংশপতি অস্পষ্ট বাক্‌শক্তিও অর্জন করতে পারেনি। তবে বাক্‌শক্তির ক্রমাগত ব্যবহার ও

উন্নতি অবশ্যই মন ও মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তার ফলে পরস্পর সংযুক্ত দীর্ঘ চিন্তা করার প্রেরণা পাওয়া গেছে এবং সেইভাবে চিন্তা করা সম্ভব হয়েছে। অঙ্কের সাহায্য ছাড়া যেমন দীর্ঘ গণনা সম্ভব নয় তেমন ভাষার সাহায্য ছাড়া জটিল বিষয়ে একটানা বেশীক্ষণ চিন্তা করা যায় না।

বাক্‌শক্তির সঙ্গে মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের রহস্য কিন্তু কয়েকটি অসুখের মধ্যেও ধরা পড়ে। মস্তিষ্কের এমন কয়েকটি অসুখ আছে যার মধ্যে স্মৃতিশক্তি লোপ পায় আর বাক্‌শক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্ক এবং কণ্ঠস্বর সংশ্লিষ্ট অঙ্গের গঠন ও ক্রিয়াপদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এঙ্গেল্‌স এই পরিবর্তনের উপর জোর দিয়ে বলেছেন, প্রথমে শ্রম এবং তারপর বাক্‌শক্তি—এই দুটি অত্যাবশ্যকীয় উদ্দীপকের প্রভাবাধীনে বনমানুষের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার মস্তিষ্কের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার সহায়ক ইন্দ্রিয়স্থানের উন্নতি হয়েছে। বাক্‌শক্তির ক্রমবিকাশ যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রমোন্নতিসাধন করেছে তেমন মস্তিষ্কের উন্নতির সাথে সাথে সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থান উন্নত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কথা উঠতে পারে যে কথা বলার জন্য এখন আমরা যে সব অঙ্গ ব্যবহার করে থাকি অপরাপর অঙ্গের পরিবর্তে সেই অঙ্গ প্রথমে কেন উন্নত হল ?

তার জবাবে ডারউইন বলেছেন, মানুষের কণ্ঠস্বর সংশ্লিষ্ট অঙ্গের সদৃশ গঠন-পদ্ধতির অঙ্গ সাধারণতঃ সমস্ত উচ্চ পর্যায়ের প্রাণীর আছে। এই অঙ্গকে তারা মনোভাব বিনিময়ের জন্য ব্যবহার করে থাকে। কাজেই মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতার যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে স্বভাবতঃ কণ্ঠস্বর সংশ্লিষ্ট অঙ্গের উন্নতিবিধান করতে হবে। সন্নিহিত আরও দুটি অঙ্গ অর্থাৎ জিহ্বা আর ওষ্ঠের সহায়তায় এই উন্নতি সাধিত হয়েছে।

কথা বলার জন্য বনমানুষ তার কণ্ঠস্বর সংশ্লিষ্ট অঙ্গ ব্যবহার করতে পারে না সত্য, তবে কথা বলার উপযোগী অঙ্গ তাদেরও আছে। দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাস করে গেলে সেই অঙ্গের সাহায্যে কথা বলার ক্ষমতা হয়ত অর্জন করা যেত ; কিন্তু যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারেনি বলে তাদের পক্ষে কথা বলা সম্ভব হয়নি। এমন দৃষ্টান্ত প্রাণীসর্গে আরও আছে। নাইটিংগল এই স্বরযন্ত্র দিয়ে সুরের ঝংকার সৃষ্টি করে, কিন্তু কাকের পক্ষে কা-কা ছাড়া অন্য কোন রব করা সম্ভব হয় না।

॥ ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ঐক্যমত ॥

ভাষার বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে যে কয়েকটি অভিমতের কথা বলা হয়েছে তা থেকে বাক্‌শক্তির উদ্ভব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা গঠন করা যেতে পারে। এই বিষয়ে কোন মতই যে সংশয়াতীতভাবে পণ্ডিতমহলের স্বীকৃতি পায়নি সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে সম্ভাব্যতার দিক থেকে যে সব মত ব্যাপকভাবে স্বীকৃত তার কয়েকটির খানিকটা আভাস দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আলোচনা স্বভাবতই অসম্পূর্ণ। আরও দু' চারজন পণ্ডিতের বক্তব্য যোগ করলে আলোচনার পটভূমি বিস্তৃত হয়। কিন্তু তার মধ্যেও সম্ভাব্যতার অনুমান ছাড়া ভাষার উদ্ভব প্রসঙ্গে নতুন কোন দিশা পাওয়া যায় না। তবে কোন্ প্রেরণার ফলে মানুষের কণ্ঠ বাঙ্ময় হয়েছিল এবং সেই প্রেরণার প্রকৃতি কি ছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে মতভেদ থাকলেও কয়েকটি মূল প্রশ্ন সম্পর্কে অধিকাংশ পণ্ডিত মোটামুটি একমত।

মানবজাতির কণ্ঠে স্পষ্ট বাক্‌শক্তির উদ্ভব যে ধীর-মন্থরে ক্রমে ক্রমে হয়েছে সে বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ মতানৈক্য নেই। ভাষার অঙ্কুরও যে মানবেতর প্রাণীর রস ও প্রক্ষোভব্যঞ্জক কণ্ঠ-সংকেতের মধ্যে নিহিত সেকথাও মোটামুটি স্বীকৃত। বিভিন্ন ভাষার গঠন প্রণালীর মধ্যে এই মন্থর ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত বহু শব্দের গঠনরীতি অনুধাবন করে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে মানবজাতির উদ্ভবের পূর্বেই সেই সব শব্দের উদ্ভব হয়েছে। উদ্ভূত ও গঠন প্রণালীর স্বজাত্যের জন্য বিভিন্ন ভাষার বহু শব্দের মধ্যেও বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। এমন কি বিভিন্ন ভাষার রূপান্তর এবং বিকাশ-পদ্ধতির মধ্যেও জীব-প্রজাতির বিকাশধারার কতকগুলি বিধিবিধানের সাদৃশ্য আছে।

দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। জীব-প্রজাতির মত ভাষাকেও উৎপত্তিগতভাবে শাখা-প্রশাখায় ভাগ করা যেতে পারে। বলিষ্ঠ ভাষা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার প্রভাবাধীন এলাকার অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভাষার ক্রমাবলুপ্তি ঘটায়। কোন ভাষা একবার যদি অবলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে জীব-প্রজাতিব মত তার পুনরুদ্ভব হতে পারে না। অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অক্ষর বা ধ্বনি এমনভাবে বদলে যায় যেন সেই পরিবর্তনের পেছনে পারম্পর্যের সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। শব্দের মধ্যে উপযোগিতাহীন অক্ষরের বর্তমানতার সাদৃশ্য আরও বিস্ময়কর। কিছু কিছু শব্দ বানান করতে গিয়ে এখনও এমন সব অক্ষর ব্যবহার করা হয় সমকালীন

উচ্চারণ রীতির দিক থেকে যার কোন উপযোগিতা নেই। এই সব উপযোগিতাহীন অক্ষর সাবেকদিনের উচ্চারণ-পদ্ধতির স্মারক। জীবদেহে সাবেক অঙ্গলক্ষণের অস্তিত্বের সঙ্গে এই লক্ষণের কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! কোন ভাষার জন্ম যেমন আলাদা দুই স্থানে হয় না তেমন আলাদা ভাষার সংমিশ্রণ এবং সমন্বয়ও সম্ভবপর। তাছাড়া জীব-প্রজাতির মত প্রতিটি ভাষার মধ্যে প্রকারণ-বৈচিত্র্য আছে। প্রতিনিয়ত তার মধ্যে নতুন নতুন শব্দ সংযোজিত হচ্ছে। আবার এক একটি শব্দ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই পদ্ধতিকে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার 'শব্দের রাজ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রাম' আখ্যা দিয়েছেন।

এই যে সব সাদৃশ্যের উল্লেখ করা হল তার বলে এই অনুমান জোর দিয়ে করা হয় যে জীব-প্রজাতির ক্রমবিকাশের মত মানুষের ভাষার পেছনেও ক্রমবিকাশের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। মানবকণ্ঠে উচ্চারিত বিভিন্ন ভাষার মধ্যে এই ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান।

সামাজিক বৃত্তি

মানুষ যে সামাজিক জীব এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। প্রাণীসর্গে যত জীব আছে তার মধ্যে মানুষই যে সবচেয়ে বেশী সামাজিক সেকথাও সর্ববাদীসম্মত। নিঃসঙ্গতার প্রতি মানুষের বিরাগ, নিজের পরিবারের গণ্ডীর বাইরের মানুষের সঙ্গ লাভেচ্ছা আর তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার প্রবণতার মধ্যে এই সামাজিক বৃত্তি সুপরিস্ফুট। নির্জন কক্ষে নিঃসঙ্গ বন্দীত্বকে মানুষ কঠোরতম পীড়াদায়ক শাস্তি বলে গণ্য করে। এই শাস্তিবোধও তার সঙ্গকামিতার দ্যোতক।

অধিকাংশ বনমানুষশ্রেণীর জীবের দৃষ্টান্ত বিচার করে পণ্ডিতেরা এই অনুমান করেন যে মানুষের বনমানুষাকার বংশপতিও সম্ভবতঃ মানুষের মত সামাজিক জীব ছিল। পণ্ডিত এঙ্গেল্‌স বলেছেন, আমাদের বানরাকার বংশপতি যূথচারী প্রাণী ছিল। মানুষের মত সর্বাপেক্ষা সামাজিক প্রাণী যূথচারী নয় এমন কোন পূর্বপুরুষের বংশে উদ্ভূত হয়েছে এই অনুমান করা এবং তাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম। যূথচারিতাকে একদল পণ্ডিত আবার সাচ্চা সামাজিক সম্পর্ক বলে গণ্য করতে চান না। স্থানীয় একদল প্রাণী সঙ্ঘবদ্ধ হলে সেই জোঁটবাঁধাকে তাঁরা সামাজিক সংহতিবোধের পরিচয় বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। কিন্তু যূথচারী প্রাণীর মানসিক প্রবণতা, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি এবং আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য বলে মনে হবে যে তাদের মধ্যেও সামাজিক সহজপ্রবৃত্তির প্রেরণা আছে। সামাজিক সহজ প্রবৃত্তি বলতে অবশ্য সন্তানের প্রতি জনিতার আকর্ষণ আর জনিতার প্রতি সন্তানের আকর্ষণও বোঝায়। পুনরুৎপাদনকল্পে যৌন জোড়-বাঁধার প্রবণতাও সেই দিক থেকে সামাজিক বৃত্তির সূচক।

।। সামাজিক বৃত্তির লক্ষণ ।।

সামাজিক বৃত্তির প্রেরণায় যে কোন প্রাণী সহচরদের সাহচর্যে আনন্দবোধ করে, তাদের প্রতি খানিকটা সহানুভূতিসম্পন্ন হয় এবং নানাভাবে তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে। এই সাহায্য সুনির্দিষ্ট এবং সাহজিক প্রকৃতির হতে পারে।

আবার সুনির্দিষ্ট উপায়ে সহচরদের সাধারণভাবে সাহায্য করার ইচ্ছা বা সম্মতির মধ্যেও এই বৃত্তি অভিব্যক্ত হতে পারে। এই ধরনের সাহায্য করার উদাহরণ অধিকাংশ উচ্চতর পর্যায়ের যূথচারী প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায়। তবে এই ধরনের প্রেরণা অথবা সাহায্য করার ইচ্ছা কেবলমাত্র স্বদলভুক্ত সহচরদের সম্পর্কেই অনুভূত হয়ে থাকে। নিজের প্রজাতির সমস্ত প্রাণী সম্পর্কে অনুভূত হয় না। এই নিয়ম মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। স্বদলীয় সহচরদের সম্পর্কে অসভ্য বর্বর মানুষ যে মনোভাব পোষণ করে ভিন্ন দলের মানুষ সম্পর্কে তেমন মনোভাব নিশ্চয়ই পোষণ করে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। সামাজিক বৃত্তির ক্ষেত্রে সহানুভূতিবোধের প্রশ্নটি অসীম গুরুত্বসম্পন্ন, বলতে গেলে সামাজিক বৃত্তির মূল ভিত্তি। আবার ব্যক্তির অভ্যাসও চূড়ান্ত বিচারে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। কেন না সহানুভূতিবোধসহ সামাজিক সহজ প্রবৃত্তি-সমূহ অভ্যাসের ফলে শক্তিশালী হয়। সমাজের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্যও তার ফলে শক্তিশালী হয়ে থাকে।

এই দিক থেকে বিচার করে যে সব প্রাণী সচরাচর মিলেমিশে জোট বেঁধে বাস করতে চায়, পরস্পরের প্রতি যারা খানিকটা অনুরাগ, সহানুভূতি বা দরদবোধ করে, পরস্পরকে যারা সাহায্য করে, মিলিতভাবে পরস্পরকে যারা রক্ষা করে এবং পরস্পরের প্রতি যারা খানিকটা বিশ্বস্ত আর দলের প্রতি আনুগত্যসম্পন্ন হয় তাদের সাধারণতঃ সামাজিক বৃত্তিসম্পন্ন জীব বলা হয়।

॥ প্রাণীসর্গের সামাজিক বৃত্তি ॥

বহু শ্রেণীর মানবেতর প্রাণীর মধ্যে এই প্রবণতার আভাস পাওয়া যায়। সেই দিক থেকে তাদেরও সামাজিক বৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী বলা যেতে পারে। এক জাতের প্রাণীর দল বেঁধে থাকার দৃষ্টান্ত বহু আছে। তাছাড়া ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীও অনেক সময় জোট বেঁধে থাকে। আমেরিকার কয়েক জাতের বানর এবং বিভিন্ন জাতের কাকের মধ্যে এইভাবে দল বাঁধার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভিন্ন জাতের প্রাণী নিয়ে বাস করা আর তাদের প্রতি অনুরক্তির দৃষ্টান্ত মানুষের মধ্যেও পাওয়া যায়। কুকুরের প্রতি অনুরক্তির মধ্যে এই মনোভাব সুপ্রকাশ। আবার কুকুরও মানুষ সম্পর্কে সমান অনুরক্তির পরিচয় দেয়।

নিঃসঙ্গতা যে মানবেতর প্রাণীর পক্ষে পীড়াদায়ক তার প্রমাণ ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীর আচরণের মধ্যে পাওয়া যায়। সহচরদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে পড়লে এদের বড় করুণ অবস্থা হয়। আবার তাদের সঙ্গে পুনর্মিলন হলে কুকুর বা ঘোড়ার কত আনন্দ !

সকলের পক্ষে বোধগম্য উপায়ে পরস্পরকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার দৃষ্টান্তটি উচ্চতর পর্যায়ের যূথচারী প্রাণীর পারস্পরিক সহায়তার অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত। শিকারীরা জানেন যে যূথচারী প্রাণীর কাছাকাছি যাওয়া কত কঠিন। বন্য ঘোড়া বা গবাদি পশু যূথচারী, তারা কোন বিপদ-সংকেতধ্বনি করে না। তবু তাদের মধ্যে সবার আগে যে শত্রুকে দেখেছে তার হাবভাব থেকে অপর সকলে বিপদের কথা বুঝতে পেরে হুঁশিয়ার হতে পারে। বিপদ-সংকেত হিসাবে বিলাতী ইঁদুর (র‍্যাবিট্) পশ্চাদ্‌পদ ঠুকে জোরে জোরে শব্দ করে। ভেড়া ঠোকে সামনের পা আর শ্যামোয়া (ভেড়ার মত আকৃতির মৃগজাতীয় পাহাড়ে রোমন্থক প্রাণী) শিস দেয়। সীল মাছের মধ্যে মাদীরা প্রহরীর কাজ করে। আর বানর দলপতি নিজেই বিপদসূচক এবং বিপন্মুক্তিসূচক ধ্বনি করে থাকে।

পরস্পরের সাহায্য করার অন্যান্য পদ্ধতিও যূথচারী প্রাণীর মধ্যে অনুসৃত হয়। ঘোড়া আস্তে আস্তে পরস্পরের গা কামড়ে দেয়। গরু পরস্পরকে চেটে গা চুলকে দেয়। আর বানর বাছে উকুন, এমন কি গায়ের কাঁটাও তুলে দিতে দেখা গেছে। এ ছাড়া জীবনসংগ্রামের আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নেকড়ে বাঘ আর অপর কয়েক জাতের জন্তু দল বেঁধে শিকার করে এবং শিকার আক্রমণকালে পরস্পরকে সাহায্য করে। পেলিকান পাখীও দল বেঁধে মাছ ধরে। হামাড্রাইয়াস্ বেবুন নামে এক জাতের হনুমান পোকামাকড় খাবার জন্য দল বেঁধে বড় বড় পাথরের খণ্ড উলটে ফেলে এবং সকলে মিলে লুঠের মাল ভাগ করে খায়।

পরস্পরকে রক্ষা করার দৃষ্টান্তও যূথচারী প্রাণীর মধ্যে বিরল নয়। বিপদের আঁচ পেলে উত্তর আমেরিকার এক জাতের বুনো মহিষ পালের সমস্ত মাদী আর শাবকগুলোকে মাঝখানে জড়ো করে নিজেরা বৃত্তাকারে তাদের ঘিরে থাকে। এবং সেইভাবে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে।

ব্রেম নামে এক নিসর্গবেত্তা আবিসিনিয়ায় একটি বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এক দল বেবুন একটি উপত্যকা পার হচ্ছিল। কিছু বেবুন পাহাড়ের উপরে চড়েছিল। আর বাকী সকলে ছিল উপত্যকার তলদেশে। এক পাল কুকুর এই সময় তাদের আক্রমণ করে। পাহাড়ের উপরের বেবুনগুলি তাই দেখে বিপন্ন সহচরদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। প্রবল বিক্রমে আক্রমণকারীদের হটিয়ে দিয়ে তারা সহচরদের উদ্ধার করে। কুকুরের দলটি

সাময়িকভাবে হটে গেলেও ফের তাড়া করে। একটি বেবুনশাবক ছাড়া আর সকলেই ততক্ষণে পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে। বিপন্ন শাবকটি একখানি পাথরের উপর চড়ে বসল আর কুকুরগুলি তাকে ঘিরে ধরল। তার আর্ত চীৎকার শুনে পালের গোদা বেবুনটি বীরবিক্রমে নেমে এল। শাবকটির কাছে গিয়ে তাকে আশ্বস্ত করল। বেবুনটির ভাবভঙ্গীতে কুকুরগুলি এমন হকচকিয়ে গিয়েছিল যে সেই ফাঁকে গোদা বেবুনটি উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করে চলে যেতে পেরেছিল।

এই নিসর্গবেত্তাই আরও একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একবার একটি ঈগল পাখী ছোঁ মেরে সারকোপিথেকাস জাতের একটি বানরশিশুকে আক্রমণ করেছিল। বানরশিশুটি এমনভাবে গাছের ডাল ধরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল যে পাখীটি চট করে তাকে নিয়ে উড়ে যেতে পারল না। ইতিমধ্যে শাবকটির আর্ত চীৎকারে দলের আর সব বানর জোট বেঁধে ছুটে এল এবং পাখীটিকে আক্রমণ করে এমনভাবে তার পালক ছিঁড়তে আরম্ভ করল যে ঈগলটি তখন শিকার ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে।

যূথচারী প্রাণী পরস্পরের প্রতি কতকটা ভালবাসার আবেগও অনুভব করে বলে মনে হয়। তবে অপরের বেদনা বা আনন্দ সম্পর্কে তাদের কোন অনুভূতি আছে কি না সন্দেহ। মুমূর্ষু বা মৃত সহচরকে ঘিরে গরুর পাল যখন একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তখন তাদের মনে কোন্ ভাবের উদয় হয় কে বলতে পারে? আর্ত সহচরদের সম্পর্কে কোন কোন জাতের প্রাণী যে আদৌ দরদবোধ করে না তার প্রমাণও আছে। তা যদি থাকত তাহলে আহত সহচরকে দল থেকে বার করে দেবার অথবা তাকে গুঁতিয়ে মেরে ফেলার দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত না।

তথাপি বহু প্রাণী যে পরস্পরের দুর্গতি ও বিপদে সহানুভূতি দেখায় তার দৃষ্টান্তও আছে। সম্পূর্ণ অন্ধ একটি পেলিকান পাখীকে দলের আর সকলে খাদ্য সংগ্রহ করে এনে দিত এমন দৃষ্টান্তও আছে। ভারতের কাক পাখীকেও অন্ধ সহচরদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে দেখা গেছে। তাছাড়া প্রভুকে যদি অপর কেউ আক্রমণ করে তো প্রভুভক্ত সাহসী কুকুর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই সব আচরণও সহানুভূতিসঞ্জাত বলা যেতে পারে।

খানিকটা আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা না থাকলে সামাজিক বৃত্তি বজায় রাখা যায় না। কুকুরের মধ্যে খানিকটা আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার লক্ষণ দেখা যায়। তার বিশ্বস্ততা আর আনুগত্যের কথা সুবিদিত। খানিকটা আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা না থাকলে এই দুটি গুণ বজায় রাখা যায় না। বিশ্বস্ততার দিক থেকে হাতির

নামও উল্লেখযোগ্য। মাহুতের প্রতি সব সময় সে বিশ্বস্ত থাকে। একবার একটি হাতি কাদার মধ্যে পড়েছিল। এই অবস্থায় যা কাছে পাওয়া যায় শুঁড় দিয়ে টেনে এনে হাতি নিজের পায়ের তলায় গুঁজে দিতে থাকে যাতে সে কাদার মধ্যে আরও ডেবে না যায়। মাহুত তার পিঠের উপরে ছিল। তবু তার কোন অনিষ্ট সে করেনি। বরং কাদায় ডোবা অবস্থায় উদ্ধারের জন্য প্রতীক্ষা করেছে। এমন বিপজ্জনক জরুরী অবস্থায় অমন ভারী জন্তুর পক্ষে এতটা সহিষ্ণুতা দেখান অবশ্যই তার বিশ্বস্ততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

যে সব জন্তু একজোট হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে অথবা মিলিতভাবে আত্মরক্ষা করে, পরস্পরের প্রতি তাদেরও খানিকটা বিশ্বস্ততা আছে। আবার যারা দলপতিকে অনুসরণ করে তারাও অবশ্যই কতকটা আনুগত্যসম্পন্ন। ফলের বাগান লুঠ করার সময় আবিসিনিয়ার বেবুনরা নিঃশব্দে দলপতির অনুসরণ করে। কোন অবোধ বা অবাধ্য শাবক যদি চেঁচামেচি কিংবা শব্দ করে তো চড় মেরে তাকে নীরব থাকতে শেখান হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার অর্ধ-বন্য গবাদি পশু সম্পর্কে এক নিসর্গবেত্তা বলেছেন, মুহূর্তের জন্যও তারা দলের সঙ্গে বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে না। দলের প্রতি আনুগত্য তাদের এত বেশী যে দলের মধ্যে থেকে যা জোটে তাকেই তারা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকে।

॥ সামাজিক ও সাহজিক বৃত্তি ॥

যে আবেগের প্রেরণায় বিভিন্ন জাতের প্রাণী যূথবদ্ধ হয় এবং পরস্পরকে সাহায্য করে সেই প্রক্ষোভ সম্পর্কে এই অনুমান করা হয় যে অপরাপর সহজ প্রবৃত্তিসঞ্জাত কাজ করে বিভিন্ন জাতের প্রাণী যে ধরনের তৃপ্তি বা আনন্দবোধ করে, জোট বেঁধে এবং পরস্পরের সহায়ক হয়েও তারা সেই ধরনের সন্তোষ বা আনন্দবোধ করে। আবার সহজ প্রবৃত্তিসঞ্জাত কাজে বাধা পেলে যে ধরনের অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এই কাজ করতে বাধা পেলেও সমান অসন্তোষ অনুভব করে।

সহজ প্রবৃত্তিসম্ভূত কাজ করায় যে তৃপ্তি ও আনন্দ আছে তার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। গৃহপালিত জন্তুর অর্জিত সাহজিক বৃত্তির মধ্যে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মেষপালের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত কুকুরের শাবক মেষ-পালকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে এবং তাদের চারদিকে ছুটে বেড়াতে পরম আনন্দ-বোধ করে। তাদের উত্যক্ত করতে নয়। আবার ফক্স-হাউণ্ড কুকুরের বাচ্চাও শিয়াল শিকারের সুযোগ পেলে উল্লসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এমন জাতের কুকুরও আছে যারা শিয়াল সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহশীল নয়। পাখী স্বভাবতঃ কর্মচঞ্চল

প্রাণী। কিন্তু ডিমের উপর দিনের পর দিন বসে তা দেওয়ার মধ্যে যদি আত্মতুষ্টিবোধ না থাকত তাহলে পক্ষিনীর পক্ষে নিশ্চল হয়ে এই কাজ করা সম্ভব হত না। দেশান্তরগামী পাখীকে যদি আটকে রেখে দেশান্তর গমনে বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে তার অবস্থা বড় করুণ হয়। এই দীর্ঘ দেশান্তর যাত্রার মধ্যে নিশ্চয়ই তারা আনন্দবোধ করে।

আবার এমন কয়েকটি সহজ প্রবৃত্তি আছে যার প্রকৃতি শুধু মাত্র ভয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। আত্মরক্ষার বৃত্তি এই ধরনের সাহজিক বৃত্তি। এ ছাড়া আরও কয়েক ধরনের সাহজিক বৃত্তি আছে যা আনন্দ বা বেদনার উদ্দীপক ছাড়া নিছক উত্তরলব্ধি হিসাবে ক্রমাগত আচরিত হয়। কাজেই এই অনুমান করা যায় না যে কেবলমাত্র মানুষেরই প্রতিটি কাজের পেছনে আনন্দ বা বেদনাবোধের প্রভাব আছে। তবে আনন্দ বা বেদনার সঙ্গে সম্পর্কহীন যে কোন অভ্যাস অন্ধভাবে অনুসৃত হলেও সহসা জোর করে যদি সেই অভ্যাস বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে একটা অস্পষ্ট অসন্তোষের ভাব জাগ্রত হয়।

॥ প্রকৃতিক নির্বাচনের প্রভাব ॥

সাধারণতঃ এই অনুমান করা হয়ে থাকে যে বিভিন্ন প্রাণী প্রথমে সামাজিক জীব হয়েছে এবং সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হবার পরে যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে তখন অস্বস্তি বোধ করেছে। আবার মিলিত হতে পারলে স্বস্তিবোধ করেছে। ডারউইন কিন্তু উলটো সম্ভাবনার উপর জোর দিয়েছেন। পরস্পরের সাহচর্যে স্বস্তি এবং বিচ্ছেদে অস্বস্তির সংবেদন তাঁর মতে আগে বিকাশলাভ করেছে এবং তার ফলে যূথবদ্ধ সামাজিক জীবন যাদের পক্ষে মঙ্গলকর বলে প্রতিপন্ন হয়েছে তারা এক জোট হয়ে বসবাস করতে সম্মত হয়েছে। সামাজিক জীবনের আনন্দবোধকে ডারউইন জনিতার সন্তানপ্রীতি এবং সন্তানের জনিতার প্রতি প্রীতির ব্যাপ্তরূপ বলে গণ্য করার পক্ষপাতী। কেন না জনিতার সঙ্গে দীর্ঘদিন একসাথে থাকার ফলেই হয়ত শিশুসন্তানের মধ্যে সামাজিক সহজ প্রবৃত্তির বিকাশ হয়েছে। আংশিকভাবে অভ্যাস এই বৃত্তির পরিব্যাপ্তি লাভ করার কারণ হলেও মুখ্যতঃ প্রাকৃতিক নির্বাচনই ইহার কারণ বলে তিনি মনে করেন।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি বলেছেন, ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গে বাস করে যে সব প্রাণী উপকৃত হয়েছে তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সঙ্ঘপ্রিয় তারাই সবচেয়ে ভালভাবে বিপদ এড়িয়ে চলতে পেরেছে। আবার যারা সহচরদের এড়িয়ে একাকী বাস করেছে তাদের অধিক সংখ্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা।

জনিতা এবং সন্তানের পারস্পরিক অনুরক্তি সামাজিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি। এই সম্পর্ক কি ভাবে ক্রমে ক্রমে উদ্ভূত হয়েছে তার সঠিক সন্ধান জানা যায় নি; তবে এই অনুমান করা যেতে পারে যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই প্রধানতঃ এই সম্পর্কের উদ্ভব হয়েছে।

সহানুভূতির প্রক্ষোভটি সামাজিক বৃত্তির ক্ষেত্রে অসীম গুরুত্বপূর্ণ। প্রক্ষোভটি এই বৃত্তির অপরিহার্য অংশ। ভালবাসার প্রক্ষোভ থেকে এই প্রক্ষোভটি আলাদা। মাতা তার ঘুমন্ত নির্জীব সন্তানকে প্রবলভাবে ভালবাসতে পারেন কিন্তু এই অবস্থায় তার প্রতি কোন সহানুভূতি বোধ করেন না।

সহানুভূতিবোধের উদ্ভব প্রসঙ্গে বহু পণ্ডিত বিবিধ মত প্রকাশ করেছেন। উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে মনোবিদ্যাবিদ্‌দের যুক্তিতর্কের বিস্তারিত আলোচনা না করে এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, যে সব প্রাণী পরস্পরকে সাহায্য এবং রক্ষা করে তাদের পক্ষে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই প্রক্ষোভ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে শক্তি সঞ্চয় করেছে। কেন না যে দলের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতিশীল প্রাণীর সংখ্যা বেশী, বেঁচে থাকার সংগ্রামে তাদের সাফল্য, উন্নতি এবং সংখ্যাবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা সমধিক।

তবে সমস্ত সামাজিক বৃত্তি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মারফত অর্জিত হয়নি। কয়েকটি সামাজিক সহজ প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, কিংবা সেগুলি অপরাপর সহজ প্রবৃত্তি আর সহানুভূতি, বিচারবোধ, অভিজ্ঞতা কি অনুকরণ প্রবণতা জাতীয় শক্তির পরোক্ষ ফল অথবা দীর্ঘদিন আচরিত কোন অভ্যাসের ফল তা সঠিক বলা যায় না। উদাহরণ হিসাবে বিপদ-সংকেত করার জন্য প্রহরী নিয়োগের সহজ প্রবৃত্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সাহজিক বৃত্তি সহানুভূতি, বিচারবোধ, অভিজ্ঞতা কি অনুকরণ প্রবণতা জাতীয় শক্তির পরোক্ষ ফল হতে পারে না। কাজেই এই সাহজিক বৃত্তি সরাসরি অর্জিত হয়ে থাকবে।

বিভিন্ন সহজ প্রবৃত্তি আর অভ্যাসের মধ্যে কয়েকটি আবার অন্যান্য সহজ প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস থেকে প্রবলতর। তার মানে, এই সব সাহজিক বৃত্তি এবং অভ্যাসানুগ কাজে বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। বাধা পেলে বেশী কষ্ট বোধ হয়। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে কয়েক ধরনের অভ্যাস ত্যাগ বা সংশোধন করা অন্যান্য অভ্যাসের তুলনায় কত কঠিন। এই কারণে বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন সাহজিক বৃত্তির মধ্যে অথবা সহজ প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসগত প্রকৃতির মধ্যে একটা সংঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেটি প্রবল হয় শেষ পর্যন্ত সেই

বৃত্তি বা অভ্যাস জয়ী হয়। দেশান্তরগামী পাখীর সন্তানপ্রীতির সহজ প্রবৃত্তি আর দেশান্তর গমনের সাহজিক বৃত্তির সংঘাত তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই দুই বৃত্তির সংঘাতের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত দেশান্তর গমনের বৃত্তি জয়ী হয়। শাবক ফেলে পক্ষিনীরা দেশান্তর যাত্রা করে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের দিক থেকে বিচার করলে যে-বৃত্তি প্রজাতির পক্ষে মঙ্গলকর সেই বৃত্তিই শক্তিশালী হবার কথা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সাময়িকভাবে হলেও মাতার সন্তানপ্রীতির বৃত্তি বছরের এক সময় অন্ততঃ অন্য বৃত্তির কাছে হার মানে।

॥ মানুষের সামাজিকতাবোধ ॥

মোটামুটি তাহলে বোঝা যায় যে বিভিন্ন প্রাণী বিশেষ বিশেষ সহজ প্রবৃত্তির আবেগ দ্বারা চালিত হয়ে সহচরদের সাহায্য করে থাকে। তবে একথাও সত্য যে সহজ প্রবৃত্তির আবেগের সঙ্গে কতকটা পারস্পরিক প্রীতি ও সহানুভূতিবোধের প্রেরণাও তাদের মধ্যে থাকে। সেই সঙ্গে খানিকটা বিচারবোধও থাকতে পারে। মানুষের মধ্যে সব কয়টি সামাজিক বৃত্তি বিশেষভাবে বিকাশলাভ করেছে। সঙ্গী-সাথীদের প্রতি খানিকটা প্রীতি, দরদ বা সহানুভূতি সে পোষণ করে। সঙ্গীদের প্রতি বিশ্বস্ততা আর দলের প্রতি আনুগত্যের বৃত্তিও সে উত্তরলব্ধি হিসাবে অর্জন করে। আবার অপরের সঙ্গে একযোগে সঙ্গীদের রক্ষা করার খানিকটা উত্তরলব্ধ প্রবণতা যেমন আছে, তেমন নিজের ইষ্ট অথবা কোন প্রবল আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী না হলে যে কোন ভাবে সঙ্গীদের সাহায্য করতেও সে রাজী হয়। তবু খুব সামান্য কয়েকটি বিশেষ ধরনের সহজ প্রবৃত্তিই মানুষের মধ্যে আছে। সঙ্গীদের সাহায্য করার আবেগ মানুষের মধ্যে থাকলেও এমন সহজ প্রবৃত্তি তার নেই যার আবেগে আপনা থেকে সে বুঝতে পারে যে কি ভাবে সে সাহায্য করবে। কিন্তু তার বুদ্ধিশক্তি অনেক বেশী উন্নত। তাই বিভিন্ন প্রাণীর মত বিশেষ ধরনের সহজ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত না হয়ে সঙ্গীদের সাহায্য করার ব্যাপারে স্বভাবতঃ তাকে প্রধানতঃ বিচারবোধ এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা চালিত হতে হয়। সঙ্গীদের সম্পর্কে খানিকটা সহজ প্রবৃত্তিগত প্রীতি ও সহানুভূতি সে আবহমানকাল ধরে বজায় রেখে এসেছে। তাই এই সহজ প্রবৃত্তিগত সহানুভূতির প্রভাবে সাথীদের প্রশংসা এবং নিন্দাকে সে বিশেষ মূল্য দেয়। ভাষা ও হাবভাবের মাধ্যমে প্রকাশিত সাথীদের অভিপ্রায়, নিন্দা অথবা প্রশংসা তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই আদিমতম অবস্থায় যে সামাজিক বৃত্তি মানুষ অর্জন করেছে এবং যে বৃত্তি তার বংশপতিরও ছিল বলে মনে হয় সেই বৃত্তি আজও

মানুষের বহু সৎকার্যের প্রেরণা যোগায়। তবে তার কার্যাবলী প্রধানতঃ সাথীদের অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত এবং নিজের স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু প্রীতি ও সহানুভূতিবোধ আর আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অনেকটা স্বচ্ছ হওয়ায় মানুষের পক্ষে সাথীদের মতামতের যথাযথ মূল্য দেওয়া সম্ভব। কাজেই ক্ষণস্থায়ী আনন্দ বা বেদনার প্রশ্ন বাদ দিয়েও নির্দিষ্ট একটা আচরণ-পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রবণতা আপনা থেকে সে বোধ করতে পারে।

বিভিন্ন জন্তুর বিভিন্ন সাহজিক বৃত্তির মধ্যে যেমন সংঘাত লক্ষ্য করা যায় মানুষের বিভিন্ন সাহজিক বৃত্তির মধ্যেও তেমন সংঘাত সৃষ্টি হয়। এই সংঘাতের ফলে একটি বৃত্তির কাছে আর একটি বৃত্তি সাময়িকভাবে পরাভব স্বীকার করে। তার কারণ মানুষের সাহজিক বৃত্তির শক্তির মধ্যেও তারতম্য আছে। দলভুক্ত মানুষের জন্য বর্বর মানুষ অকাতরে চরম আত্মত্যাগ করতে পারে। কিন্তু ভিন্ন দলের মানুষ সম্পর্কে এই মনোভাব পোষণ করে না। ভীরু জননীও মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে সন্তানের জন্য চরম বিপদবরণ করে বসে কিন্তু অপর কোন সঙ্গী-সাথীর জন্য করে না। আবার এমন সাহসী এবং দরদী মানুষও আছে যারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পরের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে। এই ক্ষেত্রে সামাজিক বৃত্তি আত্মরক্ষার বৃত্তির উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু মায়ের দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে সন্তানপ্রীতির বৃত্তি জয়যুক্ত হয়েছে। কাজেই একথা জোর করে বলা যায় না যে মানুষের মধ্যে সামাজিক বৃত্তিগুলি অধিকতর শক্তিশালী কিংবা চিরাচরিত অভ্যাসের ফলে সেইসব বৃত্তি আত্মরক্ষা, প্রতিহিংসা, ক্ষুধা কিংবা কামজাতীয় সহজ প্রবৃত্তি থেকে শক্তিশালী হতে পেরেছে।

তবু মানুষকে অনুতাপ করতে দেখা যায়। একটি বৃত্তি অনুসারে কাজ না করে অন্য বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করার পরে সে মনস্তাপ ভোগ করে। এই দিক থেকে মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর গভীর পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু এই অনুতাপের কারণও আছে।

মানুষের মন এমনভাবে গড়া যে তার পক্ষে চিন্তা এড়াবার উপায় নেই। অতীত ঘটনা ও ধারণার প্রতিচ্ছবি অনবরত তার মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে। যে সব প্রাণী সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে সামাজিক বৃত্তি সব সময় তাদের মধ্যে জাগরূক থাকে। সব সময় তারা এই বৃত্তি অনুসারে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত থাকে। মানুষের অবস্থাও তাই। একলা বসে চিন্তা করার সময়েও অন্যে কি ভাববে, না ভাববে তার কথা মনে হয়। কিন্তু ক্ষুধা বা প্রতিহিংসা জাতীয় বৃত্তি ক্ষণস্থায়ী। পেট ভরে খাবার পর ক্ষুধার অনুভূতি স্পষ্টভাবে স্মৃতিপথে নিয়ে

আসা যায় না। তেমনি চরিতার্থতার পর প্রতিহিংসাবৃত্তিরও নিবৃত্তি হয়। অতীতের ছাপকে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না বলে মানুষ তার ক্ষণস্থায়ী বৃত্তির সঙ্গে চিরজাগরূক সহানুভূতির বৃত্তির তুলনামূলক বিচার করতে বাধ্য হয়। অপরে কোনটা প্রশংসার্হ এবং কোনটা নিন্দার্হ বলে গণ্য করে, মানুষ নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিরিখে তারও বিচার না করে পারে না। তখন হয়ত মনে হয়, একটি বৃত্তি অনুসরণ করে এবং অপর আর একটি অনুসরণ না করে ভুল করা হয়েছে। তার ফলে মনের মধ্যে অস্বস্তি দেখা দেয়।

তবে কাজ করায় সময় মানুষ তার তৎকালীন প্রবলতর বৃত্তি অনুসারে কাজ করে থাকে। তার ফলে সে মহৎ কাজও করে বসতে পারে আবার হীন স্বার্থপর কাজও করতে পারে। কিন্তু সাময়িকভাবে প্রবলতর সেই বৃত্তির চরিতার্থতার পরে চিরজাগরূক সামাজিক সহজ প্রবৃত্তির নিরিখে যখন অতীতের দুর্বলতর স্মৃতিগুলি বিচার করা হয় এবং সঙ্গী-সাথীদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব সেই বিচারের মধ্যে যখন প্রভাব বিস্তার করে তখন অনুশোচনা দেখা দেয়। তখন সে মনস্তাপ, অনুতাপ, দুঃখ কি লজ্জাবোধ না করে পারে না। তার ফলে সে ভবিষ্যতে অন্যভাবে কাজ করার শপথ নেয়। একেই বলে বিবেক। এইভাবে দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক বৃত্তির কাছে ক্ষণস্থায়ী সাহজিক বৃত্তি পরাভব স্বীকার করে।

॥ মতান্তর ॥

এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা কিন্তু স্বীকার করতে চান না যে মানবেতর প্রাণীর বিকাশ-পদ্ধতির মধ্যে চিরস্থায়ী সামাজিক জীবনের পটভূমি আছে। এমন কি ব্যক্তি-সত্তার স্থায়ী অনুষঙ্গের দৃষ্টান্তও প্রাণীসর্গে সচরাচর বিরল বলে গণ্য করা হয়। মানবেতর প্রাণীর বিশেষতঃ মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্বভাব ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করে এঁরা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে মানবেতর প্রাণিকুলে এমন দৃষ্টান্ত সচরাচর পাওয়া যায় না যাকে সাচ্চা সামাজিক সম্পর্ক বলা যেতে পারে।

প্রাণীসর্গের যূথচারিতার দৃষ্টান্ত সম্পর্কে এঁরা বলেন যে স্থানীয় কিছু প্রাণী সংঘিত হলে সেই জোটবাঁধাকে স্থায়ী অনুষঙ্গ বলা যায় না। যূথচারী স্তন্যপায়ীদের সন্তানবাৎসল্য, মায়া-মমতা, সহানুভূতি এবং সামাজিকতাবোধ নিঃসঙ্গ মাংসাশী প্রাণীর তুলনায় কম বলে এঁরা মনে করেন। এঁদের মতানুসারে সামাজিক সংহতিবোধ অথবা এক উদ্দেশ্যে মিলিতভাবে কাজ করার দৃষ্টান্ত সংঘিত মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে বিরল। ব্যক্তির লক্ষ্যকে কখনও সমষ্টির বা সমাজের লক্ষ্যের অধীন করা হয় না। বিভিন্ন প্রাণিকুলকে মূলতঃ নিঃসঙ্গ এবং জোটবাঁধার দৃষ্টান্তকে

বিরল সাময়িক ঘটনা বলে গণ্য করা হয়। ব্রিফলট বলেন, ব্যক্তিসত্তার অনুষঙ্গ প্রাণীজগতের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয়। প্রাণীর জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মানব ব্যাখ্যাকার তার নিজের মনের ব্যাখ্যা করে থাকেন। প্রাণীদের সমাজ ও যূথচারী প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের অনুরূপ সম্পর্ক, কীটপতঙ্গের কথা বাদ দিলে প্রাণীসর্গে নেই বললে চলে। ··· বীভরদের কিংবা বিশাল তৃণভূমির কুকুরের সমাজ সম্পর্কে এককালে বহু রোমান্টিক কাহিনী শোনান হয়েছে। কিন্তু এখন জানা গেছে যে সেই সব কাহিনী ভিত্তিহীন।

প্রাণীসর্গের যৌন-অনুষঙ্গ এবং মাতা ও সন্তানের অনুষঙ্গ সম্পর্কে এই পণ্ডিত-মণ্ডলী বলেন যে পুনরুৎপাদনের উদ্দেশ্যে যৌন জোড়-বাঁধার মধ্যে সামাজিক জীবনের সূচনা দেখা যায় বটে, কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণিকুলে এই যৌন-অনুষঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী সাময়িক অনুষঙ্গ মাত্র। একমাত্র মিলন-ঋতুতে ছাড়া মদ্দা আর মাদী সচরাচর বরং পরস্পরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। উদাহরণ হিসাবে ওরাং ওটাং এবং গরিলার কথা বলা হয়। মাদী-মদ্দার অনুষঙ্গের সম্পর্ক এই উভয় শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে ক্ষণস্থায়ী। ওরাং ওটাংদের মধ্যে মাদী-মদ্দারা একসাথে বসবাস করে না, আর গরিলাদের যৌন-অনুসঙ্গের কাল একজন নিসর্গবেত্তার মতে (সুইডেনের রাজকুমার উইলিয়ম) ক্ষণস্থায়ী।

গর্ভধারিণী ও নবজাত সন্তানের অনুষঙ্গের দৃষ্টান্তকে সাচ্চা সামাজিক সংহতির একমাত্র উদাহরণ বলে স্বীকার করে এই পণ্ডিত মহল বলেন, এই ক্ষেত্রেও মানুষ আর বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। মনের বিকাশের দিক থেকে এই পার্থক্যের তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

স্তন্যপায়ী প্রাণিকুলের ক্রমবিকাশের পর্যায়ক্রমিক ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ক্রমোন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাতা ও সন্তানের অনুষঙ্গের কাল ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সন্তানের শৈশবকালীন অসহায় অবস্থার ক্রমবৃদ্ধির জন্য। এই সঙ্গে গর্ভধারণের কালের ক্রমবৃদ্ধি এবং বুদ্ধি ও সামাজিক সহজ প্রবৃত্তির ক্রমোন্নতির দৃষ্টান্তও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তার অর্থ সব কয়টি পরিবর্তন পারম্পর্যের সম্পর্ক বিশিষ্ট।

দু' একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি স্পষ্টতর হবে। শাকাশী প্রাণীর গর্ভধারণের কাল অপেক্ষাকৃত কম। তাদের সন্তানের শৈশবকালও সংক্ষিপ্ত। ভূমিষ্ঠ হবার কয়েক ঘণ্টা পরে নবজাত শাবক গর্ভধারিণীর অনুসরণ করতে পারে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার ক্ষমতা অর্জন করে। মাংসাশী

প্রাণীর গর্ভধারণের কাল এর চাইতে দীর্ঘ। তাদের সন্তানের অসহায় অবস্থার কালও দীর্ঘতর। বনমানুষ পর্যায়ে গর্ভধারণ এবং শৈশব-কাল আরও দীর্ঘ এবং মানব পর্যায়ে তা আরও দীর্ঘতম হয়েছে। একটি সিংহশাবক এক সপ্তাহের মধ্যে যতটা উন্নতি লাভ করে ঠিক ততটা উন্নতি লাভ করতে ওরাংশাবকের লাগে এক মাস। মানবশিশুর লাগে এক বছর। আঠারো মাস বয়স হলে সিংহশাবক আত্মনির্ভর হয়ে চলাফেরা করার যোগ্যতা অর্জন করে। এইটুকু স্বনির্ভরতা অর্জন করতে বনমানুষ পর্যায়ের প্রাণীর লাগে পাঁচ বছরের মত। আর মানব পর্যায়ে অসভ্য মানুষের সন্তান পাঁচ বছর পর্যন্ত মাতৃস্তন্যপানের স্তর অতিক্রম করতে পারে না।

তাছাড়া বনমানুষ সহ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মাতা ও সন্তানের অনুষঙ্গের পর্যায় সন্তান যৌন সাবালকত্ব অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মানব পর্যায়ে এক পুরুষ সাবালকত্ব অর্জন করার আগে নতুন জনি-গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়। নতুন জনির অনুষঙ্গের দৃষ্টান্ত অবশ্য প্রাইমেট্‌স পর্যায়ের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে আছে। তবে সংহতির দিক থেকে নতুন জনির অনুষঙ্গের কাল মানব পর্যায়ে অনেক বেশী। অল্পস্থায়ী অনুষঙ্গের পরিবর্তে এই সম্পর্ক মানব পর্যায়ে স্থায়ী রূপ পেতে চায়। তার অর্থ মাতা ও শিশুসন্তানের অনুষঙ্গের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের অনুরূপ যে সম্পর্ক প্রাণীসর্গে বিদ্যমান, মানবশিশুর শৈশবকালীন অসহায়তার জন্য সেই সম্পর্ক মানবজীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। প্রতিটি মানুষ তার ফলে কোন-না-কোন সামাজিক গোষ্ঠীর স্থায়ী সভ্য হয়ে পড়ে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা হচ্ছে যে মানুষের বিকাশপদ্ধতির পেছনে স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠীজীবনের পটভূমি আছে কিন্তু মানবেতর প্রাণীর বিকাশপদ্ধতির পেছনে নেই। সহজ কথায় বলতে গেলে, মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ হয় স্থায়ী সামাজিক পটভূমির উপর আর মানবেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই পটভূমি থাকে না।

এই সামাজিক পটভূমির সঙ্গে মানবমস্তিষ্কের পূর্ণতালাভের পর্যায়গুলি যদি যুক্তভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে মানুষের মানসতার মধ্যে ধারণাশ্রয়ী চিন্তাশক্তি-কেন্দ্রিক পার্থক্য সৃষ্টি হবার যুক্তিটি আরও সহজবোধ্য হবে।

প্রসবের পরেও মানবশিশুর অপরিণত অবস্থা দীর্ঘদিন বর্তমান থাকে। তার ফলে তাদের বাড়তি কেবলমাত্র দৈহিক বংশগতির প্রভাবাধীনে সম্পূর্ণতা-লাভ করে না। এই কারণে তাদের বুদ্ধি মাংসাশী এবং শাকাশী প্রাণী আর বনমানুষের চাইতে অনেক উন্নত

শিশুকালীন অপরিণত অবস্থা বলতে অবশ্য দেহতন্ত্রের অপূর্ণতা বোঝায় না। মাংসাশী প্রাণী, বনমানুষ আর মানুষের সন্তান জনকজননীর মত দেহতন্ত্র নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। অপরিণতি থাকে মাত্র দুটি ক্ষেত্রে—কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র আর জননতন্ত্রে। এ ছাড়া গঠন ও ক্রিয়াপদ্ধতির দিক থেকে তাদের দেহ অন্যান্য বিষয়ে স্বজাতের বয়স্কদের মত থাকে।

জননতন্ত্রের পূর্ণতালাভ করতে অনেক বিলম্ব হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র পূর্ণতালাভ করে শৈশবে। শাকাশী প্রাণীর সন্তান সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। তাই জন্মলগ্নের অব্যবহিত পরে তাদের মধ্যে অকাল-পক্বতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু মাংসাশী প্রাণী, বনমানুষ আর মানুষের শৈশব তাদের কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ক্রমোন্নতির সঙ্গে পারম্পর্যের সম্পর্কযুক্ত। তার ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াপদ্ধতির ক্রমোন্নতি মায়ের সঙ্গে শৈশব-কালীন সম্পর্কের স্থায়িত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে বাঁধা পড়ে। জননীর সন্তান-বাৎসল্যের সহজ প্রবৃত্তি, সন্তানের উপর নির্ভরতার সাহজিক বৃত্তি আর যে সামাজিক সহজ প্রবৃত্তি গোষ্ঠীর সকলকে যুক্ত করে, সেই প্রবৃত্তি মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে শক্তিশালী করে তোলে। এই সব সহজ প্রবৃত্তির প্রভাবাধীনে মানুষের মস্তিষ্ক পূর্ণতালাভ করেছে বলে এই পণ্ডিত মহল অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মনের বিকাশপদ্ধতির পার্থক্য সম্পর্কে এই যে ব্যাখ্যা দেওয়া হল তার ফলে মানবেতর প্রাণীর মানসতা সামাজিক ঐতিহ্যের প্রভাবে মানুষের মনে রূপান্তরিত হয়েছে।

যে বিকাশপদ্ধতির কথা বলা হল তার দূরপ্রসারী তাৎপর্য সম্পর্কে ব্রিফলটের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন যে প্রাণিত্ব থেকে মানবত্বে উত্তরণ বলতে কেবল দেহতন্ত্রের পরিবর্তন অথবা বৃহৎ মস্তিষ্কবান এক প্রাণী-শাখার ক্রমবিকাশ বোঝায় না। মস্তিষ্কটি শুধুমাত্র বৃহৎ হলেই সেটি মানুষের মস্তিষ্ক হয় না। প্রাণী-দশা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মানবজাতির বিকাশ সামাজিক গোষ্ঠীর ক্রমবিকাশের জন্য সম্ভব হয়েছে। সেই সামাজিক গোষ্ঠী স্থায়িত্বলাভ করেছে মাতৃস্নেহের বৃত্তি এবং সামাজিক সহজ প্রবৃত্তির আবেষ্টনীর মধ্যে লালিত তার প্রতিটি সভ্যের সুদীর্ঘ শৈশবব্যাপী ক্রমবৃদ্ধির জন্য। প্রথম থেকেই এই বিকাশপদ্ধতির মুখ্য প্রকৃতি যতটা সামাজিক ততটা জৈবিক নয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ক্রমান্বয়ে সুচিহ্নিত হয়ে উঠেছিল বলে, কতকগুলি পূর্বপ্রবণতা ধীর মন্থরে পুঞ্জীভূত হয়েছিল বলে এই বিকাশপদ্ধতি সম্ভবপর হয়েছে। এই

পদ্ধতিকেও ক্রমবিকাশ আখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু জৈবিক ক্রমবিকাশের বহু পদক্ষেপের মত এই বিকাশপদ্ধতির ফলে একটি সুনির্দিষ্ট সীমান্ত রেখা অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সীমান্তরেখা যখন অতিক্রম করা হয়েছে তখন থেকে ক্রমবিকাশের পদ্ধতি নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। এই নতুন ধারার সৃষ্টি সামাজিক গোষ্ঠী নামে এক নতুন সত্তার সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। সামাজিক ঐতিহ্যের উত্তরলব্ধি নামে এক নতুন বংশগতি জৈবিক বংশগতির উপর ছায়াপাত করেছে। এই সীমান্ত রেখা অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণিত্ব আর মানবত্বের মধ্যে ব্যবধান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংস্কৃতি এই ব্যাবধান সৃষ্টি করেনি। ব্যবধান সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সংস্কৃতির শর্ত, সামাজিক গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব আর তার ঐতিহ্য।

ব্রিফটল আরও বলেন যে সংস্কৃতির দিক থেকে নিম্নতম পর্যায়ের, এমন কি সংস্কৃতিহীন মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণও ইউরোপখণ্ডে পাওয়া যায়। সেই সব উলঙ্গ বর্বর ইউরোপবাসীদের পরিচয় রোমানরা জানত। সিরিয়ার পরিব্রাজক আর রোমের সাম্রাজ্যস্রষ্টাদের সংস্পর্শে এসে তাদের কিছু কিছু বর্বর দুই এক পুরুষের মধ্যে উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছিল। আধুনিক যুগের ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাদের জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক খুব দূরের নয়। স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠীজীবনের বন্ধন যদি বর্তমান থাকে, গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ যদি নিজেদের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধন অনুভব করে, যদি তারা কণ্ঠ-সংকেতের সাহায্যে ভাবের বিনিময় করে এবং গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের উত্তরলব্ধি পায়; তাহলে তারা উলঙ্গ, হাতিয়ারবিহীন, কৌশলহীন অথবা নৃশংস হলেও কিছু এসে যায় না। মূলতঃ তারা সকলেই যে কোন মানবীয় ঐতিহ্যের উত্তরলব্ধি অর্জন করতে সমর্থ এবং বনমানুষের সঙ্গে তাদের অনতিক্রম্য ব্যবধান থাকে। হতে পারে, বনমানুষের স্থান হয়ত এই সীমান্ত রেখার পরপারে। প্রতিটি মানুষ ধারণাশ্রয়ী চিন্তার যে ঐতিহ্য উত্তরলব্ধি হিসাবে লাভ করে এবং যে উত্তরলব্ধি তাকে মানুষ করে তোলে সেই ঐতিহ্য সমাজসম্ভূত। প্রাণী-দশা থেকে মুক্ত মানবজাতির বিকাশের মৌলিক শর্তাবলীও তেমন নিছক জৈবিক নয়। বরং এই মৌলিক শর্তাবলীকে সামাজিক শর্ত বলা যেতে পারে।

বুদ্ধির উন্নতি

প্রাণীসর্গের মধ্যে মানুষ যে সমুন্নত আসন অধিকার করে আছে তার মূলে বুদ্ধির অবদান সর্বাগ্রগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই শক্তির বলে পরিবর্তন-শীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে অভিযোজনের এমন অভিনব পন্থা সে উদ্ভাবন করেছে যার ফলে ক্রমবিকাশের চিরাচরিত ধারার গতিপথ পালটে গিয়ে জীবজগতে এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। প্রখ্যাত নিসর্গবিদ্ ওয়ালেস বলেছেন, আংশিকভাবে এই শক্তি এবং সেই সঙ্গে নীতিবোধ অর্জন করার পর প্রাকৃতিক নির্বাচনের রীতি অনুসারে কিংবা অপর যে কোন নীতি অনুযায়ী মানুষের দেহতন্ত্রের পরিবর্তনসাধনের প্রয়োজন তিরোহিত হয়েছে। কেন না অপরিবর্তিত দেহ নিয়েই পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানুষ সামঞ্জস্য-বিধান করতে পারছে। পরিবর্তনশীল প্রতিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের অপরিমিত ক্ষমতা তার আয়ত্তাধীন। খাদ্য সংগ্রহ এবং আত্মরক্ষা করার জন্য নিজে সে হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এবং নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন করতে পারে। দুষ্পাচ্য খাদ্যকে পরিপাকযোগ্য করে নেবার পদ্ধতিও সে আবিষ্কার করেছে। তুন্দ্রা অঞ্চল হোক কিংবা গ্রীষ্মমণ্ডল হোক, প্রাকৃতিক আবহাওয়া নির্বিশেষে পৃথিবীর যে কোন বাসযোগ্য অঞ্চলে সে বেঁচে থাকতে পারে। তার জন্য দেহতন্ত্রের পরিবর্তন-সাধনের কোন প্রয়োজন হয় না।

নির্দিষ্ট কোন প্রতিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকার পক্ষে মানুষের দৈহিক উপযুক্ততা অধিকাংশ প্রাণীর চেয়ে নিকৃষ্ট। মেরু অঞ্চলের ভল্লুকের মত তার দেহে লোমাবরণ নেই যে শীতের আবহাওয়ায় দেহের উত্তাপ বজায় রাখবে। পলায়ন, আত্মরক্ষা কিংবা শিকারের পক্ষেও তার দৈহিক উপযুক্ততা তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। খুব দ্রুত দৌড়োবার ক্ষমতা তার নেই। উটপাখী বা খরগোসের সঙ্গে দৌড়ে জেতার আশা সে করতে পারে না। তাছাড়া বাঘের মত আত্মরক্ষামূলক কোন রঙের প্রলেপও তার দেহে নেই। কাঁকড়া বা কচ্ছপের মত দৈহিক বর্ম থেকেও সে বঞ্চিত। পাখা নেই যে উড়ে পালাবে কিংবা অন্তরীক্ষ থেকে শিকারের খোঁজ করবে। শিকার ধরার পক্ষে কিংবা আত্মরক্ষার পক্ষে তার পেশী, দাঁত বা

নখর শ্বাপদের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। বাজপাখীর মত ঠোঁট, নখর কিংবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি থেকেও সে বঞ্চিত। মানুষের যত জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তার কোনটির মধ্যে এমন লক্ষণ নেই যে দৈহিক অঙ্গলক্ষণের পরিবর্তনসাধন করে সে তার দেহের স্বাভাবিক হাতিয়ারের কোন উন্নতিসাধন করেছে। তথাপি বহু বিচিত্র অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের কৌশল তার করায়ত্ত। তার এই ক্ষমতা অপর যে কোন প্রাণীর চেয়ে বেশী। আর তার বংশবৃদ্ধির হারও উচ্চ পর্যায়ের যে কোন স্তন্যপায়ীর তুলনায় বেশী। মেরুমণ্ডলের ভল্লুক, খরগোস, বাজপাখী আর বাঘকেও সে হার মানিয়েছে। আগুন জ্বালাবার কৌশল আয়ত্ত করে আর ঘরবাড়ি তৈরি করার পদ্ধতি শিখে অনায়াসে সে মেরুমণ্ডলে বসবাস ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে। মানুষের তৈরী যান খরগোস কি উটপাখীকে দ্রুততায় হারিয়ে দিয়েছে। আকাশযান টেক্কা দিয়েছে পাখীর সঙ্গে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বলে তার দৃষ্টি বাজপাখীর চাইতেও অনেক দূরে প্রসারিত। অস্ত্রের সাহায্যে এমন সব জন্তুকে অনায়াসে সে ঘায়েল করতে পারে যার কাছে ঘেঁসতেও বাঘ পর্যন্ত ভয় পায়। কিন্তু এই ঘরদোর, আগুন, পরিচ্ছদ, যানবাহন বা অস্ত্রশস্ত্রের কোনটাই মানুষের দেহের অংশ নয়। ইচ্ছে করলে এর যে কোনটা সে পরিহার করে চলতে পারে। জৈবিক অর্থে এগুলি তার উত্তরলব্ধি নয়। জীবনসংগ্রামের সহায়ক এই দ্রব্যসম্ভার তৈরি করার কৌশল বা নিপুণতা মানুষের সামাজিক উত্তরলব্ধির অংশ—বংশপরম্পরায় সঞ্চিত ঐতিহ্যের ফল। রক্তের মারফত এর কোনটা তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। সামাজিক জীবনের কাঠামোর মধ্যে বাক্‌শক্তি আর ভাষার মাধ্যমে এই বিদ্যা, এই কৌশল সে আয়ত্ত করেছে। জীবনসংগ্রামের এই কৃত্রিম সহায় মূলতঃ তার সৃজনশীল শ্রম আর উন্নততর বুদ্ধির অবদান।

অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় দেহের স্বাভাবিক হাতিয়ারের ঘাটতিটুকু মানুষ মস্তিষ্কের বলে পূরণ করেছে। মস্তিষ্ক মানুষের জটিল নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্র। এই নার্ভতন্ত্র আর মস্তিষ্কের জন্য অতি হুঁশিয়ার ইন্দ্রিয়স্থানের আবেগের সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ বহুবিধ সুনিয়ন্ত্রিত অঙ্গচালনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এই কারণে তার আত্মরক্ষার আয়োজন সর্বার্থসাধক।

মানবেতর প্রাণীর অবস্থা ভিন্ন প্রকৃতির। গৃহপালিত কিছু প্রাণী অবশ্য সব রকম আবহাওয়ার মধ্যে বসবাস করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবু খুব পরিবর্তন-শীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যদি অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় তাহলে তাদের দেহতন্ত্রের পরিবর্তন আবশ্যক হয়। নতুন শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করে চলতে হলে অধিকতর শক্তিশালী হতে হবে। দাঁত বা নখরের কার্যসাধকতা বৃদ্ধি করতে

হবে আর নয় তো আকৃতি খর্ব করে দৃষ্টি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে। শীতের দেশে বাঁচতে হলে গায়ে পুরু লোমাবরণ আবশ্যক হবে। আর না হয় গোটা দেহতন্ত্র পালটে ফেলতে হবে। এই ধরনের পরিবর্তনসাধনের যোগ্যতা যদি মানবেতর প্রাণী অর্জন করতে না পারে তাহলে কালক্রমে প্রাকৃতিক নির্বাচনের রীতি অনুসারে তাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

তার মানে এই দাঁড়ায় যে উদ্বর্তনের দিক থেকে দেহতন্ত্রের পরিবর্তনের প্রয়োজন মানুষ বুদ্ধি ও সৃজনশীল শ্রমের সাহায্যে সিদ্ধ করেছে। মানুষের মধ্যে এই শক্তির সবিশেষ উন্নতি হয়েছিল বলে মানসিক শক্তিকে তারা উদ্বর্তনের সহায়ক হিসাবে প্রয়োগ করে ক্রমবিকাশের চিরাচরিত ধারার এক অন্যতম রীতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে পেরেছে। নিজে পরিবর্তিত না হয়েও পরিবর্তনশীল প্রতিবেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছে। এমন কি, নিজের প্রয়োজন অনুসারে পূর্বকল্পিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেশের পরিবর্তনসাধন করতে পেরেছে।

মানবেতর প্রাণীও তাদের কার্যকলাপ দ্বারা বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্তনসাধন করতে পারে। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার এই পরিবর্তন পরিবর্তন-সাধকের নিজের উপরেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রকৃতির রাজ্যে কোন ঘটনা বিশ্লিষ্টভাবে ঘটে না। প্রতিটি ঘটনা অপর সব কিছুর উপর কোন-না-কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। কিছু মানবেতর প্রাণীর কার্যকলাপের ফলে প্রতিবেশের মধ্যে যদি কোন স্থায়ী পরিবর্তন দেখা দেয় তবে তাকে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন বলা যায় না। যেমন শাকাশী প্রাণী অনেক সময় কোন কোন অঞ্চলের লতা-পাতা খেয়ে নির্মূল করে দেয়। ছাগলের জন্য গ্রীস দেশে বনজঙ্গল তেমন ভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি। ছাগলের এই কার্যকলাপের পেছনে কোন সজ্ঞান ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত উদ্দেশ্য নেই। নিজেদের কাজের তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করতে পারে না। মানুষ সচরাচর ভিন্নভাবে কাজ করে। সে যদি বন-বাদাড় সাফ করে তো সেই জমিতে ফসল ফলায়। এক দেশের গাছপালাকে ভিন্ন দেশে রোপণ করে সে গোটা মহাদেশের উদ্ভিদকুলের প্রকৃতি বদলে দেয়। আবার ভিন্ন জাতের উদ্ভিদ্ এবং গৃহপালিত জন্তুর মিলন ঘটিয়ে সে নতুন সংকর-জাত সৃষ্টি করে। তাই বলে একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই যে মানবেতর প্রাণী ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত কাজ করার সামর্থ্যহীন আর মানুষের সব কাজ সজ্ঞান ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত। এমন ব্যাপক কোন মন্তব্য করা যায় না। বরং এই কথাই মূলতঃ সত্য যে জীব-কোষের অস্তিত্ব যেখানে আছে সেখানেই পরিকল্পিত কর্মপদ্ধতির খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। তার মানে বাইরের সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রভাবে জীবকোষ

সুনির্দিষ্টভাবে সাড়া দেয়—সেই সাড়ার প্রকৃতি যত সরল হোক না কেন। কোন্ প্রাণী কতটা পরিকল্পিত ভাবে সজ্ঞানে কাজ করতে পারে তা নির্ভর করে তার নার্ভতন্ত্রের বিকাশের মাত্রার উপর।

তা সত্ত্বেও কোন প্রাণীর কার্যকলাপ ধরিত্রীর বুকে তার ছাপ এঁকে রাখার উপায় উদ্ভাবন করতে পারেনি। সেই সাফল্য একমাত্র মানুষেই অর্জন করেছে। মানবেতর প্রাণী বাহ্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করে এবং শুধুমাত্র নিজেদের উপস্থিতির দ্বারা তার পরিবর্তনসাধন করে। কিন্তু মানুষ এই পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকৃতিকে তার প্রয়োজন সিদ্ধির কাজে লাগায়—তার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। মানুষ আর মানবেতর প্রাণীর মধ্যে চূড়ান্ত এবং মূল পার্থক্য এইখানে। এই পার্থক্যও আবার মানুষের সৃজনশীল শ্রম আর বুদ্ধির জন্য সৃষ্টি হয়েছে।

স্বভাবতই তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে আদিমানবের মধ্যে বুদ্ধির উন্নতি হল কি ভাবে এবং কি কারণে। মানবেতর প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিগত প্রতিটি শক্তি যে পর্যায়ে আছে সেই পর্যায় থেকে ক্রমোন্নতি লাভ করে এই সব মানসিক শক্তি কেমন করে মানুষের বুদ্ধি-শক্তির স্তরে উন্নীত হল সেই কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক হলেও সুপরিজ্ঞাত নয়। এই ক্রমপরিবর্তন সম্পর্কে পণ্ডিতেরা সম্ভাব্য কারণের উল্লেখ করেছেন মাত্র।

বুদ্ধির উন্নতির প্রশ্নটি মস্তিষ্কের উন্নতির প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এই মস্তিষ্ক আবার নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্র। নার্ভতন্ত্রের সূচনা অতি নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে তারাও দু' এক প্রকারে অঙ্গ-চালনা করে সাড়া দিতে পারে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর বিপদের শঙ্কার প্রভাব পড়া মাত্র শুক্তি এমনভাবে তার নার্ভতন্ত্র উদ্দীপিত করে যার ফলে পেশী সংকুচিত হয়ে খোলস আটকে যায়। শুক্তির নার্ভতন্ত্রের এই প্রকৃতিকে আত্মরক্ষার স্বতঃক্রিয় পদ্ধতি বলা যায়।

কিন্তু অভিব্যক্তির মানদণ্ডে যে প্রাণী যত উচ্চ পর্যায়ের বলে স্বীকৃত তার নার্ভতন্ত্রে তত বেশী জটিলতা দেখা যায়। দেহের উপর চাপের মাত্রা, বায়ুমণ্ডলের স্পন্দন, আলোর রশ্মি প্রভৃতি উপলব্ধি করার পক্ষে ইন্দ্রিয়স্থান বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে। এই ভাবে স্পর্শশক্তি, শ্রুতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি সুস্পষ্ট ক্ষমতার সৃষ্টি হল এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হল। আবার পেশী-নিয়ামক চেষ্টীয় নার্ভের উন্নতি এবং পারদর্শিতালাভের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গচালনা করার মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। চেষ্টীয় নার্ভ আর সংবেদ নার্ভের সংযোজক বিধিব্যবস্থাও সৃষ্টি হয় উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে। দেহতন্ত্রের এই উন্নতির ফলে বাইরের অবস্থার

সামান্যতম পরিবর্তন ঘটলেও নার্ভের উপর তার প্রভাবের জন্য যে কোন উচ্চ পর্যায়ের প্রাণীর পক্ষে অঙ্গভঙ্গী বা আচরণ পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। অনায়াসে বাইরের প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে নিতে পারে। এই সামঞ্জস্যবিধানের পদ্ধতিটির প্রায় সবটা মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত। নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যে শুধু সংবেদ নার্ভ আর চেষ্টীয় নার্ভের গ্রন্থি আছে। এই সূচনা থেকে মস্তিষ্কের গঠন আরম্ভ হয়েছে। বিভিন্ন সংবেদ নার্ভের সংযোগসাধনের উদ্দেশ্যে এবং তাদের আবেগ সংশ্লিষ্ট চেষ্টীয় নার্ভে পৌছে দেবার জন্য মানুষের দেহের অভ্যন্তরে এক জটিল জাল সৃষ্টি হয়েছে। সংবেদ প্রথমতঃ অস্থায়ী অনুভূতি ছিল। নার্ভতন্ত্রের যোগসাধনের জটিল জাল যখন সৃষ্টি হল, সংবেদন তখন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থায়ী রূপ পেল। অর্থাৎ সংবেদন মনে করে রাখা সম্ভব হল।

এই সব জৈবিক উন্নতির ফলে স্তন্যপায়ী প্রাণীর পক্ষে অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পরিবর্তনশীল বিবিধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গেও তারা পাল্লা দিতে পারছে। এই উন্নতির ফলে তারা সফলভাবে শত্রুকে এড়িয়ে চলতে শিখেছে এবং তাদের বংশবৃদ্ধি আর খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত হয়েছে। নার্ভতন্ত্র আর মস্তিষ্কের উন্নতির ফলে বহু বিচিত্র অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকা সহজ হয়েছে, আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে বলে বহুমুখী অভিযোজনের ক্ষমতা অস্তিত্ব রক্ষা এবং বংশবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

প্রাণীসর্গের মধ্যে একমাত্র মানুষের দেহতন্ত্রে এই নার্ভতন্ত্র আর মস্তিষ্ক চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। তাই মানুষের পক্ষে সর্বতোমুখী অঙ্গচালনার ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে এবং তার মধ্যে উন্নততর মানসিক শক্তির স্ফূরণ হয়েছে। তবে এই সব শক্তি ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করেছে বলে মনে করা হয়। তার মানে উদ্বর্তনের পক্ষে এই সব মানসিক শক্তির উৎকর্ষসাধন আবশ্যক হয়ে পড়েছিল বলে আদিমানব এবং তার বনমানুষাকার বংশপতির মধ্যে বুদ্ধির উন্নতি হয়েছে।

বুদ্ধিগত শক্তির তারতম্য থাকে। তার ফলে যে প্রকারণ সৃষ্টি হয় সেই বুদ্ধিগত প্রকারণ আবার উত্তরলব্ধি হিসাবে সঞ্চারিত হতে চায়। এই দিক থেকে বিচার করলে যে-সব শক্তি আদিমানবের পক্ষে এবং তার বনমানুষাকার বংশপতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের অগ্রগতি এবং উন্নতিও প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতি অনুসারে হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। আদিমতম মানুষের কথা চিন্তা করলে মনে হয়, যে সব লোক সবচেয়ে বিচক্ষণ ছিল, যারা সবচেয়ে কার্যসাধক হাতিয়ার কিংবা ফাঁদ তৈরী এবং ব্যবহার করতে পেরেছে, যারা

সবচাইতে ভাল ভাবে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে তাদের বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা সব চাইতে বেশী। আদিমানবের যে দলে এই ধরনের ক্ষমতাবান লোক ছিল দলগত ভাবে তাদেরও সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে এবং অপর দলকে স্থানচ্যুত করে তারা সেই দলের বাসস্থানও অধিকার করতে পেরেছে।

দলবৃদ্ধি মূলতঃ অবশ্য প্রাণধারনোপযোগী সামগ্রীর সুলভতার উপর নির্ভরশীল। আবার এই সামগ্রী কতটা সুলভ কি দুর্লভ তা নির্ভর করে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং স্থানীয় লোক যে ধরনের কলা-কৌশল প্রয়োগ করতে সমর্থ প্রধানতঃ তার উপর। তাছাড়া সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য কোন দল যদি বিজয়ী হতে পারে তবে বিজিত দলের অন্তর্ভুক্তির ফলেও বিজেতাদের দলবৃদ্ধি হতে পারে।

বর্বর মানুষ সম্পর্কে যেটুকু তথ্য জানা যায় কিংবা তাদের সুপ্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন এবং ঐতিহ্য থেকে যে ধারণা হয় তাতে একথা বলা যেতে পারে যে উন্নততর কলা-কৌশলের অধিকারী মানবদল আবহমান কাল থেকে অপরাপর দলকে স্থানচ্যুত করে তাদের অধিকার দখল করে আসছে। পৃথিবীর বহু সভ্য দেশে যেমন বিস্মৃত কি বিলুপ্ত মানবদলের স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া গেছে, তেমনি আমেরিকার বনকান্তার, এমন কি সাগরবক্ষে বিশ্লিষ্ট দ্বীপেও বিস্মৃত মানবদলের স্মারকচিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। আধুনিক কালেও সুসভ্য জাতিগুলি অসভ্যদের স্থানচ্যুত করে তাদের বাসভূমি দখল করছে এবং আবহাওয়া বিশেষ প্রতিকূল না হলে সেখানে বসবাস করছে। এই স্থানচ্যুতির কাজ প্রধানতঃ বিজয়ীদের উন্নততর কলা-কৌশলের সাহায্যে নিষ্পন্ন হচ্ছে। এই কলা-কৌশল অবশ্যই তাদের বুদ্ধি ও শ্রমের সৃষ্টি। সাফল্য অর্জন আর অধিকার বিস্তারের এই পদ্ধতি থেকেও অনুমান করা হয়ে থাকে যে মানবজাতির বুদ্ধিগত শক্তিও প্রাকৃতিক নির্বাচনের রীতি অনুসারে ক্রমান্বয় উৎকর্ষ লাভ করেছে। অন্ততঃ এই রীতি উৎকর্ষ লাভের প্রধান কারণ।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে মানুষের বংশপতি সামাজিক বৃত্তিসম্পন্ন হবার পর তার মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তা, যুক্তিবাদিতা এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তার ফলে বুদ্ধি-শক্তিরও খানিকটা পরিবর্তন হয়ে থাকবে। সামাজিক জীবনের পটভূমিকায় এই সম্ভাবনা সমধিক। তাই যদি হয় তাহলে দলের অপরাপর সদস্যের চাইতে খানিকটা বেশী বিচক্ষণ কোন লোক যদি কোন নতুন হাতিয়ার, ফাঁদ, কিংবা আত্মরক্ষা বা আক্রমণের কোন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে পেরে থাকে তবে নিছক স্বার্থের জন্যও দলের আর সকলে তার অনুকরণ করার প্রেরণা বোধ করবে। এজন্য খুব বিচারবোধের আবশ্যক হয় না।

এই অনুকরণের ফলে সকলেই উপকৃত হবে। প্রতিটি নতুন কলা-কৌশল দলের মধ্যে এইভাবে অনুকৃত হতে থাকলে সকলের বুদ্ধি খানিকটা উন্নত হয়।

তাছাড়া মস্তিষ্কের বাড়তি সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হবার পরে হয়। সেই দিক থেকে মানুষের দীর্ঘস্থায়ী শৈশব, তার শৈশবকালীন শিক্ষাপদ্ধতি এবং সেই শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য অবশ্যই বুদ্ধিশক্তি উন্নত করার সহায়ক হয়েছে। কাজেই ওয়ালেসের উক্তির পুনরাবৃত্তি করে অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধির উন্নতির ফলে জীবজগতের চিরাচরিত অভিযোজনের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে দেহতন্ত্রের রূপান্তরসাধনের আবশ্যকতা না থাকলেও, আদিমানবের মধ্যে উন্নত বুদ্ধির বিকাশ বেঁচে থাকার ও বংশবৃদ্ধি করার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের রীতি অনুসারে ক্রমে ক্রমে হয়েছে।

আদিমানবের রূপরেখা

আজকের মানুষ থেকে আলাদা দৈহিক লক্ষণের মানুষ যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে সত্যই ছিল, এই তথ্য সঠিকভাবে জানা গেছে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। তার আগে তৎকালীন বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত মনে করতেন যে লিখিত ইতিহাসের যুগ আরম্ভ হবার ছয় সাত হাজার বছর আগে মানুষের অস্তিত্ব ছিল না।

কিন্তু প্রাণের প্রাগিতিহাস যেমন শিলাস্তর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তেমনি প্রাগৈতিহাসিক মানবজাতির ইতিহাসও ভূগর্ভের যাদুঘরে আবিষ্কৃত হয়েছে। অস্থির সাক্ষী এক্ষেত্রেও মানুষের প্রাগৈতিহাসিক অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে শুধু প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অস্থি নয়, পশ্চিম ইউরোপে তার সংস্কৃতির স্মারক পাথুরে যন্ত্রপাতির সন্ধান পাওয়া গেল। তার কিছুদিন পরে মানুষের শিলীভূত অস্থিও এক গুহাকন্দরে পাওয়া গেল। হাতি, গণ্ডার প্রভৃতি যে সব জন্তু ইউরোপ খণ্ডে অবলুপ্ত হয়ে গেছে, তাদের অস্থিও ছিল সেই সঙ্গে। তারপর দুনিয়ার বহু স্থানে বিবিধ স্মারকচিহ্নের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভূস্তরের যে প্রতিবেশের মধ্যে এই সব অস্থির সন্ধান মিলেছে কিংবা এই অস্থির সঙ্গে অধুনালুপ্ত যে সব জীবজন্তুর অস্থি দেখা গেছে তা থেকে এই সব স্মারকচিহ্নের সুপ্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

মানুষ আর বনমানুষের শাখা আলাদা হয়ে গিয়েছিল টারসিয়ারি কল্পে অর্থাৎ প্রাণবিকাশের তৃতীয় পর্বে। তবু প্রাণবিকাশের সাম্প্রতিক পর্বের (প্লিস্টোসিন কল্প) প্রথম পর্যায়ের আগেকার কোন মানুষের অস্থি পাওয়া যায়নি। প্লিস্টোসিন কল্পের ব্যাপ্তিকাল সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলে মতভেদ আছে। কারও মতে এই কল্পারম্ভ হয়েছে পাঁচ লাখ বছর আগে। আবার কারও মতে দশ লাখ বছর আগে। কেউ কেউ আবার এই দুটোর একটা মাঝামাঝি কাল নির্ণয়ের পক্ষপাতী। সে যাই হোক, সেই দশ লাখ বছর আগেও যদি সাম্প্রতিক কাল আরম্ভ হয়ে থাকে তাহলেও প্রাগৈতিহাসিক মানুষের যত অস্থি পাওয়া গেছে তার কোনটি দশ লাখ বছরের বেশী প্রাচীন নয়। ভূ-বিদ্যার মাপকাঠিতে এ আর কতটুকু সময়।

তারপর প্রাগৈতিহাসিক মানুষের যে কয়টি অস্থির সন্ধান পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই কঙ্কালের খণ্ড খণ্ড অংশ মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু দাঁত, চোয়াল, করোটি কিংবা দুচারখানা হাড়ের টুকরো পাওয়া গেছে। এই অসম্পূর্ণ কালজয়ী স্মারকচিহ্ন পরীক্ষা করে এবং তার তুলনামূলক বিচার করে সেকালের মানবীয় এবং অর্ধ-মানবীয় প্রাণীর সম্ভাব্য ছবি আঁকা হয়েছে। প্রধান প্রধান গুটি কয়েক অস্থির বিবরণ দিচ্ছি।

॥ খাড়া বনমানুষ ॥

জাভাদ্বীপে সোলো নদীর শুকনো গর্ভে ত্রিনিল গ্রামের কাছাকাছি যে অস্থিটি পাওয়া গেছে, প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অস্থির মধ্যে সেটি সবচেয়ে প্রাচীন বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কঙ্কালটির নাম দেওয়া হয়েছে পিথেক্যানথ্রোপাস ইরেক্টাস বা খাড়া বনমানুষ। ত্রিনিলের মানুষ নামেও ইহা পরিচিত। বিজ্ঞানীদের অভিমত, ইহা বনমানুষ আর মানুষের মধ্যবর্তী কোন স্তরের অস্থি। তাছাড়া প্রাণীটি খাড়াভাবে হাঁটত বলেও মনে করা হয়। সঠিকভাবে কালনির্ণয় সম্ভব না হলেও অনুমান যে অস্থিটি পাঁচ লাখ বছর আগেকার।

সোলো নদীগর্ভে হাত কয়েক দূরত্বের মধ্যে শুধু করোটির কয়েকটি খণ্ড, দুটি মাঢ়ীর দাঁত আর উর্বাস্থি পাওয়া গেছে। শিলীভূত এই অস্থি একটি কঙ্কালেরই অংশ বলে অনুমান করা হয়। অস্থিটির মাথার গড়নে মানবীয় লক্ষণ আছে। তবে করোটি আকারে ছোট এবং চাপা। কপাল সরু, নীচু আর উপরের দিকে ঢালু গড়নের। ভুরুর হাড় বেশ উন্নত। মস্তিষ্কের আয়তন আনুমানিক ৯০০ ঘন সেন্টিমিটার। মানুষের মস্তিষ্কের ন্যূনতম আয়তনের প্রায় সমান হলেও গরিলা থেকে অনেক বড়।

অস্থিটি আবিষ্কার করেছিলেন ইউজিনি ডুবোয়া নামে এক ওলন্দাজ বিজ্ঞানী। ১৮৯১ সালে। ১৮৯৪ সালে বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। মাথার ছাঁচ পরীক্ষা করে ডুবোয়া বললেন যে প্রাণীটি মানবাকারে রূপান্তরের একটি পর্যায়। তাঁর মতে, 'মানুষের পূর্বগামী প্রাণী'।

অস্থিটির দাঁতের ছাঁদ মানবীয়। আর বাক্‌শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশও বন-মানুষের চাইতে উন্নত। ডুবোয়ার মতে পিথেক্যানথ্রোপাসের বাক্‌শক্তি ছিল। কিন্তু শিলীভূত করোটি পরীক্ষা করে এতটা বলা সম্ভব কি না সন্দেহ। তবে মস্তিষ্কের উন্নত লক্ষণ থেকে প্রত্নপ্রাণী-বিজ্ঞাবিদেরা মনে করেন যে পিথেক্যান-থ্রোপাসের মধ্যে কথা বলার সম্ভাব্যতা দেখা দিয়েছিল।

ডুবোয়া ১৮৯০ সালে জাভার আর এক অংশে সাম্প্রতিক কল্পের আরও দুটি বড় মাথাওয়ালা কঙ্কাল আবিষ্কার করেছিলেন। এই কঙ্কাল দুটির নাম এক নম্বর ওয়াদিয়াক আর দুই নম্বর ওয়াদিয়াক। দুই নম্বর ওয়াদিয়াকের মস্তিষ্কের আয়তন আনুমানিক ১৬৫০ ঘন সেন্টিমিটার। আর এক নম্বর ওয়াদিয়াকের মস্তিষ্কের আয়তন আনুমানিক ১৫৫০ ঘন সেন্টিমিটার। সাধারণ ইউরোপীয় পুরুষের মাথার চেয়ে আরও বড়। ইউরোপের পুরুষের মস্তিষ্কের আয়তন গড়পড়তা প্রায় ১৪৫০ ঘন সেন্টিমিটার। এই জাভাতেই আরও তিনটি প্রাগৈতিহাসিক করোটি, দুখানি নীচের চোয়াল আর সাতটি দাঁত প্রত্নপ্রাণী-বিজ্ঞাবিদ্ ডাঃ ফন কোনিগসভ্যালড আবিষ্কার করেছিলেন ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে। এই সব অস্থিও খাড়া বনমানুষের ধাঁচের। আরও অনুসন্ধানের পর ডুবোয়ার পাওয়া মাথার মত নতুন একটি করোটি পাওয়া যায়। এই মস্তিষ্কটির আয়তন আনুমানিক ৭৭৫ ঘন সেন্টিমিটার মাত্র। ডাঃ ভাইডেনরিশ বিশালকায় এক খাড়া বনমানুষের অস্থিও জাভায় পেয়েছিলেন। তার নাম দেওয়া হয়েছে পিথেক্যানথ্রোপাস রোবাস্টাস। অর্থাৎ বিশালকায় খাড়া বনমানুষ। এটি সম্ভবতঃ পুরুষের অস্থি। এশিয়া ও জাভার প্লিস্টোসিন কল্পের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এইচ. ছ তেরার মতে পিথেক্যানথ্রোপাসরা প্রায় পাঁচ লাখ বছর আগে বেঁচেছিল। জাভা এই সময় এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তার মানে এই দাঁড়ায় যে পিথেক্যানথ্রোপাস মূলতঃ দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এরা কি কোন উচ্চতর মানুষের কুলপতি, না অবলুপ্ত এক আদিম মানবশাখার প্রতিনিধি? পিকিঙের মানুষ আর সোলো মানুষের আবিষ্কারের পর মনে করা হচ্ছে যে পিথেক্যানথ্রোপাস শাখা থেকেও উচ্চতর পর্যায়ের মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। কুইনস্ল্যাণ্ডের তালগাই'র আবিষ্কারের পর মনে করা হচ্ছে যে পিথেক্যানথ্রোপাস শ্রেণীর মানুষ অস্ট্রেলিয়ার আধুনিক কালের আদিবাসীদের কৌলিক জাতিরূপ। উভয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাত এক ধাঁচের। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও মোটামুটি সাদৃশ্য আছে।

॥ জাভা আর দক্ষিণ চীনের দৈত্য ॥

১৯৪১ সালে জাভার সংগিরানে ডাঃ ফন কোনিগসভ্যালড এক খণ্ড চোয়াল আবিষ্কার করেন। চোয়ালের টুকরোটি এত বড় যে পরিজ্ঞাত কোন মানুষ বা মানবাকার জীবের অত বড় চোয়াল দেখা যায়নি। মাঢ়ীর যে কয়টি দাঁত পাওয়া গেছে আকারে বড় হলেও তার মধ্যে নিঃসন্দেহে মানবীয় দাঁতের লক্ষণ

আছে। ডাঃ কোনিগস্ভ্যালড এই প্রাণীটির নাম দিলেন প্রাচীন জাভার বিরাটকায় মানুষ (মেগানথ্রোপাস্ পেলিওজাভানিকাস্)। ডাঃ ভাইডেনরিশের মতে পুরুষ গরিলার চাইতেও আকারে বড় প্রাণীটি। হংকং-এর এক চীনা ডাক্তারখানায় ডাঃ কোনিগস্ভ্যালড আরও তিনটি দাঁত আবিষ্কার করেন। এই দাঁত কয়টিও বিরাটকায় প্রাণীর। অবশ্য এই আবিষ্কারের ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেশ জানা যায়নি। তবু দাঁত কয়টি যে প্লিস্টোসিন কল্পের আদি বা মধ্য পর্যায়ের তাতে সন্দেহ নেই। আবিষ্কর্তা এই প্রাণীটির নাম দিলেন বিশালকায় বনমানুষ (জাইগাণ্টোপিথেকাস)।

তবে ডাঃ কোনিগস্ভ্যালডের আবিষ্কার পরীক্ষা করে ডাঃ ভাইডেনরিশ তাকে বিশালকায় মানুষের দাঁত বলে রায় দিলেন। তার নাম দিলেন বিশালকায় মানুষ (জাইগাণ্ট্এনথ্রোপাস)। তাঁর মতে, এই বিশালকায় মানবগোষ্ঠী খাড়া বনমানুষ আর পরবর্তী স্বাভাবিক আকারের মানুষের কুলপতি। তবে এই অভিমত সমর্থন করার পক্ষে বাস্তব প্রমাণের অভাবের কথা তিনি স্বীকার করেছেন।

॥ পিকিঙের মানুষ ॥

বনমানুষ আর মানুষের শাখা এশিয়া খণ্ডে আলাদা হয়ে গিয়েছিল বলে বহু প্রত্নপ্রাণী-বিজ্ঞাবিদের বিশ্বাস। মাইওসিন আর প্লিস্টোসিন কল্পের বহু মানবাকার প্রাণীর শিলীভূত অস্থি ভারতে পাওয়া গেছে। ১৯২৭ সালে পিকিঙ শহর থেকে সাঁইত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চৌ কো তিয়েন গুহাকন্দরে এক নতুন মানবগোষ্ঠীর অস্থি ডাঃ ডেভিডসন ব্লাক আবিষ্কার করেন। ডাঃ ব্লাক পিকিঙ ইউনিয়ন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অস্থিটির নাম দিলেন পিকিঙের চীনা মানুষ (সিনানথ্রোপাস পিকিনেনসিস)।

প্রায় পুরো ছুটি করোটি, খানকয়েক চোয়ালের হাড় আর কিছু দাঁত পাওয়া গেল। এই অস্থির ধাঁচ খাড়া বনমানুষের মত। যে ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেশের মধ্যে এই স্মারকচিহ্ন পাওয়া গেছে সেই প্রতিবেশ প্লিস্টোসিন কল্পের মধ্য পর্যায়ের। মানুষ আর জন্তু উভয়ে তখন আশ্রয়ের আশায় গুহাকন্দরে আসত। ভূতত্ত্ব আর প্রত্নপ্রাণী-বিদ্যার বিচারে পিকিঙের মানুষ খাড়া বনমানুষের পরবর্তীকালের। আনুমানিক সাড়ে চার লাখ বছর আগেকার। তার মানে ইউরোপের দ্বিতীয় হিমবাহের সমকালীন।

ডাঃ ব্লাকের পর ডাঃ ভাইডেনরিশ গবেষণা চালিয়ে যান। ১৯৩৬ সাল অবধি পাঁচটি পুরো করোটি, তার সঙ্গে বহু চোয়াল আর দাঁত এবং জন চল্লিশেক

মানুষের ছিন্নমুণ্ড পাওয়া যায়। এই ছিন্নমুণ্ডগুলির করোটি নীচের দিকে খোলা। এই লক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে এই কালে নরখাদকতা চালু ছিল, তাই ঘিলু বার করার জন্য কাজটি করা হয়েছে। আগুন জ্বালাতে জানত পিকিঙের মানুষ। আনাড়ী হাতিয়ার তৈরীর বিদ্যাও তারা আয়ত্ত করেছিল। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে মনে করা হয় যে এরা হরিণ কিংবা অন্যান্য প্রাণীও শিকার করত। নিজেদের নীচের চোয়াল আর হরিণের শিঙ তাদের হাতিয়ার ছিল। তাছাড়া শাঁস খাবার জন্য হ্যাক্‌বেরি এনে খোসা ভাঙা হত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই মানবগোষ্ঠীর করোটি আকারে ছোট। মস্তিষ্কের আয়তন আনুমানিক ৯০০ থেকে ১২০০ ঘন সেন্টিমিটার। বিজ্ঞানীরা খুব নিশ্চয় করে বলতে চান না যে এরা পরবর্তীকালের কোন মানবগোষ্ঠীর কুলপতি। অধ্যাপক ব্লাক অবশ্য এদের দাঁতের গড়ন থেকে মন্তব্য করেছেন যে নিয়ানডারথ্যাল আর হোমো সাপিয়ঁ বা আধুনিক 'জ্ঞানী মানুষ' যে ধরনের মানবীয় কুলপতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সেই কুলপতির সঙ্গে পিকিঙের মানুষের সম্পর্ক খুব দূরের হতে পারে না। এতে কিন্তু নির্দিষ্টভাবে বলা হচ্ছে না যে সিনানথ্রোপাস আমাদের কুলপতি।

চীন দেশে এই মানুষটির সন্ধান পাওয়া গেছে বলে ধরে নেওয়া যায় না যে, সে প্রাক্‌-মোঙ্গলীয় মানুষ। আধুনিক 'জ্ঞানী মানুষে'র আবির্ভাবের বহু সহস্র বছর আগে যার অস্তিত্ব ছিল, আধুনিক মানুষের কোন শাখার সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। তবু অস্থির করোটি, চোয়াল আর দাঁতের কয়েকটি লক্ষণ থেকে ডাঃ ভাইডেনরিশ এই অভিমত পোষণ করেন যে সিনানথ্রোপাসের সঙ্গে আধুনিক মানুষের মোঙ্গলীয় শাখার সম্পর্ক নিগ্রো বা শ্বেতকায়দের চাইতে নিকটতর। কিন্তু প্রত্নপ্রাণী-বিদ্যাবিদ্‌ মহলের সাধারণ অভিমত এই যে শ্বেত-মোঙ্গল আর নিগ্রো নির্বিশেষে আধুনিক মানবশাখার সকলের সঙ্গে চীনা-মানুষটির সম্পর্ক সমান।

।। হাইডেলবার্গের মানুষ ।।

১৯০৭ সালে মানুষের একখানা নীচের চোয়ালের সন্ধান পাওয়া গেল জার্মানির হাইডেলবার্গের কাছাকাছি এক বালির খনিতে। মানুষের যত অস্থি ইউরোপে পাওয়া গেছে তার মধ্যে এই আবিষ্কারটি সবচেয়ে প্রাচীনকালের। অস্থিটি পাওয়া গেছে ভূগর্ভের পঁচাত্তর ফুট নীচে। প্রাচীন একটি নদীগর্ভের বালির আটাত্ত ফুট নীচের স্তরে। সোজা প্রদন্তের হাতি, গণ্ডার, সিংহ প্রভৃতি

প্লিস্টোসিন কল্পের আদি পর্যায়ের অবলুপ্ত প্রাণী-শাখার বহু শিলীভূত অস্থি এই নদীগর্ভে পাওয়া গেছে। এই সব অস্থির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে কোনক্রমে এগুলি ইউরোপের দ্বিতীয় আন্তঃহিমবাহ পর্যায়ের পরে হতে পারে না। আলফ্রেড জেনার নামে এক পণ্ডিত অস্থিটিকে সাড়ে চার লাখ বছর আগেকার বলে সাব্যস্ত করেছেন। তার মানে পিকিঙের মানুষের সমসাময়িক।

এই চোয়ালখানি আকারে বিরাট। থুতনির লক্ষণ তেমন সুস্পষ্ট নয়। তবে তা না থাকলেও মুখাবয়বের অন্যান্য লক্ষণ মানবীয়। দাঁতের পাটির ছাঁদ মোটেই বনমানুষের মত নয়। বরং মানবসদৃশ। আর চিবুকহীন চোয়ালের অগ্রভাগও বনমানুষের চোয়াল থেকে আলাদা। দাঁতগুলি চোয়ালের আকারের তুলনায় ছোট। পিকিঙের মানুষের চোয়ালের সঙ্গে এই চোয়ালের কতকটা নৈকট্য আছে। তবে তার দাঁত আরও আদিম ছাঁদের।

হাইডেলবার্গের এই মানুষকে অধ্যাপক সুশ্‌টেনবাক 'হোমো হাইডেল-বার্গেনসিস' বা হাইডেলবার্গের মানুষ বলে বর্ণনা করেছেন। এই মানুষ তাঁর মতে নিয়ানডারথ্যাল মানুষের জাতিরূপের কুলপতি। এই মত বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু এইচ. এফ. অস্‌বর্‌ন একে পরবর্তীকালের নিয়ানডারথ্যাল মানুষের 'পূর্বগামী মানুষ' বলে অভিহিত করেছেন।

পিকিঙ ও জাভার আবিষ্কারের ফলে এই প্রাগৈতিহাসিক স্মারকচিহ্নের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক কল্পের আদি বা মধ্য পর্যায়ের এই তিনটি মানবীয় জাতিরূপ যে মানব-পরিবারের প্রাচীনতম এবং আদিমতম স্মারকচিহ্ন, একথা সর্বজনস্বীকৃত। প্রত্নপ্রাণী-বিদ্যাবিদেরা এদের আদিমতম মানবাকার জীবের পর্যায়ে (প্রোটানথ্রোপিক হোমিনিড্) ফেলতে চান। দেশদেশান্তরে এদের অস্তিত্ব থেকে এই মতবাদ সমর্থিত হয় যে প্রাক্ মানবীয় প্রাণিকুল মধ্য বা দক্ষিণ-মধ্য এশিয়া থেকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের উত্তর খণ্ড এই সম্ভাব্য এলাকার মধ্যে পড়ে।

।। নিয়ানডারথ্যাল মানুষ ।।

আধুনিক মানুষ থেকে স্বতন্ত্র প্রাচীন জাতি হিসাবে জীববিদ্যায় প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে নিয়ানডারথ্যাল মানুষ (হোমো নিয়ানডারথ্যালেনসিস)। ১৮৫৬ সালে জার্মানির ডুসেলডর্ফের কাছাকাছি এই অস্থি আবিষ্কৃত হয়।

অস্থিটির গড়ন অদ্ভুত ধরনের। দেখে মনে হয় যেন বর্বর বন্য মানবগোষ্ঠীর একটি হাবা-গোবা মানুষ। কিন্তু জিব্রালটারের কাছাকাছি এক গিরিকন্দরে

এক ধরনের আর একটি নারীর অস্থি যখন পাওয়া গেল, তখন ডুসেলডর্ফের আবিষ্কারকে স্বতন্ত্র এক জাতির প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হয়। তারপর ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সম আকৃতির বহু জীবাশ্ম সংগৃহীত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এই নিয়ানডারথ্যাল গোষ্ঠী সমধিক পরিচিত। চুনা পাথরের গুহা আর গিরিকন্দরের আশ্রয়ে এই মানব-গোষ্ঠীর যত স্মারকচিহ্ন পাওয়া গেছে তার সবগুলির সঙ্গে সমকালীন ইতিহাসের অজস্র নজীর আছে। সমসাময়িক যুগের জন্তুর হাড় আর প্রস্তর যুগের পাথুরে হাতিয়ার পাওয়া গেছে এই অস্থির সঙ্গে। জার্মানি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ক্রোশিয়া, স্পেন, ইতালি আর সম্প্রতি প্যালেস্টাইনেও পুরোপলীয় সংস্কৃতির হাতিয়ারের সঙ্গে নিয়ানডারথ্যাল মানুষের অস্থি পাওয়া গেছে। উত্তর আফ্রিকাতেও সন্ধান মিলেছে এই সাংস্কৃতিক স্মারকচিহ্নের। এত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই মানবগোষ্ঠীর অস্থি আবিষ্কৃত হয়েছে যে, সেকালের ইউরোপ ও এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডের বহু স্থানে এদের বসতি ছিল বলে প্রত্নপ্রাণী-বিদ্যাবিদ্‌দের বিশ্বাস।

নিয়ানডারথ্যাল মানুষের দৈহিক গড়ন গাঁট্টাগোট্টা হলেও মাথায় তারা বেঁটে ছিল। পুরুষেরা বড় জোর পাঁচ ফুট তিন-চার ইঞ্চি লম্বা ছিল। মেয়েরা ছিল আরও বেঁটে। তবে এদের অস্থির গড়ন বেশ পোক্ত এবং মোটা। করোটির গড়নেও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। করোটির বিভিন্ন অংশে বিশিষ্টতা ছিল। কারও কারও মতে এরা আধ-খাড়া ভাবে চলত। তাদের কাঁধ ছিল গরিলার মত পুরু। তবে হাতের অগ্রভাগ আর হাঁটুর নীচের হাড়, বাহু আর জঙ্ঘার তুলনায় খাটো ছিল। কিন্তু হাত আর পায়ের গড়ন ছিল অনেকটা আধুনিক মানুষের মত। প্রস্তর যুগের যে পর্যায়ের সংস্কৃতির নাম মুস্টিরিয় সংস্কৃতি, সুনিপুণ কৌশলে যখন হাত কুঠার, চাঁচার যন্ত্র, বর্শার ফলা, ফোঁড় করার যন্ত্র প্রভৃতি তৈরি করা হত, সেই সংস্কৃতির ধারক ছিল নিয়ানডারথ্যাল মানুষ। এদের বাসস্থানের ভগ্নাবশেষ থেকে মনে হয়, আগুন জ্বালাবার বিদ্যাও এরা আয়ত্ত করেছিল। এই বিদ্যা পিকিঙের মানুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছিল হয়ত।

॥ জ্ঞানী মানুষ ॥

নিয়ানডারথ্যাল মানুষের পরিণতি কি হল জানা যায়নি। চতুর্থ হিমবাহের যুগের পরেও ইউরোপে তাদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার বছর আগে সহসা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তাদের স্থান দখল করল জ্ঞানী মানুষ (হোমো সাপিয়ঁ) বা আধুনিক মানুষ।

আমাদের নিজেদের কুলপতির উদ্ভবের বৃত্তান্তও সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি। অনেকদিন ধরে মনে করা হত যে আধুনিক মানুষের প্রথম পর্যায়ের লোক এশিয়া আর আফ্রিকা থেকে এসে নিয়ানডারথ্যালদের নির্মূল করে দেয়। কিন্তু এমন এক উন্নত মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সুপ্রমাণিত নয়। তাছাড়া নিয়ানডারথ্যাল মানুষ তো মধ্য এশিয়াতেও ছিল।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে আধুনিক মানুষ নিয়ানডারথ্যালদের বংশজাত। ইউরোপের প্রাকৃতিক অবস্থা এই সময় অকস্মাৎ এমনভাবে বদলে গিয়েছিল যে এই ধরনের মতবাদে বিশ্বাস করার অসুবিধা আছে। মধ্যবর্তী জাতিরূপের এমন কোন নিদর্শন ইউরোপে পাওয়া যায়নি যাতে কথাটা নির্বিবাদে মেনে নেওয়া যায়।

পুরোপলীয় যুগের শেষ ভাগের কিছু শিলীভূত অস্থি ফ্রান্সের দর্দন নামে একটি গ্রামে পাওয়া গেছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'ক্রমাঞ্চ' (Cromagnon) মানুষ। এদের চেহারা লম্বা এবং খাড়া। মস্তিষ্কের আকার বড়। আজকের সাধারণ ইউরোপীয়দের চাইতে বড় মাথা। মাথার খুলির গড়ন উঁচু, কপাল খাড়া, মুখ প্রশস্ত, হাঁ বড়, চৌকো এবং কৌণিক। আর নাক ছিল সরু লম্বা এবং ছুঁচলো। নীচের চোয়াল বড় হলেও চিবুক বেশ সুগঠিত ছিল। উন্নত ধরনের পাথুরে হাতিয়ার ব্যবহার করত এই সুদর্শন মানবগোষ্ঠী। তাছাড়া চিত্রাঙ্কন, খোদাই করা আর গুহাচিত্রণের বিদ্যাও এদের আয়ত্তাধীন ছিল। এদের দৈহিক গড়নের সঙ্গে আধুনিক মানুষের মিল অনেক বেশী। নিয়ানডারথ্যাল আর আধুনিক মানুষের মধ্যবর্তী জাতিরূপ হিসাবে তাই এদের গ্রহণ করা যায় না।

॥ রোডেশিয়ার মানুষ ঃ জাভার সোলো মানুষ ॥

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবাকার জীবের আরও দুটি কঙ্কাল পাওয়া গেছে। একটি উত্তর রোডেশিয়ায় (১৯২১), আর দ্বিতীয়টি সোলো নদীর গর্ভে ত্রিনিল গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে (১৯৩১-৩৬)। রোডেশিয়ায় যে অস্থিটি পাওয়া গেছে তার নাম দেওয়া হয়েছে রোডেশিয়ার মানুষ (হোমো রোডেশিয়েনসিস)। আর সোলো নদীগর্ভের এগারটি করোটির নাম দেওয়া হয়েছে সোলো মানুষ (হোমো সোলেনসিস)।

নিয়ানডারথ্যাল মানুষের সঙ্গে এই দুটি বিভিন্ন স্থানে পাওয়া অস্থির মিল অমিল দুই-ই আছে। ডাঃ কন কোনিগস্‌ভ্যালডের মতে পরিচিত আধুনিক মানুষের প্রাচীন জাতিরূপের মধ্যে সোলো মানুষ প্রাচীন যুগের প্রতিনিধি।

রোডেশিয়ার অস্থিটি অনন্যসাধারণ এবং অদ্বিতীয়। সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। কিন্তু সোলো নদীগর্ভে পাওয়া অস্থির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এই করোটিগুলির সব কয়টি নীচুর দিকে খোলা। তাতে মনে হয় এরা নরখাদকতার শিকার।

কারও কারও মতে এশিয়া আর ইউরোপের নিয়ানডারথ্যাল মানুষ পিকিঙের মানুষের কুলে জন্মেছে। তেমনি সোলো আর রোডেশিয়ার মানুষও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কুলপতির একটি স্তর বলে অনেকের বিশ্বাস। প্লিস্টোসিন কল্পের শেষ ভাগের যে দুটি অস্থি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া গেছে তাতে এই মত সমর্থিত হয়। সাম্প্রতিক কল্পের শেষাশেষি অস্ট্রেলিয়দের আদিম গোষ্ঠীপতিরা এই মহাদেশে যায়।

।। পিল্‌টডাউনের মানুষ ।।

বৃটেনের অন্তর্গত সাসেকসের এক প্রাচীন নদীগর্ভের গোলাকার প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে মানুষের করোটির কয়েকখানি টুকরো পাওয়া যায় ১৯১১-১২ সালে। এই অস্থির মধ্যে বনমানুষের অস্থির আদল আসে সন্দেহ নেই, তবু তার মধ্যে আধুনিক মানুষের লক্ষণ সুস্পষ্ট। স্যার আর্থার স্মিথ উডওয়ার্ড এই অস্থিটির নাম দেন উষা-মানব (ইয়োএনথ্রোপাস ডস্‌নি)।

পিল্‌টডাউনের যে প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে এই অস্থি পাওয়া গেছে, তার ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেশ সুনিশ্চিত নয়। তাতে কালনির্ণয়ে অসুবিধা দেখা দেয়। কেউ কেউ মনে করেন, এই অস্থি প্লিস্টোসিন কল্পের আদি পর্যায়ের মানুষের। আবার কারও মতে এটি পরবর্তীকালের—আকস্মিকভাবে পুরাকালের প্রস্তরের সঙ্গে মিশে গেছে। কেউ কেউ একে শিম্পানজির অস্থি বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

তবে বৃটিশ প্রত্নপ্রাণী-বিদ্যাবিদেরা এটিকে উষা-মানবের অস্থি বলে দাবি করেন। কিন্তু ফরাসী আর আমেরিকান পণ্ডিতেরা বনমানুষের মত চোয়ালওয়ালা আধুনিক মানুষসদৃশ অস্থির এতটা সুপ্রাচীনত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত।

প্রাচীনতম যুগ থেকে যত মানবীয় অস্থি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে একদিকে যেমন ধারাবাহিকতার অভাব, তেমনি এই সব আবিষ্কার যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সব কয়টি শাখার পুরো ছবি উন্মোচন করছে এমন কথা বলা যায় না। তবে যত অস্থি পাওয়া গেছে তাকে যদি কালানুক্রমে সাজান যায় তাহলে পরিজ্ঞাত করোটি বা কঙ্কাল থেকে অনায়াসে বোঝা যায় যে দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এগুলি একটি ক্রমিক রূপান্তরের ছবি। প্রাচীনতম অস্থিটির দিকে যদি তাকান যায় তো বনমানুষের সঙ্গে তার সাদৃশ্য অনেক বেশী মনে হয়।

আধুনিক কালের অস্থিটির মধ্য সভ্য আধুনিক মানুষের আদল আসবে। ভূবিদ্যা আর প্রত্নপ্রাণী-বিদ্যা এই সাক্ষ্য দেয় যে বনমানুষের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের সাদৃশ্য আমাদের সমকালীন মানুষের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। হাজার হাজার বছরের ক্রমিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে বনমানুষের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য কমে এসেছে। কালের যাত্রাপথে যত এগিয়েছি তত আলাদা হয়েছি বনমানুষ থেকে। ক্রমে দূরে সরে গেছি, আর সেই সঙ্গে আমাদের গড়নে বেশী করে মানবীয় রূপ ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন উঠেছে যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের দৈহিক লক্ষণের এই বৈশিষ্ট্য মানুষ আর বনমানুষের কৌলিক অভিন্নত্ব প্রমাণ করে কি না। মানুষের যে জীবাশ্ম যত বেশী প্রাচীন, বনমানুষের সঙ্গে তার সাদৃশ্য তত বেশী। এই সাদৃশ্যকে কৌলিক অভিন্নত্বের প্রমাণ বলে দাবি করা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র এই যুক্তির উপর নির্ভর করে ঐ সিদ্ধান্ত করা যায় কি না সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠেছে। মানুষ আর বনমানুষের কৌলিক অভিন্নতার অন্যান্য প্রমাণ অবশ্যই আছে। তবে প্রাগৈতিহাসিক মানবীয় অস্থির সঙ্গে বনমানুষের সাদৃশ্যের যুক্তি কৌলিক অভিন্নত্ব প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে কোন কোন বিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা কিন্তু উভয়ের কৌলিক অভিন্নত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন না। চ্যালেঞ্জ করেন যুক্তিটি। তাঁদের মতে, প্রাগৈতিহাসিক মানুষের দৈহিক গড়নের প্রতিটি পরিবর্তনের কারণ প্রধানতঃ খাদ্য আর স্বভাবের পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত।

জাতবিচারের সমস্যা

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জীবজগতের কতগুলি জীবের দৈহিক গঠন, চেহারার ব্যঞ্জনা আর স্বভাবের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্বাজাত্য প্রতিফলিত হয়। রূপ ও স্বভাবের এই স্বাজাত্য তাদের স্বকীয় পৃথক সত্তা, সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং অপরাপর জীবের সঙ্গে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য দান করে। এই সব বৈশিষ্ট্য আবার পুরুষপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। জনিতা যে নতুন সত্তা সৃষ্টি করে সেই নবজাতক অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনিতার অনুরূপ এবং সর্বক্ষেত্রে কিছুটা বিভিন্নতা সম্পন্ন হয়। নবজাত সন্তানের সঙ্গে জনিতার সুনির্দিষ্ট পরিবারগত সাদৃশ্য থাকে, আবার সেই সঙ্গে সন্তানের নতুন সত্তার নিজস্ব কিছু বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। মানুষসহ জীব-জগতের প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে এই নিয়ম প্রত্যক্ষ সত্য।

জাতিগতভাবে জীবের শ্রেণী-বিন্যাসের পক্ষে রূপ ও স্বভাবের সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতপক্ষে এই স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা আর পুরুষপরম্পরায় সেই বিশিষ্টতা সঞ্চারিত হবার ধারাকে কেন্দ্র করে জাতি-কল্পনার উদ্ভব হয়েছে। যে সব বৈশিষ্ট্য এক শ্রেণীর অন্তর্গত সকলের মধ্যে থাকে এবং যে বৈশিষ্ট্য বংশগতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলতে কেবলমাত্র সেই সব বৈশিষ্ট্যকেই বোঝায়। এ ছাড়া জাতি কথাটির তাৎপর্যের মধ্যে তেমন স্পষ্টতা নেই। তার মানে বংশগতির প্রশ্নটি জাতি কল্পনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জনিতার সঙ্গে জাতকের, পূর্বপুরুষের সঙ্গে উত্তরপুরুষের যুগপৎ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ সত্যের কারণ উদ্ভাবন করা এবং যে বিভিন্নতা জীবজগতে জাতিগত কি ব্যষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সুপ্রজনন-বিদ্যার মুখ্য সমস্যা। প্রজনন রহস্য এবং জীবজগতে বংশগত ধারায় পরিবর্তনের ইতিহাস, এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত। কেন না এই রূপান্তরের ফলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়—জীবজগতে প্রকারণ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া প্রোটোপ্লাজম নামে যে জৈব পদার্থটি আছে তার প্রকৃতি এবং আচরণও এই প্রশ্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কারণ প্রোটোপ্লাজমের জন্যই পরিবর্তন বা রূপান্তর সম্ভব হয়।

॥ বংশগতির বাহকের প্রকৃতি ॥

মানুষ হোক, পশুপক্ষী হোক আর গাছপালাই হোক, প্রতিটি জীবের প্রকৃতি, তার চেহারা, গঠন কিংবা আচরণ মুখ্যতঃ দুটি জিনিসের খেলায়, অর্থাৎ বংশগতি আর প্রতিবেশের প্রভাবে নিরূপিত হয়। জনিতার কাছ থেকে সন্তান শুধু এই বংশগতি বা সহজাত প্রকৃতিটুকু তার জন্মের মূলাধার জনন-কোষের মাধ্যমে অর্জন করে। জীবদেহের আর সবটা বিশ্ব প্রকৃতির আধার থেকে সংগৃহীত হয়। বংশগতির বাহকের ক্ষমতা বিস্ময়কর। প্রকৃতি থেকে খাদ্য এবং অন্যান্য উপাদান গ্রহণ করে সেই আহৃত বস্তুকে সে নির্দিষ্ট ছকে রূপ দিতে পারে, আর সেই রূপের মধ্যে জাতিগত, পরিবারগত এবং ব্যষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জননকোষের আধারে কি আছে যার মাধ্যমে বংশগতি সঞ্চারিত হয়ে থাকে? সেই বস্তুকণার প্রকৃতিই বা কি? কোন্ পদ্ধতিতে সে কাজ করে?

এই সব প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলে মতভেদ আছে; আর তাঁদের শেষ কথাও শোনা যায়নি।

সাবেক ধারণা ছিল যে রক্তের মারফত সন্তানের মধ্যে বংশগতি সঞ্চারিত হয়। জর্জ মেণ্ডেল নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী এই প্রচলিত বিশ্বাস খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে বংশগতির বাহক বস্তুটি বহু অবিভাজ্য বস্তুকণার সমষ্টি। এই বস্তুকণার নাম তিনি দিয়েছেন জেনি। তাঁর মতে এই সব জেনি অবিকৃত অবস্থায় জনিতার দেহ থেকে সন্তানের দেহে সঞ্চারিত হয় এবং স্ত্রী-পুরুষের উৎপাদকশক্তির সংমিশ্রণেও তাদের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। তাছাড়া এই জেনির স্থায়িত্ব এত দীর্ঘ যে তার প্রভাবে পূর্বপুরুষ এবং উত্তরপুরুষের মধ্যে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়।

ওলন্দাজ বিজ্ঞানী উগো দ ভ্রিয়ে এই সূত্র সম্পর্কে আরও নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। গাছপালা ও জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছেন, তার ফলে জেনি এখন জীবজগতের বংশগতির বাহন আর প্রকারণ সৃষ্টির অন্যতম মূল ভিত্তি বলে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি আরও বলেছেন যে হাজার হাজার বছর ধরে বংশগত ধারা অনুযায়ী জীবদেহ সৃষ্টি করে নির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হবার পর জেনি 'অকস্মাৎ একদিন' পরিবর্তিতরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তার মানে হাজার হাজার

বছর ধরে জেনি যদি সোজা চুল সৃষ্টি করে থাকে তো 'অকস্মাৎ একদিন' সে কোঁকড়ান বা পশমী চুলের আকারেও আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

॥ ক্রোমোসোম তত্ত্ব ॥

ক্রোমোসোম তত্ত্বের গবেষণায় জেনি সম্পর্কে সম্প্রতি আরও নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। জানা গেছে যে প্রতি জননকোষে কয়েকটি করে ক্রোমোসোম থাকে আর ভিন্ন ভিন্ন জীব-প্রজাতির মধ্যে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ভিন্ন। জেনি এই ক্রোমোসোমের অংশ। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়েছে। মটর গাছের জননকোষে সাতটি করে ক্রোমোসোম আছে; আর তার প্রতিটি ক্রোমোসোমের মধ্যে সাত সাতটি জেনি আছে। মেণ্ডেল এই জেনিসমূহের একটি মাত্র জেনির সন্ধান পেয়েছিলেন। মানুষের প্রতিটি জননকোষে চব্বিশ জোড়া ক্রোমোসোম আছে। সব কয়টি ক্রোমোসোমের অন্তর্গত জেনির ছক এখনও বিজ্ঞানীরা বের করতে পারেননি। একটি ক্রোমোসোমের আংশিক ছক তৈরী হয়েছে মাত্র। যে জেনিটি স্ত্রী-পুরুষের লিঙ্গগত পার্থক্য সৃষ্টি করে, এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র তার সন্ধান জানা গেছে। আবার এও জানা গেছে যে প্রতিটি ক্রোমোসোমের অন্তর্গত জেনিগুলি সাধারণতঃ একসাথে জোট বেঁধে থাকতে চায়।

ক্রোমোসোম তত্ত্বের প্রবক্তারা স্বীকার করেন না যে, বংশগতি নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতির কোন অমোঘ বা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব আছে। প্রাকৃতিক প্রভাবে বংশগতি পরিবর্তিত হতে পারে একথা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন পরিবর্তিত প্রতিবেশের প্রভাবে ব্যষ্টিসত্তার বংশগত লক্ষণ কতকটা পরিবর্তিত হতে পারে মাত্র। এই পরিবর্তনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। আর এইভাবে অর্জিত নতুন লক্ষণ বংশগতির ধারায় উত্তরপুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না।

জার্মান জীববিজ্ঞানী ভাইসম্যানের মতে বংশগতির নিয়ামক বস্তুটি এক বিশেষ গুণসম্পন্ন জৈব পদার্থ। তিনি বলেন, বংশগতির বাহকের বাসা ক্রোমোসোমের মধ্যে এবং এই ক্রোমোসোমের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকণা আছে যারা 'জীবের আকৃতির চরম ব্যঞ্জনা নিয়ন্ত্রণ করে।' দুই প্রকার জৈব পদার্থ আছে ভাইসম্যানের মতে। বংশগতির বাহক বস্তু আর পুষ্টিসাধক বস্তু। তাঁর মতে বংশগতির বাহক ক্রোমোসোমগুলি যেন এক নতুন জগতের সাক্ষী। এই জগৎ যেন জীবদেহ এবং বেঁচে থাকার অবস্থা নিরপেক্ষ। কোনভাবে তার উপর নির্ভরশীল নয়। জীবদেহকে এইভাবে বংশগতির বাহক বস্তুটির পরিপোষক ও পুষ্টিসাধক ক্ষেত্রে পরিণত করে তিনি ঘোষণা করেছেন যে বংশগতির বাহক

বস্তুটি 'অবিনশ্বর এবং নতুন করে তার সৃষ্টি হয় না।' তার মানে প্রতিটি জীব আবহমান কাল একই বংশগতির ধারা বহন করে চলেছে।

ভাইসম্যানের ব্যাখ্যার অর্থ মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে জীবদেহ বা জীবকোষ বংশগতির বাহক বস্তুটি সৃষ্টি করতে পারে না, কিংবা প্রকৃতির প্রভাবেও তার কোন পরিবর্তন হয় না। অথচ বস্তুটি এমন যে নশ্বর দেহের বিকাশক হয়েও নিজেকে বিকশিত করার ক্ষমতা তার নেই। সোজা কথায় ভাইসম্যানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বংশগতির বাহক বস্তুটি ব্যষ্টিসত্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় না এবং ব্যষ্টিসত্তার বিকাশ বা বাড়তি যে অবস্থার উপর নির্ভরশীল সেই অবস্থাও তাকে প্রভাবিত করতে পারে না।

ভাইসম্যান যে বস্তুটির কথা বলেছেন মেণ্ডেল তারই নাম দিয়েছেন জেনি। মেণ্ডেল-মরগ্যানপন্থী পণ্ডিতেরা জীবদেহকে দুটি বিভিন্ন বস্তুতে ভাগ করেছেন— নশ্বর দেহ বা সোমা আর অবিনশ্বর বংশগতির বাহক বস্তু। কাজেই সোমার অর্থাৎ জীবদেহের পরিবর্তন বংশগতির বাহককে প্রভাবিত করতে পারে না। জীবদেহ যেন এই বস্তুটির বাসা এবং বেঁচে থাকার অবস্থা আর জীবদেহের গঠনের গুণগত বিভিন্নতা নির্বিশেষে এই জৈব পদার্থটি অবিকৃতভাবে পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরপুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বেঁচে থাকার প্রতিবেশ এবং বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে জীব যে সব নতুন লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, সেই বৈশিষ্ট্য কিংবা লক্ষণ উত্তরপুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে না। অর্থাৎ জীবজগতের ক্রমবিকাশের রীতির উপর এই সব অর্জিত বৈশিষ্ট্যের কোন গুরুত্ব নেই। মেণ্ডেল-মরগ্যান-পন্থীদের মতেও বেঁচে থাকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে জীবদেহের বংশগতির গুণগত প্রকারণের কোন সম্পর্ক নেই। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করেন, বেঁচে থাকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যথাযথভাবে পরিবর্তন করে জীবের বংশগতি নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। বংশগতির বাহক বস্তুটি এঁদের মতে অনির্দিষ্ট প্রকারণের গুণসম্পন্ন অর্থাৎ বেঁচে থাকার অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়। তাই বংশগতির পরিবর্তনের কারণ হিসাবে মেণ্ডেল জেনির আকস্মিক খেয়ালের কথা উল্লেখ করেছেন।

॥ মতান্তর ॥

বস্তুবাদী জীববিজ্ঞানী মহল এই আকস্মিক খেয়ালের যুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁরা স্বীকার করেন না যে বংশগতির বাহক বস্তুটি এক অপরিবর্তনীয় অবিনশ্বর জৈব পদার্থ। তাঁরা দাবি করেন বংশগতির নিয়ামক বস্তুটির উপর বহির্জাগ-

তিক প্রকৃতি এবং বেঁচে থাকার প্রতিবেশের অসীম প্রভাব আছে। তাঁদের মতে, প্রকৃতির প্রভাবে বংশগতির রূপান্তর ঘটতে পারে এবং সেই রূপান্তর বংশগতির ধারায় উত্তরপুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। কোন্ প্রাণী বেঁচে থাকবে আর কোন্ প্রাণী মরে যাবে, প্রকৃতি শুধুমাত্র সেইটুকু নিয়ন্ত্রণ করে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বংশগত ধারারও মৌলিক গুণগত রূপান্তর ঘটে। তার অর্থ বংশগত ধারা অনুযায়ী জীবের আকার, গঠন বা আচরণের যে রূপ হওয়া উচিত, প্রাকৃতিক প্রতিবেশের প্রভাবে এবং বেঁচে থাকার অবস্থার প্রভাবে তার গুণগত পরিবর্তন হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা হয়, কোন মানুষের শ্বেতবর্ণত্বের বংশগতি থাকলেও তার চামড়ার রঙ সাদা হবে শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক প্রতিবেশের মধ্যে, আর তার আচরণও হবে ইংরেজের মত যদি সে ইংরেজ পরিবারের মধ্যে লালিত হয় এবং ইংরেজের স্কুলে লেখাপড়া শেখে।

এঁরা বলেন, বেঁচে থাকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে উদ্ভিদ্ বা জীবজন্তু যে ধরনের ব্যষ্টিগত বিভিন্নতা অর্জন করে, উত্তরপুরুষের পক্ষে সেই প্রকারণ উত্তরলব্ধি হিসাবে অর্জন করা সম্ভব। অর্জিত প্রকৃতি যে বংশগতিত্ব লাভ করতে পারে, জীববিজ্ঞানের এই তত্ত্বের কথা প্রথম বলেন লামার্ক। পরে ডারউইনের লেখার মধ্যে এই তত্ত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। রুশ বিজ্ঞানী মিচুরিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই তত্ত্বের সত্যতা হাতে-কলমে প্রতিপন্ন করেছেন।

এই মতের প্রবক্তারা বলেন, জীবদেহ গঠনের ব্যাপারে বহিঃপ্রকৃতির সক্রিয় ভূমিকা আছে। যে জননকোষ থেকে উত্তরপুরুষ জন্মলাভ করে, সেই কোষ নবসৃষ্ট জীবদেহের আধারে সৃষ্টি হয়। পুনরুৎপাদনক্ষম এই নবসৃষ্ট জীব-দেহটি যে জননকোষ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল, তা থেকে নয়। জীবদেহের মধ্যে দেহনিরপেক্ষ কোন আলাদা বংশগতির বাহকের অস্তিত্ব থাকতে পারে, একথা এঁরা স্বীকার করেন না। জীবদেহে পরিবর্তনের ফলে বংশগতি পরিবর্তিত হয়। আর এই পরিবর্তন তখনই হয় যখন জীবদেহের মধ্যে আত্তীকরণ বা তার বিপরীত ক্রিয়ার স্বাভাবিক রীতির ব্যতিক্রম ঘটে, তার বিপাকের ধারা যখন বদলায় অর্থাৎ পুষ্টিসাধক বস্তুকে জৈব পদার্থে পরিণত করার স্বাভাবিক নিয়ম যখন পালটে যায়। জীবদেহের বা তার কোন অঙ্গবিশেষের কিংবা তার আচরণের পরিবর্তন সব ক্ষেত্রে এবং পুরোপুরিভাবে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত নাও হতে পারে; কিন্তু উত্তরপুরুষের নবসৃষ্ট জীবদেহে যদি কোন ভিন্ন ধরনের জীবাণু পাওয়া যায়, তাহলে সেই বিভিন্নতার কারণ হচ্ছে জনিতার বংশগতির পরিবর্তন। আবার জনিতার

মধ্যে সেই পরিবর্তন ঘটে জীবদেহ বা তার অঙ্গবিশেষের বিকাশের পথে বেঁচে থাকার পারিপার্শ্বিকতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের ফলে। তবে যৌন বা উৎপাদনক্ষম জীবাণুর প্রভাব এই ব্যাপারে বেশী কার্যকরী হয়।

সোবিয়েত বিজ্ঞানী লাইসেঙ্কোর ভাষায়, বংশগতির পরিবর্তন, নতুন প্রকৃতি অর্জন এবং তার বৃদ্ধি ও সঞ্চয়ন সব ক্ষেত্রে জীবের বেঁচে থাকার অবস্থার দ্বারা নিরূপিত হয়। পুরুষ পরম্পরায় জীবদেহ যে সব নতুন প্রকৃতি বা গুণ সঞ্চয় করে, তার ফলে বংশগতির পরিবর্তন অথবা সেই সংক্রান্ত জটিলতার উদ্ভব হয়। জীবদেহ আর তার বেঁচে থাকার পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিভিন্ন জীবদেহের বিকাশের জন্য বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের প্রকৃতি অনুধাবন করে জীবদেহের প্রকৃতির গুণগত বৈশিষ্ট্য কিংবা তার বংশগতির গুণগত বৈশিষ্ট্য জানা সম্ভব। নির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকার পক্ষে, বিকাশলাভের পক্ষে আর বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে নির্দিষ্টভাবে সাড়া দেবার জন্য জীবের মধ্যে যে সব গুণ থাকা আবশ্যক, তাকেই বলে বংশগতি। ... পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে স্বকীয় পদ্ধতিতে এবং বংশগতি অনুযায়ী প্রতিটি জীব তার দেহ গড়ে তোলে। সেই কারণে অভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বিভিন্ন জীবদেহ বেঁচে থাকে এবং বিকাশলাভ করে। উদ্ভিদ্ কিংবা জীবজন্তুর যে কোন এক পুরুষ সচরাচর প্রধানতঃ তার পূর্বপুরুষ, বিশেষতঃ তার নিকটতম পূর্বপুরুষের মত বিকাশলাভ করে। নিজের মত জীব সৃষ্টি করা জীবদেহের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য। ...কোন জীবদেহ যদি তার বংশগতির অনুকূল প্রতিবেশ পায়, তাহলে তার বাড়তি পূর্বপুরুষের মত হবে। কিন্তু অনুকূল প্রতিবেশ যদি না থাকে, যদি নিজেদের প্রকৃতির অল্পবিস্তর প্রতিকূল কোন পরিবেশের মধ্যে বাস করতে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে তারা বাধ্য হয়, তাহলে তাদের দেহ বা অঙ্গবিশেষ পূর্বপুরুষের চাইতে কিছুটা ভিন্ন হবে। এই পরিবর্তিত অঙ্গ-বিশিষ্ট জীব থেকে যদি নতুন জনির সূত্রপাত হয়, তাহলে সেই নতুন উত্তরপুরুষের গঠন বা প্রকৃতি পূর্বপুরুষের চাইতে অল্পবিস্তর আলাদা হবে।

লাইসেঙ্কো আরও বলেছেন যে জীবজগতের বংশরক্ষার বাহন হচ্ছে জনন-কোষ। এই জননকোষ বা অন্য যে কোন জীবকোষ সমগ্র জীবদেহের বাড়তির ফলে আত্তীকরণের পদ্ধতি অনুযায়ী সৃষ্টি হয়ে থাকে। জীবদেহের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় যেন জীবকোষের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে তার মধ্য থেকে নতুন জনি সৃষ্টি করে। কাজেই একথা বলা চলে, নবজাতকের দেহ যতটা নতুন করে গঠিত হয়, বংশগতিসহ তার দৈহিক গুণও ততটা নতুনভাবে বিকাশলাভ করে।

তাহলেই বোঝা যায় যে জাতি-কল্পনার অন্যতম মূলভিত্তি বংশগতি সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলে প্রবল মতভেদ আছে। একপক্ষ অনির্দিষ্ট পরিবর্তনের গুণসম্পন্ন এক বংশগতির বাহকের অস্তিত্বে আস্থাবান, আর অপর পক্ষের মতে জীবদেহের বিকাশের পথে যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং বেঁচে থাকার অবস্থা দেখা দেয়, বংশগতির বাহক সেই অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত পরিবর্তনশীল জৈব পদার্থ।

যে প্রতিবেশের মধ্যে জীবজগতের প্রজাতিগুলি বেঁচে থাকে, সেই প্রতিবেশের যদি কোন পরিবর্তন ঘটে তাহলে সেই প্রজাতির কিছুটা পরিবর্তন হয়, এ তো প্রত্যক্ষ সত্য। প্রতিটি প্রজাতির মধ্যে এমন কিছু জীব অবশ্যই থাকে যারা নিজস্ব বিভিন্নতার জন্য অনায়াসে পরিবর্তিত নতুন প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে নিতে পারে। আবার নিজস্ব প্রকারণের জন্য কিছু জীবের পক্ষে বেঁচে থাকাও ক্লেশকর হয়ে ওঠে। যারা প্রতিবেশের সঙ্গে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তারা দীর্ঘজীবী হয়—অধিক সংখ্যায় বংশবৃদ্ধিও করতে পারে। এইজন্য প্রতিটি প্রজাতির অধিকাংশ জীব নতুনতর পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকার উপযোগী হবার উদ্দেশ্যে নিজস্ব প্রকৃতির পরিবর্তনসাধনের জন্য সচেষ্ট হয়। প্রকৃতি পরিবর্তনের এই রীতিকে বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন, অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূলে জীবের স্বকীয় প্রকৃতির পরিবর্তনসাধন। যে কোন প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা, পরিবর্তন ও ধ্বংস-সাধনের জন্য যত শক্তি কাজ করে তার খোঁজ এখনও পুরোপুরি জ্ঞাত নয়। কিংবা তার কারণ সম্পর্কে মতভেদও থাকতে পারে। কিন্তু জীবজগতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাব যিনি অস্বীকার করবেন, বুঝতে হবে জীবনের নিত্যসত্য সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ।

প্রকৃতির এই পরিবর্তনসাধিকা শক্তির বলে মূল প্রজাতি থেকে শাখা-প্রজাতি, আঞ্চলিক জাতি অথবা জাতির উদ্ভব হয়। জল, বায়ু, মাটি এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে প্রাণী বা উদ্ভিদের মূল প্রজাতিগুলির চেহারা, গঠন এবং শারীরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া স্থানীয় বিশিষ্টতা এবং বিভিন্নতা অর্জন করে। এই নতুন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মূল বংশগত ধারা লোপ নাও পেতে পারে। কিন্তু স্থানীয় বিশিষ্টতা এই নতুন সৃষ্টিকে নতুন জাতিত্ব দান করে। নতুন জাতিগঠন এবং নতুনতর বিশিষ্টতা অর্জনের এই রীতিকে ডারউইন জীবজগতের অভিব্যক্তির চিরন্তন ধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন। ক্রমবিকাশের ধারা তখনই শুরু হয় যখন জীবজগতের কোন প্রজাতি নিজের আবাসে নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্মুখীন হয়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নতুন প্রতিবেশের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে নেবার জন্য এমনভাবে তাকে জৈব প্রকৃতি সংশোধন করতে হয়,

যাতে বিনাশের পরিণতি এড়িয়ে সে দীর্ঘজীবী হতে এবং বংশবৃদ্ধি করতে পারে। আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনসাধনের আত্মচেষ্টা তার রূপ ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়।

॥ জাতিগত বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য ॥

রূপ ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি হবার এই রীতি মানুষসহ জীবজগতের সমস্ত প্রাণী সম্পর্কে প্রযোজ্য। মানুষের মধ্যেও বংশগতিক্রমে রূপ ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার হয়। প্রকৃতির পরিবর্তনসাধিকা শক্তির প্রভাব মানুষের ক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল। বংশগতির বাহক অনির্দিষ্ট পরিবর্তনশীলতার গুণসম্পন্ন জৈব পদার্থ হোক, অপরিবর্তনীয় অবিনশ্বর জৈব পদার্থ হোক, আর পরিবর্তনশীল প্রতিবেশ দ্বারা প্রভাবিত পরিবর্তনশীল জৈব পদার্থই হোক, তার প্রভাবে পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য উত্তরপুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং জনিতার সঙ্গে জাতকের অনুরূপতা দেখা দেয়। জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ সকলের মধ্যে বিদ্যমান আর বংশগতিক্রমে সঞ্চারিত বৈশিষ্ট্যের লক্ষণও মানবকুলে আছে এবং তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, বিশেষতঃ দৈহিক লক্ষণগুলি, প্রায় অক্ষুণ্ণ অবস্থায় কিংবা সামান্য পরিবর্তিতরূপে বংশগতিক্রমে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই দৈহিক লক্ষণের বিশিষ্টতাকে কেন্দ্র করে মানবকুলকে জাতিগত-ভাবে ভাগ করা হয়েছে। এই জাতিগত দেহলক্ষণের বিশিষ্টতা শুধুমাত্র আধুনিক মানুষের মধ্যেই লক্ষ্য পড়ে না। প্রায় দেড় কোটি বছর আগে জীবধাত্রী বসুন্ধরার কোলে মানবাকার প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। রহস্যময় সেই সুদূর অতীতকাল থেকে আরম্ভ করে হাজার পঁচিশেক বছর আগে আধুনিক মানুষের আবির্ভাবের দিনটি পর্যন্ত, কালের যাত্রাপথে যত নতুন আকৃতি ও প্রকৃতির মানুষের আবির্ভাব ও বিলুপ্তি হয়েছে তার বিস্তারিত ইতিহাস সুপরিজ্ঞাত নয়। তবে শিলীভূত অস্থির সাক্ষী-প্রমাণের মধ্য দিয়ে যতটা জানা যায় তাতে এই ধারণা হয় যে, আধুনিক মানুষের বিকাশের পূর্বে যত মানুষ বসুন্ধরার বুকে বিচরণ করেছে, তাদের মধ্যেও রূপ ও প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল এবং স্বকীয় বিশিষ্টতার সামগ্রিক বিচারে তারাও স্বতন্ত্র জাতিত্বের দাবিদার।

তবে মানুষের তথাকথিত জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে কিন্তু তার স্বতন্ত্র প্রজাতিত্বের লক্ষণ বলে গণ্য করা হয় না। নৃবিদ্যাবিদেরা স্বীকার করেন না যে মানবকুলের তথাকথিত জাতিগুলি স্বতন্ত্র প্রজাতি এবং এই প্রজাতিগুলি অজ্ঞাত অতীতে স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল, আর তার ধারা এখনও বংশগতিক্রমে বাহিত হয়ে আসছে। তাঁদের মতে, মানুষের সমস্ত জাতি এক

অভিন্ন আদিম মানবকুলোদ্ভব। শারীরবৃত্তবিদ্‌, শারীরসংস্থানবিদ্‌, ভাষাবিদ্‌ আর মনোবিদ্যাবিদের গবেষণায় এই মৌলিক একত্ব স্বীকৃত হয়েছে। মানুষের উৎপত্তির স্থান সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও, তার মূলগত জাতবিচারের ক্ষেত্রে পণ্ডিত মহলে মতভেদ নেই বললেই চলে। মানবকুলের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা শাখা-প্রজাতিত্বের লক্ষণ বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী। কিন্তু জাতি শব্দটি এমন বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত যে, দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে শাখা-প্রজাতির বদলে জাতি কথাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

তাই বলে একথা মনে করা যায় না যে মানুষের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য একেবারেই নেই। জীবজগতে যে সব বৈশিষ্ট্যকে ভিন্ন প্রজাতিত্বের লক্ষণ বলে গণ্য করা হয়, তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মানুষের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও দেখা যায়। সাদৃশ্যসম্পন্ন কোন দুটি জীবকে ভিন্ন প্রজাতির জীব বলে গণ্য করা উচিত কিংবা অভিন্ন প্রজাতির অন্তর্গত প্রকারণ বলে গণ্য করা উচিত—এই প্রশ্নের বিচার করতে গিয়ে জীববিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ কয়েকটি বাস্তব প্রমাণের উপর নির্ভর করে থাকেন। তাঁরা বিচার করে দেখেন, জীব দুটির পার্থক্যের মাত্রা কতটা এবং দেহতন্ত্রের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই পার্থক্য আছে, আর এই পার্থক্যের পরিমাণ কম না বেশী। তাছাড়া এই পার্থক্যের গুরুত্ব এবং তার ধ্রুবকতার প্রশ্নও বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। বৈশিষ্ট্যের ধ্রুবকতার উপর বিজ্ঞানীরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। যদি দেখা যায়, জীব দুটি দীর্ঘকাল তাদের সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তাহলে সেই বিশিষ্টতা তাদের স্বতন্ত্র প্রজাতিত্বের লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়।

মানুষের বিভিন্ন জাতির অঙ্গলক্ষণের তুলনা করলে দেখা যাবে যে তাদের নাক, চোখ, মুখ ও মাথার গঠন এবং দেহতন্ত্রের ব্যঞ্জনার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। কয়েকটি পার্থক্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া প্রতিটি জাতি বহু শত বছর স্বকীয় বিশিষ্টতা মোটামুটি বজায় রেখে এসেছে। এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার নজীর আলাদা প্রজাতিত্বের স্বপক্ষের যুক্তি। কিন্তু কোন বৈশিষ্ট্যের ধ্রুবকতার প্রশ্ন যদি বিচার করা হয় তাহলে ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হবে। কেন না সমস্ত জাতের মানুষের স্বাতন্ত্র্যসূচক বিশিষ্টতাগুলি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। এক জাতের মধ্যেই সেই সব বৈশিষ্ট্যের বহু প্রকারণ থাকে। এমন কোন জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায় না, যেটি জাতির অন্তর্গত সকলের মধ্যে অবিকল একভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কোন নিত্য বৈশিষ্ট্যও কোন জাতের নেই। দলীয় গণ্ডীবদ্ধ বর্বর মানুষের চেহারাও অবিকল এক ছাঁচে ঢালা নয়।

আমেরিকার কয়েকটি দলের গায়ের রঙ আর লোমশতার মধ্যেও পার্থক্য আছে। আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যেও গায়ের রঙে খানিকটা এবং চেহারার ব্যঞ্জনায় প্রভৃত পার্থক্য দেখা যায়। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কাজেই অনিত্য বিশিষ্টতার ভিত্তিতে প্রজাতির সংজ্ঞা-নির্ণয়ের প্রয়াসকে বিজ্ঞানীরা হঠকারিতা বলে গণ্য করেন।

তাছাড়া কোন দুটি জীবের প্রথম পরিনিষেকের ফলে যদি নতুন জনি সৃষ্টি না হয়, অর্থাৎ তারা যদি খানিকটা বন্ধ্যাতার লক্ষণ প্রকাশ করে, তবে সেই বৈশিষ্ট্যকেও স্বতন্ত্র প্রজাতিত্বের লক্ষণ বলে গণ্য করা হয়। আর এই বন্ধ্যাতা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য-সম্পন্ন কোন দুটি জীব এক আঞ্চলিক চৌহদ্দির মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তাদের উভয়ের বিশিষ্টতাসম্পন্ন কোন জীব-প্রকারণ যদি সেখানে পাওয়া না যায়, তাহলে মধ্যবর্তী প্রকারণের অবর্তমানতা জীবদ্বয়ের সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের সুনিশ্চিত প্রমাণ বলে গৃহীত হয়।

মানুষের মধ্যে ভিন্ন জাতের নরনারীর মিলনে সন্তান জন্মে না একথা সত্য নয়। বিভিন্ন জাতের মিলনের ফলে সংকর-লক্ষণাক্রান্ত মানুষের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই সংকরদের মধ্যে বহু মিশ্র-লক্ষণের দৃষ্টান্ত আছে। গোটা আমেরিকা মহাদেশের অগণিত মানুষ এই মিশ্র-লক্ষণের ধারক। নিগ্রো ও পর্তুগীজ আর ইণ্ডিয়ান ও স্পেনিয়ার্ডদের সংকর-সন্তান ছড়িয়ে আছে দক্ষিণ আমেরিকায়। উত্তর আমেরিকায় আছে নিগ্রো, ইণ্ডিয়ান আর ইউরোপীয়দের মিলনজাত মিশ্র-লক্ষণের সংকর-সন্তান। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপবক্ষেও পলিনেশীয় আর ইংরেজের রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। ফিজি দ্বীপে হয়েছে নিগ্রো আর পলিনেশীয়দের সংমিশ্রণ। আফ্রিকার বহু অঞ্চলে এই ধরনের জাতিগত মিশ্রণের অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। তাছাড়া এই মিশ্রণ শুধু ইদানীংকালে কিংবা দু-এক ক্ষেত্রে ঘটেনি। আধুনিক মানুষের সকল জাতির মধ্যে মিশ্র-লক্ষণের অস্তিত্ব আছে। জাতিগত মিশ্রণ বহু হাজার বছর আগে আরম্ভ হয়েছে। একাধিক জাতির মধ্যে কোন ঘটনাচক্রে যদি যোগাযোগ ঘটে, তবে তাদের মিশ্রণ অনিবার্য এবং এই মিশ্রণের ফলে সংকর জাতির উদ্ভব হয়। ফলে মিশ্রধারা দেখা দেয়। যে সব মূল বংশধারার সংমিশ্রণে এই মিশ্রধারার সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে মূলজাতির বংশগতির বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে না। তবে এই বৈশিষ্ট্যের দু-একটি দৃষ্টান্ত থাকতে পারে; কিন্তু সেই সঙ্গে সংকর এবং নতুন ধারার সাক্ষীও অবশ্য থাকবে মানবসমাজেও তাই ঘটেছে। বিভিন্ন জাতি প্রথমতঃ

নির্দিষ্ট আঞ্চলিক চৌহদ্দির মধ্যে উদ্ভূত হলেও তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ঘটেছে। যৌন-সংযোগ ঘটেছে ভিন্ন বংশগতিসম্পন্ন নরনারীর। ফলে মিশ্রধারার উদ্ভব হয়েছে। প্যালেস্টাইনে প্রস্তর যুগের যে সব শিলীভূত করোটি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে নিয়ানডারথ্যাল আর আধুনিক মানুষের সংকরত্বের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। বহু সহস্র বছর পূর্বে আরব্ধ এই সংকরত্বের ধারা আজও মানবসমাজে অব্যাহত।

তার মানে, কোন দুই জাতের মানুষ যদি এক স্থানে বাস করে তাহলে তাদের মধ্যে মিলন ঘটে এবং তার ফলে মিশ্র-লক্ষণের সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই অন্তবর্তী প্রকারণ জাতি দুটির সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অর্থাৎ তাদের প্রজাতিগত পার্থক্যের প্রমাণ নয়। বরং মিশ্র-লক্ষণের প্রকারণ প্রমাণ করে যে জনিতার জাত দুটি আলাদা প্রজাতি বলে গণ্য হতে পারে না।

এই সব কারণে মানুষের বিভিন্ন জাতিকে আলাদা প্রজাতি বলে গণ্য না করে তাদের শাখা-প্রজাতি আখ্যা দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে মানুষ অভিন্ন কুলোদ্ভব।

মানুষের বর্তমান জাতিগুলির মধ্যে বহু বিষয়ে পার্থক্য আছে সন্দেহ নেই। আঙ্গিক লক্ষণের পার্থক্য অনস্বীকার্য। কিন্তু বিভিন্ন জাতের মানুষের গোটা দেহ-তন্ত্রের যদি তুলনামূলক বিচার করা হয়, তবে বৈসাদৃশ্যের চাইতে সাদৃশ্যের মাত্রা অনেক বেশী হবে। শুধু দেহতন্ত্র কেন, মানসিকতার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। রুচি, প্রকৃতি ও অভ্যাসের মধ্যে এই সাদৃশ্য ধরা পড়ে। সকল জাতের মানুষ নাচতে, গান গাইতে, অভিনয় করতে, ছবি আঁকতে এবং উলকি পরতে ভালবাসে এবং এই সব কাজে আনন্দ অনুভব করে। অঙ্গভঙ্গীসহকারে ইঙ্গিত দ্বারা ভাব প্রকাশ করার মধ্যেও সাদৃশ্য আছে। সম-আবেগে উদ্দীপিত হলে সকলে প্রায় এক ধাঁচের অস্ফুট ধ্বনি উচ্চারণ করে। তাছাড়া বিভিন্ন জাতের মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির মধ্যেও যেন খানিকটা সমধর্মিতা আছে। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত তীরধনুক, অলংকারের প্রকৃতি তার প্রমাণ। রীতিনীতি আর বিশ্বাসের দিক থেকেও যে মিল আছে তার নজীরও পাওয়া যায়, যেমন প্রায় সকল জাতের মানুষই মৃতদেহ সমাধিস্থ করে।

দুই বা ততোধিক গৃহপালিত জাতির মধ্যে অভ্যাস, রুচি এবং প্রকৃতিগত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখতে পেলে জীববিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করে থাকেন যে, এই সব গুণ তারা অভিন্ন বংশপতি থেকে অর্জন করেছে এবং বংশপতির মধ্যে সব কয়টি গুণ ছিল। এই কারণে সকলকে এক প্রজাতিভুক্ত গণ্য করা

হয়। মানুষের বিভিন্ন জাতি সম্পর্কেও এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

॥ জাত-বিভাগের বাস্তব বিচার ॥

এইবার তাহলে দেখা যাক, যে সব ভিত্তির উপর আধুনিক মানুষের জাত-বিভাগ করা হয়, বাস্তব বিচারে তার জাতিগত তাৎপর্য কতটা।

যে বৈশিষ্ট্য জাতির অন্তর্গত সকলের মধ্যে বিদ্যমান নয় তাকে কিন্তু জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। আবার যে সব বৈশিষ্ট্য বংশগতিক্রমে সঞ্চারিত হয় না তাকেও জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। এই বৈশিষ্ট্য দেহের গঠন, দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ দৈহিক গঠন এবং দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সমসত্ত্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মূলভিত্তি। এই ভিত্তির উপর আলোচনা করে দেখা যাক যে বাস্তব ক্ষেত্রে অবস্থা কি রকম দাঁড়ায়।

শারীরিক লক্ষণের বাহ্য পার্থক্য জাতিগত শ্রেণী-বিন্যাসের অন্যতম ভিত্তি। মানবদেহের অস্থির গঠন, মাথার খুলির আকার, মুখের ছাঁদ, চামড়ার রঙ, নাকের গঠন, চোখের রঙ, আকার ও সংস্থান আর চুলের রঙ ও বিন্যাসের মধ্যে এই পার্থক্য প্রতিফলিত। জাত-বিভাগ করতে গিয়ে কোন কোন পণ্ডিত বিশেষ এক একটি অঙ্গলক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। গায়ের রঙের গুরুত্ব প্রথম দিকে প্রাধান্য লাভ করেছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে বর্ণই এখনও জাতবিচারের সহজ মানদণ্ড। জার্মান নৃকুলবিদ্যাবিদ্ জোহান ফ্রিড্‌রিস ব্লুমেনবাখের মতে, আধুনিক মানুষের মধ্যে বর্ণানুগ পাঁচটি জাতি আছে: শ্বেতকায় (ককেসীয়), পীতকায় (মোঙ্গল), কৃষ্ণকায় (ইথিওপীয়), লোহিতকায় (আমেরিকান) আর পিঙ্গলকায় (মালয়ী)। কেউ কেউ আবার মাথার খুলির আকার ও প্রকারের ভিত্তিতে জাত-বিভাগের পক্ষপাতী। কেউ বা গুরুত্ব দেন চুলের উপর, কেন না দেহলক্ষণের মধ্যে একমাত্র চুলের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু জাত-বিভাগের এই সব মানদণ্ড পণ্ডিতমহলে খুব নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত নয়। সব দিক বিচার করে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে মানবকুলে তিনটি প্রধান বিভাগ আছে। বিভাগ তিনটির নাম: ককেসীয়, মোঙ্গল আর নিগ্রো। দেহলক্ষণের পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিভাগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোন বিভাগের দেহলক্ষণেরই সুনির্দিষ্ট কোন ছক নেই। তবে মোটামুটিভাবে খানিকটা সাধারণ সাদৃশ্য অবশ্যই আছে। সেই দিক থেকে বিচার করলে এদের জাতিগত দেহলক্ষণের প্রকৃতি মোটামুটি এই রকম দাঁড়ায়:

দৈহিক লক্ষণ	ককেসীয়	মোঙ্গল	নিগ্রো
গায়ের রঙ :	ফিকে লালচে সাদা থেকে তামাটে কটা	গাঢ় পীত থেকে পীতাভ কটা … লালচে কটাও হয়	কটা থেকে বাদামি কালো … কেউ বা বাদামি কটা
আকার	মাঝারি থেকে লম্বা	মাঝারি লম্বা থেকে মাঝারি বেঁটে	লম্বা থেকে খর্বকায়
মুখমণ্ডল	সরু থেকে মাঝারি প্রশস্ত … উন্নত ধরনের … চোয়াল উঁচু নয়	মাঝারি প্রশস্ত থেকে বেশ প্রশস্ত …চোয়াল উন্নত এবং চ্যাপটা থেকে কতকটা উন্নত	মাঝারি প্রশস্ত থেকে সরু…মাঝারি উন্নত … চোয়াল উদ্গত
চুল	মাথার : ফিকে পিঙ্গল থেকে গাঢ় বাদামি … চিকণ থেকে মাঝারি মসৃণ … সোজা থেকে ঢেউ খেলান। গায়ের : কম থেকে বেশী	মাথার : বাদামি থেকে কালচে কটা … অমসৃণ … সোজা গায়ের : বিরল	মাথার : কালচে কটা থেকে কালো … অমসৃণ…অল্প কোঁকড়ান থেকে পশমের মত কোঁকড়ান। গায়ের : সামান্য
চোখ	ফিকে নীল থেকে গাঢ় কটা	কটা থেকে বাদামি কটা	কটা থেকে কালচে কটা…
নাক	সাধারণতঃ খাড়া… সরু থেকে মাঝারি চওড়া	সাধারণতঃ থ্যাবড়া থেকে মাঝারি খাড়া… নাসা মাঝারি চওড়া	সাধারণতঃ থ্যাবড়া… নাসা মাঝারি চওড়া থেকে বেশ চওড়া
দেহের গড়ন	রৈখিক থেকে পার্শ্ব বিশিষ্ট … লিকলিকে থেকে গাঁট্টা-গোট্টা	কতকটা প্রশস্ত ধরনের… রৈখিক লক্ষণও দেখা যায়	প্রশস্ত ধরনের… পেশল তবু কিছুটা রৈখিক গুণসম্পন্ন।

সুইডেনের মানুষের সঙ্গে নিগ্রোর তুলনা করলে দেখা যায়, সুইডিসের রঙ সাদা, চুল সোজা বা ঢেউ খেলান, নাক সরু এবং উন্নত, আর নিগ্রোর রঙ কালচে, চুল কোঁকড়ান, নাক চ্যাপটা ও বিস্ফারিত। উভয়ের বিশিষ্টতা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ে পড়ে। কেন না সুইডিস বা নিগ্রোদের সকলের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আছে, আর বংশগতিক্রমে তার সঞ্চার হয়।

প্রকৃতপক্ষে অঙ্গলক্ষণের পার্থক্যের ভিত্তি ছাড়া অন্য কোনভাবে জাতিগত বিশিষ্ট লক্ষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যায় না। কোন শারীরস্থানবিদের সামনে যদি দুটি ঘিলু রেখে দেওয়া হয় এবং তার কাছে অন্য কোন প্রমাণ যদি না থাকে, তাহলে তিনি সঠিকভাবে বলতে পারবেন না যে কোন্ ঘিলুটি নিগ্রোর, আর কোন্‌টি সুইডিসের।

তাছাড়া দুটি জাতির সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হবে তাদের চেহারার সাদৃশ্য তত বেশী হবে। নিগ্রোর সঙ্গে সুইডিসের পার্থক্য যতটা স্পষ্ট, দিনেমারদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য তত স্পষ্ট নয়। ডেন জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যত জ্ঞান থাক না কেন, কোন মানুষকে চট করে দিনেমার বলে সনাক্ত করা যায় না। সে যদি লম্বা, সাদা আর নীলনয়ন হয় এবং তার মাথার গঠন যদি লম্বাটে হয়, তাহলে সে সুইডিসও হতে পারে। আবার সম-আকৃতির মানুষ জার্মানি, ইতালী কিংবা ফ্রান্সেও পাওয়া যাবে।

এই ধরনের অবস্থা যখন থাকে, জাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রশ্ন তখন ওঠে না। সকলের মধ্যে যে লক্ষণ নেই, তাকে জাতিগত বংশগতি বলা যায় কি করে? উত্তর ইতালীর মানুষের মাথা গোলাকার আর স্কান্দেনেভীয়দের মাথা লম্বাটে। অথচ উভয় স্থানের মানুষের মধ্যে এত মিশ্র-লক্ষণ আছে এবং দেহের গঠনে এত মিল আছে যে সহসা উভয় স্থানের কোন লোককে ইতালীয় অথবা স্কান্দেনেভীয় বলে সনাক্ত করা কঠিন। পুরোপুরি স্থানীয় বিশিষ্টতাসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে অনুমান বরং সত্য হতে পারে ; কিন্তু মিশ্র-লক্ষণবিশিষ্ট মানুষ যে কোন জাতের হতে পারে। কাজেই উভয় স্থানের দৈহিক বিশিষ্টতা সঠিক অর্থে জাতিগত বৈশিষ্ট্য নয়।

॥ জাতিরূপ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ॥

প্রকৃতপক্ষে জাতিরূপ সম্পর্কে সচরাচর যে ধারণা পোষণ করা হয় সেই ধারণা ত্রুটিপূর্ণ। কোন এক ধাঁচের চেহারার আধিক্য থাকলে তাকে সেই জাতির আসল জাতিরূপ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ সুইডিস সাদা, লম্বা আর নীলনয়ন। এই দৈহিক লক্ষণকে সাধারণতঃ সুইডিসের সাচ্চা জাতিরূপ বলে

কল্পনা করা হয়। সেই সঙ্গে ভুলে যাওয়া হয় যে স্কান্ডেনেভিয়াতেও ভিন্ন চেহারার মানুষ আছে। সিসিলি দ্বীপের মানুষ সাধারণতঃ ময়লা, বেঁটে ; তাদের চোখ কালো এবং চুলও কালো। এই লক্ষণকে সিসিলিয়ানদের জাতিরূপ বলে গ্রহণ করা হয় এবং সেই সঙ্গে ভুলে যাওয়া হয় যে তাদের মধ্যেও দৈহিক প্রকারণ আছে।

যে কোন দেশের দিকে তাকালে এক ধাঁচের চেহারার আধিক্য লক্ষ্য পড়ে। মনে হয় যেন শুধুমাত্র সেই ধাঁচের চেহারার মানুষ সেই দেশে বসবাস করে। কিন্তু এই ধারণা সেই দেশের মানুষের বংশগত ধারার প্রকৃতি চেনার সহায়ক নয়। কেন না জাতিরূপ সম্পর্কে যে ধারণা গঠন করা হয়েছে সেই ধারণা সম্পূর্ণ আত্মগত ধারণা—আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

মনে করা যাক, সুইডেনের যে অঞ্চলের মানুষ সাদা, লম্বা আর নীলনয়ন ; সেখানকার কোন সরল সুইডিস স্কটল্যাণ্ডে গেল। সে যদি অকপটে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে, তবে তাকে বলতে হবে যে স্কটল্যাণ্ডে একদল সুইডিস আর তার পাশাপাশি ভিন্ন জাতের মানুষ দেখে এল। কোন স্কচম্যান যদি সুইডেনে যায়, তাহলে তাকেও বলতে হবে যে সুইডেনেও সে নীলনয়ন স্কচ দেখে এল। উভয়ের ধারণা পূর্বতন অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতিরূপের কথা বলতে গিয়ে সচরাচর ঠিক এই ধরনের কথা বলা হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা আর ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন আকৃতির মানুষকে শ্রেণীবদ্ধ করে থাকি এবং সেই ধাঁচের মানুষ দেখলে তাকে সাচ্চা জাতিরূপ বলে গ্রহণ করি। এই ভাবে বিচার করে সাদা রঙের উত্তর ইউরোপীয় আর নাক-খাড়া এবং মাথার পেছন চ্যাপটা আর্মানিরা সাচ্চা জাতিরূপ বলে গৃহীত হয়।

কিন্তু জৈবিক অর্থে এই জাতের ধারণা খুব যুক্তিগ্রাহ্য নয়। নির্দিষ্ট ছক মাফিক চেহারা হলে তাকে সাচ্চা জাতিরূপ বলা যায় না। কারণ আমরা জানি না যে তার সন্তানের চেহারার মধ্যে কতটা বিভিন্নতা থাকবে এবং সেই লোকটার নিজের বংশগতিই বা কি ! যদি প্রমাণও হয় যে, এই সব সাচ্চা জাতিরূপবান মানুষের উদ্ভব সমসাত্বিক, তবু জোর করে একথা বলা যাবে না যে মিশ্র-চেহারার মানুষের উদ্ভব সমসাত্বিক নয়।

।। জাতিগত বংশগতির বিশ্লেষণ ।।

বংশগতি বলতে পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরপুরুষের মধ্যে দৈহিক এবং বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার বোঝায়। সেই দিক থেকে বিচার করলে প্রথমেই স্বীকার করতে হয়, জাতি বলতে যে জনসমষ্টিকে বোঝায় *তারা যে সাধারণ পূর্বপুরুষ*

থেকে উদ্ভূত সে কথা প্রমাণ করা যায় না। তবে কোন কোন পরিবারের সন্তানদের মধ্যে পূর্বপুরুষের গুণাবলী বংশগতিক্রমে সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এদের তো আর জাতি বলা হয় না। ভাইবোনদের এই দলকে তো ভ্রাতা-ভগিনীদল (ফ্রেটারনিটি) বলে।

আবার ভাইবোনদের সকলের চেহারাও এক রকম হয় না। তাদের চেহারার মধ্যেও রকমফের থাকে। জাতির অন্তর্গত সকল ভাইবোনদের চেহারা যদি এক রকম হয়, তবে তাদের চেহারার লক্ষণকে জাতির বংশগত বৈশিষ্ট্য বলা যায়। কিন্তু ভাইবোনদের বিভিন্ন দলের চেহারায় যদি বিভিন্নতা থাকে, এক পরিবারের চেহারার সঙ্গে যদি অন্য পরিবারের চেহারার মিল না থাকে, তাহলে কোন পারিবারিক লক্ষণকে জাতিগত বংশগতির অভিব্যক্তি বলা যায় না। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবার স্বতন্ত্র পারিবারিক বংশগতির ধারার বাহক। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সকল জাতের মধ্যে প্রতিটি পরিবারের বংশগত দৈহিক লক্ষণ আলাদা। তাছাড়া এমনও দেখা যায়, এক জাতের এক পরিবারের ভাই-বোনদের চেহারা ভিন্ন জাতের আর এক পরিবারের ভাইবোনদের মত। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোন জাতের বংশগত লক্ষণ তার একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়, ভিন্ন জাতের মধ্যেও অনুরূপ লক্ষণ থাকতে পারে।

তবে কতকগুলি পরিবার বহুকাল ধরে যদি পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তাদের মধ্যে যদি ভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণ না ঘটে, তাহলে সেই সম্প্রদায়ের প্রতিটি পরিবারের সন্তানদের মধ্যে পূর্বপুরুষের দৈহিক লক্ষণ প্রতিফলিত হয়। কোন এক পরিবারের ভাইবোনদের চেহারার মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু সমস্ত পরিবারের সমস্ত ভাইবোনদের চেহারার মধ্যে প্রভূত সাদৃশ্য থাকবে। এই সব ক্ষেত্রে যে কোন একটি পরিবার থেকে সমগ্র জনসংখ্যার প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। ইউরোপের কিছু গ্রাম্য জমিদার পরিবার এবং অভিজাত মহলে, আর কিছু বিচ্ছিন্ন দলের মধ্যে এই অবস্থা দেখা যায়। উত্তর গ্রীনল্যাণ্ডের এস্‌কিমোরা বহু শতাব্দী ধরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করছে। কোন দিন তাদের জনসংখ্যা কয়েক শতের উর্ধ্বে ওঠেনি। আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহাদিও নিষিদ্ধ নয়। এদের পূর্বপুরুষের সংখ্যা হয়ত সামান্য। তাদের রক্ত বর্তমান পুরুষের সকলের ধমনীতে প্রবাহিত। এদের গোটা সম্প্রদায়ের চেহারার মধ্যে প্রভূত সাদৃশ্য আছে। আমেরিকার টেনেসি উপত্যকার একটি বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই অবস্থা দেখা গেছে। তারাও শতাধিক বছর নিজেদের সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে বিবাহাদি করে আসছে। এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পারিবারিক ধারার মধ্যেও সাদৃশ্য আছে।

এই সব ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষের সমসত্ত্ব না থাকলেও কিছু এসে যায় না। যৌন-সংসর্গ যতদিন নিজেদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে, পারিবারিক বংশগত ধারা ততদিন এক ধরনের হবে। জাতিগত উদ্ভবের বিভিন্নতা থাকে তো সেই বিভিন্নতা বরং ভাইবোনদের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। বিবাহ ও বংশবৃদ্ধি যত বেশীদিন নির্বিচারে চলবে, তত বিভিন্ন জাতিগত ধারার বণ্টন সমস্ত পরিবারের মধ্যে প্রায় সমভাবে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার বাস্টার্ড (ওলন্দাজ আর হটেনটটদের সংকর) আর কানাডার চিপেপওয়ারা (ফরাসী আর ইণ্ডিয়ানদের সংকর) এই ধরনের সম্প্রদায়। তাদের বিভিন্ন পারিবারিক ধারার মধ্যে বহুল সাদৃশ্য আছে, অথচ ভাইবোনদের চেহারার পার্থক্য সুস্পষ্ট।

আধুনিক সমাজে নির্দিষ্ট গুটিকয়েক পরিবারের মধ্যে বিবাহাদি নিবদ্ধ রাখার মত অনুকূল অবস্থা নেই। বসবাসের স্থান যত বিস্তীর্ণ হবে, জনসংখ্যার বসতি যত ঘন হবে, মানুষ যত সচল হবে, তত নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বিবাহাদি আবদ্ধ রাখা দুষ্কর। তার ফলে পারিবারিক ধারার বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সুইডিসদের কথা চিন্তা করলে কথাটির সত্যতা প্রতিপন্ন হবে। সুইডিস জাতির বাহ্যিক সমসত্ত্ব সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বিভিন্ন পারিবারিক ধারা আছে। কেউ বা সাদা সাচ্চা সুইডিস, আবার কারও বংশগতি কালো চুল আর কটা চোখের। সুইডিস জাতিরূপের মানুষ যেমন প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দেখা যায়, তেমন সুইডিস পারিবারিক ধারার মত পারিবারিক ধারাও ডেনমার্ক, জার্মানি, হল্যাণ্ড বা উত্তর ফ্রান্সে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। আবার এই সব দেশের পারিবারিক ধারার মত পারিবারিক ধারাও সুইডেনে পাওয়া যাবে।

এই সব ক্ষেত্রে বংশগত বৈশিষ্ট্য জাতিগতভাবে নিরূপিত হয় না। সেই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন পারিবারিক ধারার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এক ধরনের পারিবারিক ধারা যখন একাধিক জাতির মধ্যে দেখা যায়, তখন জাতিগত বংশগতি কথাটি তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পারিবারিক ধারার বংশগতির কথা বলা যায়। জাতিগত বংশগতি বলতে বিভিন্ন জাতের আলাদা বংশগতির ধারার সমসাত্ত্বিক উদ্ভব বোঝায়। কিন্তু তেমন সমসাত্ত্বিক বংশ-গতির অস্তিত্ব কোন জাতির মধ্যে নেই।

মোট কথা, জাতিগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করতে গিয়ে স্বীকার করতে হয় যে প্রতিটি জাতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে, আর সেই সব বৈশিষ্ট্য পারিবারিক ধারা অনুযায়ী সঞ্চারিত হয়ে থাকে, জাতিগত ভাবে নয়। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকভাবে জাতির মধ্যে থাকে না।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি প্রশ্নেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। জাতিরূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে আত্মগত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কোন জাতির মধ্যে যদি জাতিরূপের ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত দেখা যায় তবে সেই দৃষ্টান্তকে সাধারণতঃ বিজাতীয়ের সংমিশ্রণের ফল বলে গণ্য করা হয়। প্রতিটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয়ে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে কথাটা সত্য হতে পারে, কেন না বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। কিন্তু ভিন্ন জাতের সংমিশ্রণ যদি নাও হয়, তবু যে কোন জাতিরূপের চেহারা কতটা বিভিন্নতাসম্পন্ন হতে পারে তার খবরও তো আমাদের জানা নেই। পশুপালকদের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, প্রজনন-ব্যবস্থা সযত্নে যদি সমজাতের মধ্যে নিবদ্ধ রাখা যায়, তবু বিভিন্ন পশুর চেহারার মধ্যে প্রভূত প্রকারণ-বৈচিত্র্য দেখা দেয়। কিন্তু মানুষের কোন সাচ্চা জাতের অস্তিত্ব নেই বলে তাদের ক্ষেত্রে কি হয়, কোনদিন সে কথা জানা যাবে না। দুনিয়ার ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে যে মানুষ চিরকাল এখানে সেখানে ছুটে বেড়িয়েছে। পূর্ব এশিয়ার মানুষ এসেছে ইউরোপে। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার মানুষ আক্রমণ করেছে পশ্চিম এশিয়া। উত্তর ইউরোপের মানুষ ঝড়ের বেগে এগিয়ে গেছে ভূমধ্যসাগর অবধি। মধ্য আফ্রিকার মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দক্ষিণ আফ্রিকায়, আর আলাস্কার মানুষ ছুটে গেছে মেক্সিকো অবধি। তার মানে সুপ্রাচীনকাল থেকে চলমান মানুষের ছবিই আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। এই চলতি-পথে বিভিন্ন জাতের মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে, তাই হয়ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে সুস্পষ্ট ভৌগোলিক এবং জৈবিক বিশিষ্টতার অভাব দৃষ্ট হয়। প্রাণীসর্গেও এই ধরনের অবস্থা দেখা যায়। স্থানীয় বিশিষ্টতাসম্পন্ন জাতিগুলিকে সহজেই চেনা যায়, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মিশ্র-লক্ষণের দৃষ্টান্ত থাকে।

প্রতিবেশী দুটি জনসংখ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য না থাকলে উভয় জনসংখ্যার মধ্যে বাহ্য-অভিন্নতাসম্পন্ন পারিবারিক ধারা দেখা দিতে পারে এবং উভয় জনসংখ্যার কিছু কিছু মানুষের চেহারার মধ্যে সাদৃশ্য সৃষ্টি হতে পারে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও প্রমাণ করা যায় যে তাদের মধ্যে বৃত্তিগত (ফাংশানাল) মিল থাকে না। কারণ এই সাদৃশ্যবান মানুষের সন্তানদের চেহারা তুলনা করলে দেখা যাবে যে তাদের চেহারায় সাদৃশ্য বজায় থাকছে না। জনিতা যে জনসংখ্যা-ভুক্ত, সন্তানের চেহারার মধ্যে মোটামুটি সেই জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বোহেমিয়ানদের মাথা সাধারণতঃ গোল আর সুইডিসদের লম্বাটে। তা সত্ত্বেও উভয় জনসংখ্যার মধ্যে এক ধরনের মাথাওয়ালা

মানুষ দেখা যায়। সুইডিসদের মধ্য থেকে বাছাই করে এমন এক দল সুইডিস পাওয়া যায় যাদের মাথা সাধারণ সুইডিসদের মাথার আকারের চাইতে গোলাকার। বোহেমিয়ানদের মধ্য থেকেও এমন এক দল লোক বাছাই করা যেতে পারে যাদের মাথা বোহেমিয়ানদের সাধারণ মাথার আকৃতির চেয়ে লম্বাটে। এই বাছাই করা সুইডিসদের সন্তানের মাথার আকার জনিতার মাথার আকারের চাইতে লম্বাটে হয় বলে দেখা গেছে। নির্বাচিত বোহেমিয়ানদের সন্তানের মাথার আকারও তেমনি জনিতার মাথার আকারের চাইতে গোল হয় বলে জানা গেছে।

এর কারণ বোঝা খুব কঠিন নয়। বাছাই করা সুইডিসদের মাথার আকৃতি হয়ত নিছক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য—বংশগতিসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য নয়। এদের আত্মীয়দের মাথার সাধারণ আকৃতি লম্বাটে এবং সন্তানের আকৃতি যেহেতু শুধুমাত্র জনিতার আকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়, গোটা পারিবারিক ধারার বৈশিষ্ট্য যেহেতু তাদের আকৃতি নিরূপণে প্রভাব বিস্তার করে, সেই কারণে তাদের মধ্যে জনসংখ্যার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি হবার আশা করা যায়। বোহেমিয়ানদের সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। কাজেই এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে স্বতন্ত্র জাতিরূপের জনসংখ্যার মধ্যে সদৃশ দৈহিক আকৃতির যে সব মানুষ দেখা যায়, বৃত্তিগতভাবে তারা অভিন্ন নয়। সেই কারণে কোন জনসংখ্যার মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কোন জাতিরূপের মানুষ বেছে নিয়ে বলা যায় না যে, ভিন্ন জাতের সদৃশ আকৃতির মানুষের সঙ্গে তার সাযুজ্যতা আছে। প্রতিটি মানুষকে তার স্বকীয় জাতির অংশরূপে বিচার করতে হবে, অর্থাৎ যে জাতি থেকে সে উদ্ভূত হয়েছে তার অংশ হিসাবে। এই অনুমান করা যায় না যে ডেনমার্কের পিঙ্গলবর্ণ গোল মাথার মানুষ আর সুইজারল্যাণ্ডের সদৃশ আকৃতির মানুষ অভিন্ন। এই ধরনের মানুষের মধ্যে শারীরস্থানগত কোন পার্থক্য যদি লক্ষ্য নাও পড়ে, তবু জন্মসূত্রে তারা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ধারক। অভিন্নত্বের দৃষ্টান্ত ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়।

জাতিগত বংশগতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সে কথা শুধু সুস্থিত জাতি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। জাতিগত বংশগতির তাৎপর্য হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে উত্তর-পুরুষের সংগঠনও পূর্বপুরুষের সঙ্গে অভিন্ন হবে, অর্থাৎ এক পুরুষ মারা যাবার পরেও তার দৈহিক ও বৃত্তিগত বিশিষ্টতা উত্তরপুরুষের মধ্যে থাকবে। প্রতি পুরুষের মধ্যে বিবাহাদি যতদিন নির্বিচারে চলে ততদিন এই অবস্থা বজায় থাকতে পারে। প্রথম এক পুরুষ যদি ঘটনাচক্রেও নির্বিচারে সঙ্গী নির্বাচন করে থাকে, তবে অনুবর্তী পুরুষের মধ্যেও সেই নির্বিচার নির্বাচন-রীতি অক্ষুণ্ণ থাকতে হবে।

কিন্তু বংশরক্ষাকল্পে সঙ্গী নির্বাচনের জন্য যদি পছন্দ ব্যবহার করা হয় কিংবা সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও যদি বাইরের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে, তাহলে সেই সম্প্রদায়ের প্রজননের ধারায় পরিবর্তন দেখা দেবে। সেই কারণে বর্তমান দুনিয়ার কোন জনসংখ্যা বংশগতির দিক থেকে সুস্থিত নয়। তবে বহিরাগত লোকের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে প্রতি জনসংখ্যার মধ্যে পাঁচমিশালী যত সব পারিবারিক ধারা সৃষ্ট হয়, কালক্রমে সেগুলিও সমসত্ত্বের রূপ পাবে, যদি সেই জনসংখ্যার উত্তরপুরুষ একস্থানে বাস করে। নির্দিষ্ট এলাকায় যারা বাস করে তাদের বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা যদি তাদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে তবে স্থানীয় বিশিষ্টতা-মণ্ডিত জাতিরূপের সৃষ্টি হবে। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহাদি যদি নিষিদ্ধ থাকে, তাহলে সেই জনসংখ্যার অন্তর্গত সমস্ত পারিবারিক ধারার মধ্যে একটা সাধারণ সাদৃশ্য সৃষ্টি হবে। আর নিষিদ্ধ তুতো ভাইবোনদের বিবাহপ্রথা যদি চালু থাকে (এই ধরনের বিবাহপ্রথা বহু দলের মধ্যে প্রচলিত), তাহলে স্বতন্ত্র পারিবারিক ধারার উদ্ভব হবে এবং এই দিক থেকে জনসংখ্যার মধ্যে একটা মিশ্রভাব সৃষ্টি করবে।

।। প্রতিবেশের প্রভাবের গুরুত্ব ।।

প্রজননের ধারা অনুযায়ী দৈহিক লক্ষণের উপর বংশগতি কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তার কথা খানিকটা বলা হয়েছে। জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবের কথা এইবার আলোচনা করে দেখা যাক।

নিম্ন পর্যায়ের জীবের উপর প্রতিবেশের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সমভূমির উদ্ভিদকে শৈলশিখরে রোপণ করলে তার ডাল খর্বাকার হয়। জলের তলার উদ্ভিদের পাতা আর জলের উপরের উদ্ভিদের পাতা এক রকম নয়। এখন কথা হচ্ছে, উন্নততর জীবের মধ্যে প্রতিবেশভেদে এই ধরনের প্রকারণ দেখা দেয় কি না।

প্রতিবেশের পরিবর্তে বংশগতি উন্নততর জীবের আকৃতি নিরাকরণ করে সাধারণতঃ এই কথা মনে করা হয়। তার মানে ইউরোপীয়দের সন্তানের জাতিরূপ হবে ইউরোপীয়দের মত, চীনাদের সন্তান হবে মোঙ্গলের মত, আর নিগ্রোদের সন্তান নিগ্রোর মত। কিন্তু মানুষের আকৃতি শুধুমাত্র বংশগতি দ্বারা নিরূপিত হয় না, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এই নজীর তো আছে যে, আমেরিকাবাসী ইউরোপীয়দের সন্তানের দৈহিক আকৃতি সুস্পষ্টভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। জনিতা থেকে সন্তানেরা এক্ষেত্রে অনেক বেশী লম্বা এবং জীবনযাত্রার পরিবেশের উন্নতি খুব সম্ভবতঃ তার কারণ বলে মনে করা হয়।

তাছাড়া পেশার জন্যও দৈহিক আকৃতি প্রভাবিত হয়ে থাকে। হাতুড়ি-পেটা শ্রমিক আর যন্ত্রসঙ্গীতজ্ঞদের হাত এক রকম নয়। ব্যবহারের প্রকৃতি ও পরিমাণের প্রভাব অঙ্গের আকার ও অনুপাত উভয়ের উপর পড়ে। মাথা ও মুখমণ্ডলের আকার বেশ স্থায়ী লক্ষণ। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার খানিকটা প্রভাব তার উপরেও পড়ে, যার ফলে দেখা যায় যে জনকজননী নতুন কোন প্রতিবেশের মধ্যে বসবাস আরম্ভ করলে সন্তানদের চেহরার সঙ্গে জনিতার অনুরূপতা অক্ষুণ্ণ থাকে না। এই সব প্রভাব বংশগতির প্রভাবকে নস্যাৎ করে দিতে না পারলেও তার গুরুত্ব নগণ্য নয়। কারণ এই পরিবর্তনের শেষ পরিণতি কি হতে পারে এখনও তা সঠিকভাবে জ্ঞাত নয়। আবার এ কথাও জানা যায়নি, এই মানুষ তার সাবেক প্রতিবেশের মধ্যে ফিরে গেলে ইতিপূর্বে যে পরিবর্তন তার ঘটেছে সেই দৈহিক পরিবর্তন বজায় থাকবে কি না।

প্রতিবেশের প্রভাবে নিগ্রোর চেহারা কোনকালে ইউরোপীয়দের মত হবে না। কিন্তু ইউরোপীয়দের মধ্যে সামান্য যে সব পার্থক্য আছে তার কয়েকটি যে প্রতিবেশের পার্থক্যের জন্য সৃষ্টি হয়নি, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

॥ জাত-বিভাগের বৃত্তিগত তাৎপর্য ॥

জাতি কথাটির তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য যে আলোচনা এই পর্যন্ত করা হয়েছে তার গণ্ডী মোটামুটিভাবে দৈহিক আকৃতির মধ্যে নিবদ্ধ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ জাতি কথাটির দৈহিক তাৎপর্য স্পষ্টতর করার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। এইবার দেখা যাক বৃত্তির দিক থেকে তার তাৎপর্য কি ধরনের।

কোন জাতের শারীরস্থানের বিশিষ্টতা সম্পর্কে সাধারণভাবে যে সব ধারণা পোষণ করা হয়ে থাকে, সেই ধারণা যে ত্রুটিপূর্ণ, তার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যে কোন জনসংখ্যার অধিকাংশ লোক দৈহিক বিশিষ্টতা সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি করে সেই ধারণাকে জাতির রূপ-বৈশিষ্ট্য বলে গ্রহণ করা হয়। বৃত্তি সম্পর্কেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। যে কোন জনসংখ্যার বহু লোকের বৃত্তি দেখে তার বিশিষ্টতা সম্পর্কে মনে যে ধারণা জন্মে, সেই ধারণাকে সমগ্র জনসংখ্যার বৃত্তিগত বিশিষ্টতা বলে গণ্য করা হয়। অপর কোন জনসংখ্যার অপর কোন বৈশিষ্ট্য যদি মনে প্রভাব বিস্তার করে, তবে তাকে সেই জনসংখ্যার বৃত্তিগত বিশিষ্টতা বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই দুই প্রকার বিশিষ্টতার মিশ্রণ যদি তৃতীয় কোন জনসংখ্যার মধ্যে দেখা যায়, তাহলে এ কথা প্রতিপন্ন হয় না যে তারা মিশ্রবৃত্তিসম্পন্ন। সর্বসাধারণ সম্পর্কে এই ধরনের ব্যাপক মন্তব্য বাস্তব বিচারে

ত্রুটিপূর্ণ, কেন না এগুলি আত্মগত ধারণা মাত্র। বৃত্তির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক প্রকারণ-বৈচিত্র্য আছে, এই ধরনের সিদ্ধান্তের মধ্যে সেই প্রকারণ-বৈচিত্র্য উপেক্ষিত।

কোন জনসংখ্যার শারীরস্থানের বিশিষ্ট লক্ষণকে যেমন জাতিগত বংশগতি নামে আখ্যা দেওয়া কঠিন, তেমন কোন জাতি বৃত্তিগত ক্ষেত্রে যেভাবে সাড়া দিয়ে থাকে, তাকে বংশগতি বলে আখ্যা দেওয়া আরও কঠিন। ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত প্রতিক্রিয়ার প্রকারণ এত বেশী যে কোন জাতির সকল লোক কোন ব্যাপারে একভাবে সাড়া দেয় না।

দেহের স্বাভাবিক বাড়তি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে অঙ্গলক্ষণ দীর্ঘ দিন এক রকম থাকে। বার্ধক্যে আবার অবশ্য পরিবর্তনের সূচনা হয়। তবু যখনই দেহ পরীক্ষা করা হোক না কেন, তার ফলাফল মোটামুটি এক হবে। কিন্তু দৈহিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে এ কথা মোটেই সত্য নয়। হৃৎস্পন্দনের গতি ক্ষণস্থায়ী কারণের উপর নির্ভরশীল। ঘুমের মধ্যে কম, আর খাওয়া কি ব্যায়ামের পর দ্রুত হয়। পাকনালীর অবস্থা খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তীব্র আলোয় কিংবা অন্ধকারের মধ্যে চোখের ক্রিয়া আলাদা হয়। যে কোন একজন মানুষের দৈহিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রভূত প্রকারণ থাকে। তাছাড়া কোন জনসংখ্যার সমস্ত মানুষের দৈহিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া একভাবে হয় না। শারীরস্থানের বিশিষ্ট লক্ষণের প্রকারণের একটি মাত্র সূত্র আছে। সেই প্রকারণের ভিত্তি হচ্ছে দুটি মানুষের পার্থক্য। কিন্তু বৃত্তিগত প্রকারণের আরও একটি নূতন সূত্র আছে: একজন মানুষই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সাড়া দিয়ে থাকে। কাজেই যে কোন জনসংখ্যার আচরণের মধ্যে যে ব্যাপক প্রকারণ-বৈচিত্র্য থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কি আছে?

একাধিক জাতি যদি অভিন্ন প্রতিবেশের মধ্যে বাস করে তবু তাদের বৃত্তিগত প্রতিক্রিয়া এক হয় না। কিন্তু জাতিগতভাবে তাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যতটা পার্থক্য থাকে তার চাইতে বেশী পার্থক্য দেখা যায় প্রতিটি জাতির জনসংখ্যার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। শ্বেতকায়, ইণ্ডিয়ান, ফিলিপিনো আর নিউগিনির লোকের একই ইন্দ্রিয়স্থানের সুবেদিতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তার সুবেদিতা মোটামুটি এক ধরনের। আদিবাসীদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ বলে সাধারণতঃ মনে করা হয়। কিন্তু পরীক্ষার ফলে এই লৌকিক বিশ্বাস সত্য প্রতিপন্ন হয়নি।

প্রতিবেশভেদে বৃত্তিগত ক্রিয়া ভিন্ন ধরনের হয়, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে হৃৎস্পন্দনের কথা ধরা যাক। অলস আয়াসী জীবনে অভ্যস্ত এবং ব্যায়ামে অনভ্যস্ত কোন কলিকাতাবাসীকে যদি নেপালের কোন শৈলশিখরে বাস করতে হয় এবং সেখানে কাজ করে খেতে হয়, তাহলে নূতন প্রতিবেশের মধ্যে

অচিরে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে। তার হৃৎস্পন্দনের গড় তাহলে বদলে যাবে। পরিশ্রুত হালকা হাওয়ার মধ্যে তার ফুসফুসও আলাদাভাবে কাজ করবে। তার ফলে এই নতুন প্রতিবেশের মধ্যে তার দৈহিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আগের চাইতে আলাদা হবে। কাজেই এ কথা বলা চলে যে আকৃতির উপর প্রতিবেশের প্রভাব যতটা হোক আর না হোক, দৈহিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উপর তার প্রভাব প্রবল।

এই সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের উপর প্রতিবেশের প্রভাব একভাবে কাজ করে। কাজেই দৈহিক দিক থেকে আলাদা দুটি মানুষকে যদি অভিন্ন প্রতিবেশের মধ্যে নিয়ে আসা যায়, তাহলে তাদের বৃত্তিগত সাড়া এক ধরনের হতে পারে। এবং সেক্ষেত্রে এই ধারনা করা যেতে পারে যে দৈহিক দিক থেকে আলাদা দুটি মানুষের বৃত্তিগত সাড়ার সাদৃশ্যের কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাদের আভ্যন্তরীণ গঠন নয়। তবে যে সব ক্ষেত্রে জীবের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবের তীব্রতা আলাদা হয়, সেই সব ক্ষেত্রে অভিন্ন প্রতিবেশ সত্ত্বেও, বৃত্তিগত সাড়ার মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখা দেবে। তীব্রতা যে সহ্য করতে পারবে সে সুস্থ.থাকবে, আর যে পারবে না সে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

দৈহিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে যা সত্য. মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তা আরও সত্য। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। ঘণ্টার শব্দ শোনা মাত্র যদি কোন জিনিস স্পর্শ করতে বলে দেওয়া হয়, তাহলে সে কাজ খুব অল্প সময়ের মধ্যে করা যাবে যদি মন সুস্থির থাকে আর একান্তভাবে ঘণ্টার শব্দের দিকে নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু ক্লান্তি যত বেশী হবে, মন যত বিক্ষিপ্ত থাকবে, তত ঘণ্টার শব্দ আর কাজ করার অন্তবর্তী সময়ের ব্যবধান বেশী হবে। অন্য কোন কারণে এমন অন্যমনা থাকাও সম্ভব যে ঘণ্টার শব্দ হয়ত একেবারেই কানে এল না। কাজেই সাড়া দেবার সময় নির্ভর করছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। দুটি মানুষের প্রতিক্রিয়ার সময়ের মধ্যে ব্যবধান থাকতে পারে, তবু পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তারা একভাবে সাড়া দেবে। বৈষয়িক অবস্থার প্রভাবে একজন যদি মনযোগী হতে বাধ্য হয়ে থাকে, আর অপরজন জীবনে কখনও যদি মনোযোগী হবাব প্রয়োজন বোধ না করে থাকে, তবু দেহতন্ত্রের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা একভাবে সাড়া দিতে পারে।

জটিল সামাজিক ও মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষের পক্ষে একভাবে সাড়া দেবার নজীর হামেশা পাওয়া যায়। ছোট্ট কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিটি মানুষের উচ্চারণের সাদৃশ্য এত বেশী যে অভিজ্ঞ মানুষের পক্ষে উচ্চারণ শুনে বাড়ীর ঠিকানা বলে দেওয়া কষ্টকর নয়। এই সব লোকের মুখের বা নাসার

আভ্যন্তরীণ গঠনে পার্থক্য থাকতে পারে, তাদের কণ্ঠস্বরও পৃথক হতে পারে, তবু তাদের উচ্চারণের ধরন এক হবে। কেন না, শব্দোচ্চারণ তো শুধুমাত্র মুখের গঠনের উপর খুব বেশী নির্ভর করে না। উচ্চারণ জিনিসটি প্রধানতঃ মুখের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল।

মানুষ যে সমাজে বাস করে তার বহু অভ্যাস ও আচরণ সে অনুকরণ করে থাকে। এই অনুকৃত অভ্যাস তার দৈনন্দিন স্বভাবের মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং এগুলি তার দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার ফলে ব্যক্তিগত দৈহিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকলের চিন্তা ও কাজের মধ্যে একটা সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখে সঠিকভাবে বংশগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা অসম্ভব।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, মানুষের মানসিক আচরণের সবটা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ চরিত্র বলতে যা বোঝায় সেই জিনিস পুরোপুরি বাইরের অবস্থার প্রভাবসঞ্জাত। তবে মানসিক আচরণের উপর দৈহিক আকৃতির কোন প্রভাব নেই, এ কথা সকলে স্বীকার করেন না। সেই প্রভাব পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব দ্বারা চাপা পড়ে যাবার সম্ভাব্যতা তারা অবশ্য অস্বীকার করেন না। কিন্তু এই মতান্তর সত্ত্বেও এ কথা কেউ বলেন না যে, মানসিক বৃত্তি দেখে বংশগতির ধারা সঠিকভাবে বলা যায়। কেন না সুসংবদ্ধ সমাজের মধ্যে বিভিন্ন বংশধারার বাহকদের আচরণ এমন সাদৃশ্যসম্পন্ন হয় যে, শুধুমাত্র তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকে তাদের জাত বিচার করা যায় না। এই সব সমাজেও ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত ধারার মধ্যে পার্থক্য থাকে। কিন্তু দৈহিক আকৃতির পার্থক্যের সঙ্গে এই পার্থক্যের পারস্পর্যের সম্পর্ক এত নগণ্য যে, তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে সনাক্ত করা যায় না যে তারা কোন্ সুনির্দিষ্ট পরিবারগত বংশগতির বাহক। এই ক্ষেত্রে যে কোন জাতির অন্তর্গত পারিবারিক ধারার প্রকারণ-বৈচিত্র্য দৈহিক প্রকারণ-বৈচিত্র্য থেকে এত বেশী যে তেমন প্রকারণ ভিন্ন জাতের মধ্যেও থাকতে পারে। দৈহিক দিক থেকে নিগ্রো আর ককেসীয়দের মধ্যে জাতিগত বংশগত বিশিষ্টতার পার্থক্য আছে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে এ কথা সত্য নয়। যে কোন জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন মানুষের মানসিক জীবন এমন বৈচিত্র্যময় যে সেই মানসিক জীবনের অভিব্যক্তি থেকে জাতবিচার করা যায় না। অভিজ্ঞতা থেকে পণ্ডিতেরা বরং এই কথা বলে থাকেন যে, দুটি জাতের মধ্যে মানসিক বৃত্তিগত যতটা বিভিন্নতা আছে তার চাইতে অনেক বেশী বিভিন্নতা আছে একটি জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন পরিবারের মানসিক বৃত্তির মধ্যে।

বুদ্ধির পরীক্ষা নিয়েও মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকে জাতবিচার করা সম্ভব নয়। কেন না যে কোন বুদ্ধির পরীক্ষায় জাতিগত পার্থক্যের চাইতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমির তারতম্যের প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে। যে সব জাতের জনসংখ্যা বিপুল, তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট মানসিক পার্থক্য সামাজিক কারণের পরিবর্তে জৈবিক কারণে সৃষ্টি হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত প্রত্যয়যোগ্য যুক্তি দিয়ে এখনও প্রমাণিত হয়নি।

কোন দুটি মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি পৃথক হয় তাহলে তাদের মানসিক সাড়া প্রতিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, না জৈবিক প্রভাব দ্বারা নিরূপিত হয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। আর যে কোন জাতির সাংস্কৃতিক জীবনেও অভিন্ন প্রতিবেশ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রতিটি সংসার, প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। অথচ এই বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি নিরাকরণ করা কঠিন। বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে যে সব লোকের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা মোটামুটি এক, তাদের প্রতিবেশের মধ্যে মোটামুটি একটা সমতা থাকে। এই সব ক্ষেত্রে প্রতি-বেশের প্রভাবের গণ্ডীও সীমাবদ্ধ। সেই কারণে মানুষে মানুষে জৈবিক পার্থক্যের প্রভাব এই ক্ষেত্রে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে তুলনা করা হয়, সামাজিক পটভূমির আপেক্ষিক সাদৃশ্য তখন তিরোহিত হয়ে যায় এবং এক বংশোদ্ভূত বিভিন্ন জনসংখ্যার মানসিক সাড়ার ধরন তুলনা করলে দেখা যায় যে, তাদের সাড়ার পার্থক্য জৈবিক পার্থক্য দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মূলতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্নতা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে শিশুকাল থেকে চারপাশের মানুষের আচরণ অনুকরণ করে লোকে চিন্তা ও কাজ করার পদ্ধতি আয়ত্ত করে, আর বাল্যের এই অভ্যাস পরিণত বয়সে মানুষের আচরণ প্রভাবিত করে থাকে। অনুকরণ করে শেখা চিন্তা ও কাজের অভ্যাস মানসিক ধারা ও ধরন নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিক্রিয়া বংশগতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, কিন্তু বৃহৎ জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এই যুক্তি অচল।

॥ জাতি ও সংস্কৃতি ॥

মানব-সংস্কৃতির মৌলিক ধারার সাদৃশ্য নৃ-কুলবিদ্যার ছাত্রদের এমনভাবে আকৃষ্ট করেছে যে সংস্কৃতির বিচার করতে বসে কেউ জাতিগত উদ্ভবের প্রশ্ন চিন্তা করা আবশ্যক মনে করেননি। নৃকুলবিদ্যার গবেষণায় এই সাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করা গেছে যে মানুষের বৃহৎ জাতিগুলির মধ্যে যতটা পার্থক্য থাক না কেন,

সাংস্কৃতিক জীবনের উপর সেই পার্থক্যের প্রভাব অকিঞ্চিৎকর। মানব-সংস্কৃতিকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হোক না কেন, তার প্রকৃতি জাতিগত পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থনৈতিক জীবন আর আবিষ্কারের দিক থেকে এস্‌কিমো আর আফ্রিকার বুশম্যান এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের অবস্থা তুলনার যোগ্য। ইউরোপের তুষার যুগের পর মাগদালেনীয় জাতি নামে যে জাতিটি বাস করত, এস্‌কিমোদের সঙ্গে তাদের অবস্থা অনায়াসে তুলনা করা যেতে পারে। আবার সুদানের নিগ্রোদের আর্থিক জীবন আর আবিষ্কারের সঙ্গে ইউরোপবাসীর আদি-বংশপতিদের এবং প্রাচীন চীনাদের অবস্থা তুলনা করা যায়।

সংস্কৃতির বাস্তবরূপের কথা আলোচনা করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা দেখেছেন, বিভিন্ন জাতের মানুষ প্রায় এক ধরনের হাতিয়ার আবিষ্কার করেছে। অস্ট্রেলিয়া আর আমেরিকার মানুষের বর্শা নিক্ষেপের পদ্ধতি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ-বাসীদের বর্ম আবিষ্কার আর প্রতিটি মহাদেশের চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতিকে যেমন জাতিগতভাবে আলোচনা করা যায় না, তেমন প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালার বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার আর বিভিন্ন স্থানের মানুষের লিখন-পদ্ধতির উদ্ভাবনকে জাতিগতভাবে বিচার করা সম্ভব নয়। ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহার অথবা অগ্নি প্রজ্বালনের পদ্ধতি সম্পর্কেও এ কথা বলা যায়। এই সব প্রশ্নের আলোচনা করতে গিয়ে জাতিগত আকৃতির কথা বিস্মৃত হতে হয়।

সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে আলোচনা করলেও সংস্কৃতির সার্বজনীন রূপ এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জাতিগত চিন্তা বর্জন করা ছাড়া উপায় থাকে না। এই সব ক্ষেত্রে মিল-অমিলের সঙ্গে জাতিরূপের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা আর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালার মূল্যমান নির্ধারণের রীতি, সমধর্মী পারিবারিক সংগঠন, টোটেম কল্পনা, নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যৌন-সংসর্গ বর্জন, ধর্মানুষ্ঠানে নারী-বর্জনের রীতি ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে সকল জাতের মানুষের মধ্যে মূলতঃ সমধর্মী রীতিনীতির প্রচলন দেখা যায়। কাজেই এর যে কোন বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে জাতিগত চিন্তা পরিহার করতে বাধ্য হতে হয়। এই সব রীতিনীতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে এক স্থান থেকে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে পারে, অথবা আলাদাভাবে তার উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। যাই ঘটে থাকে না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না। এই সমধর্মিতার অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, জাতি আর সংস্কৃতি আলাদাভাবে বিচার্য বিষয়। কারণ সংস্কৃতির প্রসার জাতিগত ধারা অনুসরণ করে চলেনি।

প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারা

অভিব্যক্তি বনাম সংস্কৃতি

জীববৃত্তান্তে আমরা পাই বেঁচে থাকার সংগ্রামে সফল নতুন প্রজাতির উদ্ভবের কাহিনী। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত করে যে প্রাণী জীবনসংগ্রামে নিজের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করতে পারে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে তার উদ্‌বর্তন হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে বেঁচে থাকার সমস্ত শর্ত বোঝায়। তার মধ্যে যেমন আবহাওয়া (উত্তাপ, শৈত্য, আর্দ্রতা ও বায়ু) এবং পর্বত, সমুদ্র, নদী, জলাভূমি প্রভৃতি সর্বপ্রকার নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক প্রতিবেশ আছে, তেমনি আছে খাদ্যের সুলভতা-দুর্লভতা, প্রাণীজগতের শত্রু প্রভৃতি বিষয়। মানুষের ক্ষেত্রে সামাজিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি, আইনকানুন, অর্থনৈতিক অবস্থা, এমন কি ধর্মবিশ্বাস পর্যন্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়ে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে নিজেদের অভিযোজিত করে প্রাণিকুল উৎকর্ষ লাভ করে। তাতে তাদের পক্ষে খাদ্য ও আশ্রয়ের সংস্থান করা সাধ্যায়ত্ত হয়। বংশবৃদ্ধিও সহজতর হয়। প্রাণীজগতের জৈবিক অভিযোজনের অর্থ তাদের দেহ-তন্ত্রের উৎকর্ষসাধন আর সহজ প্রবৃত্তির উন্নতি। দেহতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে যতটা যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব তার অতিরিক্ত খুব বেশী উৎকর্ষ তারা লাভ করতে পারে না।

কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আমরা আর এক নতুন সৃষ্টির কাহিনী পাই। আমরা পাই, মানুষের নিজের হাতে গড়া সৃষ্টির বিবরণ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে অভিযোজনের নূতন এক পদ্ধতির সাক্ষী দিচ্ছে এই দ্রব্যসম্ভার। এই সৃষ্টির পেছনে মানুষের জৈবিক উৎকর্ষের প্রভাব আছে বটে, কিন্তু তার কোনটা মানুষের দেহতন্ত্রের অংশ নয়, বাইরের জিনিস। অথচ এই সৃষ্টি তার বেঁচে থাকার সংগ্রামের সহায়ক হচ্ছে, সাহায্য করছে তার উদ্‌বর্তনের ও বংশবৃদ্ধির। প্রাকৃতিক নির্বাচনে তার উদ্‌বর্তনের যোগ্যতাও এই সৃষ্টির সাহায্যে সুপ্রমাণিত হচ্ছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে প্রাণিকুলের অভিযোজনের পদ্ধতি জৈবিক, আর মানুষের পদ্ধতি সক্রিয় এবং সৃজনশীল। প্রাকৃতিক সম্পদকে স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত পথে প্রয়োজন অনুসারে রূপান্তরিত করে সে জীবনসংগ্রামের সহায়ক

করে তুলেছে। বাঁচার জন্য অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে অনধিগম্য এক নূতন পরিবেশ সে সৃষ্টি করেছে। মানুষ নিজে এই সৃষ্টির বিধাতা। বুদ্ধি আর সৃজনশীল শ্রম তার সহায়। বুদ্ধি আর শ্রম-নির্ভর এই সৃজনী কার্যকলাপ থেকে মানুষের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

সামাজিক জীবনের পটভূমির উপর সৃষ্টিশীল শ্রমের কার্যকলাপ মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের রেখা টেনে দিয়েছে। প্রাচীনতম মানবসমাজে মানুষে মানুষে শ্রমের যে সম্পর্ক দেখা দিয়েছিল, সেই সম্পর্ক প্রাণীজগতে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে শ্রমের দ্বারা জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার তৈরি করার মধ্যে মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীরতম পার্থক্য নিহিত।

গিরিশিখরের হিমশীতল প্রতিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য ভেড়া তার সর্বাঙ্গে পশমের আবরণ সৃষ্টি করেছে। এই লোমাবরণ দিয়ে তারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে অভিযোজিত হচ্ছে। মানুষের দেহে লোমাবরণ নেই। তবু মানুষ ঐ আবহাওয়ার মধ্যে পশম বা ভেড়ার চামড়া দিয়ে গাত্রাবরণ তৈরি করার বিদ্যা আয়ত্ত করে বাঁচতে পারে। নখ আর তুণ্ড দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ইঁদুর আশ্রয় তৈরি করে। কুঠার আর শাবল দিয়ে মানুষও পারে আশ্রয় তৈরি করতে। এমন কি ইট, পাথর, কাঠ দিয়ে আরও ভাল আশ্রয় নির্মাণ করতে পারে। থাবা আর দাঁতের সাহায্যে সিংহ তার জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় মাংস সংগ্রহ করে। মানুষ সেই কাজ তীর ধনুক দিয়ে করতে পারে। বংশগত সহজ প্রবৃত্তির বলে জেলী মাছের মত নিম্ন পর্যায়ের জীবও নিজের আয়ত্তের সীমার মধ্যের শিকার ধরতে পারে। কিন্তু প্রবীণদের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ থেকে নিজেদের পুষ্টি বিধানের আরও কুশলী, আরও বিচার-বিবেচনাসম্মত উন্নত পদ্ধতি মানুষ আয়ত্ত করেছে।

মোট কথা, প্রাণীসর্গের পশম, থাবা, প্রদন্ত প্রভৃতির স্থান মানবসমাজের শ্রমলব্ধ পরিচ্ছদ ও হাতিয়ার অধিকার করেছে। বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রতীক হিসাবে মানবসমাজের রীতিনীতি ও নিষেধ সামাজিক ঐতিহ্যের আকারে বংশপরম্পরায় উত্তরপুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। এই সামাজিক উত্তরলব্ধি প্রাণীসর্গের বংশগত সহজ প্রবৃত্তির স্থান গ্রহণ করেছে এবং মানবজাতির বাঁচার সংগ্রামের সহায়ক হচ্ছে।

জৈবিক অভিব্যক্তি আর সাংস্কৃতিক উন্নতি উদ্‌বর্তনের দিক থেকে তুল্যমূল্যের সন্দেহ নেই। তবে ঐতিহাসিক উন্নতি আর জৈবিক অভিব্যক্তি, মানবীয় সংস্কৃতি আর প্রাণিকুলের দৈহিক গুণ এবং সামাজিক উত্তরলব্ধি আর জৈবিক বংশগতির

মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। মানুষের আত্মরক্ষার হাতিয়ার তার দেহের অংশ নয়। তার বুদ্ধি ও শ্রমের সৃষ্টি। ইচ্ছামত তার যে কোনটা সে পরিহার করে চলতে পারে, আবার প্রয়োজনের সময় তুলে নিতে পারে। আত্মরক্ষার এই হাতিয়ার ব্যবহার করার কৌশলও সে বংশগতি হিসাবে অর্জন করেনি। শিখতে হয়েছে নিজের গোষ্ঠীর কাছে। সময় লাগে এই শিক্ষাগ্রহণে। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পরে মানুষ তার সামাজিক উত্তরলব্ধি আয়ত্ত করতে আরম্ভ করে। সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের পরিবর্তন বিলম্বিত বা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। তার সূচনাও মানুষের সচেতন ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। জার্ম-প্লাজমের পরাব্যক্তির ফলে প্রাণীজগতে নতুন গুণের উদ্ভব হয়। মানুষের কোন আবিষ্কারের পেছনে জার্ম-প্লাজমের পরাব্যক্তির ইতিহাস নেই। মানবসমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এক নূতন সংশ্লেষণের মধ্যে আবিষ্কাররূপে আত্মপ্রকাশ করে। আবিষ্কর্তা নিজেও এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী। সামাজিক ঐতিহ্যের মারফত এই উত্তরলব্ধি সে অর্জন করে। পদ্ধতি দুটির পার্থক্য যথাসম্ভব সুস্পষ্ট করার জন্য দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

তুষার যুগের ইউরোপে কয়েক প্রজাতির হাতি ছিল। শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কিছু হাতির গায়ে ঝাকড়া ঝাকড়া লোম গজায়। এই লোমশ হাতির নাম ম্যামথ্। কিন্তু ম্যামথের গায়ে রাতারাতি লোম গজায়নি। এই দৈহিক গুণ হয়ত এইভাবে অর্জিত হয়েছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন: জার্ম-প্লাজম্ সদা পরিবর্তনশীল। তুষার যুগের কোন এককালে জীবকোষের পরিবর্তনের ফলে কোন হস্তিশাবকের দেহে হয়ত লোমশ ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই লোম হয়ত আরও বেড়েছিল। তার ফলে লোমের আচ্ছাদনে শীতের পরিবেশে বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় হয়ত সহজতর হয়েছে। তারপর প্রোটোপ্লাজমের রহস্যময় পরাব্যক্তির ফলে উত্তরজনির গায়ের লোম ক্রমে পূর্বপুরুষের চাইতে বাড়তির দিকে গেছে। এই ভাবে ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে বহু জনি পরে লোমশ হাতির এক নতুন প্রজাতি উদ্ভূত হয়েছে। এরা তখন অনায়াসে তুষার যুগের শীত সহ্য করতে পেরেছে। কিন্তু এই লোমশ হাতির প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছিল বহু সহস্র বৎসরব্যাপী এবং বহু জনিব্যাপী বংশগতির পরিবর্তনের ফলে।

মানুষেরও অস্তিত্ব ছিল তুষার যুগে। তারাও ম্যামথের সমকালীন। তারাও জন্তু শিকার করত আর গুহাকন্দরে ছবি আঁকত। শীতের প্রকোপ তাদেরও সমভাবে পীড়িত করেছে। কিন্তু তাদের ধারায় লোম গজাবার বংশগতি দেখা

দেয়নি। আগুন জ্বেলে তারা এই শীতের সঙ্গে যুঝেছে। আগুন জ্বালার কৌশল আর চামড়া দিয়ে গাত্রাবরণ তৈরি করার বিদ্যা আয়ত্ত করে তারা জীবনসংগ্রামে সাফল্য লাভ করেছে। হস্তিশাবকের জন্ম হয়েছে লোমশতার প্রবণতা নিয়ে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবণতা সুনিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মানবশিশু আগুন জ্বালাবার কিংবা কোট বানাবার সাহজিক বিদ্যা নিয়ে জন্মায়নি। এই বিদ্যা পরে শিখে নিতে হয়েছে। মানবশিশুর প্রতিটি জনিকে নতুন করে শেখাতে হয়েছে এই কৌশল। দৃষ্টান্ত আর উপদেশের মাধ্যমে এই শিক্ষা জনিতা থেকে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তার অর্থ এটি অর্জিত বৈশিষ্ট্য। অর্জিত গুণ প্রাণিবিদ্যা-বিশারদদের মতে বংশগতি থেকে আলাদা জিনিস।

মানুষ আর ম্যামথ্ উভয়ে তুষার যুগে বেঁচে থাকার যোগ্যতা অর্জন করলেও তাদের পরিণতির মধ্যে পার্থক্য আছে। তুষার যুগের পর ম্যামথের প্রজাতিটি নির্বংশ হয়ে গেছে; কিন্তু মানুষ বেঁচে গেল। তুষার যুগের বিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকার যোগ্যতা অর্জন করেছিল ম্যামথ্। তারপর যখন উষ্ণতর পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করার দিন এল, তাদের গায়ের লোমাবরণ, শ্যাওলা বা ছোটখাট উইলো গাছ খেতে অভ্যস্ত তাদের পরিপাক তন্ত্র, তাদের খুর ও প্রদন্ত বেঁচে থাকার সংগ্রামের সহায়ক হতে পারল না। অথচ এই সব বৈশিষ্ট্য তুষার যুগের আবহাওয়ায় বেঁচে থাকতে এবং বংশবৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। এই সব গুণ বর্জন করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। কাজেই প্রাকৃতিক নির্বাচনে তাদের পরাভব হল। মানুষ কিন্তু এই বিপাকে পড়ল না। গরমের দিন আসতেই সে গাত্রাবরণ খুলে ফেলল। আবিষ্কার করল জীবনসংগ্রামের নতুন হাতিয়ার। ম্যামথের মাংস যখন দুর্লভ হল তখন সে অন্য মাংস খাবার অভ্যাস করল। মানুষের জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার তার অঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় বলে তাকে বিপাকে পড়তে হল না।

এই দৃষ্টান্ত থেকে আরও বোঝা যায় যে কোন এক বিশেষ পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকার উপযোগী একমুখী বিশিষ্টতা বা অতিমাত্রিক বিশিষ্টতার ফল শেষ অবধি ভাল হয় না। এই ধরনের বিশিষ্টতার ফলে বেঁচে থাকার ও বংশবৃদ্ধি করার বিঘ্ন সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। ক্ষেত্র বিশেষে বিলুপ্তির শঙ্কাও থাকে। পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতা, অর্থাৎ বহুমুখী অভিযোজনের ক্ষমতা শেষ বিচারে মঙ্গলকর হয়। কিন্তু এই অভিযোজনের ক্ষমতা নার্ভতন্ত্রের উন্নতি, শেষ বিচারে মস্তিষ্কের উন্নতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আকারে বড় এবং প্রকৃতিদত্ত জটিল মস্তিষ্ক মানুষ পেয়েছিল বলে সে সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পেরেছে। অন্যান্য আনুসঙ্গিক ক্ষমতাও সাহায্য করেছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তির উল্লেখ করা যায়। মানুষের দৃষ্টিশক্তির বিশেষ তাৎপর্য এই যে দুই চোখে সে একখানি ছবি দেখে। স্পর্শের অনুভূতি আর পেশীর সক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই দৃষ্টিশক্তির বলে মানুষ দূরত্ব ও গভীরতার নিখুঁত পরিমাপ করতে পারে। এই ক্ষমতা যদি না থাকত তাহলে আঙুল যত নিপুণ হোক না কেন, তাই দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি করা যেত না। হাত আর চোখের নিখুঁত সহযোগিতার জন্য মানুষের পক্ষে সাদামাঠা জিনিস থেকে ভূকম্পন পরীক্ষার যন্ত্রের মত উন্নত যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। নার্ভতন্ত্র আর মস্তিষ্কের জন্য এই সহযোগিতা সম্ভব হয়েছে। মানুষের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, পেশীর সংবেদন প্রভৃতি এমন সুষ্ঠুভাবে ক্রিয়াশীল যে সচরাচর তার পৃথক অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াপদ্ধতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে যে এখন আমাদের অজ্ঞাতসারেই যেন কাজ করে যায়।

অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে প্রজাতির সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পূর্বপুরুষ বা গোষ্ঠীর অন্যান্য লোক যা কল্যাণকর বলে মনে করে, মানবশিশুকে তাই দৃষ্টান্ত আর উপদেশের মাধ্যমে শেখান হয়। এই ঐতিহ্য অপরিবর্তনীয় অথবা অনড় নয়। বরং উলটো। নতুন অভিজ্ঞতার নিরিখে এই ঐতিহ্যের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। কোন নতুন অভিজ্ঞার ক্ষেত্রে দেখা দিলে বিষয়টি তখন প্রচারিত, আলোচিত এবং পরীক্ষিত হয়। সামাজিক বিচার বিবেচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করার পর কালক্রমে সেই অভিজ্ঞতা হয়ত সমষ্টিগত ঐতিহ্যের মধ্যে স্থান লাভ করে। কিন্তু ঐতিহ্যের সংশোধন বা তার সঙ্গে নতুন ঐতিহ্যের সংযোজন যত সহজ বলে মনে হয়, আসলে তত সহজ নয়। পুরান ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকতে চায় মানুষ। প্রচলিত আচরণ পালটাতে বড় কুণ্ঠিত। অতীত যুগের মানুষের অগ্রগতির পথে এই রক্ষণশীল বৃত্তি আজকের দিনের চাইতে অনেক বেশী বাধা সৃষ্টি করেছে। কারণ রক্ষণশীলতার মূলে আছে সাচ্চা মননশীলতার কঠোর প্রয়াস সম্পর্কে এক ভীরু বিতৃষ্ণা। তথাপি দৃষ্টান্ত আর উপদেশ-বাহিত সামাজিক ঐতিহ্যের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পথ বেয়ে মানবসমাজ এগিয়ে গেছে।

প্রাগিতিহাসের যে আবিষ্কার পুরাবিদ্যাবিদের কাছে অগ্রগতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে গণ্য হয়, সেই আবিষ্কার আসলে সামাজিক ঐতিহ্যের মধ্যে অভিনবত্বের বাস্তব রূপ। আবিষ্কারক নিজেও সঞ্চিত সামাজিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে তার

পক্ষে নতুন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি আবিষ্কারের অর্থ সামাজিক ঐতিহ্যের সঙ্গে কর্ম ও আচরণের নতুন বিধি সংযোজনের সফল প্রয়াস। নতুন আবিষ্কারের পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অপরকে বিদ্যাটি শেখাতে হবে। তাতে সামাজিক ঐতিহ্যের মধ্যে নতুন বিধি সংযোজিত হবে আর উত্তরপুরুষ তাই শিখবে।

মানুষের বিমূর্ত চিন্তাশক্তিও তার সংস্কৃতি সৃষ্টির সাধনায় সহায়ক হয়েছে। এই চিন্তাশক্তি যেমন ভাষার মধ্যে প্রতিফলিত তেমন মানসিক ছবির মধ্যে মূর্ত। শব্দের সাহায্যে যেমন বিমূর্ত চিন্তা প্রকাশ করা যায়, তেমন ছবি বা কল্পনার মধ্যেও তার প্রতিফলন হতে পারে। এই চিন্তারীতি যন্ত্রের আবিষ্কারকদের মানসলোকে অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে মানুষের মধ্যে মননশীলতা যখন আরম্ভ হয়েছে, তার প্রথম পর্যায়ে ছবি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হয়ত গ্রহণ করেনি। চিন্তা আসলে মানসিক ক্রিয়া। চিন্তিত বিষয়ের মডেল তৈরি করা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ক্ষমতা অবশ্যই সীমাবদ্ধ। মানুষ শব্দোচ্চারণ করতে শিখেছে মানুষ হয়েই। কিন্তু ছবি আঁকতে শিখেছে অনেক পরে। তাছাড়া শব্দের সাহায্যে বিমূর্ত বস্তুর সংজ্ঞা বরং দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার ছবি আঁকা অসম্ভব। দৃষ্টান্ত হিসাবে বিদ্যুৎ, শক্তি কিংবা ন্যায়-বিচারের কথা বলা যায়। খুব উচ্চ পর্যায়ের বিমূর্ত চিন্তার পক্ষে ভাষা একরকম অপরিহার্য।

মানুষের দৈহিক অভিব্যক্তির আলোচনা প্রাগৈতিহাসিক নৃবিদ্যার অধিকারে। কিন্তু মানবজাতির মধ্যে দৈহিক বিবর্তনের স্থান দখল করেছে মানুষের নিজের সৃষ্ট সংস্কৃতি। মানব-প্রজাতির, আধুনিক মানুষের প্রজাতির প্রাচীনতম কঙ্কাল তুষার যুগের শেষ পর্বের। তার সাংস্কৃতিক পর্যায়ের নাম অরিনেশীয়, সোলুত্রিয়, মাগদালেনীয় ইত্যাদি। এই সব কঙ্কালের সঙ্গে আমাদের কঙ্কালের সাদৃশ্য এত বেশী যে শুধু মাত্র বিশেষজ্ঞেরা তার পার্থক্য ধরতে পারেন। পঁচিশ হাজার বছর আগেকার আধুনিক মানুষের কঙ্কালের মধ্যে মানবদেহের যে রূপরেখা দেখা যায়, পরবর্তীকালে সেই রূপরেখার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। মানুষের দৈহিক অভিব্যক্তি যেন পঁচিশ হাজার বছর আগে থেমে গেছে, কিন্তু তার সাংস্কৃতিক প্রগতি তখন সবে আরম্ভ হয়েছে মাত্র। অরিনেশীয় কিংবা মাগদালেনীয় সংস্কৃতি যে সব মানুষ গড়ে তুলেছিল, তাদের সঙ্গে আজকের মানুষের দৈহিক পার্থক্য উপেক্ষণীয়। কিন্তু উভয়ের সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ব্যবধান দুস্তর। সংস্কৃতি যেন মানবজীবনে নতুন জৈবিক অভিব্যক্তির স্থান গ্রহণ করেছে। পুরাবিদ্যা এই সাংস্কৃতিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করে। খাদ্য-সংগ্রহ বা আশ্রয়-নির্মাণের

জন্য পুরাকালের মানুষ যে সব হাতিয়ার ব্যবহার করেছে, সেই সব জিনিস এই গবেষণার দলিল। তার মধ্যে ক্রমোন্নত কারিগরী নৈপুণ্যের স্বাক্ষর আছে। জীবনযাত্রার প্রয়োজন মেটাবার উন্নততর সংগঠনের দৃষ্টান্ত এগুলি। মানুষের তৈরী হাতিয়ার থেকে স্পষ্টত আবিষ্কর্তার কায়িক শ্রমের আভাস পাওয়া যায়। তার মধ্যে তৎকালীন বিজ্ঞানের আভাস তত স্পষ্ট নয়। তবু প্রতিটি হাতিয়ারের মধ্যে নির্মাতার বুদ্ধি-কৌশল এবং তার জ্ঞানের আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। বেতার বা বিমান সম্পর্কে এ কথা যেমন প্রযোজ্য, হাত-কুঠার কিংবা ব্রোঞ্জের কুঠার সম্পর্কেও সে কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

প্রাগিতিহাসের কালবিচার

আমাদের পক্ষে একটি বছর বেশ দীর্ঘ সময়। বর্ষশেষে পেছন ফিরে তাকালে বিগত বর্ষের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে নিজের, নিজের পরিবার-পরিজনের, নিজের দেশের, এমন কি বিশ্বের জীবনের কত উদ্দীপনাময় কাহিনী লক্ষ্য পড়ে। দশ-বিশ বছরের ঘটনাপুঞ্জের কথা চিন্তা করলে সামান্য কয়েকটিমাত্র ঘটনার স্মৃতি ভাসা-ভাসা মনে পড়বে। গত বিশ বছরের মধ্যে বাঙালীর জীবনে কত না বিচিত্র যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই বিশ বছরের প্রতিদিনের ঘটনার ভীড়ের মধ্যে মহাযুদ্ধ, বোমা, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ কিংবা স্বাধীনতা লাভ আর নিজের জীবনের একটি দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছাড়া কার আর কত বেশী মনে আছে? এর পর যদি শতাব্দীর মানদণ্ডে কালবিচার করতে হয়, তাহলে চৌত্রিশটি শতাব্দী পেছিয়ে গেলে দেখা যাবে যে বৃটেনের ইতিহাসের কোন লিখিত নজীর নেই। আজকের আমেরিকা অস্তিত্বহীন। তখনকার অধিকাংশ দেশের মানুষ ইতিহাসের আলো-আঁধারির মধ্যে বসবাস করত। চৌত্রিশ শতাব্দী আগেকার লিখিত নজীরের খোঁজ পাওয়া যেত শুধু মাত্র ক্রীট দ্বীপে, মিশরে, পশ্চিম এশিয়ায় আর ভারত ও চীনে। কিন্তু সেই অজ্ঞাত পরিচয় যুগের ঘটনাবলী আজকের মত সেকালের মানুষের জীবন আন্দোলিত করেছে। অথচ তার খোঁজ মিশর বা ব্যাবিলন জানত না। তবু সেকালের ঘটনাবলী তৎকালীন মানুষের পক্ষে নিশ্চয়ই কম স্মরণীয়, কম উদ্দীপনাময় ছিল না। কিন্তু মানবজাতির প্রারম্ভিক ইতিহাসের আলোচনা করতে গেলে মাত্র চৌত্রিশ শতাব্দী পেছিয়ে গেলে চলবে না। পেছোতে হবে কম পক্ষে পাঁচ লাখ বছর।

বস্তুতপক্ষে মানবজাতির অগ্রগতির পুরাকালীন আরম্ভের আলোচনা করার পক্ষে বছর বা শতাব্দীর মাপকাঠি নিতান্ত ক্ষুদ্র। তার বিচার করতে হবে কমপক্ষে সহস্র বছরের মাপকাঠি দিয়ে। অথচ প্রতিটি সহস্র বছরের মধ্যে আছে দশ দশটি শতাব্দী আর তার প্রতিটি বছর, প্রতিটি শতাব্দী জুড়ে আছে ঘটনাপুঞ্জের মিছিল। এই মাপকাঠি দিয়ে লিখিত ইতিহাস বিচার করলে দেখা যাবে, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন পাঁচ শত বছর আগে। দু হাজার বছর

আগে বৃটেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে যায়। তিন হাজার বছর আগেকার লিখিত নজীর খুঁজতে হলে ইউরোপ ছেড়ে চলে আসতে হয়। রোমের তখন সবে মাত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বর্বরদের আক্রমণে গ্রীসে অন্ধকার যুগ চলছে। সাহিত্যের খোঁজে যেতে হয় প্রাচ্য খণ্ডে—মিশরে, পশ্চিম এশিয়ায়, ভারতে ও চীনে। আরও হাজার দুয়েক বছর পেছিয়ে গেলে ভারতের বুকে শুধুমাত্র মহেন-জো-দারোর দীপশিখা দেখা যায়। লিখিত ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ের খোঁজে ছুটতে হয় মিশরে ও ব্যাবিলনে। কোন লিখিত নজীর তার আগেকার মানব-ইতিহাসে আলোক সম্পাত করে না। তবু এ কথা সত্য যে মানবসভ্যতা তখনই পরিণত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

মানব-প্রগতির প্রথম পর্যায়ে পৌঁছোতে গেলে ভূবিদ্যার কালের গর্ভে ঝাঁপ দিতে হয়। ভূবিদ্যাবিদ্ ছাড়া এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালগণনা করা সম্ভব নয়। গাণিতিক সংখ্যার হিসাব এখানে অর্থহীন। প্রধানতঃ অনুমান মাত্র। তাছাড়া জীবন-বিকাশের পটভূমিকায় মানুষের অভিব্যক্তির কাহিনী যদি বিচার করতে হয়, তাহলে প্রাণবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের কালগণনার করার পক্ষে গাণিতিক সংখ্যার হিসাব আরও অর্থহীন। বিভিন্ন সময়ে ভূস্তরে যে বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার কথা বাদ দিয়ে মানুষের প্রাচীনত্ব বিচার করা সম্ভব নয়। মেসোপটেমিয়ায় যখন মানুষের প্রথম বসতি স্থাপিত হয়েছে, তারও বহু পূর্বে মানুষ স্বচক্ষে তুষার যুগের মত ঘটনা দেখেছে। তাই ভূবিদ্যাবিদের গবেষণা, বিশেষতঃ হিমবাহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের গবেষণা ছাড়া প্রাগৈতিহাসিক অতীতের কালগণনা করা অসম্ভব। দুনিয়া জুড়ে তুষারপাত হয়েছে। তবু গত দশ লাখ বছরের মধ্যে যে তুষার যুগ দেখা দিয়েছে তার নির্ভরযোগ্য কালগণনার হিসাব ইউরোপ থেকে পাওয়া গেছে। এই কালগণনার হিসাব ফসিল-মানুষের কাল-বিচার সম্পর্কেও আংশিকভাবে প্রযোজ্য।

গত দশ লাখ বছরের মধ্যে অর্থাৎ প্লিস্টোসিন কল্পে চার চার বার ইউরোপের উত্তর ও মধ্য ভাগ বরফের আস্তরণে ছেয়ে গেছে। পিরেনিজ ও আলপসের হিমবাহ ফ্রান্সের নদীগর্ভ গ্রাস করেছে। টেমস আর রাইন নদী যুক্ত হয়েছে বরফের সেতু-বন্ধনে। গোটা উত্তর সাগর জমাট বেঁধে বৃটেনকে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই প্রাকৃতিক পরিবর্তন সহসা দু-দশ বছরে সম্ভব হয়নি। দীর্ঘকাল লেগেছে বরফের আস্তরণ দানা বাঁধতে আর তার প্রসার ঘটতে। বরফের নদী হিমবাহ। তুষারপাতে জমাট বাঁধা নদীর সঙ্গে তার তফাত আছে। রোন্ হিমবাহের লিয়ঁ পর্যন্ত অগ্রগতির অর্থে এ কথা বোঝায় না যে ফ্রান্সের

রোন্ নদী সহসা জমাট বেঁধে গিয়েছিল, আর আলপসের পর্বতচূড়া থেকে হিমবাহ নেমে লিয়ঁ শহর অবধি প্রবাহিত হয়েছিল। হিমবাহের প্রবাহ অতি মন্থর। এত মন্থর যে খালি চোখে তার অগ্রগতি মালুম করা যায় না। অতি দ্রুতগামী হিমবাহকেও দৈনিক একশ ফুটের বেশী এগোতে দেখা যায়নি। স্বভাবতঃ আরও ধীরে চলে। তুষারের যে আস্তরণ ইংল্যাণ্ডের পূর্ব এ্যাংলিয়া আর উত্তর জার্মানি গ্রাস করেছিল তার অগ্রগতির হার এতটা হতে পারে না। গ্রীনল্যাণ্ডে এই বরফের আস্তরণ এখন প্রতিদিন মাত্র কয়েক ইঞ্চি এগোয়। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে হিমবাহের অগ্রগতির হার প্রতি বছরে এক মাইলের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। তাহলেই অনুমান করা যায়, রোন্ হিমবাহের পক্ষে কতদিন লেগেছিল লিয়ঁ শহরে পৌঁছোতে।

তারপর এই বরফের আস্তরণ গলতেও সমান দেরি লাগে। হিমবাহের গলনের গতি এত মন্থর যে, এক গ্রীষ্ম থেকে অন্য গ্রীষ্মকালের মধ্যে প্রান্তসীমার অবস্থানের তারতম্য সমকালীন মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা হয়ত সম্ভব হয়নি।

তবু এ কথা সত্য, ইতিহাস আরম্ভ হবার আগে মানবসমাজ ইউরোপের বুকে পুনঃ পুনঃ বরফের সর্বগ্রাসী আক্রমণ আর তার পশ্চাদপসরণ প্রত্যক্ষ করেছে। শুধু তাই নয়। বহু ভূবিদ্যাবিদের বিশ্বাস, প্লিস্টোসিন কল্পে শুধু একটি নয়, চার-চারটি আলাদা তুষার যুগের আবির্ভাব হয়েছে। চার-চার বার আগুয়ান বরফের আস্তরণ ধীর মন্থরে ইউরোপের ভূখণ্ড গ্রাস করেছে, আবার চার-চার বার গলে গেছে কিংবা শুকিয়ে গেছে। প্রতিটি তুষার যুগের পরে দেখা দিয়েছে অনির্দিষ্ট ব্যাপ্তিকালের এক একটি আন্তঃ-তুষার যুগ। আজকে আমরা হয়ত চতুর্থ আন্তঃ-তুষার যুগের পরে বাস করছি। ইউরোপ খণ্ডের এই তুষার যুগের কালগণনা করে তুষারবিদ্যাবিদেরা যে ছক তৈরি করেছেন তার নমুনা দিচ্ছি :

তুষার যুগের কালনির্ণয় (কত সহস্র বছর আগে)	পর্যায়	স্থিতিকাল	
২৫	তুষার যুগোত্তর	২৫,০০০ বছর	
৫০	উরম—তৃতীয় পর্যায়	২৫,০০০ ”	১৩৫,০০০ বছর
১০০	উরম—দ্বিতীয় পর্যায়	৫০,০০০ ”	
১৬০	উরম—প্রথম পর্যায়	৬০,০০০ ”	
	তৃতীয় আন্তঃ-তুষার যুগ	**২০,০০০ বছর**	
২০০	রিজ—দ্বিতীয় পর্যায়	২০,০০০ ”	৬০,০০০ বছর
২৪০	রিজ—প্রথম পর্যায়	৪০,০০০ ”	

তুষার যুগের কালনির্ণয় (কত সহস্র বছর আগে)	পর্যায়	স্থিতিকাল	
	দ্বিতীয় আন্তঃ-তুষার যুগ	**১,৬০,০০০ বছর**	
৪৫০	মিনডেল—দ্বিতীয় পর্যায়	৫০,০০০ „	৮০,০০০ বছর
৪৮০	মিনডেল—প্রথম পর্যায়	৩০,০০০ „	
	প্রথম আন্তঃ-তুষার যুগ	**৩০,০০০ বছর**	
৫৫০	গুনজ্—দ্বিতীয় পর্যায়	৪০,০০০ „	৯০,০০০ বছর
৬০০	গুনজ্—প্রথম পর্যায়	৫০,০০০ „	
১০০০	প্রাক-তুষারযুগ	৪,০০,০০০ „	

এই ছকের পর্যায় কয়টির নামকরণ হয়েছে জার্মানির কয়েকটি নদীর নাম অনুসারে। তুষার যুগ আর আন্তঃ-তুষার যুগের এই পর্যায়ক্রম পুরাবিত্থার নজীরের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হিমবাহের কালে মানুষ গুহাকন্দরে আশ্রয় নিয়েছে। আবার আন্তঃ-তুষার যুগের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়ায় খোলা জায়গায় বেরিয়ে পড়েছে—বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাই গুহাকন্দরের মধ্যে তুষার যুগের মানুষের স্মারকচিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু আন্তঃ-তুষার যুগের নজীরের অভাব আছে।

গাণিতিক সংখ্যার এই হিসাব থেকে বোঝা যাবে, পুরাবিত্থাবিদেরা যখন 'যুগ' শব্দটি ব্যবহার করেন, কালগতভাবে তার বিস্তার কত ব্যাপক। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে, যুগ শব্দটি সর্বত্র ভূবিত্থার কাল-ব্যাপ্তির অর্থে ব্যবহৃত হয় না। পুরোপলীয় যুগ, মধ্যপলীয় যুগ, নবোপলীয় যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ বা লৌহ যুগের ক্ষেত্রে যুগ শব্দের অর্থ ভূ-তাত্ত্বিক যুগ থেকে আলাদা। এখানে যুগ শব্দটি সাংস্কৃতিক পর্যায়ের সূচক। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে, সে মিশরে হোক বা বৃটেনে হোক, এর কোন যুগ কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কাল দখল করে থাকেনি। তবে সর্বত্র যুগগুলির ক্রম ঠিক আছে। কিন্তু কোন যুগ এই দুনিয়ায় যুগপৎ আরম্ভ বা শেষ হয়নি। এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে পৃথিবীর ইতিহাসের কোন এক মুহূর্তে দৈববাণীর সঙ্গে সঙ্গে চীন থেকে পেরু পর্যন্ত সমস্ত দেশের শিকারী মানুষ যুগপৎ শিকারের হাতিয়ার বা ফাঁদ ফেলে রেখে ধান, গম কি ভুট্টার আবাদ করতে লেগে গিয়েছিল। বরং অর্থ-নৈতিক দিক থেকে বিচার করলে মধ্য অস্ট্রেলিয়ায় এখনও পুরোপলীয় যুগের অস্তিত্ব আছে। নবোপলীয় বিপ্লব মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় নব প্রস্তর যুগ নিয়ে এসেছিল সাত হাজার বছর আগে। কিন্তু বৃটেন আর জার্মানিতে তার প্রভাব

টের পাওয়া গেছে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে—খৃস্টপূর্ব ২,৫০০ বছরের কাছাকাছি। আবার বৃটেন আর জার্মানিতে নবোপলীয় যুগ কায়েম হতে না হতে মিশর আর মেসোপটেমিয়ায় ব্রোঞ্জ যুগ দেখা দিয়েছে। নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিদের মধ্যে নবোপলীয় যুগ শেষ হয়েছে, ক্যাপ্টেন কুক সে দেশে যাবার পরে। ইংল্যাণ্ড তখন শিল্প-বিপ্লবের মুখে, আর অস্ট্রেলিয়া তখনও পুরোপলীয় যুগে।

তবে পুরোপলীয় যুগের ব্যাপ্তিকাল সর্বত্র এত দীর্ঘ যে তাকে একটি বিশ্বজনীন যুগ অর্থাৎ ভূবিদ্যার প্লিস্টোসিন কল্পের সমতুল যুগ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু পুরোপলীয় যুগের সমাপ্তির কথা চিন্তা করলে কালব্যাপ্তির তারতম্য ধরা পড়ে। মধ্যপলীয় যুগ নামে আর একটি যুগ সৃষ্টি করে কোন কোন পুরাবিদ্যাবিদ্ প্লিস্টোসিন আর পুরোপলীয় যুগকে কালবিচারে সমপর্যায়ে এনেছেন। বৃটেন ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে নবোপলীয় যুগ আসে তুষার যুগের সমাপ্তির অনেক পরে। তুষার যুগোত্তর পর্যায়ের অর্থাৎ ভূবিদ্যার প্লিস্টোসিন যুগের পরেকার আর স্থানীয় নবোপলীয় যুগের আগেকার সময়টিকে মধ্য প্রস্তর যুগ বা মধ্যপলীয় যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে মধ্য প্রস্তর যুগ পুরোপলীয় যুগের জীবনযাত্রার অনুক্রম মাত্র।

আমাদের সমকালীন অসভ্য বুনো মানুষ পুরোপলীয় যুগে বাস করছে বলে গণ্য করা হয়। পুরোপলীয় যুগের আর্থিক ব্যবস্থা অতিক্রম করে সত্যই তারা এগোতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ছয় হাজার কি বিশ হাজার বছর আগেকার ইউরোপ বা পশ্চিম এশিয়ার পুরোপলীয় যুগের মানুষের পারিবারিক সম্পর্ক কিংবা ধ্যান-ধারণা অবিকল এদের পারিবারিক সম্পর্ক কিংবা ধ্যানধারণার মত ছিল ; অথবা তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে কিংবা ক্রিয়াকর্মে এখনকার অসভ্যদের রীতিনীতির মত রীতিনীতি পালিত হত। এ কথা সত্য, আফ্রিকার বুশম্যান, মেরু অঞ্চলের এস্‌কিমো আর মধ্য অস্ট্রেলিয়ার অরুনটাদের খাদ্য আহরণের পদ্ধতি ইউরোপের তুষার যুগের মানুষের মত। এদের হাতিয়ার বা শিল্পকলার সঙ্গে তুষার যুগের ইউরোপের অরিনেশীয় আর মাগদালেনীয়দের হাতিয়ার ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর মিল আছে। এদের হাতিয়ার তৈরীর পদ্ধতি এবং সেগুলি চালনার কৌশলও বিস্ময়কর। এর মধ্যে হয়ত আমাদের পুরাকালীন বংশপতিদের কলা-কৌশলের আভাস আছে। এস্‌কিমোদের জীবন-পদ্ধতি অবশ্যই ইউরোপের তুষার যুগের মানুষের জীবনযাত্রার দিগ্‌দর্শনের সহায়ক। তবে আধুনিক কালের অসভ্যদের আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের জীবনযাত্রা বা সংস্কৃতির প্রতিলিপি মনে করলে

ভুল করা হবে। দশ হাজার বছর আগে ইউরোপের মানুষ যে স্তর অতিক্রম করে গেছে আমাদের সমকালীন অসভ্যদের আর্থিক জীবন ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি সেই স্তরে বন্দী হয়ে আছে। তাই বলে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, তাদের মনের বাড়তিও দশ হাজার বছর আগেকার সেই পর্যায়ে আটকা পড়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রতিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকার পক্ষে খাদ্য ও বাসস্থানের প্রয়োজন মেটাতে যে সামান্য সম্বল আবশ্যক তার ব্যবস্থা হলেই অরুনটারা সন্তুষ্ট। তাদের হাতিয়ার অথবা জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নির্মাণ-পদ্ধতিও কলা-কৌশলের দিক থেকে এই সরল জীবনযাত্রার সমপর্যায়ের। বহু ক্ষেত্রে ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকার পুরোপলীয় যুগের শিকারীদের হাতিয়ারের মত। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মনে হয়, বিবাহানুষ্ঠানে আর জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক নিরূপণে অরুনটারা বহু জটিল নিয়ম পালন করে। যাদুবিদ্যা প্রভাবিত ধর্মাচরণের মধ্যে তারা বিবিধ জটিল, এমন কি পীড়াদায়ক আচার পালন করে বলে মনে হয়। টোটেম জীবজন্তু, গোত্রপতি আর ভূত-প্রেত সম্পর্কেও তাদের মধ্যে বহু সঙ্গতিহীন বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস আছে। এই সব সামাজিক নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাসকে মানুষের আদিমতম অবস্থার নিয়মকানুন, আচার-আচরণ বা বিশ্বাসের নিষ্কলুষ উত্তরলব্ধি বলে গণ্য করা হঠকারিতার পরিচায়ক। কি কারণে ধরে নেব যে বিশ হাজার বছর আগেও পুরোপলীয় মানুষের ধ্যান-ধারণা বা আচারবিধি এই রকম ছিল? কেন মনে করব যে নিজেদের প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাত্রার পদ্ধতি এবং তদুপযোগী দ্রব্যসম্ভার সৃষ্টি করার পর অরুনটাদের মননশীলতা স্তব্ধ হয়ে গেছে? আমাদের সংস্কৃতির বংশপতিদের মত তারাও অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করেছে। তবে তাদের চিন্তাধারা চালিত হয়েছে ভিন্ন পথে। আমাদের বংশ-পতিরা বাস্তব সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। তারা পারেনি। তারা হয়ত কুসংস্কারের কানাগলিতে ঘুরে মরেছে। তাছাড়া গত পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে দেশ-দেশান্তরে বহু সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব দুনিয়ার দূরতম প্রান্তেও অনুপ্রবেশ করেছে। অরুনটাদের মধ্যে এই সব সভ্যতার কোন একটির বিন্দুমাত্র প্রভাবও যে পড়েনি এ কথা জোর করে বলা যায় না। বরং নৃ-কুলবিদ্যাবিদের মতে অস্ট্রেলিয়দের বাস্তব সংস্কৃতি, সামাজিক সংগঠন আর ধর্মবিধির মধ্যে পুরান পৃথিবীর উন্নততর ধ্যান-ধারণার প্রভাব আছে।

আবার এও দেখা যায় যে কোন কোন আদিম মানবগোষ্ঠী তাদের প্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্য হারিয়ে পেছনে হটে গেছে। পরদেশীর আক্রমণে দক্ষিণ

আফ্রিকার বুশম্যানরা নিজেদের বাসভূমি হারিয়েছিল। বানটুদের মত পরাক্রমশালী দলের চাপে প্রাকৃতিক সম্পদবিরল শুষ্ক এক অঞ্চলে পালিয়ে যেতে তারা বাধ্য হয়েছিল। এই নতুন প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হওয়ায় বুশম্যানদের শিল্পকলা উপেক্ষিত হতে থাকে। এমন কি, নিজেদের সাবেক সংস্কৃতিও তারা ভুলে যায়। তাদের পূর্বপুরুষেরা মৃৎপাত্র তৈরি করতে পারত। সেই বিদ্যা তারা ভুলে যায়। সামাজিক সংগঠন আর ধর্মীয় বিশ্বাসও এইভাবে বিকৃত হতে পারে। তার মধ্যে ভাঙন ধরতে পারে। তবু এই সব মানবগোষ্ঠীকে আদিম মানবগোষ্ঠী বলা সঙ্গত হবে না। সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা দরিদ্র হয়ে গেছে।

কাজেই পুরাকালের মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে কিছু মিল আছে বলে আজকের কোন অসভ্য দলকে 'আদিম' বলে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। পুরাকালের যে মানবগোষ্ঠীর কথা শুধু পুরাবিদ্যাতে জ্ঞাত তাদের চিন্তা-প্রকরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আধুনিক কালের অসভ্যদের ধ্যান-ধারণা এবং আচারপদ্ধতির উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাখ্যা প্রসঙ্গের উপমা ছাড়া, শুধুমাত্র আভাসের দৃষ্টান্ত ছাড়া পুরাকালের রীতিনীতির সঙ্গে আধুনিক কালের বিশ্বাস বা আচার-আচরণের কোন যুক্তিসঙ্গত সাযুজ্যতা নেই। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ধ্যান-ধারণা, তাদের চিন্তাধারা চিরকালের মত বিনষ্ট হয়ে গেছে। সেই চিন্তা-ভাবনার যেটুকু অংশ কালজয়ী সৃষ্টির মধ্যে বাস্তবরূপে প্রকাশিত, পুরাবিদ্যাবিদের কোদালের মুখে আজকে কেবলমাত্র সেই অবিনশ্বর বাস্তব সৃষ্টি উদ্ধার করা যেতে পারে।

প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির ইতিহাস

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের পরিচয় মুখ্যতঃ তার সৃষ্টির মধ্যে। নিজের হাতে, নিজের শ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে যে হাতিয়ার সে এক কালে জীবন-সংগ্রামের সহায়ক হিসাবে তৈরি করেছিল, মানুষের হাতে গড়া সেই কালজয়ী হাতিয়ার এবং যন্ত্রপাতি থেকে সেকালের মানুষের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় জানা গেছে। এই কৃত্রিম সৃষ্টি তার জীবনসংগ্রামের অন্যতম সহায় ছিল। যত না মানুষের শিলীভূত অস্থি পাওয়া গেছে তার অনেকগুণ বেশী পাওয়া গেছে তার হাতের কাজ। দেশ-বিদেশের যাদুঘর ভর্তি হয়ে গেছে। এই স্মারকচিহ্নকে পুঁজি করে পুরাবিদ্যাবিদেরা আধুনিক মানুষ অথবা তার আগেকার মানবগোষ্ঠীর অলিখিত প্রাগিতিহাস উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন। সেই সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবনেতিহাস গ্রথিত করার প্রয়াস সফল হয়েছে।

স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে, কি ভাবে এবং কোন বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করে পুরাবিদ্যাবিদেরা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনেতিহাস উদ্ধার করার চেষ্টা করে থাকেন? ইতিহাস যে কালের কাহিনী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব, কোন্ পদ্ধতিতে সেকালের কাহিনী উদ্ধার করা যেতে পারে?

এই প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে শুধু এই কথা বলা যেতে পারে যে, বস্তুনিষ্ঠ নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করে সহজেই লিখিত ইতিহাসের কালসীমা অতিক্রম করা যায়। মানুষের অবিনশ্বর কালজয়ী সৃষ্টির বিচার-বিশ্লেষণ করে সেই ভিত্তির উপর তার প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারার ছবি আঁকা যেতে পারে। নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে ইতিহাসের মধ্যে প্রগতির একটি চিরপ্রবহমান ফল্গুধারা খুঁজে পাওয়া যায়। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার জন্য প্রথমে ব্যক্তিগত সংস্কার বর্জন করতে হয়। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উর্ধে উঠে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস যদি গড়ে তোলা যায়, তাহলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুণ্ণ থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আত্মবিলোপের চেষ্টা করতে হবে। এতটা বিনয়, এমন নিরাসক্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাসের বিচার করা বড় সহজ কাজ নয়। তবু এই নিরাসক্ত বিচারবুদ্ধি দিয়ে ইতিহাসের

বিচার করা ঐতিহাসিকের প্রাথমিক কর্তব্য। ঘটনাপুঞ্জের জটিল গ্রন্থি থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। সেই ঘটনাপুঞ্জ থেকে যদি প্রগতির চিরপ্রবহমান ফল্গুধারা খুঁজে বার করতে হয়, তাহলে ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীও বর্জন করতে হবে। স্কুলপাঠ্য ইতিহাস যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা হয়, সেই দৃষ্টিকোণ বজায় রাখলে চলবে না। স্থান ও কাল উভয় দিক থেকে বিচারের পটভূমি প্রসারিত করতে হবে। স্থান আর কালের সংকীর্ণতর গণ্ডীর মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিচার করতে গেলে বিশ্লিষ্ট ঘটনাপুঞ্জের চাপে অন্তঃশীল ধারার ছাঁদ হারিয়ে ফেলার শঙ্কা থাকে।

প্রচলিত ইতিহাসের পটভূমি অতীতের কালবিচারে বড় জোর তিন চার হাজার বছর পর্যন্ত প্রসারিত। দেশগত ভৌগোলিক গণ্ডীও তার মধ্যে আছে। কালের পরিধি তার ফলে আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। তারপর প্রাচীন কালের ইতিহাসের ছাপ মেরে যা শেখান হয়, তার সঙ্গে আধুনিক কালের ইতিহাসের যেন কোন মৌলিক যোগসূত্র নেই। যেন কোন রহস্যময় ফাঁক রয়েছে উভয়ের মধ্যে। কিন্তু ইতিহাসের গণ্ডী যত সংকীর্ণ করা হবে, ক্রমিক প্রগতির বদলে সাময়িক উত্থান-পতনের দৃষ্টান্ত সেই ইতিহাসের মধ্যে তত প্রাধান্য লাভ করবে।

তাছাড়া ইতিহাসের যে রূপটি প্রচলিত ইতিহাসের বইতে তুলে ধরা হয়, সেই রূপ প্রধানতঃ রাজনৈতিক। ইতিহাসের নামে মূলতঃ রাজনৈতিক ইতিহাস শেখান হয়। রাজা-রাজড়ার কাহিনীর সঙ্গে রাজনীতিকের কূটবুদ্ধির খেলা আর সৈনিকের বীরত্বের কাহিনী থাকে। সেই সঙ্গে ধর্মগুরু আর ধর্মসংস্থার কথা, রাজনৈতিক সংস্থার বিবরণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ আর অত্যাচার-উৎপীড়নের কাহিনী সচরাচর এই ইতিহাসের পাতা জুড়ে থাকে। তার সঙ্গে প্রসঙ্গতঃ প্রতিটি যুগের আর্থিক অবস্থা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অথবা ললিতকলা সম্পর্কে দু-চার কথা থাকে। কিন্তু এই সব বিবরণ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক যুগটি রাজনৈতিক মানদণ্ডে চিহ্নিত করা হয়। তার নামকরণ হয় রাজবংশ, ধর্মসংস্থা অথবা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নামানুসারে। যিনি লিখছেন তার সংস্কার-নিরপেক্ষ কোন তুলনামূলক বিচারের মানদণ্ড এই আলোচনার মধ্যে সাধারণতঃ থাকে না। কাজেই একদল যাকে স্বর্ণ যুগ বলে সগর্বে অভিনন্দিত করেন, অপর এক দলের পক্ষে সেটি হয়ত চরম নিপীড়নের যুগ। এই ধরনের ইতিহাস মারাত্মকভাবে তার পরিধি সংকীর্ণ করে নিয়ে আসে। প্রাগিতিহাসের স্থান এই সব ইতিহাসে থাকে না। কারণ সে কালের কোন লিখিত নজীর নেই। প্রাগিতিহাসের অভিনেতাদের নাম খুঁজে

বার করা কিংবা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। এমন কি, পুরাবিদ্যাবিদেরা যে সব মানবগোষ্ঠীর চলাচলের কাহিনী অনুধাবন করার চেষ্টা করেন, প্রাগিতিহাসে তাদের নাম পর্যন্ত নেই। আশার কথা, রাজনৈতিক ইতিহাসই যে একমাত্র ইতিহাস পদবাচ্য এই দাবি এখন আর টিকছে না।

এই দাবির বিরুদ্ধে প্রথম প্রবল প্রতিবাদ তোলেন কার্ল মার্ক্স। ঐতিহাসিক বিবর্তনের কারণ হিসাবে আর্থিক ব্যবস্থা, উৎপাদনের সামাজিক বিধিবিধান এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর তিনি অসীম গুরুত্ব আরোপ করেন। সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ামক হিসাবে তার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সূত্র চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। কার্ল মার্ক্সের রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থক নন এমন বিদ্বানমণ্ডলীও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। কি জনসাধারণ, কি বিদগ্ধ মহল সর্বত্র ইতিহাস এখন সাংস্কৃতিক ইতিহাস হিসাবে গণ্য হতে চলেছে। প্রাগিতিহাস যাকে বলা হয় তার সঙ্গে স্বভাবতঃ এই ধরনের ইতিহাসের যোগসূত্র সৃষ্টি হতে পারে।

মানুষের নিজের হাতে তৈরী বস্তুসম্ভারের মধ্যে তার জীবনসংগ্রামের পদ্ধতির আভাস পাওয়া যায়। সমকালীন আর্থিক ব্যবস্থা, উৎপাদনের সামাজিক বিধি-বিধান আর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খানিকটা আভাসও এই বস্তুসম্ভার তথা বাস্তব সংস্কৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। আর তার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তার বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে—ধর্ম, নীতিবোধ আর সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার মারফত। পুরাবিদ্যাবিদ্ মানুষের প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির মধ্যে ডুব দেন। ইতিহাসের প্রথম যুগের মানবীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে পুরাবিদ্যার যে শাখাটি আলোচনা করে তাকে ক্লাসিক্যাল পুরাবিদ্যা বলা হয়। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক পুরাবিদ্যাবিদ্ মূলতঃ প্রাগৈতিহাসিক। কালনির্ণয়ের জন্য ভূবিদ্যাবিদ্ আর প্রত্নপ্রাণীবিদ্যাবিদের সহযোগে তাঁকে কাজ করতে হয়। আদি মানবের বাস্তব সংস্কৃতির পুনর্গঠন করা প্রকৃতপক্ষে পুরাবিদ্যার কাজ। প্রাগৈতিহাসিক কালের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামে মানুষ যে সব হাতিয়ার ব্যবহার করত, ভূগর্ভে অনুসন্ধান করে সেই দ্রব্যসম্ভার আবিষ্কার করা পুরাবিদ্যাবিদের মৌল কর্তব্য। মানুষের তৈরী যে দ্রব্যসম্ভার তিনি উদ্ধার করেন, সেগুলি হয় পাথরের, না হয় হাড়ের। পরবর্তীকালের হলে ধাতু দিয়ে তৈরী। মাটির তৈরী জিনিসও তিনি খুঁজে বার করেন। আর যে জায়গায় এই সব জিনিস পাওয়া যায় প্রাচীন যুগের মানব-বসতির সেই সব স্থানের ছকও তিনি তৈরি করেন এবং আবিষ্কৃত উপাদান বিচার-বিশ্লেষণ করে মানবজাতির হারান ইতিহাস জোড়া দেবার চেষ্টা করেন।

একদিন যে সব মানুষ এই স্মারকচিহ্ন তৈরি করেছে এবং ব্যবহার করেছে, তাদের সমাধিস্থ অস্থিও পুরাবিদ্যাবিদের চোখের সামনে সবার আগে অবারিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণীয়। অবিনশ্বর কালজয়ী দ্রব্যের উপর প্রাগৈতিহাসিক পুরাবিদ্যাকে নির্ভর করতে হয়। অতীত ঘটনার কালনির্ণয়ের জন্য ভূবিদ্যাবিদের মত তাকে ভূ-ত্বকের স্তরবিন্যাসের উপর নির্ভর করতে হয়। জীববিজ্ঞানীরা শিলীভূত অস্থি নিয়ে গবেষণা করেন। পুরাবিদ্যাবিদের গবেষণার সামগ্রীও সমবৃত্তিসম্পন্ন। তবু একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। পুরাবিদ্যাবিদের কোদালের মুখে ভূগর্ভে যে সব সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়, সেগুলি এক কালের মননশীল প্রাণীর হাতে তৈরী। মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা আর বিচারশক্তি তার ছিল। প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে পুরাবিদ্যাবিদের কোন সম্পর্ক নেই। সৃজনশীল শ্রমের বলে নিজের হাতে তৈরী যে বস্তুসম্ভার দিয়ে মানুষ জীবনসংগ্রামে সফল হয়েছে, তাই নিয়ে তাঁর কারবার।

এইবার দেখা যাক পুরাবিদ্যার সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সামাজিক ও আর্থিক বিধিব্যবস্থার আভাস কি ভাবে পাওয়া যায়। পুরাবিদ্যাবিদ্ আমাদের বংশপতিদের তৈরী হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে তাকে শ্রেণীবদ্ধ করেন। তুলনামূলক বিচার করেন এই সব সংগ্রহের। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বসতির ঘরবাড়ি আর তাদের আবাদী জমিও পরীক্ষা করে দেখা হয়। তারা যে খাদ্য খেত কিংবা যে খাদ্য বর্জন করত, তাও পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। সংগৃহীত যন্ত্রপাতি সেকালের মানুষের উৎপাদনের হাতিয়ার, তাদের আর্থিক বিধিব্যবস্থার স্মারক। অথচ কোন লেখা ইতিহাস তার নেই। আজকের যুগের যে কোন যন্ত্র বা হাতিয়ারের মত প্রাচীনকালের এই সব স্মারকচিহ্নও তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগে সৃষ্টি করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আজকের দিনের একখানা জাহাজ যেমন ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র আর পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের সম্মিলিত প্রয়োগে সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি একটিমাত্র গাছের গুঁড়ি থেকে তৈরী প্রস্তর যুগের 'ক্যানো'র মধ্যেও সেকালের বিবিধ বিদ্যার প্রয়োগ কৌশল সুপ্রকাশ।

তাছাড়া জাহাজ নির্মাণের বিধিব্যবস্থার মধ্যে একটি জটিল আর্থিক ও সামাজিক সংস্থার ছক ফুটে ওঠে। বিভিন্ন স্থান থেকে কাঁচামাল এনে এক জায়গায় জড়ো করতে হবে। বহু দূর দেশ থেকে এজন্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হয়। তার মানে বহু বিস্তীর্ণ সুদক্ষ যানবাহন ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাছাড়া জাহাজ তৈরি করতে হলে বিশেষ বিশেষ কারিগরী বিদ্যায় কুশলী একদল কর্মীকে

কেন্দ্রীয় এক পরিচালকমণ্ডলীর ব্যবস্থাপনায় একটি সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী একযোগে কাজ করতে হবে। এই কর্মীদের কেউ নিজেদের খাদ্য উৎপন্ন করে না। তার জন্য কৃষিজীবীদের বাড়তি ফসলের উপর নির্ভর করতে হবে। খাদ্যের এই যোগানদারদল হয়ত দূর দূরান্তে বাস করছে। গোটা কাজ নিষ্পন্ন করার জন্য জটিল বিনিময় ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

জলযান হিসাবে ক্যানোকে জাহাজের কুলপতি বলা যায়। ক্যানো তৈরীর মধ্যেও একটি আর্থিক বিধিব্যবস্থা, একটি সামাজিক কাঠামোর আভাস পাওয়া যায়। তবে সেই বিধিবিধান অনেক সরল। আলাদা ধরনের। একখানা পাথুরে কুড়াল থাকলেই ক্যানো তৈরি করা যায়। কাছাকাছির নদী থেকে পাথরের টুকরা সংগ্রহ করে নির্মাতা তার নিজের বাড়িতে এই হাতিয়ার তৈরি করতে পারে। নৌকা তৈরীর গাছও গাঁয়ে পাওয়া যায়। গাছ কাটা আর নৌকা জলে ভাসানর জন্য জনকয়েক সঙ্গীর প্রয়োজন হতে পারে। তার সংখ্যা নিশ্চয়ই বেশী নয়। পরিবারের মধ্যেও সেই কয় জন পাওয়া যায়। তাছাড়া মেছো, শিকারী কিংবা চাষীরা নিজেরাই অবসর সময় ক্যানো তৈরি করতে পারে। তার মানে পরিবার পরিজনের খাদ্য সংগ্রহের কাজ করেও অবসর সময়ে নৌকা তৈরি করা যায়। এজন্য বাইরে থেকে বাড়তি খাদ্য আমদানি করার আবশ্যক হয় না। এমন কি নিজেদের দলের মধ্যেও বাড়তি খাদ্য গোলাজাত করা নিষ্প্রয়োজন। কাজেই এই শিল্পকার্যের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ গোষ্ঠীজীবন বা পারিবারিক জীবনের আভাস ফুটে বেরোয়। আজকের অসভ্য বুনোদের মধ্যে এই ধরনের আর্থিক ব্যবস্থা দেখা যায়। শুধুমাত্র এই উৎপাদন-বিধি, এই আর্থিক ব্যবস্থা দুনিয়ার কোন স্থানে কোন সময়ে যদি চালু থাকে, তাহলে সেই যুগের সংজ্ঞা পুরাবিদ্যা-বিদেরা দিতে পারেন। কাজেই ইতিহাস যদি প্রাগিতিহাসের মধ্যে প্রসারিত হয়, তাহলেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত উৎপাদন-বিধির তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব।

আর এক কথা। আর্থিক ব্যবস্থা ও উৎপাদন-বিধির পরিবর্তন লক্ষ্য করা এবং সেই পরিবর্তন অনুযায়ী ক্রমিক পর্যায়ে বিধিব্যবস্থাকে সাজানও পুরা-বিদ্যার পক্ষে সম্ভব। প্রস্তর, ব্রোঞ্জ ও লৌহ যুগে ভাগ করা হয়েছে প্রাগিতি-হাসকে। এই যুগ-বিভাগ খামখেয়াল নয়। কাটার জন্য যে হাতিয়ারটি ব্যবহার করা হত, প্রধানতঃ তার ভিত্তিতে এই যুগ-বিভাগ করা হয়েছে। বিশেষতঃ কুড়াল অনুসারে। কেন না কুড়াল ছিল উৎপাদনের প্রধান হাতিয়ার। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী উৎপাদনের হাতিয়ার সামাজিক সংগঠন এবং আর্থিক

বিধিব্যবস্থা প্রভাবিত করে। তাছাড়া এই পাথুরে কুঠার অনায়াসে বাড়িতে তৈরি করে নেওয়া যেত। অর্থাৎ উৎপাদনের প্রধানতম হাতিয়ার সমাজের সকলের আয়ত্তাধীন ছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ শিকারী বা কৃষকগোষ্ঠীর যে কোন লোক এই হাতিয়ার ব্যবহার ও তৈরি করতে পারত। তাতে বোঝা যায়, গোষ্ঠীর বাইরে কোন ব্যবসায়িক লেনদেন চালু ছিল না। শ্রম সম্পর্কে যতটা দক্ষতা প্রয়োজন তার সবটা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যেত। এর পর এল ব্রোঞ্জের কুড়াল। এটি শুধু উন্নত অস্ত্র নয়। এর পেছনে কিছুটা জটিল আর্থিক ও সামাজিক বিধি-বিধানের ইঙ্গিত আছে। ব্রোঞ্জ ঢালাইর কাজটি জটিল। খাদ্য উৎপাদন করে কিংবা সন্তান লালনপালন করে সকলের পক্ষে অবসর সময় এই কাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন। অন্যের দ্বারা উৎপন্ন খাদ্যের বাড়তি অংশের উপর নির্ভর না করলে ধাতুনিষ্কাশকদের চলে না। তাছাড়া ব্রোঞ্জ যে যে ধাতুর মিশ্রণে তৈরী হয়, সেই তামা ও টিন দুষ্প্রাপ্য। এই দুটি ধাতু কদাচিৎ এক জায়গায় পাওয়া যায়। প্রায় সব ক্ষেত্রে যে কোন একটি ধাতু ভিন্ন জায়গা থেকে আমদানি করতে হয়। যানবাহন ব্যবস্থা আর ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত না হলে এবং ধাতুর সঙ্গে বিনিময় করার মত বাড়তি কোন স্থানীয় দ্রব্য না থাকলে, বিদেশের সামগ্রী দেশে আমদানি করা চলে না।

বাস্তববাদী ইতিহাস যাকে সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণ বলে গণ্য করে সেই উৎপাদন বিধি, আর্থিক ব্যবস্থা আর সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তনের সঙ্গে পুরাবিদ্যার সিদ্ধান্তের মিল আছে। পুরাবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে প্রাগৈতিহাসিক মানব-সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা আর সামাজিক সংগঠনের ব্যাপক পরিবর্তনের কারণ খুঁজে বার করতে পারে। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের কারণ হিসাবে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয় তার প্রকৃতি আর প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সব পরিবর্তনের প্রকৃতি সমপর্যায়ের। মানবসমাজের উপর প্রভাবের দিক থেকে বিচার করলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটি পরিবর্তন অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের মত নাটকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনীয়।

কিন্তু প্রাগিতিহাস তো শুধু ইতিহাসকে পেছনে প্রসারিত করেনি, জীব-বৃত্তান্তকেও এগিয়ে দিয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক পুরাবিদ্যার এক পা যদি প্রাচীন ইতিহাস হয় তো অপর পা ভূবিদ্যা। প্রাগিতিহাসের উপর মানুষের ইতিহাস, প্রাণীবিদ্যা, প্রত্নপ্রাণীবিদ্যা আর ভূবিদ্যার সেতু রচিত হয়েছে। আমাদের এই পৃথিবীর ইতিহাস ভূবিদ্যায় বিধৃত। ভূতাত্ত্বিক কালের অসীম বিস্তারের মধ্যে প্রাণিকুলে যত পরিবর্তন হয়েছে তার আলোচনা করা হয়েছে প্রত্নপ্রাণীবিদ্যায় আর

তার আধুনিক যুগের কাহিনী আছে প্রাগিতিহাসে। এই দিক থেকে প্রাগিতিহাসকে অনায়াসে জীববৃত্তান্তের অনুক্রম বলা যায়। প্রাগৈতিহাসিক নৃবিদ্যা আদি মানবের জীবাশ্ম নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু নৃবিদ্যার এই বিভাগটি প্রকৃতপক্ষে প্রত্নপ্রাণীবিদ্যা আর জীববিদ্যার শাখা মাত্র। মানুষের তৈরী সামগ্রী প্রাগৈতিহাসিক পুরাবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। মানবসংস্কৃতির ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাসও এই বিদ্যায় আলোচনা করা হয়। নতুন প্রজাতির উদ্ভব প্রত্নপ্রাণীবিদ্যার পক্ষে যতটা গুরুত্বসম্পন্ন, সংস্কৃতির পরিবর্তনও পুরাবিদ্যার পক্ষে ততটা গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই ঐতিহাসিকের প্রগতি আর প্রাণীবিদ্যাবিদের অভিব্যক্তি তুল্যমূল্যের।

প্রস্তর যুগের মানুষ

পৃথিবীর পঙ্ক স্তরে, নদীগর্ভের বালুকা স্তরে, কাঁকড়ের পললে, গুহাকন্দরে, জলাভূমিতে কিংবা সমাধিস্থানে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বাস্তব সংস্কৃতির স্মারক যত হাতিয়ার পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশ পাথর দিয়ে তৈরী। হাতিয়ার তৈরি করার জন্য সেকালের মানুষ নিশ্চয় কাঠের টুকরা, হাড়, খোলক অথবা পাথর ব্যবহার করে থাকবে। কিন্তু কাঠের হাতিয়ার কালজয়ী হতে পারে না। তার বিনষ্টি অবধারিত। হাড় খোলক বা পাথর দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে। তাই পুরাবিদ্যাবিদের কোদালের মুখে কিংবা ভূবিদ্যাবিদের তল্লাসের ফলে প্রকৃতির যাদুঘরে অবিকৃত কিংবা সামান্য বিকৃত অবস্থার হাজার হাজার বছর পরেও তার সন্ধান পাওয়া যায়।

হাতিয়ার তৈরীর প্রধান উপাদান হিসাবে পাথর ব্যবহৃত হত বলে মানবজাতির প্রাগৈতিহাসিক জীবনযাত্রার এই পর্যায়কে প্রস্তর যুগ বলা হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে স্যার জন লুবক এই নামকরণ করেন। ভূবিদ্যার কালগণনার ক্ষেত্রে জীবনবিকাশের স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রাগিতিহাসের এই স্তরটি মানুষের হাতে তৈরী হাতিয়ারের প্রধানতম উপাদানের নাম অনুসারে নামাঙ্কিত হয়েছে। যে হাতিয়ারটি সেকালের মানুষের উৎপাদনের প্রধানতম হাতিয়ার ছিল, সেই কুঠার যে উপাদানে তৈরী, তার নামানুসারে এই যুগের নামাকরণ হয়েছে। এমন কি একালের মানুষের পরিচয় পর্যন্ত তার সৃষ্টি আশ্রয়ী। প্রাগিতিহাসের এই কালের মানুষও তার সৃষ্টির পরিচয় অনুযায়ী প্রস্তর যুগের মানুষ নামে পরিচিত।

প্রাগিতিহাসের এই পর্যায়ে মানুষের কারিগরী বিদ্যার যত স্মারকচিহ্ন পাওয়া গেছে, তার নির্মাণ-কৌশলের মধ্যে সুস্পষ্ট তারতম্য আছে। কোনটি প্রস্তর খণ্ড ভেঙে তৈরি করা হয়েছে, কোনটি বা পালিশ করে। কোনটির অগ্রভাগ ছুঁচলো ধরনের হলেও ভোঁতা, আবার কোনটি সত্যই ছুঁচলো। কোন হাতিয়ার অপেক্ষাকৃত বড় প্রস্তর খণ্ড দিয়ে তৈরী, আবার কোনটি পাথরের পাতলা চওড়া ফালি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

এই কারিগরী কৌশলের তারতম্য আর তার মধ্য দিয়ে জীবনসংগ্রামের প্রচলিত বিধির যতটা আভাস পাওয়া যায়, তার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তর যুগকে আবার পুরোপলীয় এবং নবোপলীয় এই দুইটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। পুরোপলীয় যুগের অর্থ—খণ্ডিত পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরীর পর্যায়। আর নবোপলীয় যুগের অর্থ-পালিশকরা পাথরের হাতিয়ারের পর্যায়। এই দুটি যুগের মাঝখানে আবার মধ্যপলীয় যুগ নামে তৃতীয় একটি পর্যায়ের কল্পনা করা হয়ে থাকে। পুরোপলীয় পর্যায় আর নবোপলীয় পর্যায়ের যেমন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে, তাদের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যাপকতার মধ্যে যেমন সার্বজনীনত্ব আছে, এই মধ্যপ্রস্তর যুগটির তা নেই। কারিগরী কৌশলের দিক থেকে এই কালের হাতিয়ারের মধ্যে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে সত্য, কিন্তু মধ্যপলীয় যুগের কলা-কৌশল নামে আখ্যাত হাতিয়ার নির্মাণের পদ্ধতি দুনিয়ার কয়েকটি মাত্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই মানবজাতির অগ্রগতির বিচার করতে বসে এই হাতিয়ার নির্মাণের রীতিকে আলাদা কোন যুগের মর্যাদা দিতে অনেকে কুণ্ঠা বোধ করেন। বরং মধ্যপলীয় পর্যায়কে তারা পুরোপলীয় যুগের অনুক্রম বলে গ্রহণ করতে চান।

।। পুরোপলীয় যুগ ।।

হাতিয়ার ব্যবহারকারী স্তন্যপায়ী হিসাবে যেদিন মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয়, সুদূর অতীতের সেই দিন থেকে আরম্ভ করে খৃস্টপূর্ব ৮০০০ বছর অবধি সুদীর্ঘ কালব্যাপী মানুষের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পর্যায়টি পুরোপলীয় যুগ নামে চিহ্নিত। প্রাচীনতম হাতিয়ার পাওয়া গেছে প্লিস্টোসিন কল্পের আদি পর্যায়ের পঙ্ক স্তরে। এমন কি তারও আগে—মাইওসিন কল্পের পললস্তরে। তার মানে সেগুলি কয়েক লাখ বছর আগেকার কালের। তবে পুরোপলীয় যুগের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং জনসংখ্যার পরিবর্তন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী তথ্য জানা গেছে দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপ থেকে। প্রাগৈতিহাসিক মানবগোষ্ঠীর এত ভীড় অন্যত্র কোথাও হয়েছে বলে জানা যায়নি। এশিয়া বা আফ্রিকায় কিংবা সমুদ্রের জলের তলায় আরও বেশী তথ্য থাকতে পারে। কিন্তু সেই গুপ্তধন যদি আদৌ থেকে থাকে, তাহলেও অদ্যাপি গোপন আছে। তাছাড়া ইউরোপের স্মারকচিহ্ন সম্পর্কে যত গবেষণা হয়েছে অপর কোন স্থানের তথ্য সম্পর্কে তত আলোচনা হয়নি। যাই হোক, ইউরোপে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পুরোপলীয় সংস্কৃতিকে আটটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। তার চারটিকে বলা হয় পুরোপলীয় যুগের

পূর্ব ভাগ ; আর চারটিকে বলা হয় পুরোপলীয় যুগের উত্তর ভাগ। স্তর আটটির নাম :

পুরোপলীয় পর্যায়ের পূর্ব ভাগ
(১) প্রাক্ কেলীয় স্তর—প্রাচীনতম স্তর
(২) কেলীয় স্তর
(৩) আকুলিয় স্তর
(৪) মুষ্টিরিয় স্তর

পুরোপলীয় পর্যায়ের উত্তর ভাগ
(৫) অরিনেশীয় স্তর
(৬) সোলুত্রিয় স্তর
(৭) মাগদালেনীয় স্তর
(৮) আজিলিয়-তার্দোনেশীয় স্তর—সর্বাধুনিক

পণ্ডিতেরা মনে করেন, ইউরোপীয় তথ্যের ভিত্তিতে এই স্তর-বিভাগ করা হলেও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে সংগৃহীত তথ্যাদিকেও এই সাংস্কৃতিক স্তর-বিন্যাসের পরিকল্পনার সঙ্গে মোটামুটি খাপ খাওয়ান সম্ভব। প্রস্তর যুগের মানুষ সম্পর্কে আলোচনায় এই স্তর-বিন্যাসের ক্রম অনুসরণ করা হবে।

পাথুরে হাতিয়ার তৈরি করার বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করা ছাড়া আগুন জ্বালাবার বিদ্যা আয়ত্ত করা পুরোপলীয় মানুষের অন্যতম কৃতিত্ব। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বশ্যতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাগিতিহাসের মানুষ যত কৃতিত্ব দেখিয়েছে, এই সাফল্য সম্ভবতঃ তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আগুনের তাতে শরীর গরম রেখে মেরুমণ্ডলে বসবাসের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হল। তাছাড়া রাতের অন্ধকারেও আগুনের শিখায় দৃষ্টিশক্তি পেল মানুষ। তাতে অন্ধকার গিরিকন্দরও বাসোপযোগী হল। তারপর রান্না করা জিনিস কাঁচা খাদ্যের চাইতে সহজ পাচ্য। এই বিদ্যা আয়ত্ত করার পর মানুষের গতিবিধি আর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রইল না। সূর্যের আলোর উপর একান্ত নির্ভরতা থেকেও সে মুক্তি পেল।

আগুন জ্বালাবার বিদ্যা আয়ত্ত করে মানুষ নিজের অগোচরে এক মহাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার সূচনা করল। প্রকৃতির এক সন্তান এই সর্বপ্রথম প্রকৃতির এক মহাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করল। এই ক্ষমতা ক্ষমতাবানের উপরেও নিশ্চয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। অগ্নিকুণ্ডে শুকনা ডাল আহুতি দিলে শিখা লক লক করে ওঠে, আর সেই ডাল পুড়ে ভস্ম এবং ধোঁয়ায় পরিণত হয়। এই বিস্ময়কর কাণ্ড দেখে আদিম মানুষের মস্তিষ্ক নিশ্চয় উদ্দীপ্ত হয়েছিল। তাছাড়া, আগুন প্রজ্বলিত রাখার কায়দা কিংবা তাকে অন্যত্র নিয়ে যাবার কৌশল অথবা নিজের প্রয়োজনে লাগাবার কায়দা যখন মানুষ আয়ত্ত করল, তখন তার চরিত্রে ও আচরণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

সূচিত হল। এই বিস্তার মধ্য দিয়ে মানুষ তার মানবীয়তা প্রতিষ্ঠা করছিল। নিজের হাতে নিজেকে গড়ে তুলছিল।

স্বভাবতঃ প্রশ্ন ওঠে, মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখছিল কি করে? বজ্রপাতের ফলে কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে উৎপন্ন অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত রাখতে শিখে হয়ত আগুনকে আয়ত্তাধীনে আনা হয়েছে। এজন্য কিছুটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োজন। এই বুদ্ধি এসেছে পর্যবেক্ষণ আর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। দেখে দেখে শিখতে হয়েছে আগুনের গুণ কি—কি খাবেন অগ্নিদেব। আবার আগুন জ্বালিয়ে রাখতে গিয়ে মানুষ তার নিজের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করছিল। প্রাচীন মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে পবিত্র অগ্নিশিখা অনির্বাণ রাখার একটি রীতি দেখা যায়। মানুষ যখন ইচ্ছামত আগুন জ্বালাতে শেখেনি, এই রীতি হয়ত সেই কালের স্মারক।

প্রাগিতিহাসের ঠিক কোন্ সময় এই আবিষ্কার হয়েছিল সঠিকভাবে জানা যায়নি। চকমকি পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করে, কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি করে, কিংবা বাঁশের নলের মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি করে আগুন জ্বালাবার রীতি অসভ্যদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তুষার যুগের ইউরোপে প্রথম রীতিটি অনুসৃত হত। দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ঘর্ষণের মধ্য দিয়ে বিবিধ পদ্ধতিতে আগুন জ্বালাবার রীতি দেখে পণ্ডিতেরা মনে করেন ইচ্ছামত আগুন জ্বালাবারবিদ্যা মানব ইতিহাসের খানিকটা বিলম্বিত পর্যায়ে আয়ত্ত করা হয়েছে। এর আগেই হয়ত মানুষ দুনিয়ার নানা স্থানে বিশ্লিষ্ট দলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

যাই হোক, আবিষ্কারটির তাৎপর্য অনন্যসাধারণ। আগুন জ্বালাবার বিদ্যা আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সেই আগুন জ্বালিয়ে রাখার কৌশলও মানুষ আয়ত্ত করল। তার মানে উত্তাপ সৃষ্টির বিস্ময়কর পদ্ধতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান তার আয়ত্তাধীন হল। তখন সে সচেতন স্রষ্টা। দুই খণ্ড পাথর বা দুই টুকরা কাঠে ঘষাঘষি করে আগুন জ্বালান অর্থ, কিছু না থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি করা। এই কৌশল যখন বিশেষভাবে পরিচিত ছিল না, আগুন জ্বালান তখন নিশ্চয়ই খুব উৎসাহের কাজ ছিল। আমি স্রষ্টা—এই বাস্তব অনুভূতি বড় কম উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তবে পাথর বা কাঠের টুকরা থেকে আগুন জ্বালাতে শেখার আগে হাতিয়ার তৈরীর মধ্য দিয়ে মানুষ স্রষ্টা হয়ে বসেছে। হাতিয়ার তৈরি করতে গিয়ে প্রকৃতির উপর নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক বস্তুকে সে নিজের অভীষ্ট বস্তুতে পরিণত করছিল।

প্লিস্টোসিন কল্পের পূর্ব ভাগের কিংবা তারও আগেকার মানুষ সম্পর্কে এইটুকু মাত্র সুনিশ্চিত জানা গেছে। কি খেয়ে তারা জীবনধারণ করত এখনও তা অপরিজ্ঞাত। মনে করা হয়, বন্য জন্তু শিকার করে কিংবা মাছ, পাখী অথবা

গিরিগিটি ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। এছাড়া ফলমূল, শামুক বা ডিমও সংগ্রহ করেছে বলে অনুমান করা হয়। আশ্রয়ের জন্য কিছু মানুষ গুহার মধ্যে আত্মগোপন করত, কিংবা ডালপালা দিয়ে কুঁড়ে তৈরি করে তার তলায় মাথা গুঁজত। দেহ আচ্ছাদনের জন্য চামড়া ব্যবহৃত হত বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। কিন্তু কথাটা খুব জোর দিয়ে বলা হয় না। শিকারে সাফল্য অর্জনও অত সহজ ছিল না। তার আগে শিকারের আচার-আচরণ দীর্ঘদিন লক্ষ্য করতে হয়েছে। আর এই পর্যবেক্ষণের ফলাফল দলের মধ্যে প্রচার করতে হয়েছে। খাদ্য সম্পর্কে বাছ-বিচারের জন্যও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়েছে। কোন্ জিনিস পুষ্টিকর আর কোন্‌টি বিষাক্ত এই জ্ঞান সে যুগে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। এই অভিজ্ঞতা কালক্রমে গোষ্ঠীর সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে স্থান লাভ করেছে।

কোন্ ঋতুতে কোন্ জন্তু শিকার করা যায়, আবার কখন কোন্ ফল অথবা ডিমের আইয়াম এ জিনিস প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখতে হয়েছে। এই ব্যাপারে পারদর্শিতা অর্জন করতে হলে আকাশের রহস্যের পাঠোদ্ধার করা প্রয়োজন। লক্ষ্য করতে হবে চন্দ্রোদয় বা নক্ষত্রের গতিবিধি। আবার এই সব জিনিসের সঙ্গে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীজগতের সম্পর্ক বিচার করে দেখতে হবে। তাছাড়া কোন্ পাথরে ভাল হাতিয়ার তৈরী হবে, আর কোথায় সেই পাথর পাওয়া যাবে এই তথ্যও অভিজ্ঞতা ছাড়া জানার উপায় ছিল না। তাহলে মোটামুটি এই দাঁড়ায়, জীবনসংগ্রামে সফলতা অর্জনের জন্য প্রাচীনতম মানুষকেও জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, জীববিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যা সম্পর্কে প্রভূত প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়েছে। আর এই প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়েছে।

সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা দরকার, জীবনসংগ্রামের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয়েছে। এক সাথে এক জোট হয়ে কাজ করতে শিখতে হয়েছে। মানুষের মত এত দুর্বল, এমন নিকৃষ্ট দৈহিক গুণসম্পন্ন প্রাণীর পক্ষে একলা কোন বিরাটকায় অথবা হিংস্র জন্তু শিকার করা সম্ভব ছিল না। অথচ শিকারের মাংস তাদের প্রাণধারণের অন্যতম খাদ্য। কাজেই বাধ্য হয়ে দলবদ্ধ সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলতে হয়েছে। পরিবার বলতে ইউরোপখণ্ডে যা বোঝায়, তা থেকে এই অপরিজ্ঞাত সংগঠনের চেহারা আলাদা।

এই তো প্রাগৈতিহাসিক মানবকাহিনীর তিন-চতুর্থাংশের সারাংশ। কম পক্ষে লাখ দুই বছরের কাহিনী। এই যৎসামান্য পরিচয়ের অতিরিক্ত বিশেষ কিছু জানা যায়নি। সেকালের মানুষের চেহারা সম্পর্কে আমাদের ধারণা যেমন অনুমান সম্বল, তেমন তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কেও অনুমানই আমাদের প্রধান নির্ভর। হাজার

পঞ্চাশেক বছর আগে এলে এই ভাসাভাসা কাহিনীর সঙ্গে খানিকটা বিস্তারিত বর্ণনা যোগ করা যেতে পারে। তবে একটি বিষয়ে খানিকটা নিশ্চিত ধারণা গঠন করা সম্ভব। সে হচ্ছে মানুষের হাতের কাজ। তার হাতিয়ার। ক্রমোন্নতির একটি সুস্পষ্ট ধারা পাথুরে হাতিয়ারের নির্মাণ-কৌশলের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, বিভিন্ন স্থানে বিবিধ পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে।

হাতিয়ার তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের মানুষকে বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে হয়েছে। হাতিয়ার তৈরীর পক্ষে কোন্ পাথর উপযোগী, কোথায় তা পাওয়া যায়, এই তথ্য শুধু একজনের জানা থাকলে চলবে না। সকলকে জানাতে হবে সেই তথ্য। তারপর হাতিয়ার তৈরীর প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন না করে উন্নততর হাতিয়ার তৈরি করা নিশ্চয়ই সম্ভব হয়নি। যে পাথর সহজলভ্য তার উপর হাতেখড়ি দিয়ে তার উপযোগিতা পরখ করে দেখতে হয়েছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্যসাধক সেরা পাথর বেছে বার করতে হয়েছে। হাত পাকাতে হয়েছে ক্রমান্বয়ে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের কল্পনা করা যায় না।

পুরোপলীয় যুগের হাতিয়ার থেকে মনে হয় যেন প্রথম দিকের হাতিয়ার বিবিধার্থসাধক ছিল। একটি হাতিয়ার দিয়ে বিবিধ প্রয়োজন সিদ্ধ করা হত। ক্রমিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষকে শিখতে হয়েছে কোন্ পাথর হাতিয়ার তৈরীর পক্ষে উপযোগী, আর কি ভাবে সেই পাথর থেকে হাতিয়ার তৈরি করতে হবে। পাথর ভাঙার কাজ শিখতে হয়েছে। চকমকি পাথর বেশ শক্ত। প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী করে সেই পাথর ভাঙা বড় সহজ কাজ নয়। যাই হোক, বিবিধার্থসাধক হাতিয়ার থেকে আরম্ভ করে বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক অনেক রকম উন্নত পর্যায়ের হাতিয়ার পুরোপলীয় পর্যায়ে দেখা যায়। এই হাতিয়ারের মধ্যে কারিগরী কৌশলের ক্রমোন্নতির স্বাক্ষর আছে। উন্নতির প্রতিটি স্তর আবার সুনির্দিষ্ট শিল্পরীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কলাকৌশল পুরোপলীয় মানব-সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির বিশিষ্ট লক্ষণ।

পাথুরে হাতিয়ার তৈরি করতে গিয়ে পুরোপলীয় মানুষ সাধারণতঃ চারটি মূল পদ্ধতি অনুসরণ করেছে :

১। ক্ষয়ে-যাওয়া গোলাকার ছোট পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরীর পদ্ধতি।

২। ছুমুখো হাতিয়ার বা হাত-কুঠার তৈরীর পদ্ধতি।

৩। পাথরের মিহি চওড়া টুকরা দিয়ে হাতিয়ার তৈরীর পদ্ধতি।

৪। ব্লেডের মত পাতলা ফালি দিয়ে হাতিয়ার তৈরীর পদ্ধতি।

তবে এর কোন রীতি বিশুদ্ধভাবে কোথাও দেখা যায়নি। সম্ভবতঃ হাতিয়ার তৈরীর উন্নততর পদ্ধতি কোন অঞ্চলে প্রবর্তিত হবার পরেও সাবেক কৌশল যতদিন কার্যসাধক হয়েছে ততদিন চালু রয়েছে। যাই হোক, ছেদন করার উদ্দেশ্যে এক প্রান্ত ধারাল গোলাকার প্রস্তর খণ্ড দিয়ে হাতিয়ার তৈরী প্রায় সর্বত্র আরম্ভ হয়েছে। এইখান থেকে শুরু করার একটা প্রবণতা সর্বত্র দেখা যায়। আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং দূর প্রাচ্য সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য।

গোলাকার প্রস্তর খণ্ড দিয়ে হাতিয়ার তৈরীর প্রচলন দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় গোটা পুরোপলীয় যুগে ছিল। অন্যত্র তার পরবর্তীকালের পঙ্কস্তরে হাত কুঠারের খোঁজ পাওয়া গেছে। পুরোপলীয় যুগের পূর্ব ভাগের হাতিয়ারের মধ্যে এই হাত কুঠার সব চেয়ে বিশিষ্টতামণ্ডিত। যে কোন এক খণ্ড প্রস্তরের উভয় দিক থেকে পাতলা টুকরা বার করে মূল প্রস্তর খণ্ডকে যথাসম্ভব ছুঁচলো করে কুঠারের উপযোগী করে নেওয়া হত। পাথরের কুঠার তৈরীর জন্য বিভিন্ন স্থানে বিবিধ কৌশল প্রয়োগ করা হত। কোন কোন স্থানে মূল প্রস্তর খণ্ডের বদলে তার মিহি চওড়া টুকরা দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য টুকরা দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করা হয়েছে। আর কোন কোন অঞ্চলে বরাবর মূল প্রস্তর খণ্ড দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করা হয়েছে।

দুটি বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী এই দুটি বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে গেছে। মিহি পাতলা টুকরা দিয়ে হাতিয়ার তৈরীর রীতি মোটামুটি পুরান পৃথিবীর উত্তরাংশে অর্থাৎ আলপ্‌স, বলকান্‌স, ককেসাস, হিন্দুকুশ আর হিমালয় পর্বতমালার উত্তরে নিবদ্ধ ছিল। যেসব জীবাশ্মের সঙ্গে এই ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গেছে, তারা আধুনিক মানুষের বংশপতি নয়। বরং তাদের ধারা আমাদের ধারা থেকে আলাদা বলে পণ্ডিতদের অনুমান। আর মূল প্রস্তর খণ্ড দিয়ে হাতিয়ার তৈরীর সন্ধান পাওয়া গেছে দক্ষিণভারতে, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে, গোটা আফ্রিকায় এবং স্পেন, ফ্রান্স আর ইংলণ্ডে। এই সব কারিগর আধুনিক মানুষের বংশপতিদের দলের। তবে এই সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তুষার যুগের আবহাওয়ায় উভয় পদ্ধতির মিলন হয়। উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণের আভাসও পাওয়া যায়।

।। পুরোপলীয় সংস্কৃতির স্তর ঃ পূর্বভাগ ঃ ।।

প্রাচীনতম হাতিয়ারের গড়ন এমন যে তাকে হাতিয়ার বলতে কুণ্ঠা হয়। প্রাকৃতিক কারণে ভেঙে যাওয়া কিংবা উত্তাপ কি কুয়াশায় ফেটে যাওয়া প্রস্তর খণ্ডের সঙ্গে তাদের পার্থক্য বোঝা শক্ত। বহুদিন ধরে সন্দেহ করা হয়েছে,

সত্যই এগুলি কৃত্রিম কি না। যাই হোক, শেষ অবধি পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এর কিছু প্রস্তর খণ্ড বুদ্ধি-প্রয়োগে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভাঙা হয়েছিল। মনে হয়, হাজার হাজার বছর ধরে কোন মানবাকার প্রাণী হয়ত প্রস্তর খণ্ডের প্রান্ত খানিকটা সরু করে প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী করার চেষ্টা করেছে। হয়ত কাঠ কাটা তার উদ্দেশ্য ছিল। এই সব হাতিয়ারকে বলা হয় ইওলিথ। গ্রীক ইওস্ শব্দের অর্থ উষা আর লিথোস্ শব্দের অর্থ পাথর। তার মানে মানবজাতির প্রথম হাতিয়ার। পুরোপলীয় যুগের স্তর বিচারে ইওলিথ প্রাক্-কেলীয় স্তরের হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের কর্মকার যে কোন্ জাতের মানুষ, তার সঠিক প্রমাণ আজও অপরিজ্ঞাত। তবে সে মানুষ ছিল খাদ্য-সন্ধানী যাযাবর অসভ্য। বুনো জন্তু শিকার আর পাখী শিকার করে, মাছ ধরে, এবং বুনো ফলমূল সংগ্রহ করে সে পেটের চাহিদা পূরণ করত। তুষার যুগের কঠোরতম আবহাওয়া আর তার ব্যাপ্তিকালের কথা স্মরণ করলে খানিকটা আন্দাজ করা যায় যে খাদ্য সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে কত কষ্টসাধ্য ছিল। এই সঙ্গে এও স্মরণ রাখতে হবে যে পিকিঙের মানুষের সঙ্গে পাথুরে হাতিয়ার পাওয়া গেছে আর পাওয়া গেছে আগুনে পোড়ান হাড়ের টুকরা।

পরবর্তীকালের পঙ্কস্তরে আর এক ধাঁচের বড় বড় আনাড়ী হাতের তৈরী হাতিয়ার পাওয়া গেছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে কেলীয় হাতিয়ার। ফ্রান্সের যে জায়গায় এই হাতিয়ার সব চেয়ে বেশী পাওয়া গেছে, সেই জায়গার নাম অনুসারে এই হাতিয়ারের নামকরণ করা হয়েছে। এই স্তরে হাতিয়ার তৈরীর কৌশল খানিকটা উন্নত হয়েছে। নতুন হাতিয়ারও তৈরি করা হয়েছে দু-চারটে। হাত-কুঠার এই স্তরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। গোলাকার প্রস্তর খণ্ডের এক প্রান্তের উভয় দিক থেকে পাথরের ফালি বার করে প্রান্তটি ছুঁচলো করা হত আর অপর প্রান্ত গোলাকার থাকত। কোন হাতল ছিল না হাত-কুঠারের। হাতে ধরে ব্যবহার করা হত। শিকড় তোলার কাজ এই হাতিয়ার দিয়ে করা যেত বলে মনে হয়।

পরবর্তী পঙ্কস্তরে আরও বড় কিন্তু শিল্প নৈপুণ্যে উন্নততর আর এক ধরনের হাতিয়ার দেখা গেছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে আকুলিয় হাতিয়ার। যেসব হাতিয়ার এই স্তরে পাওয়া গেছে, তার আকৃতি যেমন উন্নত তেমনি তার মধ্যে বিচিত্রতাও লক্ষ্য করা যায়। প্রাক্-কেলীয় হাতিয়ারের তুলনায় আকুলিয় হাতিয়ার মানুষের বুদ্ধি ও কৌশলের উন্নতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। গুহা-কন্দরে এই সব হাতিয়ার পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে সে কালের নদীর কাঁকড়ের

স্তরে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই হাতিয়ার ব্যবহারকারী মানুষ সম্ভবতঃ তিন লাখ বছর থেকে চার লাখ বছর আগে ইউরোপ খণ্ডের উন্মুক্ত স্থানে বাস করত। হয়ত এই মানবকার প্রাণী বনাকীর্ণ নদীর পারে ডালপালা দিয়ে আশ্রয় নির্মাণ করে বাস করত; আর কোন হরিণ জল খেতে এলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। গাছপালার ফলমূলও তাদের খাদ্য ছিল। তবু তাদের চেহারা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। কিছুই সঠিক জানি না বলতে গেলে। হাইডেলবার্গের মানুষ কিংবা পিলটডাউনের মানুষ এই কেলীয় বা আকুলিয় হাতিয়ারের নির্মাতা কি না আমরা জানি না। দুটি মানবগোষ্ঠীর চেহারার গড়নে পার্থক্য ছিল অথচ হাতিয়ারগুলি এক ধাঁচের। যাই হোক, এই কেলীয় আর আকুলিয় হাতিয়ার তিন থেকে চার লাখ বছর আগেকার মানবজীবনের একমাত্র সাক্ষী। যুগের পর যুগ এই মানুষ বেঁচে রয়েছে। এক ধাঁচের হাতিয়ার সম্বল করে যুগের পর যুগ তারা পরিবর্তনহীন জীবনযাপন করেছে।

চতুর্থ তুষার যুগের অপর নাম বলগা হরিণের যুগ। কেন না উত্তরের নাতি-শীতোষ্ণ মণ্ডলে এই সময়ে আধ-মেরুমণ্ডলের জীবজন্তু দেখা যায়। এই সময়ের মানব-সংস্কৃতিকে বলা হয় মুস্টিরিয় স্তর। তবে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কঠোর-তর ছিল বলে আকুলিয় স্তরের তুলনায় তাদের শিল্প-নৈপুণ্যের উন্নতি বিম্বিত হয়। দক্ষিণ ইউরোপের গুহাকন্দরে তাদের প্রচুর স্মারকচিহ্ন আছে। তুষার যুগের হিমশীতল আবহাওয়ায় তারা গুহাকন্দরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। মুস্টিরিয় স্তরের মানুষকে তাই গুহামানব বলা হয়। এই স্তরের প্রথম দিকের হাতিয়ারের মধ্যে উন্নতির লক্ষণ দেখা না গেলেও, পরবর্তীকালে এই স্তরের হাতিয়ারের মধ্যে অভিনবত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সম্পূর্ণ নতুন এক সংস্কৃতি দেখা দেয় মুস্টিরিয় স্তরে। আকুলিয় মানবগোষ্ঠী কোন নতুন জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে এই সংস্কৃতি সৃষ্টি করেনি। আর একটি নতুন জাতি তাদের স্থান দখল করেছিল বলে মনে হয়। এই সময়কার হাতিয়ারের সঙ্গে জীবাশ্মও পাওয়া গেছে। কাজেই হাতিয়ারের নির্মাতাদের সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই সময় আর একটি আকস্মিক ছেদ দেখা যায়। কেলীয় পদ্ধতির হাতিয়ার আকুলিয় হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তরের একটা ধারা আছে। কিন্তু আকুলিয় হাতিয়ারের ক্রমিক পরিবর্তনের কোন ধারা নেই। সেই হাতিয়ার খতম হয়ে গেলে নতুন ধরনের হাতিয়ার দেখা দিল। পুরোপলীয় যুগের পূর্বভাগের হাতিয়ারের ধরন আলাদা। তার নির্মাণ-কৌশলও স্বতন্ত্র। প্রস্তর খণ্ড নিয়ে কাজ

করার সময় টুকরাগুলি ফেলে দেওয়া হত। এইবার সব হাতিয়ার টুকরা দিয়ে তৈরী হতে থাকল। মূল খণ্ডটি ফেলে দেওয়া হত। কাজেই এই হাতিয়ারের একদিক চ্যাপটা আর অপর দিক খানিকটা গোলাকার হত। আর কোনটি আগের কালের হাতিয়ারের মত বড় হত না। তাছাড়া এই ধঁাচের হাতিয়ার যেমন চটপট তৈরি করা যায়, তেমন সংখ্যার দিক থেকেও অনেক বেশী তৈরি করা সম্ভব। হাতিয়ার নির্মাণের এই কৌশলকে বলা হয় 'ফ্লেক' শিল্প।

বল্লমের মাথায় পাথরের টুকরা লাগিয়ে একালের মানুষ তার হাতিয়ারের মারণ-ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করে। এই কারণে তারা হয়ত গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। এরা যে নবাগত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুধু এদের হাতিয়ারের ধরন যে আলাদা ছিল তা নয়, মানুষগুলির চেহারার গড়নও আলাদা ছিল। নিয়ানডারথ্যাল জাতের মানুষ এরা। পুরোপলীয় পর্যায়ের যে কোন মানব-গোষ্ঠীর চাইতে এদের খবর আমরা বেশী জানি। দুটি কারণে জিনিসটি সম্ভব হয়েছে। নিয়ানডারথ্যাল মানুষ প্রথমতঃ গুহাশ্রয়ে বাস করত; আর দ্বিতীয়তঃ তারা মৃতদের সমাধিস্থ করত।

বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে যে পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ার আগে এরা রাইন নদী থেকে পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের মূল বাসভূমির খবর অবশ্য জানা যায়নি। সম্ভবতঃ এশিয়ার মানুষ। এদের গুহাবাসের রীতি দেখে মনে হয়, যুগের আবহাওয়া নিশ্চয় ঠাণ্ডা ছিল। এদের অস্থির পাশাপাশি যেসব জীবজন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গেছে, তাতেও এই অনুমান সমর্থিত হয়। তুষার যুগের হিমশীতল আবহাওয়ার প্রকোপে পূর্ব ইউরোপ ছেড়ে এরা ফ্রান্স ও স্পেনের সহনীয় সমুদ্র সৈকতের আবহাওয়ায় চলে আসে এবং আকুলিয় হাতিয়ার নির্মাতাদের হটিয়ে দেয়। যুদ্ধ হয়েছিল কি না জানা যায়নি। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে আকুলিয় সংস্কৃতির মানুষ সম্ভবতঃ পাহাড়ে অঞ্চলে হটে যায় এবং সেইখানে তুষার যুগের প্রকোপে শেষ হয়ে যায়। যাই হোক, সঠিক তথ্য জানা যায়নি। আকুলিয় মানুষের শেষ পরিণতি বা তাদের চেহারা অথবা গড়নের কিছুই আমরা জানি না।

নিয়ানডারথ্যাল মানবগোষ্ঠী সিরিয়া আর প্যালেস্টাইনেও ছিল বলে জানা গেছে। আফ্রিকাতেও তারা গিয়ে থাকবে নিশ্চয়। কেন না মিশর আর আল-জেরিয়ায় মুস্টিরিয় হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে। সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকাতেও বহু মুস্টিরিয় হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি সম্ভবতঃ মুস্টিরিয় মানুষের হাতের কাজ।

শিল্পের দিক থেকে মুস্টিরিয় মানুষ ফ্লেক দিয়ে হাতিয়ার তৈরীর রীতির বাহক ছিল। তবে কেউ কেউ মূল প্রস্তর খণ্ড দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করার কৌশলও জানত। দৈহিক দিক থেকে তারা নিয়ানডারথ্যাল জাতের মানুষ। অবলুপ্ত হয়ে গেছে জাতটি। ঋজু পায়ে বেঁটে মোটা দেহভার বয়ে এলোমেলোভাবে চলত। মাথা খাড়া করার সাধ্য ছিল না। মুষ্টিরিয় মানুষের চোয়ালে থুতনি ছিল না। ভুরুর মোটা হাড় আর গড়ানে ঢালু কপাল তাদের মুখে একটা পাশবভাব এনে দিত। সবাই মিলে এক সাথে শিকারের ব্যবস্থা করার জন্য যেটুকু কথা বলা দরকার সেটুকু কথা বলার ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু জিহ্বার পেশীর লক্ষণ থেকে বিচার করলে মনে হয় যেন থেমে থেমে অস্পষ্টভাবে কথা বলত।

অর্থনৈতিক দিক থেকে মুস্টিরিয়রা শিকারজীবী মানুষ ছিল। মেরু মণ্ডলের বিশালকায় লোমশ হাতি, লোমশ গণ্ডারজাতীয় জন্তু ফাঁদে ফেলার কৌশল তারা আয়ত্ত করেছিল। গুহার সম্মুখে টেনে এনে এই সব শিকার কাটা হত। একলা একজনের পক্ষে কিংবা পরিবারগতভাবে এই কাজ করা সম্ভব নয়। বৃহৎ কোন দল যদি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সামাজিক ভিত্তিতে সহযোগিতা করতে সম্মত না হয়, তাহলে লোমশ হাতির মত বিরাট জন্তু শিকার করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বলগা হরিণ, বুনো ঘোড়া আর বাইসনের অস্থিও পাওয়া গেছে নিয়ানডারথ্যাল মানুষের জীবাশ্মের পাশাপাশি। আগুন জেলে তার উত্তাপে রান্না করার পদ্ধতি এরা জানত। পাথরের করাতও ব্যবহার করত মাংসের জোড়া কাটতে; আর পাথুরে ছোরা ব্যবহার করত হাড় থেকে মাংস ছাড়াতে। হাড়ের হাতিয়ার, এমন কি চামড়া সেলাই করার স্ুঁচ পর্যন্ত এরা অবিষ্কার করেছিল।

বহু হাজার বছর এই মানবগোষ্ঠী ইউরোপ খণ্ডে বাস করেছে। কিন্তু যেই তুষার যুগের আবহাওয়া কেটে উষ্ণ আবহাওয়া দেখা দেয়, আর নিয়ানডারথ্যাল মানুষের হদিস পাওয়া যায় না। ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা আর পশ্চিম এশিয়ায় তখন সুনিশ্চিতভাবে আধুনিক মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। মুস্টিরিয় হাতিয়ারের পর আর নিয়ানডারথ্যাল মানুষের খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালের কঙ্কালের সঙ্গে আধুনিক মানুষের কঙ্কালের সামান্য খুঁটিনাটি পার্থক্য ছাড়া বিশেষ কোন তারতম্য নেই। অনায়াসে তাদের আধুনিক মানুষের দলে ফেলা যায়।

।। উত্তরভাগের সাংস্কৃতিক স্তর ।।

মুস্টিরিয় সংস্কৃতির পরবর্তীকালের পঙ্কস্তরে নতুন এক শিল্পরীতির স্বাক্ষর পাওয়া যায়। আগেকার কারিগরী কৌশলের তুলনায় এই শিল্পকৌশল ভিন্ন

ধরনের। এইখান থেকে পুরোপলীয় যুগের উত্তর ভাগ শুরু হয়। পূর্বভাগ শেষ হয়ে যায় মুস্টিরিয় সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে। দুটি পর্যায়ের কালগত ব্যবধান বেশ কয়েক হাজার বছর। তুষার যুগের আবহাওয়া এই সময় খানিকটা উন্নত হয়। উষ্ণতার আমেজ ক্রমান্বয় ফিরে আসে। কালগণনায় এই উত্তর ভাগ সমগ্র পুরোপলীয় যুগের দশ ভাগের এক ভাগ সময় মাত্র। এই অল্পকালের মধ্যে মানবজাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বহু বিচিত্র সম্পদ সংযোজিত হয়েছে।

আগের কালে পাথরের পাতলা চওড়া টুকরা অথবা ফ্লেক দিয়ে হাতিয়ার তৈরী হত। এই পর্যায়ে পাথরের পাতলা ফালির ব্যবহার আরম্ভ হল। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক বহুবিধ হাতিয়ার তৈরী হতে থাকল। হাতলওয়ালা পাথুরে হাতিয়ার, হারপুন, বর্শা নিক্ষেপক, চামড়ার পরিধেয়, সুঁচ-সুতো, মাছধরার সরঞ্জাম প্রভৃতি বহুবিধ জিনিস এই পর্যায়ে আবিষ্কৃত হয়। পাথুরে হাতিয়ার ছাড়া হাড়, প্রদন্ত আর হরিণের শিঙেরও ব্যাপক প্রচলন হয়। হাতিয়ার তৈরীর হাতিয়ার তৈরি করতেও শিখেছিল এই পর্যায়ের মানুষ। আগের কালের মানুষ পাথরের উপর যেমন সুনিপুণ কাজ করতে পারত, একালের মানুষও হাড় বা প্রদন্তের উপর তেমন কাজ করতে শিখেছিল। বর্শা নিক্ষেপক আবিষ্কার করে অস্ত্রক্ষেপণের যান্ত্রিক কৌশল এরা আয়ত্ত করে। ললিতকলার চর্চাও শুরু হয়। চিত্রাঙ্কণ, মূর্তি-নির্মাণ আর স্থাপত্যবিদ্যার সূচনা হয়। সঙ্গীতচর্চা, মুখোস ব্যবহার এবং উৎসব-অনুষ্ঠানেরও সূত্রপাত হয়। মানুষের সমাজব্যবস্থাও এই পর্যায়ে জটিলতর সংগঠনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়েই প্রাচীনতম মানবগোষ্ঠী অবলুপ্ত হয়ে আধুনিক মানুষের আবির্ভাব হয়।

প্রতিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের অনেক বেশী কৌশল এই পর্যায়ের মানুষ আয়ত্ত করেছিল। নতুন আবিষ্কারের প্রাচুর্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, একালের মানুষ শুধু তার কারিগরী নৈপুণ্যের উৎকর্ষসাধন করেনি, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের ব্যাপকতর প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত করে তার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। জনসংখ্যাও এই সময় বেড়েছিল। আগের কালের মানুষের যত জীবাশ্ম মোট পাওয়া গেছে, একমাত্র ফ্রান্সেই তার চাইতে অনেক বেশী একালের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। অথচ কালগণনায় এই পর্যায় আগেকার যুগের বিশ ভাগের এক ভাগও নয়। তবে পুরোপলীয় যুগের জীবাশ্মের সংখ্যা এই ফ্রান্সেই আবার নবোপলীয় যুগের জীবাশ্মের শত ভাগের এক ভাগও নয়। অথচ তার কৃষ্টিকাল অরিনেশীয় আর মাগদালেনীয় কৃষ্টিকালের পঞ্চমাংশেরও কম।

একালের মানুষের জীবাশ্মের মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য আছে সত্য। তবু

মোটামুটিভাবে তাদের সকলকে আধুনিক মানুষের পর্যায়ে ফেলা যায়। আজকের মানুষের তুলনায় তাদের মুখাবয়ব আদিম ধরনের ছিল। মুখের চোয়াল আরও বড় ছিল। ভুরুর হাড় ছিল আরও উঁচু। নিয়ানডারথ্যাল মানুষের মত অত উঁচু নয় যদিও। গ্রীবা তখনও আজকের মত এমন সুস্পষ্ট বা সুচিহ্নিত হয়নি। মাথার গড়নও ছিল লম্বাটে। তবু সকলের পায়ের হাড় তখন সোজা হয়ে গেছে। মাথার আয়তনও আজকের মানুষের মত হয়েছে। একালের মানুষের মধ্যে প্রকারণ বৈচিত্র্য দেখে বোঝা যায়, অভিব্যক্তির অগ্রগতি বেশ দ্রুত হচ্ছিল যার ফলে মুখাবয়বের লক্ষণ অচিরে আজকের রূপ পরিগ্রহ করে। ভুরুর হাড়ের উঁচু ভাব কেটে যায়। চোয়াল ছোট হয়ে আসে। গ্রীবাও সুস্পষ্ট হয়। আর মস্তিষ্কের আকারও প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

একমাত্র ইউরোপ খণ্ডেই এই ধরনের আধুনিক মানুষের চারটি আলাদা প্রকারণ দেখা যায়। দৈহিক লক্ষণের দিক থেকে এদের চার জাতের মানুষ বলা যেতে পারে। পুরোপলীয় যুগের উত্তর ভাগের এই মানবগোষ্ঠীর শিল্প পুরাবিদ্যার দিক থেকে গুটিকয়েক সাংস্কৃতিক স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তরের হাতিয়ার নির্মাণ-পদ্ধতির আর আর্টের আলাদা ঐতিহ্য আছে।

নিরানডারথ্যাল মানুষের মত এই পর্যায়ের মানুষও গুহাকন্দরে আসা-যাওয়া করত। এরাও অসভ্য ছিল। তবে আগের কালের অসভ্যদের তুলনায় অনেক চতুর ছিল একালের অসভ্য মানুষ। এদের সংস্কৃতির প্রথম পর্যায়ের নাম অরি-নেশীয় সংস্কৃতি। পাথুরে হাতিয়ার নির্মাণের নতুন কৌশল এই স্তরে আরও উন্নত, আরও নিখুঁত হয়। তাছাড়া আর্টেরও প্রথম সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এই স্তরের স্মারকচিহ্নের মধ্যে পাওয়া যায়। এর আগে মানুষের সৌন্দর্যবোধ, মানুষের কান্তিবোধ, হাতিয়ার নির্মাণের উৎকর্ষসাধনের মধ্যে সার্থকতা খুঁজেছে। কিন্তু এই স্তর থেকে সেই মানসিক বৃত্তি খোদাই করা হাতিযার, অলংকার তৈরী, চিত্রাঙ্কন এবং স্থাপত্যবিদ্যার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

এই সংস্কৃতির স্রষ্টারা ইউরোপের মানুষ নয়। এসেছিল আফ্রিকা থেকে। ইতালি আর সিসিলির মধ্যে অতীতকালের লুপ্ত স্থলপথের যে চিহ্ন এখনও আছে, সেই পথ ধরে এসেছিল। ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগে এই মানবগোষ্ঠীর প্রচুর সাক্ষী আছে। উন্নত অস্ত্রের অধিকারী ছিল এরা। পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার বছর আগে ইউরোপে এসে গুহামানবদের গুহা দখল করে বসে। নিয়ানডারথ্যাল মানুষের সঙ্গে এদের দেখাশোনা হয়েছে। তাদের সঙ্গে এই নবাগতদের পার্থক্য এত বেশী নয় যে উভয়ের মধ্যে মেলামেশা হতে পারে না। অরিনেশীয় স্তরের

প্রথম পর্যায়ের যে সব হাতিয়ার পাওয়া গেছে তার মধ্যে নিয়ানডারথ্যাল মানুষের শিল্পকৌশলের আভাস আছে। অবশ্য এই দুটি জাতির নরনারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে কি না জানা যায়নি। তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে আধুনিক মানুষের মধ্যেও নিয়ানডারথ্যাল বংশগতি আছে।

নবাগত এই মানবগোষ্ঠী আজকের যুগের বহু মানুষের পূর্বপুরুষ। ক্র-মাঞঁ মানুষ নামে পরিচিত এরা। ফ্রান্সের দর্দন পল্লীর একটি গুহার নাম অনুযায়ী এই নামকরণ করা হয়েছে। এরাও মূলতঃ শিকারী যাযাবর ছিল। মাংস ছিল এদের প্রধান খাদ্য। গণ্ডার, বুনো ঘোড়া প্রভৃতি বন-প্রান্তরের জন্তু-জানোয়ার শিকার করে জীবিকার সংস্থান করত। গুহাকন্দর ছাড়া তাঁবুর মত আশ্রয় নির্মাণ করেও এরা বাস করত। কাঠের খাঁচা চামড়া দিয়ে মুড়ে এই আশ্রয় তৈরি করা হত। গ্রীষ্মকালে দল বেঁধে শিকার করতে বা মাছ ধরতে যেত। শিকারের চমৎকার হাতিয়ার তৈরি করতে জানত। মাছ ধরার জন্যও নানা-রকম বঁড়শী বা বল্লম তৈরি করত। ছাল ছাড়াবার কিংবা সেলাইর হাতিয়ার তৈরি করত হাড় কিংবা শিঙ দিয়ে। অন্যান্য সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যও হাড়ের বা শিঙের হাতিয়ার ব্যবহার করা হত। ফ্রান্সের অরিনেশীয়রা তীর-ধনুকের ব্যবহার জানত কি না সঠিক জানা যায়নি। তবে এদের সমকালীন পূর্ব স্পেনের আর এক মানবগোষ্ঠী তীর ধনুক ব্যবহার করত। কিন্তু মানুষের হাতে তৈরী এই প্রথম ইঞ্জিনটি কারা যে আবিষ্কার করেছিল সে তথ্য আজও অপরিজ্ঞাত।

সব চাইতে অবাক লাগে যখন এই যাযাবর শিকারী মানবগোষ্ঠীর কলা-শিল্পের অনুরাগ আর কান্তিবোধের নিদর্শন দেখি। প্রাচীর গাত্রে, প্রস্তর খণ্ডে, হাড়ের টুকরায় তাদের অলংকরণের রুচিবোধের সার্থক নিদর্শন অমর হয়ে আছে। ছুঁচলো হাতিয়ার দিয়ে জীবজন্তুর যেসব নকশা খোদাই করা হয়েছে, কালবিচারে এবং সাংস্কৃতিক স্তরের কথা স্মরণ রেখে বিচার করলে শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ এবং তার সার্থক কলানৈপুণ্য বিস্ময়াবিষ্ট করে। মাগদালেনীয় সাংস্কৃতিক স্তরে এই প্রাগৈতিহাসিক কলাশিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

কিন্তু মাগদালেনীয় পর্যায়ের আগেই আর একটি সাংস্কৃতিক পর্যায়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। পুরোপলীয় যুগের উত্তর ভাগের সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্যায় এটি। নাম সোলুত্রিয়। এই পর্যায়ের হাতিয়ার নির্মাণ পদ্ধতি অভিনব। পাতার আকারে হাতিয়ার তৈরি করা হয়েছে। পাথুরে ছোরা, বর্শাফলক এবং তীরের ফলা নির্মাণের মধ্যে এই যুগের শিল্পকৌশল চরম উন্নতির শিখরে উঠেছে।

ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের স্তেপভূমির এক শিকারীদলকে এই সংস্কৃতির জনক বলে গণ্য করা হয়। বুনো ঘোড়ার পাল অনুসরণ করে হয়ত এরা পশ্চিমে এসে পড়েছিল। এদের কিছু কিছু গুহাশ্রয়ে প্রচুর ঘোড়ার হাড় পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয়, আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য শিকার ও শিকারী উভয়ে পশ্চিমে চলে এসেছিল। যখন সাবেক আবাসের আবহাওয়া বাসোপযোগী হয়েছে আবার তারা ফিরে গেছে। তারা চলে যাবার পর অরিনেশীয় দল আবার নতুন শিল্পকৌশল, নতুন অভ্যাস আয়ত্ত করে ফিরে আসে এবং মাগদালেনীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করে। মাগদালেনীয় সংস্কৃতির স্রষ্টা আর অরিনেশীয় সংস্কৃতির স্রষ্টারা অভিন্ন মানবগোষ্ঠী বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

আর্টের উৎকর্ষ এই মাগদালেনীয় পর্যায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মাগদালেনীয় সংস্কৃতির স্রষ্টারাও যাযাবর শিকারী। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে এদের যাযাবরত্ব হ্রাস পায়। ইউরোপের কনকনে ঠাণ্ডা ভেজা আবহাওয়া এই সময় শুষ্ক এবং উষ্ণ হয়ে ওঠে। তার ফলে বনভূমি বিস্তার লাভ করে। অরিনেশীয় আর সোলুত্রিয় পর্যায়ের আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা ছিল। বলগা হরিণ ছিল ইউরোপের মধ্য ভাগের প্রধান জন্তু। তার সঙ্গে ছিল লোমশ হাতি আর লোমশ গণ্ডার। আর ছিল গুহাবাসী ভল্লুক, সিংহ এবং হায়না। কোথাও গাছপালা বড় বেশী ছিল না। অধিকাংশ জমি বৃক্ষহীন খোলা মাঠ কিংবা তৃণভূমি ছিল। বন যদি কোথাও থেকে থাকে তো সে বন পাইন গাছের। মাগদালেনীয় পর্যায়ে এই নৈসর্গিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে। ওক গাছের বন মধ্য ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। পাইনের বন উত্তরে হটে যায়। বলগা হরিণও চলে গেল পাইনের সাথে সাথে। লোমশ হাতি আর লোমশ গণ্ডারও ক্রমান্বয়ে লোপ পেল। তাছাড়া ঘন বনের মধ্যে শিকার করা ক্রমেই অসুবিধাকর হয়ে ওঠে। কাজেই মাগদালেনীয়রা যাযাবর শিকারী অভ্যাস বর্জন করতে বাধ্য হল। শিকারের বদলে এরা মাছ ধরার উপর বেশী নির্ভর করত। তাতে যে আয়াসী জীবন দেখা দিল তার ফলে পাথুরে হাতিয়ারের নির্মাণ-কৌশলের অবনতি হয়। কিন্তু মাছ ধরার কৌশল উৎকর্ষ লাভ করে। ছিপ-বঁড়শী দিয়ে মাছ ধরত এই যুগের মানুষ। এদের আস্তানায় যেসব বঁড়শী, হারপুনের ফলা এবং অন্যান্য মাছ ধরার সরঞ্জাম পাওয়া গেছে তার অধিকাংশ হাড় দিয়ে তৈরী। এই পর্যায়েই কাঁটাওয়ালা হাড়ের বর্শা-ফলকের নিদর্শন পাওয়া যায়।

একালের শিকারী মানবগোষ্ঠী যে দলবদ্ধ জীবনযাপন করত সে বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে না। দলটি খুব ছোট হলেও চলত না। লোমশ হাতি কিংবা

বাইসনের মত বিশালকায় জন্তু শিকার করার উপযোগী হওয়া চাই। দল বেঁধেই তখন শিকার করতে হত। তবে এই দলবদ্ধ জীবন কি ভাবে সংগঠিত হত তার খোঁজ জানা যায়নি। আর্থিক দিক থেকে প্রতিটি দল স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। তার অর্থ এই নয় যে অন্য দলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। সামান্য লেনদেনও থাকতে পারে। তবে দলের আর্থিক জীবন সেই লেনদেনের উপর কোন ভাবে নির্ভর করত না। দল বেঁধে শিকার করে যে খাদ্য সংগৃহীত হত তার উপরে দলের আর্থিক জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মাগদালেনীয় স্তরে মাছ ধরার উপর নির্ভর করত। কৃষিকাজ কিংবা পশুপালন করে খাদ্য সংগ্রহের কোন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। না ফ্রান্সে, না অন্যত্র। লোমশ গণ্ডার অরিনেশীয় পর্যায়ে অবলুপ্ত হয়ে যায়। আর লোমশ হাতি লোপ পায় মাগদালেনীয় পর্যায়ের শেষাশেষি। এই দুটি বিশালকায় জন্তুদলের বংশ লোপের পেছনে একালের শিকারীদের কৃতিত্ব নিশ্চয়ই নগণ্য ছিল না।

তবে শিকারী মানুষের ললিতকলার চর্চা এই পর্যায়ের সংস্কৃতির সব চেয়ে বিস্ময়কর দিক। পাথর আর হাতির দাঁতের উপর এরা মূর্তি অঙ্কন করত। মাটি দিয়ে গড়ত জন্তুর মডেল। হাতিয়ারের উপর নানা প্রতীকচিহ্ন খোদাই করত। গুহাকন্দরের চালেও এরা ছবি এঁকেছে। এঁকেছে গুহার প্রাচীর গাত্রে। অনেক ছবির মধ্যে কলাকুশলতার প্রশংসনীয় স্বাক্ষর আছে।

অরিনেশীয় ছবিগুলি প্রধানতঃ রেখাচিত্র। এই সব নকশার কোনটি আঙুলে কাদা মেখে আঁকা, কোনটি পাথরের হাতিয়ার দিয়ে উৎকীর্ণ আর কোনটি কয়লা দিয়ে আঁকা। তবে মাগদালেনীয় শিল্পীর চিত্রে বেধ এবং দূরত্বের আভাস আছে।

মনে হয়, এই সব চিত্রাঙ্কনের পেছনে গুরুতর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। শুধু ছবি আঁকার আনন্দেই হয়ত ছবি আঁকা হত না। গুহাকন্দরের ছবি সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। চুনা পাথরের গুহার দুর্গম অন্ধকার কন্দরে এই ছবি আঁকা হত। শিল্পীকেও কম কষ্ট সহ্য করতে হত না। চিত হয়ে শুয়ে কিংবা কারও ঘাড়ে চড়ে আঁকতে হত। কৃত্রিম প্রদীপ ব্যবহার করতে হয়েছে নিশ্চয়। কোন কোন জায়গায় পাথরের দীপাধার পাওয়া গেছে। চর্বি হয়ত এই প্রদীপের তেলের কাজ করত আর পলতে ছিল শ্যাওলা। কোন মানুষ এই সব গুহাকন্দরে বাস করত না। গুহা প্রাচীরের প্রতিটি ছবি এক একটি জন্তুর বিশেষ বিশেষ অবস্থার জীবন্ত প্রতিকৃতি। এই সব ছবি থেকে মনে হয়, একটা বিশেষ বাস্তব উদ্দেশ্য ছিল অরিনেশীয় আর মাগদালেনীয় পর্যায়ের গুহাচিত্রের। আগে যেখানে কিছু ছিল না, শিল্পীর কয়েকটি আঁচড়ের পরে সেই প্রাচীর গাত্রে বাইসন কি

হাতির ছবি ফুটে ওঠে। তাই দেখে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অবৈজ্ঞানিক মনে স্বভাবতঃ এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে বাইরের জগতেও নিশ্চয় এই ধরনের প্রাণী আছে যাকে সে শিকার করতে পারে এবং আহার্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। খাদ্যের জন্য দলের লোক যেসব জন্তুর উপর নির্ভর করত তাদের যোগান সুনিশ্চিত করা সম্ভবতঃ এই চিত্রাঙ্কণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

শিল্পীরা যে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ছিল তার আভাসও পাওয়া যায়। দর্দনে কতকগুলি গোলাকার প্রস্তর খণ্ড পাওয়া গেছে যার উপর ছবি আঁকা পরখ করা হয়েছে। দু-একখানি স্কেচের উপর কাটা দাগ দেখে মনে হয় যেন কোন শিক্ষক ভ্রম সংশোধন করে দিয়েছেন। শিল্পী যাদুকরেরা বিশেষজ্ঞ ছিল বলে দলের মধ্যে খানিকটা সম্মান প্রতিপত্তিও নিশ্চয়ই তাদের ছিল। তবু দলের যৌথ শিকার অভিযানে তাদের যোগ দিতে হত। কারণ শিকারীর দৃষ্টি নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জীবজন্তুর হালচাল খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে তার পক্ষে বিভিন্ন অবস্থার পটভূমিকায় সেই সব জন্তুর জীবন্ত আলেখ্য রূপায়িত করা সম্ভব হত না।

পুরোপলীয় যুগের অপরাপর শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও যাদুবিদ্যার আভাস পাওয়া যায়। তবে তার পদ্ধতি আলাদা। মোরাভিয়ার প্রেডমোস্টিয়ান দলের আর্টের মধ্যে হাতির দাঁতের উপর উৎকীর্ণ কিছু নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। আকারে ছোট এই সব মূর্তি। আকৃতি সাধারণতঃ মোটা এবং যৌনলক্ষণগুলি অতিরঞ্জিত। কোন মূর্তির মুণ্ড নেই। মনে হয়, উর্বরতার প্রতীক এই নারীমূর্তি। যেসব জন্তু বা উদ্ভিদের উপর দলের খাদ্য নির্ভরশীল ছিল তাদের মধ্যে নারীর উর্বরতা আরোপ করে তাদের বংশবৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই হয়ত এই সব ছবি আঁকা হয়েছে।

তাছাড়া পুরোপলীয় আর্টের মধ্য দিয়ে সেকালের জীবজন্তু সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানেরও খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এমন বিশ্বস্ততার সঙ্গে ছবি আঁকা হয়েছে যে, এতদিন পরেও বিভিন্ন প্রজাতির পার্থক্য মালুম করা সম্ভব। আধুনিক প্রাণীবিদ্যাবিদের মত মাগদালেনীয়রাও জীবজন্তুর প্রজাতিগত পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারত বলে মনে হয়। তাহাড়া জীবজন্তুর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেও তাদের খানিকটা জ্ঞান ছিল। অন্ততঃ হৃদয়ের গুরুত্ব বুঝত। তাই হয়ত আহত এক বাইসনের ছবিতে হৃদয়টি বর্শাবিদ্ধ দেখান হয়েছে।

ফ্রান্সের মাগদালেনীয় সংস্কৃতির মধ্যে পুরোপলীয় মানুষের অগ্রগতির চরম বিকাশ ঘটেছে। গুহাবাসী শিকারী মানুষের পক্ষে যে সমৃদ্ধি, যতটা উৎকর্ষ লাভ

করা সম্ভব তার খানিকটা আভাস এই সংস্কৃতির স্মারকচিহ্নের মধ্যে পাওয়া যায়। তবু ইউরোপের এই সমৃদ্ধ মানবগোষ্ঠী নবোপলীয় বিপ্লবের সূচনা করে নতুন আর্থিক জীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি। খাদ্য-সংগ্রাহক ছিল এরা। খাদ্য-উৎপাদক হতে পারল না। বিশেষ এক পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সফলভাবে সামঞ্জস্যবিধান করতে পেরেছিল বলে এই মানবগোষ্ঠী এতটা সমৃদ্ধ হতে পেরেছিল। শেষ তুষার যুগের অবসানে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা যখন বদলে গেল, শিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সংস্কৃতির জৌলুস ম্লান হয়ে পড়ল। খাদ্য সংগ্রহের স্থানে খাদ্য উৎপাদনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আর্থিক জীবনের পত্তন করল ভিন্ন মানবগোষ্ঠী। এমন সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তাদের ছিল না।

আজিলীয় আর তার্দোনেশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাঞ্যঁ মানুষের পতনের পথ পরিষ্কার হয়েছে। আজিলীয়রা ফ্রান্স আর বেলজিয়মে ছড়িয়ে পড়ে। তার্দোনেশীয়রা দখল করে স্পেন। পরে দুই দলে মেশামিশি হয়ে যায়।

এই দলের পাথুরে হাতিয়ার যেমন ছোট তেমন অদ্ভুত ধরনের। আগেকার যুগের হাতিয়ারের সঙ্গে কোন মিল নেই। গভীর অরণ্যে শিকারের প্রয়োজনে এই পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। ইউরোপের বনাঞ্চলে একমাত্র হরিণ তখন সহজলভ্য শিকার। খাদ্যের অপর অবলম্বন মাছ। আবহাওয়ার ঠাণ্ডা ভাব তখনও বজায় ছিল বলে এদের পক্ষে গুহাশ্রয় ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। এই সাদৃশ্য ছাড়া ইউরোপের শেষ পুরোপলীয় মানবগোষ্ঠী সম্পূর্ণ আলাদা সংস্কৃতিবান ছিল। বহিরাগত এরা। আলপাইন অঞ্চল আর উত্তর আফ্রিকা থেকে এসেছিল। একমাত্র আর্টের দিকে ছাড়া অন্য সব দিক থেকে এই বহিরাগত দলের মানসিক গঠন ক্রমাঞ্যঁ মানুষের চাইতে উন্নত ছিল। তবে ভূমধ্যসাগরের পথে আর একদল অগ্রগামী মানুষ এসে এদের কাবু করে ফেলে। আজিলীয়-তার্দোনেশীয়দের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ খণ্ডের পুরোপলীয় যুগের অবসান হয়।

পুরোপলীয় মানুষের সাক্ষী

রহস্যের ঘন অন্ধকারে ঘেরা আদিম মানুষের জীবন কাহিনী। ভূস্তরে, গিরিকন্দরে কিংবা প্রস্তর গাত্রে সামান্য কালোত্তীর্ণ নিদর্শন ছাড়া হাজার হাজার বছর আগেকার মানুষের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। এই অকিঞ্চিৎকর সাক্ষী সম্বল করে সেই যুগের দীর্ঘ ইতিহাসের ইমারত গড়ার চেষ্টা করতে হয়। কল্পনা স্বভাবতঃ এক্ষেত্রে কিছুটা প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু বর্তমানকাল থেকে যদি সেই সুদূর অতীতের জীবনধারার ব্যাখ্যা করার সুযোগ মেলে তাহলে কাজটা সহজ হয় নিশ্চয়। আধুনিক দুনিয়ার সব চাইতে অনগ্রসর অধুনালুপ্ত তাসমানীয়রা এই সুযোগ দিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেও এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী মানবগোষ্ঠী পুরোপলীয় যুগের মানুষের মত জীবনযাপন করত।

১৮৭৭ সালে এই মানবগোষ্ঠী নির্বংশ হয়ে গেছে। তাদের আচার-আচরণ কিংবা জীবনযাত্রার পদ্ধতি সম্পর্কে সামান্য তথ্যই জানা গেছে। তবু যতটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে নৃবিদ্যার গবেষকদের কাছে তার মূল্য প্রচুর।

মাঝারি লম্বা গড়নের মানুষ ছিল তাসমানীয়রা। গায়ের রঙ প্রায় কালো—কারও কারও কটা ধরনের। তাদের চোখ ছোট এবং বসা ছিল। মুখের হাঁ বড় এবং দাঁতও বড় ছিল। চোয়াল অনুপাতে আবার ভুরু উঁচু ও ঘন ছিল। নাক ছোট এবং চওড়া আর নাসা ছিল প্রসারিত।

তাসমানীয়দের চুল ছিল কালো এবং ঘন। ছিপি খোলার স্ক্রুর মত পাকান। পুরুষদের মুখে দাড়িগোঁফের অভাব ছিল না। চুলের ধরন থেকে যদি মানুষের জাতিত্ব নির্ণয় করা হয় তাসমানীয়দের তাহলে নিগ্রোজাতের মানুষ—উলোত্রিচি বলতে হয়।

দিগম্বর ছিল তাসমানীয়রা। সাধারণতঃ উলঙ্গভাবে চলাফেরা করত। তবে শীতের দিনে মাঝে মাঝে কাঙ্গারুর চামড়া গায়ে জড়াত। বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য গায়ে মাখত চর্বি মেশান গিরিমাটি। তাই বলে অঙ্গসজ্জার রীতি প্রচলিত ছিল না এমন নয়। মেয়েরা ফুলের মালা কিংবা ঝকঝকে বেহ্মির মালা

পরত। হাঁটুতে, মণিবন্ধে কি গোড়ালিতে কাঙ্গারু কিংবা ওলাবির (ছোট কাঙ্গারু বিশেষ) চামড়ার ফিতে বাঁধত।

কেশ প্রসাধনের পদ্ধতিও তাদের অজ্ঞাত ছিল না। দুই টুকরা পাথর দিয়ে এক এক গোছা করে চুল কাটত। একখানা পাথরের উপর গুচ্ছটি রেখে আর একখানা পাথর দিয়ে চাপ দিয়ে কাটা হত। প্রসাধনের জন্য চর্বি আর গিরিমাটি মেশান এক প্রকার পোমেড ব্যবহার করত। উলকি কাটার রীতি অবশ্য প্রচলিত ছিল না। তবে বাহু কেটে ঘা তৈরি করে সেই ক্ষতচিহ্ন দিয়ে অঙ্গসজ্জার বর্বর রীতি খুব বিরল ছিল না।

ঘর-বাড়ি কিংবা স্থায়ী বসতির বালাই এদের ছিল না। খাদ্যের সন্ধানে প্রতি-নিয়ত যত্রতত্র ঘুরে বেড়াত। ঝড়ো হাওয়া, দুরন্ত শীত কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার একটি মাত্র ব্যবস্থা এরা জানত। কাঠের খোঁটার সঙ্গে গাছের ছাল ঝুলিয়ে এক ধরনের ঢাকনা তৈরি করত এবং তার আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করত।

শিকার কি যুদ্ধের জন্য গুটিকয়েক সোজা হাতিয়ার এরা ব্যবহার করত। তার মধ্যে বর্শাই প্রধান। 'টি' গাছের ডাল সরল। তাই দিয়ে বর্শা তৈরী হত। বর্শা তৈরি করতে প্রচুর যত্ন, সতর্কতা আর নিপুণতার প্রয়োজন হত। আগুনে সেঁকে ডালখানা প্রথম নরম করা হত। ডাল যদি খুব সোজা না থাকত তো মাঝখানটা দাঁত দিয়ে কামড়ে দুই প্রান্ত ধরে চাপ দেওয়া হত। মানুষের চোয়াল সোজা করার যন্ত্র হিসাবে কাজ করত। এরপর আগুনে পুড়িয়ে বর্শার প্রান্ত শক্ত করা হত, আর ছুঁচলো করা হত খাঁজকাটা পাথরে ঘষে। তারপর আর একটি পাথুরে জিনিসের সাহায্যে ডালখানার ছাল ছাড়িয়ে গোল ও মসৃণ করা হত। তার ফলে যে মারাত্মক হাতিয়ার তৈরী হত, তাই দিয়ে বিশ গজ দূর থেকেও অনায়াসে মানুষের দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলা যেত। এই দূরত্ব থেকেও তাসমানীয়রা স্বচ্ছন্দে লক্ষ্যভেদ করতে পারত। বর্শাগুলি দেখাত মাছ ধরা ছিপের মত। কাজে না লাগার সময় এগুলি গাছের সোজা গুঁড়িতে বেঁধে রাখা হত।

ফুট দুয়েক লম্বা লাঠির মত আর একটি মাত্র কাঠের হাতিয়ার এরা ব্যবহার করত। তার এক প্রান্ত খাঁজকাটা আর অপর প্রান্ত কখনও কখনও গাঁটওয়ালা করা হত। নির্মাণ-কৌশল ছিল ঠিক বর্শার মত। এই ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা চল্লিশ গজ পর্যন্ত অব্যর্থ।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধক পাথরের অস্ত্র তৈরি করা হত বড় বড় চাঙড়া থেকে পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ড বিচ্ছিন্ন করে। এই কাজে দীর্ঘ সময় লাগত। চকমকি পাথরের ব্যবহার তাসমানীয়রা জানত না। মিহিদানার এক ধরনের

বেলে পাথর দিয়ে তার কাজ চালান হত। চকমকির মত অত ভাল কাজ এতে হত না।

এই প্রসঙ্গে তাসমানীয়দের বর্শা ঘষার খাঁজকাটা পাথরের তাৎপর্য উল্লেখ করা দরকার। কাঠের জিনিস বেশী দিন থাকলে নষ্ট হয়ে যায়। পুরোপলীয় যুগের কাঠের হাতিয়ারের সন্ধান কদাচিৎ মিলেছে। কিন্তু পুরোপলীয় কি নবোপলীয় যুগের ভূগর্ভস্থ প্রতিবেশের মধ্যে বহু খাঁজকাটা পাথরের সন্ধান মিলেছে। এগুলি অবশ্যই বর্শা অথবা তার পরবর্তী ছোট ধরনের বর্শা, মানে তীরের সূচক এ বিষয়ে সংশয় নেই।

কুঠারের ফলার মত আর এক ধরনের বড় হাতিয়ার তাসমানীয়রা ব্যবহার করত। বড় পাথর থেকে একটিমাত্র আঘাতে এক খণ্ড প্রস্তর বিচ্ছিন্ন করে এই হাতিয়ার তৈরি করা হত। তারপর যে পিঠ ভাঙা হয়েছে, গুটি কয়েক সমান্তরাল আঘাত মেরে সেই দিকটা যথাসম্ভব সমতল করা হত। কোন হাতল ছিল না এই হাতিয়ারের। পুরোপলীয় যুগের যেসব কুঠার অন্যত্র পাওয়া গেছে তার সঙ্গে এই হাতিয়ারের সাদৃশ্য আছে। পুরোপলীয় যুগের কুঠারেরও কোন হাতল ছিল না বলে বহু নৃবিদ্যাবিদ্ মনে করেন। তাছাড়া তাসমানীয়দেরও বাঁট সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। তাহলেও এই হাতিয়ার অনেক কাজে লাগত। বিশেষতঃ গাছে ওঠার কাজে।

মেয়েরাই গাছে চড়তে ওস্তাদ ছিল। গাছে দড়ি জড়িয়ে বাঁ হাতে শক্ত করে সেই দড়ি ধরে, ডান হাত দিয়ে তারা গাছের গুঁড়িতে এই হাতিয়ার দিয়ে খাঁজ কাটত। বুড়ো আঙুলটা সেই খাঁজে ভরে দিয়ে উঁচুতে উঠত। তারপর আরও খানিকটা উপরে দড়ি জড়িয়ে হাতে যতটা পাওয়া যায়, ততটা উঁচুতে আবার একটা খাঁজ কাটত। এইভাবে অনায়াসে তারা দু শ গজ উঁচু গাছে পর্যন্ত চড়তে পারত। এই পদ্ধতিতে মসৃণ পাম গাছে চড়ে তারা নিশাচর অপজাম জন্তু ধাওয়া করত।

চক্ষের পলকে গাছে চড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত মেয়েরা। একবার একদল নাবিক একদঙ্গল মেয়েকে তাড়া করেছিল। নিমেষের মধ্যে কোথায় যেন তারা মিলিয়ে গেল। খোঁজাখুঁজি করে দেখা গেল, গাছের ডগায় পাতার আড়ালে হাস্যময়ী কিছু মুখ উঁকি মারছে।

পাথরের নেহাই আর একটি হাতিয়ার। সাত ইঞ্চি ব্যাসের পাথর এইখানি। মাঝখানে পনের ইঞ্চি চওড়া আর প্রান্তে ইঞ্চিখানেক পুরু। ছয় ইঞ্চি ব্যাসের একটি হাতুড়ি দিয়ে এই নেহাইর উপর ভুক্তাবশিষ্ট মাংসের হাড় গুড়িয়ে মেয়েরা

সজ্জা বায় করত। পুরোপলীয় যুগের ভূস্তরের প্রতিবেশের মধ্যে এই ধরনের হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে তার নির্মাণ-কৌশল এতটা উন্নত নয়।

চাঁচার জন্য ছুরির ফলার মত ইঞ্চি দুয়েক ব্যাসের একফালি পাথর ব্যবহার করা হত। বহুল প্রচলন ছিল এই হাতিয়ারের। একটা পাশ অতি যত্নে কেটে কেটে কতকটা ভোঁতা ধরনের করা হত। এই প্রান্ত করাতের মত ঢেউ খেলান ছিল না। তবে লাইন সোজা রাখার জন্য সতর্ক হয়ে পাথর পাতলা করা হত। শিকার করা জন্তুর ছাল ছাড়াবার জন্য এই হাতিয়ার ব্যবহার হত। অন্য কাজেও অবশ্যই লাগত। একবার এই হাতিয়ারের একটা নমুনা কসাইখানায় পাঠান হয়েছিল। কসাইরা তো হেসেই অস্থির। কিন্তু ছাল ছাড়াতে গিয়ে দেখা গেল, হাতিয়ারটি কাজের পক্ষে বেশ উপযোগী। হঠাৎ পোঁচ লেগে মাংস কেটে যাবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

তাসমানীয়দের দেশে শিকারের অভাব ছিল না। এদের রন্ধন পদ্ধতির জন্য কাঙ্গারু, ওলাবি, অপজাম, কাঙ্গারু ইঁদুর এবং ওমব্যাটের মাংস বেশ রসাল খাদ্য হত। ছালসহ শিকারটি আগুনে সেঁকে নেওয়া হত। তারপর পাথরের ছুরি দিয়ে কেটে টুকরা করা হত। মাংস যাতে পচে না যায় তার জন্য লবণের মধ্যে, আর লবণের অভাবে ভস্মের মধ্যে রেখে দেওয়া হত। সিদ্ধ করে রান্না করার পদ্ধতি এরা জানত না। এমন কি শিখিয়ে দেবার পরেও পদ্ধতিটি এদের পছন্দ হয়নি।

জন্তু ছাড়াও এমু, কালো হাঁস, পেংগুইন প্রভৃতি পাখী শিকার করত তাসমানীয়রা। মেয়েরা আর শিশুরা ডিম কুড়াত। সরীসৃপ এবং গিরিগিটি খাওয়াও প্রচলিত ছিল। মাছ এরা খেত না। কেন না মাছ ধরার রীতি এদের অজ্ঞাত ছিল। তবে কাঁকড়া বা শুক্তি হামেশা খাওয়া হত। জলে ডুব দিয়ে মেয়েরা এই খাদ্য সংগ্রহ করত। জলের নীচে পাহাড়ের গায়ে লাগা শুক্তি খুলে আনার জন্য কাঠের বাটালি সঙ্গে নিত। ঝিনুকে ঘষে এই বাটালি মসৃণ করা হত। আগুনে সেঁকে খাওয়া হত শুক্তি—রোস্ট করে। তাসমানীয়রা যে জাতের শুক্তি খেত, বিশ্বের সর্বত্র সেই জাতের শুক্তি রসাল খাদ্য বলে সমাদৃত।

ফলমূলের মধ্যে ফার্নের কচি শিকড়, বুলরাসের মূল, পাকা কাঙ্গারু আপেল আর এক রকম ছত্রাক এরা ভেজে খেত। পানীয়ের মধ্যে জল ছাড়া গাছের রসে তৈরী মদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ইউকেলিপটাস জাতের স্থানীয় এক রকম গাছ থেকে সামান্য মিঠে রস বেরোয়। গাছের গোড়া ফুটো করে এই রস তারা সংগ্রহ করত। স্বাভাবিকভাবে এই রস গেঁজে মদ তৈরী হলে তাই খাওয়া হত।

কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালত তাসমানীয়রা। এক খণ্ড কাঠের ফুটোর মধ্যে আর এক খণ্ড লাঠির মত কাঠের ছুঁচলো মুখ ভরে ড্রিলিং পদ্ধতিতে ঘষাঘষি করে আগুন জ্বালান হত। প্রতিটি সংসারে আলাদা আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা থাকত। দুটি সংসারের বসতির ব্যবধান ছিল চৌদ্দ থেকে বিশ গজ।

একবার এক তাসমানীয় বুড়ীকে বিভিন্ন দিকে মুখ করে খণ্ড খণ্ড পাথরের টুকরা সাজিয়ে রাখতে দেখা যায়। পাথরগুলির কোনটা চ্যাপটা, কোনটা বা উপবৃত্তের মত। সব ক'খানা ইঞ্চি দুয়েক চওড়া। এই পাথরের টুকরায় লাল বা কালো দাগ কাটা ছিল। অনুসন্ধানে জানা গেল, এই সব প্রস্তর খণ্ড না কি প্রবাসী স্বজনদের প্রতীক। সব চাইতে বড় প্রস্তর খণ্ডখানি না কি মেদবহুল এক বৃদ্ধার স্মারক।

ইউরোপের গুহাকন্দরে পুরোপলীয় যুগের প্রতিবেশের মধ্যে এই ধরনের প্রস্তর খণ্ডের সন্ধান মিলেছে। সেগুলিও বিভিন্ন দিকে মুখ করে সাজান। তার উপরেও লাল বা কালো রৈখিক দাগ ছিল।

নকশা আঁকার আনাড়ী চেষ্টার প্রমাণও তাসমানীয়দের মধ্যে পাওয়া গেছে। কাঠকয়লা দিয়ে কাঙ্গারু কি আরও দু-চার রকম জন্তুর নকশা আঁকার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া এই আদিম অধিবাসীদের হাতে যে ধরনের দাগ কাটা থাকত, সেই ধরনের নকশার সন্ধান গাছের ছালের বড় বড় টুকরার উপর পাওয়া গেছে। পুরোপলীয় যুগের অস্ত্রের উপরেও এই ধরনের চিহ্ন আঁকা থাকত।

ডিঙি বা ক্যানোর ব্যবহার এরা জানত না। তার বদলে এরা গাছের ছালের ভেলা তৈরি করত। আঁটিবাঁধা নল-খাগড়া দিয়ে তৈরী কালিফোর্নিয়ার সেরি ইণ্ডিয়ানদের 'বালসা' কিংবা নীল নদে কি নায়াঙ্গা হ্রদে পাপিরাস নামে নলডাঁটার তৈরী আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের যে ভেলা দেখা গেছে, তাসমানীয়দের আধো-ডিঙি আধো-ভেলার সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। মেলানেশিয়ার দ্বীপবাসীরাও না কি এই ধরনের ভেলা ব্যবহার করত।

গাছের ছাল দিয়ে তাসমানীয়দের ভেলা তৈরি হত। প্রধানতঃ ইউকেলিপটাস জাতের গাছ ব্যবহার করা হত। চুরুটের মত গোল করে এই ছাল পাকান হত। এই রকমভাবে পাকান ছালের তিনটি চুরুট একত্রে ঘাসের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ভেলা তৈরি করা হত। বড় চুরুটটি থাকত মাঝখানে আর ছোট দুটি দুই পাশে। ভেলাটি অনেকটা ডিঙির মত দেখতে।

বাকল দিয়ে তৈরি করলেও ভেলাগুলি আকারে বড় কম হত না। প্রায় ছয় হাত সাড়ে ছয় হাত লম্বা, হাত খানেক চওড়া আর আট থেকে নয় ইঞ্চি গভীর

হত। তিন চারজন লোক অনায়াসে চড়তে পারত। বাইবার জন্য লগি ব্যবহার করা হত। গভীর সমুদ্রেও এই লগি দিয়ে বৈঠার কাজ করা হত। ভেলার এক প্রান্তে মাটি বা ছাইয়ের উপর আগুন জ্বালান থাকত। এই ভেলায় চড়ে গভীর সমুদ্রে কতদূর অবধি এরা যেত কেউ জানে না। তবে শান্ত সমুদ্রে মাইল তিনেক অবধি যেতে পারত বলে মনে হয়।

সেরি ইণ্ডিয়ানদের বালসা এই ভেলার চাইতে অনেক মজবুত, অনেক সুন্দর। আকারেও অনেক বড় হত বালসা—প্রায় বিশ হাত।

নিগ্রো জাতের সঙ্গে তাসমানীয়দের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। মিঃ হাকসলির মতে কালিডোনিয়া এবং আন্দামান দ্বীপের আদিবাসীদের সঙ্গে তাসমানীয়দের ঘনিষ্ঠ সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু মিঃ ফ্লাওয়ারের মতে পাপুয়ান আর মেলানশিয়ান গোষ্ঠীর সঙ্গে তাসমানিয়দের ঘনিষ্ঠতা বেশী। ফরাসী পণ্ডিতেরা এই দুটোর কোন মত স্বীকার করেন না। ফরাসী পণ্ডিত কারত্রাজে এবং হোমির মতে তাসমানীয়ার মানবগোষ্ঠী এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক। বর্তমান যুগের অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সুনির্দ্দিষ্ট সাদৃশ্য বার করা অসম্ভব। এই মতবাদ পণ্ডিতমহলে সাধারণতঃ স্বীকৃত।

মনে হয়, তাসমানীয়রা ঐ দেশেরই সন্তান। এক আদিম মানবগোষ্ঠীর জীবন্ত সাক্ষী। অন্যত্র এদের সগোত্রেরা হয় অবলুপ্ত, না হয় অন্য কোন শক্তিমানগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে। তাসমানীয়ার তটরেখা আর দূর সমুদ্র পাড়ি দেবার মত বাহনের অভাব দেখে অনায়াসে অনুমান করা যায়, প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দূরের দ্বীপ থেকে এরা আসেনি। বরং অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছে এই অনুমান বিশ্বাস্য বলে মনে হয়। এদের পূর্বপুরুষ হয়ত পূর্ব গোলার্ধে ছড়ান ছিল। উন্নততর কোন মানবগোষ্ঠীর চাপে বাস্তহারা হয়ে অস্ট্রেলিয়া এবং তাসমানিয়ায় এসেছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কাছেও এরা তাড়া খেয়েছে নিশ্চয়। তবে বাস প্রণালীর ব্যবধানের জন্য তারা তাসমানিয়া অবধি আসতে পারেনি।

কিন্তু এখানকার বসতির নির্বিঘ্নতাও পশ্চিমী ঔপনিবেশিকদের আগমনে ঘুচল। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে স্থলপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নিরাপত্তা এসেছিল সত্য কিন্তু শ্বেতাঙ্গ অতিথির আগমনে বিপদ আরও বাড়ল। শিকারী যাযাবর মানুষ আর কৃষিজীবী মানুষের সহ-অবস্থান কদাচিৎ সম্ভব। এখানেও তাই ঘটল। ঔপনিবেশিকদের কৃষিক্ষেত্র তাসমানীয়দের শিকারের সুযোগ সংকুচিত করে ফেলল। বনে পত্তন হল আবাদ। জীবনসংগ্রামের তাগিদে নতুন প্রতিবেশীর জমিতে অনধিকার প্রবেশ করতে বাধ্য হল তাসমানীয়রা। সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে

উঠল। ১৮২৫-৩১ সালের যুদ্ধের পর মাত্র দুশ জন আদিবাসী বেঁচে ছিল। অথচ আগে এদের সংখ্যা ছিল বেশ কয়েক হাজার।

যাই হোক, যুদ্ধের পর আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু শ্বেত-সভ্যতার সংস্রব শ্বেতাঙ্গের বুলেটের মত মারাত্মক হয়ে উঠল। ১৮৭৭ সালে ক্রুগানিনির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই মানবগোষ্ঠীর শেষ বংশধর ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

গুহামানবের আর্ট

আদিম মানবগোষ্ঠীর শিল্পকর্মের সাক্ষী হিসাবে কিছু হাতিয়ার—পাথর, হাতির দাঁত, হাড় কিংবা শিঙের তৈরী কিছু শিল্প-সামগ্রীর সন্ধান ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়েছিল। অকস্মাৎ একদিন গভীর গিরিকন্দরে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের শিল্পচর্চার নতুন খোঁজ পাওয়া গেল। প্রস্তর গাত্রে কিছু ছবির নকশা দেখা গেল। এই সব নকশার কোনটি জন্তুর ছবি, আবার কোনটি বা মানুষের মুখ কিংবা বিশেষ কোন অবয়বের ছবি। এ ছাড়া প্রতীকধর্মী কিছু রেখাচিত্রেরও সন্ধান মিলল। নকশার বিষয়বস্তুর মধ্যে আদিম মানুষের হাতিয়ার কিংবা তৎকালীন বাস্তব জীবনের আলেখ্য আছে। কোন কোন নকশায় গতিশীল জীবনচিত্র রূপায়িত করা হয়েছে। নকশাগুলির কোনটি পাথরের উপর খোদাই করা। কোনটি বা রঙ দিয়ে আঁকা।

আদিম মানুষের আর্টের এই নিদর্শন নির্দিষ্টভাবে কোন ভৌগোলিক চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়ার বহু স্থানে এই শিল্প-প্রতীক ছড়িয়ে আছে এবং ভৌগোলিক ব্যবধান সত্ত্বেও এই আদিম শিল্পচর্চার বিষয়বস্তুর, রীতির এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

ইউরোপ খণ্ডে স্পেনের সান্তাদার প্রদেশের আলতামিরা গিরিকন্দরে ১৮৭৯ সালে কিছু নকশার সন্ধান পাওয়া যায়। ছবিগুলির অভিনবত্ব এবং অস্বাভাবিকত্ব স্বভাবতঃ কৌতূহল সঞ্চার করল। কিন্তু আবিষ্কারক দঁ মার্সিলিনো দ সোতোলা নিজে এই নকশার সুপ্রাচীনত্বে খুব আস্থাবান হতে পারলেন না। পণ্ডিত মহলেও সংশয় দেখা দিল। ভিলানোভা নামে মাদ্রিদের এক প্রত্নজীব-বিদ্যাবিদ্ বললেন, ভূতাত্ত্বিক বিচারে পৃথিবীর চতুর্থ যুগ অর্থাৎ সর্বাধুনিক যুগের গুহাবাসী মানবের যেসব চুল্লী আবিষ্কৃত হয়েছে, এই সব নকশা তার সমকালীন। সংশয়বাদীরা প্রশ্ন করলেন, ছবিগুলি সত্যই যদি হাজার হাজার বছর আগেকার হয় তো স্যাঁৎস্যেঁতে পাহাড়ের গায়ে অমন অবিকৃত আর সুস্পষ্ট থাকে কি করে? তাছাড়া এই গিরিকন্দরে কোনকালে যদি মানুষের আবাস থেকে থাকে তো তারা

আগুন জ্বালাত নিশ্চয়ই। তাই যদি হয়, দেয়ালে ধোঁয়ার চিহ্ন থাকবে। কিন্তু কোথায় সেই চিহ্ন? তাছাড়া এত গভীর গুহাকন্দরে জন্তু-জানোয়ারের নকশা আঁকার সার্থকতাই বা কি?

সংশয়বাদীদের যুক্তি অনুসন্ধিৎসু মনের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে না পারলেও হৈ চৈ সাময়িকভাবে স্থগিত রইল। গুহাকন্দরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এমন অনেক প্রমাণ ছিল যাতে এই সব অভিনব নকশাকে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কীর্তি বলে গ্রহণ করা যায়। খানকয়েক নকশার উপর চোয়ান জলের দরুন চুনের মত সাদা দাগ লেগেছিল। তাছাড়া ১৮৬৮ সাল অবধি গুহামুখটি রুদ্ধ এবং অজ্ঞাত ছিল।

যাই হোক, ১৮৯৫ সালে ফ্রান্সের দ লা মাথের গুহাকন্দরে আরও কিছু নকশার সন্ধান পেলেন এমিল রিভিয়ের। এই আবিষ্কারের পূর্বে গুহামুখ থেকে পুরোপলীয় এবং নবোপলীয় যুগের পঙ্কস্তূপ অপসারণ করতে হয়েছিল। কাজেই এখানকার নকশার সুপ্রাচীনত্বে সংশয় প্রকাশ করার অবকাশ কম। দালো নামে আর একজন ফরাসী অনুসন্ধানী আরও কিছু নকশার খোঁজ পেলেন পেয়ার নঁ পেয়ার গিরিকন্দরে। এখানকার নকশার উপর কোন দাগ ছিল না। কাজেই আলতামিরার আবিষ্কার সম্পর্কে যে সংশয় জেগেছিল, এইবার তার নিরসন হল।

কিন্তু এই ধরনের গুহাচিত্রের আবিষ্কার শুধুমাত্র ইউরোপ খণ্ডে সীমাবদ্ধ রইল না। প্রত্নতাত্ত্বিকদের উৎসুক সন্ধানী দৃষ্টি অন্যত্রও এই ধাঁচের বহু নকশা আবিষ্কার করতে থাকল। পর্যটকদের বিবরণে মাঝে মাঝে এই ধরনের গুহা-চিত্রের উল্লেখ থাকত। অনেকে আবার এই সব নকশার গুরুত্ব উপেক্ষা করেছেন। আঁকা-বাঁকা রেখাটানা ছাড়া নির্দিষ্ট বিষয় বস্তুর উপর ছবি আঁকার ক্ষমতা যে আধুনিক কালের অসভ্যদের থাকতে পারে, এই বিশ্বাস অনেকের ছিল না। কাজেই অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তরগাত্রে ছবির মত নকশার বিবরণ শোনা গেলেও, ইতিপূর্বে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

মিঃ জর্জ গ্রে ১৮৪০ সালে উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় কয়েকটি নকশা-আঁকা গুহা আবিষ্কার করলেন। তারপর এই অঞ্চলে আরও বহু খোদাই করা নকশার খোঁজ পাওয়া গেল। কোন কোন গুহার প্রাচীরে কিংবা প্রস্তর খণ্ডের উপর অদ্ভুত ধরনের হাতের নকশা দেখা গেল। আবিষ্কৃত নকশাগুলির শিল্পরীতির সাদৃশ্য আরও চমকপ্রদ। সবগুলি যেন এক পদ্ধতিতে খোদাই করা।

উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ফ্লাক্স নামে এক জায়গায় দেড়শ মূর্তির নকশা পাওয়া গেল একখানা মাত্র পাথরের উপর। তার মধ্যে কোনটা কচ্ছপ, কোনটা

হাঙর, কোনটা কুকুর, কোনটা কাঙারু আবার কোনটা ক্যানো, কোনটা মুগুরের নকশা। অস্ট্রেলিয়ার ইয়র্ক অন্তরীপের এক গুহায় দেখা গেল লালচে-গেরুয়া পটের উপর হলদে রঙের পোঁচমাথা মানুষের নকশা। লাল, হলদে কি সাদা রঙ দিয়ে আঁকা মানুষের হাত, কিংবা কাঙারু কচ্ছপ জাতীয় জীবজন্তুর অথবা দলবদ্ধভাবে কাঙারু শিকারের ছবিও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া গেছে।

পাথরের গায়ে আঁকা কিংবা খোদাই করা নকশা আমেরিকাতেও পাওয়া গেছে। কালিফোনিয়ায় যেসব নকশা পাওয়া গেছে তার অঙ্কনরীতি মোটামুটি-ভাবে অস্ট্রেলিয়ার নকশার মত। তবে কালিফোর্নিয়ার নকশাগুলি গুহামুখের কাছাকাছি খোলা জায়গায় আঁকা।

এই ধরনের নকশার সন্ধান আফ্রিকার উত্তরাংশেও মিলেছে। এই সব চিত্রের কোন কোনখানি আধুনিক যুগের দেওয়াল-চিত্রের মত। আলজেরিয়ার একখানি ছবিতে নবোপলীয় যুগের কুঠার হাতে একটি মানুরের নকশা আছে। সেই গুহার মধ্যেই আবার পাথরে তৈরী পালিশ করা কুঠার, তীর, বর্শা এবং ঢাল পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন মহাদেশের এই সব নকশার সাধারণ সাদৃশ্য বিস্ময়কর হলেও দুর্বোধ্য নয়। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং তাদের শিল্পচর্চা সম্পর্কে আধুনিক সমাজতত্ত্ব যে আলোকপাত করেছে তাতে মনে করা যায়, এই চিত্রাঙ্কনের পেছনে আর্থিক এবং অন্যান্য বাস্তব কারণ সহ আদিম মানুষের সেই সব বিশ্বাসের প্রেরণা আছে, বিজ্ঞানের পরিভাষায় সমষ্টিগতভাবে যাকে বলা হয় টোটেমবাদ।

টোটেম শব্দটি উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের পরিভাষা। শব্দটির অর্থ মোটামুটিভাবে 'প্রতীক'—'চিহ্ন'—'ছাপ' বা 'পরিবার'। শব্দটির ব্যবহার আঞ্চলিক হলেও টোটেম বলতে যা বোঝায় তার তাৎপর্য সার্বজনীন। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম মানুষের গোষ্ঠীগুলি বিশ্বাস করত যে তারা এক একটি প্রাণী দ্বারা রক্ষিত। এই রক্ষক সাধারণতঃ কোন জীব বা জন্তু। গোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য আরাধনা করে এই রক্ষকের তুষ্টিবিধান করা আবশ্যক। কালক্রমে টোটেম জন্তুর পূজা গোষ্ঠীর অবশ্য আচরণীয় ধর্ম হয়ে পড়ে। আদিম মানুষের বহু কৌলিক কুসংস্কারের মূলে এই টোটেমবাদী বিশ্বাস আছে। যে গোষ্ঠী যে জীব বা জন্তুকে টোটেম বলে গ্রহণ করত, তার প্রতীক তারা আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্রের উপর বহন করত। এই টোটেম চিহ্নের বিভিন্নতা আবার আদিম মানুষের গোষ্ঠীগত বিভিন্নতার স্মারক।

আদিম মানুষের শিল্পচর্চার যত নিদর্শন পাওয়া গেছে তার অধিকাংশ গুহামুখ থেকে বহু দূরে। পিরেনিজ পর্বতের নিয়ো গিরিকন্দরের ছবি দেখতে হলে গুহা-মুখ থেকে প্রায় আটশ গজ সুড়ঙ্গ পথে এগোতে হয়। গুহার দূর প্রান্তে কিংবা দুর্নিরীক্ষ্য আনাচে কানাচে ছবি আঁকার পেছনে টোটেম সংস্কারের প্রভাব আছে। অস্ট্রেলিয়ার গুহাচিত্র সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। নারী, শিশু কিংবা অদীক্ষিত যুবকের পক্ষে এই ছবি দেখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। তাই সচরাচর তাদের দৃষ্টি যেখানে না পড়ে, এমন সব কোণে ছবি আঁকা হয়েছে। গুহার চালে এমন স্থানে ছবি আঁকা আছে যেখানে উঠতে শিল্পীকে প্রচুর অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। তাহলেই বোঝা যায়, নিছক খেয়ালের বশে কিংবা গুহাসজ্জার জন্য এই সব নকশা আঁকা হত না।

তাই বলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আর্টের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে ধর্মগত বা প্রতীকগত বৈশিষ্ট্য আরোপ করাও বাড়াবাড়ি। মানবমনের বহুমুখী সহজ প্রবৃত্তি এবং অলঙ্করণের আকর্ষণ, তার জীবনযাত্রার প্রয়োজন আর সম্ভবতঃ ধর্মীয় সংস্কার একত্রে আদিম মানুষের মানসলোকে আর্টের প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। মাগদালেনীয় যুগের কলাশিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে আর্টের উৎপত্তির সম্ভাব্য কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের উল্লেখ করেছি। সেই আর্থিক প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখেও বলা যেতে পারে যে জীবন সম্পর্কে ভূয়োদর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত টোটেমবাদী ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আদিম মানুষের মধ্যে শিল্পীমনের উৎপত্তির কারণ ভালভাবে বোঝা যায়। আদিম যুগের এই আর্টের বিলুপ্তির কারণও সম্ভবতঃ টোটেমবাদের প্রাধান্য লোপের মধ্যে নিহিত। টোটেমবাদ শিকারী যাযাবর মানুষের সংস্কার। নবোপলীয় যুগের পশুপালক কৃষিজীবী মানুষের উপর টোটেমবাদের প্রভাব তত বেশী ছিল না। কাজেই যে ধ্যান-ধারণা থেকে মুখ্যতঃ এই আর্টের উৎপত্তি, সেই ধ্যান-ধারণার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই আর্টও লোপ পেল। পরবর্তী কোন যুগে আবার তার পুনরুজ্জীবন ঘটেনি।

যাযাবর শিকারী মানবগোষ্ঠীর আর্টের সঙ্গে আদিম যাদুবিদ্যার সম্পর্ক নিবিড়। অস্ট্রেলিয়ার এমু পাখীর পূজারীরা মাটির উপর এমু টোটেমের প্রতীক এঁকে তার চারপাশে গোষ্ঠীর সমস্ত পুরুষ মিলে নৃত্যগীত করত। পিরেনিজ পর্বতমালার নিয়ো গুহাকন্দরেও মাটির মেঝের উপর আঁকা জন্তুর নকশা পাওয়া গেছে। এই যুগের নকশার উপর আঁকা কি খোদাই করা চিহ্নগুলি খুব সম্ভবতঃ যাদুবিদ্যার প্রতীক। শিকারের উপর কুটিরের চিহ্ন ছিল শিকারীর মালিকানার দ্যোতক। কিন্তু শিকারের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য বিশেষ আচার অনুষ্ঠানের

রীতি ছিল। তীরের ফলার যাদুর গুরুত্ব ছিল ঢের বেশী। মাংস খেয়ে জীবন-ধারণ করত শিকারী মানবকুল। তারা বিশ্বাস করত, খাদ্যবস্তুর প্রতিমূর্তি তৈরি করে তারা সেই জন্তুর সংখ্যাবৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম মানুষ যেমন মনে করত, ক্যাঙারু নৃত্য করে তারা ক্যাঙারুর বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। আবার জীবন্ত কোন প্রাণীর অনিষ্টসাধনের জন্যও তার প্রতিমূর্তির উপর যাদুবলে আঘাত হানা হত। এই মারণ-রীতিও সমধর্মী বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। তবে লক্ষ্যটা এখানে ভিন্ন। কাজেই 'আর্টের যাদু' কথাটা মোটেই হেঁয়ালী কথা নয়। আর্টের উৎপত্তির সঙ্গে যাদুবিদ্যার সম্বন্ধ সত্যই অতি নিবিড়।

মানবসমাজের প্রথম বিপ্লব

গোটা তুষার যুগের মধ্যে বাইরের প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। প্রকৃতির দান হিসাবে যা পাওয়া গেছে, তাই আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করেছে। এই দান সে নির্বিচারে গ্রহণ করেনি। ইতিমধ্যে বাছ-বিচার করতে শিখেছিল। কোন্‌টা নেবে আর কোন্‌টা নেবে না বিচার করতে পারত। তাছাড়া নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে এই দান সংগ্রহের পদ্ধতিরও সে উন্নতি করেছিল।

কিন্তু তুষার যুগান্তে প্রাকৃতিক প্রতিবেশ সম্পর্কে কয়েকটি মানবগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তিত মনোভাব সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে বৈপ্লবিক রূপান্তর সূচনা করে। মানব বা মানবাকার জীবের উদ্ভব যতদিন হয়েছে, তার তুলনায় তুষার যুগোত্তর কালের পরিমাণ অতি নগণ্য। বড় জোর হাজার পনের বছর হতে পারে। অথচ তার আগেকার যুগের ব্যাপ্তি কমপক্ষে আড়াই লাখ বছর। এই অল্পকালের মধ্যে মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করে। প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করে তাকে আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়।

প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার এই প্রয়াস ক্রমে ক্রমে সফল হয়েছে। প্রতিটি পর্যায়ের সফলতা অনুবর্তী পর্যায়ের সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানব-সংস্কৃতিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রতিটি পদক্ষেপ যুগান্তকারী বৈপ্লবিক প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

খাদ্য সংগ্রহ করার যে আর্থিক বুনিয়াদের উপর পুরোপলীয় যুগের মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তুষার যুগের অব্যবহিত পরে শিকার-নির্ভর সেই জীবনযাত্রা চরম বিকাশ লাভ করে। এই স্তরের অনুবর্তী পর্যায়ে খাদ্য-সংগ্রাহক মানুষ খাদ্য-উৎপাদক রূপে দেখা দিল। জীবিকার জন্য জীবজন্তু শিকার এবং মাছ ধরার উপর একান্তভাবে নির্ভর না করে খাদ্য সরবরাহের নতুন পন্থা আবিষ্কার করল। কৃষিকাজ ও পশুপালন আরম্ভ করল মানুষ। বেছে বেছে গাছ এবং খাদ্যের উপযোগী ঘাস রোপণ করতে লাগল। এই সব গাছপালা ও ঘাসের উন্নতিসাধনের

কৌশলও আয়ত্ত করল। সেই সঙ্গে কয়েক শ্রেণীর বুনো পশুকেও খাদ্য এবং আশ্রয়ের বিনিময়ে পোষ মানিয়ে অনুগত করতে পারল। খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার এই নতুন কৌশল মানুষের আর্থিক জীবনে বৈপ্লবিক রূপান্তর নিয়ে আসে। মানুষ তার খাদ্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করে।

আর্থিক জীবনের রূপান্তরসাধক এই খাদ্যোৎপাদন বিধিকে তাই মানব-সমাজের প্রথম বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়। উৎপাদন বিধির এই পরিবর্তন শুধু বেঁচে থাকার সংগ্রামের পূর্বানুসৃত রীতির পারবর্তন ঘটায়নি। মানুষের আর্থিক ও সামাজিক সংগঠন, তার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীও তার ফলে নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর মানুষ খাদ্যশস্যের উৎপাদক এবং পশুপালক হিসাবে সভ্যতার উদয়াচলের পথে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গেছে।

খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার এই নতুন পদ্ধতির উপর নবোপলীয় যুগের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কৃষিকর্ম ও পশুপালনের উপর এই সংস্কৃতির আর্থিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প আর পালিশ-করা পাথুরে হাতিয়ার তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সহসা এক সময় গোটা মানবসমাজে এই রূপান্তর দেখা দেয়নি। একদিনে শিকারী মানুষ বর্শা বল্লম ছেড়ে লাঙল দিয়ে জমি আবাদ করতে শেখেনি। এমন কোন কৌশল জানা ছিল না, যার বলে বুনো ঘাসের বীজ বুনে সে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করতে পারে। বুনো পশুকে পোষ মানাবার কোন যাদুমন্ত্রও তার জানা ছিল না। খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পশুপালনের কৌশল বহু বছরের বহুতর পরীক্ষার ফলে ক্রমিক সাফল্যের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হয়েছে। তাছাড়া জীবনযাত্রার এই নতুনবিধি দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়েছে। সাত হাজার বছর আগে যে আর্থিক-বিধি মিশর, উত্তর সিরিয়া ও ইরানে দেখা দিয়েছিল ডেনমার্ক, উত্তর জার্মানি আর সুইডেনে তার পত্তন হয়েছে খৃস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে। তবে নবোপলীয় যুগের সংস্কৃতি সর্বত্র এই সব বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত।

।। যব ও গমের উদ্ভব ।।

আবাদ করলে বহু উদ্ভিদ্ থেকে পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায়। এখনও অসংখ্য মানুষ ভাত, গম, যব, জোয়ার, ভুট্টা, আলু কিংবা মিঠে আলু খেয়ে জীবনধারণ করে। কিন্তু মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে যেসব সভ্যতার অবদান সব চেয়ে বেশী সেই সব সভ্যতার আর্থিক ভিত্তি যব ও গমের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, পশ্চিম এশিয়া এবং ভারতের সভ্যতা যব ও গমের আর্থিক

বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে। অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে এই দুটি খাদ্যশস্যের। যব ও গম থেকে যে খাদ্য পাওয়া যায় তার পুষ্টিকারিতা প্রচুর। শস্য দুটির ফলন যেমন অঢেল, ফসল সঞ্চয় করে রাখাও তেমন সহজ। তাছাড়া এই শস্যের আবাদ করতে সারা বছর মেহনত করার প্রয়োজন হয় না। ক্ষেত তৈরি করতে এবং বীজ বুনতে অবশ্য মেহনত দরকার। ফসল পাকার আগে জমি নিড়ান আবশ্যক। আবার ফসল কাটার সময়েও সকলকে বেশ খানিকটা শ্রম করতে হয়। কিন্তু এই শ্রম সাময়িক। বীজ বোনার আগে এবং পরে জমির তত্ত্ব-তল্লাস না করলেও চলে। গমচাষীর ছুটি এই সময়। অনায়াসে এই অবসরে সে ভিন্ন কাজ করতে পারে। ধানচাষীর কিন্তু এতটা অবসর জোটে না। তার শ্রম গমচাষীর মত কঠোর না হলেও প্রায় একটানা।

বুনো ঘাস আবাদ করে যব ও গম পাওয়া গেছে। বুনো ঘাসের বীজ থেকে যে শস্য পাওয়া যায়, তার চাইতে বড় দানার পুষ্টিকর শস্য পাওয়া গেছে আবাদ করে—বীজের জন্য সেরা গাছ নির্বাচন করে এবং বিভিন্ন জাতের গাছের মধ্যে আকস্মিক কিংবা স্বেচ্ছাকৃত পরিনিষেকের ফলে। ডিংকেল আর এম্মার নামে দুটি বুনো ঘাস থেকে গমের উদ্ভব হয়েছে। দুটি ঘাসই পার্বত্য অঞ্চলে দেদার জন্মে। ডিংকেল জন্মে ইউরোপের বলকান অঞ্চলে, ক্রিমিয়া, এশিয়া মাইনর আর ককেসাস অঞ্চলে। আর এম্মার জন্মে প্যালেস্টাইনে। সম্ভবতঃ ইরানেও। রুশ-বিজ্ঞানী ভাভিলভের গবেষণা অনুসারে আফগানিস্থান আর উত্তর-পশ্চিম চীন গম উৎপাদনের আদি কেন্দ্র। বুনো ডিংকেল থেকে যে গমের উদ্ভব হয়েছে তার দানা ছোট। শস্য হিসাবেও নিকৃষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মধ্য ইউরোপে এই গমের চাষ হত। এখনও এশিয়া মাইনরে হয়। এম্মার ঘাস আবাদ করে এর চাইতে উৎকৃষ্ট গম পাওয়া গেছে। প্রাচীন মিশর, এশিয়া মাইনর এবং পশ্চিম ইউরোপে এই গমের আবাদ হত। এখনও হয়। কিন্তু রুটির জন্য আজকাল যে গম ব্যবহার করা হয়, সেটি ভিন্ন জাতের। তার বুনো বংশপতি যে কোন্ ঘাস তার হদিস জানা যায়নি। হয়ত এম্মারের সঙ্গে অজ্ঞাত পরিচয় এক বুনো ঘাসের পরিনিষেকের ফলে এই গম উদ্ভূত হয়েছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, তুর্কীস্থান, ইরান ও ভারতের গম এই জাতের।

যবের বংশপতিও পাহাড়ে ঘাস। উত্তর আফ্রিকার মারমারিকা, প্যালেস্টাইন, এশিয়া মাইনর, ট্রান্স-ককেসিয়া, ইরান, আফগানিস্থান আর তুর্কীস্থানে এই ঘাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানী ভাভিলভের মতে, যবের আদি জন্ম-কেন্দ্র আবিসিনিয়া আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

॥ আবাদের প্রাচীন রীতি ॥

প্রাচীন দুটি খাদ্যশস্যের উদ্ভব সম্পর্কে তথ্য জানা গেলেও কবে, কোথায়, এবং কি ভাবে খাদ্যশস্যের আবাদ আরম্ভ হয়েছে তার খোঁজ সঠিক ভাবে জানা যায়নি। এক জায়গায় কিংবা একাধিক স্থানে যুগপৎ আরম্ভ হয়েছিল কি না, সে তথ্যও অজ্ঞাত। প্যালেস্টাইনের এক গুহাকন্দরে খাদ্য-সংগ্রাহক আর্থিক বিধির পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু হাতিয়ারের সঙ্গে কাস্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই থেকে মনে করা হয়, প্যালেস্টাইনে খাদ্যশস্যের আবাদ সকলের আগে আরম্ভ হয়েছে। এই যুক্তি ধোপে টেকে না। এও তো হতে পারে, এই গুহাবাসীরা এক অনগ্রসর দলের মানুষ ছিল। অগ্রসর অর্থাৎ খাদ্যশস্যোৎপাদক একটি দলের আর্থিক বিধি খানিকটা গ্রহণ করতে পারলেও, নিজেদের অনগ্রসর জীবনযাত্রাকে হয়ত পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে পারেনি। আর একদল গবেষকের মতে মিশরে কৃষিকার্যের উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু তার সমর্থনেও খুব বেশী প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে প্রতিবেশের মধ্যে এবং যে পদ্ধতিতে মিশর দেশে কৃষিকার্যের সূচনা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়, নীল নদের উপত্যকার বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে অনুসৃত সেই পদ্ধতি ভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিবেশের মধ্যে অনুসরণ করা অসুবিধাকর। কাজেই মিশর দেশেই যে খাদ্যশস্যের আবাদের সূচনা হয়েছে, এই দাবি স্বীকৃতি পায়নি।

খাদ্যশস্যের আবাদ সম্পর্কে নবোপলীয় যুগের যত পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে কোদাল-চাষ বা বাগান-চাষ অতি প্রাচীন পদ্ধতি। এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বহু চাষীর কাছে আবাদের অর্থ কোদাল বা লাঠি দিয়ে জমি সাফ করা, তারপর সেই জমিতে বীজ বুনে ফসল কাটা। জমিতে সার না দিয়ে কিংবা লাঙল না চালিয়ে পর পর বছর কয়েক এইভাবে চাষ করা হয়। তাতে জমির ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায়। তখন আর এক খণ্ড জমি সাফ করা হয়। উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত সেই জমিও একই পদ্ধতিতে আবাদ করা হয়। এইভাবে কাছাকাছি আবাদযোগ্য জমি যখন শেষ হয়ে যায়, গৃহস্থালীর পাট তুলে দিয়ে চাষীরা তখন নতুন জমির খোঁজে স্থানান্তরে চলে যায়।

একটি বিপদ আছে এই পদ্ধতির। অচিরে চাষীকে জমির অনটনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্থান ত্যাগ করে সমস্যাটি এড়ান যায় বটে, কিন্তু আবাদ-যোগ্য অঢেল জমি যদি না থাকে তাহলে বিপদ। যাই হোক, প্রাগৈতিহাসিক কালের ইউরোপে আবাদের এই রীতি চালু ছিল। আসামের নাগারা, সুদানের গমচাষীরা আর আমেরিকার আমাজন অঞ্চলের বোরোরা এখনও এই পদ্ধতি

অনুসরণ করে থাকে। আবাদের এই পদ্ধতিতে অপচয় বড় বেশী হয়। চাষীর জীবনের যাযাবরত্বও ঘোচে না। বরং খানিকটা যাযাবরত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া দলের জনসংখ্যাও এতে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। কারণ আবাদযোগ্য জমি কোথাও অঢেল নয়। তাই খাদ্যের যোগান ক্রমাগত বাড়ান সম্ভব হয় না।

যাযাবর কোদাল চাষের পদ্ধতি সুপ্রাচীন হলেও খুব সরল নয়। প্রাচীনতম পদ্ধতিও এটি নয় নিশ্চয়ই। উত্তরের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বনভূমি আর গ্রীষ্মমণ্ডলের জঙ্গলের মধ্যবর্তী এলাকায় শুষ্ক মরুময় এক বিশাল অঞ্চল আছে। সাবেক কালে এর কিছু জমি পাহাড়ের বেনোজলে প্লাবিত হত। কিছু প্লাবিত হত নদীর কুলপ্লাবী বন্যায়। এই প্লাবিত অঞ্চলে বেনোজলের পলি জমত। কিছু জল আটকা পড়ে শুকনো জমিতে রসসিঞ্চন করত। বন্যাপ্লাবিত এই সরস জমি শুকনো মরুময় অঞ্চলের সেরা আবাদযোগ্য জমি। নীল নদীর প্লাবনে প্রতি হেমন্তে জমির উপর ভিজা কাদা জমত। পূর্ব সুদানের হাদেনদোয়ারা তার মধ্যে জোয়ারের চাষ করত। সিনাই পর্বতে ঝঞ্চাবৃষ্টির ফলে ওয়াদি এল্ আরিশ্ নদীতে যখন কুলভাসান প্লাবন দেখা দিত, মরুবাসী আরবেরা সেই প্লাবনের সরস পলির উপর যবের দানা বুনত।

প্লাবনের জল শুধু ফসলের গোড়ায় জলসিঞ্চন করে না। নতুন সরস মাটিও দিয়ে যায়। পাহাড়ের চূড়া থেকে বেনোজল যখন মাটির ধোয়ানি নিয়ে প্রচণ্ড বেগে নীচের দিকে নামতে থাকে, সেই হলদেটে ঘোলা জলে প্রচুর পলি থাকে। বন্যার জল যখন সমতল জমির উপর ছড়িয়ে পড়ে তার গতিবেগ কিছুটা মন্থর হয়। জলের পলি থিতিয়ে পড়ে প্লাবিত অঞ্চলে তখন সরস মাটির পুরু আস্তরণ সৃষ্টি করে। নতুন ফসল ক্ষেতের মাটি থেকে যেটুকু রাসায়নিক সম্পদ আহরণ করে নেয়, বেনোজলের পলি নতুন করে সেই রাসায়নিক সম্পদ এনে দেয়। জমির উর্বরতা তাতে বাড়ে। প্রকৃতি যদি এইভাবে সেচকার্যের ভার গ্রহণ করে চাষীকে আর তাহলে যাযাবর হতে হয় না। ফসল বোনার আগে মাঝে মাঝে যদি বন্যা হয় তাহলে বছরের পর বছর সে এক জমি বুনে যেতে পারে।

যব বা গম যে বুনো ঘাস থেকে উদ্ভব হয়েছে, সেই ঘাস যে অঞ্চলে জন্মে এই ধরনের চাষ-আবাদ সেইখানে সম্ভব। তাই কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, জলসেচের সহায়তায় সর্বপ্রথম শস্য উৎপন্ন হয়েছে। সেই যুক্তি অনুসারে নীল নদের উপত্যকাকে প্রথম খাদ্যশস্য উৎপাদক দেশ বলে গণ্য করা হয়। মৌসুমী বর্ষণে আবিসিনিয়ার মালভূমিতে নীল নদের বুকে যখন জলস্ফীতি হত, দুকূল ছাপিয়ে সেইজলরাশি প্রতি হেমন্তে নেমে আসত। এমন সময় এই বন্যা আসত যে গ্রীষ্মের

তাপে শস্যের অঙ্কুর শুকিয়ে যাবার শঙ্কা থাকত না। কাজেই নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত এই বন্যা দেখে মানুষ হয়ত বীজ বোনার অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। শস্যের দানাও তাদের চেনা ছিল। আবাদ আরম্ভ করার আগে থেকে খাদ্য-সংগ্রাহক মানুষ বুনো যব ও গমের দানা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছে। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতে হয়, নীল নদের বন্যার পলির উপর ছড়ান কিছু শস্যের দানা সমস্ত আবাদী খাদ্যশস্যের বংশপতি।

কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদনের এই তত্ত্বের সমর্থনে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব আছে। নীল নদের উপত্যকায় যখন প্রাচীনতম কৃষিপল্লী গড়ে উঠেছিল, পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার গড়পড়তা বারিপাতের মাত্রা তখন আজকের চাইতে বেশী ছিল। কাজেই জলসেচ ব্যবস্থা যে খাদ্যশস্য উৎপাদনের একমাত্র আদি পদ্ধতি, এ কথা মনে করা যায় না। খাদ্য উৎপাদনের প্রেরণা দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল নিশ্চয়ই। উত্তর সিরিয়া, ইরাক এবং ইরানের মালভূমিতে বহু কৃষিপল্লীর নিদর্শন পাওয়া গেছে। কালবিচারে এই সব এলাকার কৃষিপল্লী মিশরীয় কৃষি-পল্লীর মত অত প্রাচীন না হলেও প্রায় সমসাময়িক। যাযাবর বাগান-চাষের পদ্ধতিকে যদি আদি কৃষি-পদ্ধতি বলে গণ্য করা যায়, তাহলে এই বিস্তারের কারণ অনায়াসে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু নীল নদের উপত্যকার এক বিশেষ ধরনের প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে শস্যোৎপাদনের যে পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেই পদ্ধতি প্রায় সমকালে ইরান ও মেসোপটেমিয়ার ভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে কি ভাবে চালু হতে পারে ঠিক বোঝা যায় না। ইউরোপ খণ্ডে খাদ্যশস্যের আবাদ কোদাল-চাষ দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। উত্তর আফ্রিকা আর দানিয়ুব অঞ্চল থেকে কোদাল-চাষীরা ছড়িয়ে পড়েছিল।

তাছাড়া পুরাকালের মিশরে চাষ-আবাদ করা বড় সহজ কাজ ছিল না। বহু জঙ্গলাকীর্ণ বিল ছিল নীল নদের উপত্যকায়। এই জলাভূমির জঙ্গলে জলহস্তী আর হিংস্র শ্বাপদের বাসা ছিল। কাজেই এখানে আবাদ করতে হলে প্রথমে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তারপর জঙ্গল সাফ করে শ্বাপদ তাড়াতে হবে। বেশ বড় সুসংগঠিত দল না হলে এই সব কাজ করা সম্ভব নয়। ভাল ভাল হাতিয়ার না থাকলেও কাজ হবে না। এই বাস্তব অবস্থার কথা স্মরণ রেখে মনে করা হয় যে নীল নদের বন্যার উপর নির্ভরশীল আবাদের পদ্ধতির চাইতে কোদাল-চাষের পদ্ধতি পুরান। সম্ভবতঃ কোদাল-চাষ থেকে পদ্ধতিটির উদ্ভব হয়েছে।

।। কৃষির সঙ্গে পশুপালন ।।

ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার যত কৃষিপল্লী পুরাবিদ্যাবিদেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, তার প্রায় প্রতিটি পল্লীর জীবনযাত্রা কৃষিকর্ম ও পশুপালনের মিশ্র-অর্থনীতির বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। খাদ্যশস্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের জন্য পশুপালন করা হত। নবোপলীয় আর্থিক বিধির এই বৈশিষ্ট্য সর্বত্র দেখা যায়। শিঙওয়ালা গরু, ভেড়া, ছাগল আর শুয়োর জাতীয় কয়েক প্রকার জন্তু খাদ্যের জন্য পালন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে মোরগ প্রভৃতি আরও কিছু পশুপক্ষী পালন করা হত। বুনো পশুকে পোষ মানাবার যে পদ্ধতি সম্ভাব্য বলে মনে করা হয়, পশ্চিম এশিয়ার পটভূমিকায় তার কথা বলছি।

গরু পালতে হলে পুষ্টিকর ঘাস চাই। জলসিক্ত মাঠ, প্রাকৃতিক জলাধার অথবা পাতলা বন-জঙ্গলের মধ্যেও গরু বাস করতে পারে। শুয়োরের জন্য জল-জঙ্গল অথবা বন-বাদাড় চাই। ভেড়া বা ছাগল শুকনো জায়গাতেও বাস করতে পারে। নেহাৎ মরুভূমি হলে অসুবিধা। পাহাড়ে দেশেও বেশ আরামে এরা বাস করতে পারে। বলকান পর্বতমালা থেকে হিমালয় পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র এককালে বুনো ছাগল পাওয়া যেত। বুনো ভেড়াও হয়ত এই সব পাহাড়ে ছিল। আফ্রিকায় বুনো ভেড়া ছিল বলে জানা যায়নি। এই থেকে বোঝা যায়, যেসব দেশে সর্বপ্রথম খাদ্যশস্যের আবাদ হয়েছে বলে মনে করা হয়, তার সর্বত্র গৃহপালিত পশুর পূর্বপুরুষ বসবাস করত। আফ্রিকায় বুনো ভেড়ার অস্তিত্ব ছিল না। তাই মিশর দেশে কৃষি ও পশুপালনের মিশ্র-অর্থনীতির গোড়াপত্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।

খাদ্যোৎপাদনের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হবার যুগে আদিমতম চাষী যে অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল, তুষার যুগের পর সেই শুকনো গ্রীষ্মমণ্ডলের আবহাওয়ায় গুরুতর পরিবর্তন দেখা দেয়। এই অঞ্চলে খাদ্যশস্যের বংশপতি বুনো ঘাস আর গৃহপালিত পশুর পূর্বপুরুষ পাওয়া যেত। ইউরোপ খণ্ডের বরফের আস্তরণ অপসৃত হয়ে গেলে অতলান্তিক মহাসাগরের বৃষ্টিবাহী বায়ুপ্রবাহ উত্তর দিকে সরে যায়। এই গতি পরিবর্তনের ফলে উত্তর আফ্রিকা আর আরব দেশে বারিপাতের মাত্রা হ্রাস পায়। যে বৃষ্টি এই অঞ্চলে হত, সেটা সরে গেল ইউরোপের দিকে। তার ফলে উত্তর আফ্রিকা এবং আরব দেশে শুষ্কতার সূত্রপাত হল। সহসা এই পরিবর্তন ঘটেনি নিশ্চয়ই। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে বারিপাতের মাত্রা সামান্য হ্রাস পেলেও তার ফল মারাত্মক না হয়ে পারে না। এই তারতম্যের ফলে নিরবচ্ছিন্ন তৃণভূমি বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হল। দু চারটে মরূদ্যান অবশিষ্ট রইল

মাত্র। পশু খাদ্যের তাতে নিদারুণ অনটন দেখা দিল যত্রতত্র খাদ্য পাবার সুযোগ রইল না।

বার ইঞ্চি বারিপাতের ফলে যেসব জীবজন্তুর পক্ষে অনায়াসে বেঁচে থাকা সম্ভব, পর পর বছর তিনেক যদি সেই বারিপাতের মাত্রা ইঞ্চি তিনেক কমে যায়, তাহলে সেই সব জন্তুর পক্ষে বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। খাদ্য ও জলের জন্য তৃণাশী জন্তুদের তখন দুর্লভ ঝরনা কিংবা নদীর পারে জড়ো হতে হয়। একমাত্র মরূদ্যানেই এই দুটি জিনিস মিলতে পারে। এতে বাঘ-সিংহ জাতীয় শ্বাপদের ভয়ও বাড়ে। কারণ এই সব শ্বাপদও ঠিক এক কারণে মরূদ্যানে এসে হাজির হয়। শিকারী মানুষকেও বাধ্য হয়ে এখানে আসতে হয়। বিপদের মাত্রা তাতে আরও বাড়ে। তার মানে শুষ্কতার বিপদ এড়াবার জন্য প্রাণে বাঁচার তাগিদে শিকার ও শিকারী উভয়ে মরূদ্যানে মিলিত হয়। কিন্তু শিকারী যদি চাষী হয়, তাহলে মরূদ্যানে সমাবেশিত উপবাসখিন্ন পশুপালকে কিছুটা খাদ্য সে দিতে পারে। সদ্য কাটা ফসলের খড়ের চাইতে আর কত ভাল খাবার জুটতে পারে মরূদ্যানে? তাছাড়া ফসল কাটার পর অনশনখিন্ন বলদ বা ভেড়া যদি ক্ষেতে চরতে আসে, তাহলেও চাষীর খুব আপত্তি করার কথা নয়। এই পশুপাল এত দুর্বল থাকে যে দৌড়ে পালাবার ক্ষমতা তাদের থাকে না। আবার এত বিশীর্ণ জন্তু শিকার করেও বিশেষ লাভ হয় না। সেই অবস্থায় ক্ষেত-খামারে চরার সময় মানুষ বরং তাদের স্বভাবের ধরন লক্ষ্য করার সুযোগ পায়। বন্য শ্বাপদ তাড়িয়ে তাদের রক্ষা করতে পারে। এমন কি উদ্বৃত্ত ফসল এনে তাদের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করতেও পারে। এইভাবে আদর-যত্ন পেলে পশুপালও স্বভাবতঃ মানুষের সহবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে কিংবা নিছক সখের জন্য নিশ্চয়ই প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিকারীরা বুনো জন্তুর শাবক পুষত। মাংসের উচ্ছিষ্টের লোভে বুনো কুকুর মানুষের আবাসে আসা যাওয়া করত। মানুষ তাতে বাধা দেয়নি। কিন্তু শুষ্কতার সূচনায় শুধুমাত্র দলছাড়া পশুশাবককে পোষ মানাবার সুযোগ পাওয়া যায়নি। বিরাট বিরাট পশুপালের মৃতাবশিষ্ট অংশকেও অনুগত করার সুযোগ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে বিভিন্ন বয়সের মাদী-মদ্দা ছিল নিশ্চয়ই। বস্তির আশে পাশে একদল আধ-পোষমানা পশু থাকার অর্থ হাতের কাছে সহজ-বধ্য শিকার থাকা। মানুষ যদি এ কথা উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে নিশ্চয়ই সে পশুপালনের দিকে ঝুঁকবে।

এই সহজলভ্য পশু শিকার করা না-করা সম্পর্কেও যথেষ্ট সংযম দেখাবার প্রয়োজন। নির্বিচারে বধ করে মাংস সংগ্রহ করা যায় না।

পারে এমন কাজ থেকেও নিবৃত্ত হতে হয়। বাচ্চা শিকার করলেও মানুষের ক্ষতি। সব চেয়ে নিরীহ পশুকেও বধ করা ক্ষতিকর। ধূর্ত কিংবা বেয়াড়া ষাঁড় অথবা ভেড়া যদি সাবাড় করা যায়, তাহলে বেছে বেছে প্রজননের ব্যবস্থা করা সম্ভব। যাদের বাগে আনা যাচ্ছে না তাদের যদি খতম করে ফেলা যায় তাহলে নিরীহ প্রকৃতির পশুদের প্রতি নির্বিঘ্নে আনুকূল্য দেখান যেতে পারে। এই সুযোগে পশুদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতিও কাছকাছি থেকে লক্ষ্য করতে হবে। তাহলে তাদের প্রজনন পদ্ধতি এবং খাদ্য ও জলের প্রয়োজন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যেতে পারে। শুধু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে হবে না। কাজও করতে হবে সেই অনুসারে। চাষ-আবাদের আইয়াম এলে এই পশুপালকে আর ক্ষেত-খামারে চরতে দেওয়া যায় না। কিন্তু তাদের তাড়িয়েও দেওয়া যায়নি। তখন জল ও খাদ্য আছে এমন আর এক জায়গায় এই পশুপালকে চরাতে নিয়ে যেতে হয় এবং হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য পাহারায় থাকতে হয়। এইভাবে কিছু কাল কাটাবার পর এমন একদল পশু হয়ত জন্মেছে, যারা যেমন শান্ত প্রকৃতির তেমন মানুষের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ তারা পোষ-মানা পশু হয়ে ওঠে।

এই রকম বিশেষ ধরনের আবহাওয়া যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং পোষ মানাবার উপযোগী জন্তু যদি মানুষের আবাসের কাছাকাছি আসা যাওয়া করে, তাহলে বুনো পশুকে বশে আনার উপরিউক্ত পদ্ধতি সফল হতে পারে। অনেক জাতের পশুকে পোষ মানাবার চেষ্টা করা হয়েছে সন্দেহ নেই। খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগেকার মিশরীয়রা শিঙওয়ালা হরিণের পাল পুষত। এই ধরনের প্রচেষ্টা কিংবা অজানা ভিন্ন ধরনের প্রয়াস শেষ অবধি সফল হয়নি। সৌভাগ্যবশতঃ গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল, আর শুয়োর এশিয়ার শুকনো অঞ্চলের বন্য পশুপালের মধ্যে পাওয়া যেত। তাই এরা মানুষের অনুগত হয়ে তাদের পোষ মেনেছিল।

নিরীহ অথবা গৃহপালিত পশু প্রথমে হয়ত শুধু খাদ্যের প্রয়োজন মেটাত। শিকার হিসাবে এগুলি সহজ-বধ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু গৃহপালিত পশু যে ভিন্ন কাজেও লাগতে পারে এই বোধ পরবর্তীকালে জেগেছে। চাষীদের হয়ত লক্ষ্য পড়েছে, পশুপাল যে জমিতে চরে সেখানকার ফসল ভাল হয়। এই থেকে তারা হয়ত শেষ অবধি সার হিসাবে গোবরের উপকারিতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। দুধ দোহানর পদ্ধতি আরও পরে শিখতে হয়েছে। কেন না কাছাকাছি থেকে শাবকের বাঁট টানার তাৎপর্য অনুধাবন না করে দুধের রহস্য জানা যায়নি। কিন্তু একবার যেই টের পেয়েছে, দুধ অমনি দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য হয়ে পড়েছে। পশুটি বধ না করে এই জিনিস পাওয়া যায়। তার মানে পুঁজি নষ্ট করতে হয়

না। এই ক্ষেত্রেও বহু বিচারের প্রশ্ন এসে পড়ে। যে বেশী দুধ দেয় তাকে আর বধ করা হয় না। তার বাচ্চাটাকেও বিশেষ যত্নে পালন করতে হয়। ভেড়া বা ছাগলের লোমের উপযোগিতা মানুষ আরও পরে উপলব্ধি করেছিল। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই জিনিস কাজে লাগান হয়েছে। প্রথমে সম্ভবতঃ গাছের আঁশ আর ভেড়ার লোম একসাথে বুনে কাপড় তৈরি করা হত কিংবা পিটে কম্বল তৈরি করা হত। নির্বাচিত প্রজনন ছাড়া পশম পাওয়া যায় না। বুনো ভেড়ার লোমকে পশম বলা যায় না। খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের পরেও মিশরীয়রা পশমের হদিস জানত না। কিন্তু মেসোপটেমিয়ায় তার আগে থাকতে ভেড়ার প্রজনন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভার বহন করা, লাঙল টানা এবং গাড়ি টানার কাজে গৃহ-পালিত পশুকে ব্যবহার করার কৌশল মানুষ আরও পরে শিখেছে। এই অগ্রগতি মানুষের আর্থিক জীবনধারার পরবর্তী পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত।

উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া এবং ইউরোপের নবোপলীয় যুগের আর্থিক ব্যবস্থার তাৎপর্য যদি বুঝতে হয়, তাহলে আবাদের আদি পদ্ধতি সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, পশুপালনকেও তার সঙ্গে একযোগে বিচার করতে হবে। গৃহপালিত পশুর সংখ্যা যদি কম হয় তাহলে পশুপালনের পদ্ধতি সম্পর্কে আগেকার বর্ণনা খাটে। ফসল কাটার পর পশুপালকে ক্ষেতে চরতে দেওয়া যায় এবং ফসলের সময় বস্তির কাছাকাছি অপর কোন স্বাভাবিক চারণক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া যায়। রাখালের কাজ করার ভার জনকয়েক তরুণ যুবকের উপর ছেড়ে দিয়ে দলের বাকি লোকজন স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারে। কিন্তু গৃহপালিত পশুর সংখ্যা যদি বেড়ে ওঠে, তাহলে তাদের খাদ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ঝোঁপ-জঙ্গল সাফ করে তখন ঘাসের জমি তৈরি করতে হয়। নদীর উপত্যকা পাওয়া গেলে সেখানে বিস্তীর্ণ গোচারণ ভূমি তৈরি করা যেতে পারে। পশুর খাদ্যের জন্য বিশেষ ধরনের শস্যেরও আবাদ করা যায়। তাছাড়া শুকনোর দিনে দূরের মাঠে চরাবার জন্য নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, ইরানে এবং এশিয়া মাইনরে গরমের দিনে পাহাড়ের উপর পশু চরান যায়। কিন্তু শীতকালে এই সব পাহাড় বরফে ঢাকা থাকে। কাজেই গরমের দিনে এবং বসন্তকালে পশুপালকে এই সব জায়গায় চরাতে নিয়ে যাওয়া হত। পল্লীবাসীদের অনেকে দুধ দোহার এবং বন্য শ্বাপদ তাড়াবার জন্য পশুপালের সঙ্গী হত। খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও এই রাখালদের সঙ্গে থাকত। সব ক্ষেত্রেই যে রাখালদের সংখ্যা বেশী হত তা নয়। তবে ইরান, পূর্ব সুদান কিংবা উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের মত শুকনো গরম অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামবাসী গরমের দিনে বস্তি

ছেড়ে পশুপালের সঙ্গী হয়ে পাহাড়ের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় চলে যেত। ঘর-দোর বা ক্ষেত-খামার দেখাশোনার জন্য সামান্য জনকয়েক মাত্র থাকত।

এই ধরনের রীতি থেকে পশুপালনের উপর প্রতিষ্ঠিত আর্থিক ব্যবস্থা অনায়াসে উদ্ভূত হতে পারে। এই আর্থিক ব্যবস্থায় কৃষিকর্মের ভূমিকা উপেক্ষণীয়। আরবের বেদুইন আর মঙ্গোলিয়ার দলগুলি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পশুপালকদের জীবনযাত্রার খুব বেশী স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যায় না। কারণ ইট-পাথরের ঘর-দোর তৈরি না করে তারা তাঁবু অথবা গুহাকন্দরে বাস করে। মৃৎ-পাত্রের বদলে চামড়ার থলি অথবা ঝুড়ি ব্যবহার করে। চামড়ার তৈরী আধার অথবা ঝুড়ি কালজয়ী হতে পারে না। তাঁবুর চিহ্নও খুব বেশী দিন থাকে না। তবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্মারকচিহ্ন খুব পাওয়া যায়নি বলে পশুপালকদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করা যায় না। এ কথা ঠিক যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পশুপালন আর কোদাল-চাষের আলাদা অস্তিত্ব ছিল এবং এই দুইটি আর্থিক ব্যবস্থার সহযোগে মিশ্র-আর্থিক বিধির উদ্ভব হয়েছিল। তবে পশুপালকদের জীবনের মধ্যে স্থিতিশীলতার অভাব আছে। বহু পশুপালক দল এখনও চাষ-আবাদ করে না। এই যাযাবরেরা যদি চাষ-আবাদ নাও করে, তবু আর্থিক দিক থেকে স্থিতিশীল চাষীদের উপর তাদের অবশ্যই নির্ভর করতে হবে। চাষীরা এদের দাস বা অধীন হতে পারে, তবু চাষীরা তাদের অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য।

পশুপালন ব্যবস্থার উৎপত্তি যে ভাবে হোক না কেন, এই ব্যবস্থার মারফত কৃষির মত আর এক ভাবে মানুষ তার খাদ্যের সরবরাহ সম্পর্কে কর্তৃত্ব লাভ করেছে। মিশ্র-আর্থিক ব্যবস্থায় এই দুটি পদ্ধতি সমান গুরুত্ব লাভ করেছে। আবাদ শব্দে যেমন বিভিন্ন পদ্ধতিতে খাদ্যোৎপাদন বোঝায়, মিশ্র-ফার্মিং বলতেও তেমনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই আর্থিক বিধির প্রয়োগ বোঝায়।

খাদ্যোৎপাদনের আর্থিক বিধি সহসা খাদ্য-সংগ্রহের স্থান দখল করে বসেনি। শিকার এখন ধনীর সখের ক্রীড়ায় পরিণত হয়েছে সত্য, কিন্তু মাছ ধরা এখনও বৃত্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এখনও এই বৃত্তি প্রতিটি মানুষের খাদ্য যোগাচ্ছে। খাদ্যোৎপাদনের আর্থিক বিধি চালু হবার পরেও পশুশিকার, পক্ষী-শিকার, মাছ ধরা, ফলমূল এবং শামুক সংগ্রহ করা প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। মাছ-মাংস, ফলমূল আর পিপড়ের ডিম তখন মানুষের খাদ্যের প্রধান উপকরণ ছিল। অতিরিক্ত উপকরণ হিসাবে শস্য ও দুধ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মাত্র। সম্ভবতঃ মেয়েরা তখন মাঝে-সাঝে চাষ-আবাদ করত, আর মরদেরা শিকার করত। মিশর ও ইরানের নবোপলীয় যুগের স্মারক-

চিহ্নের মধ্যে খাদ্য-সংগ্রাহক আর্থিক বিধির সঙ্গে শস্যোৎপাদন আর পশুপালনের সহ-অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। দুটি বৃত্তি সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্য-সংগ্রাহক বিধির গুরুত্ব হ্রাস পায়। পশুপক্ষী শিকার তখন এক একটি দলের বিশিষ্ট এক অংশের বৃত্তি অথবা ধর্মীয় ক্রীড়ায় পরিণত হয়। কিংবা আর্থিক দিক থেকে কৃষি-সভ্যতার উপর নির্ভরশীল অন্য কোন দলের বৃত্তি হয়ে পড়ে।

।। সঞ্চয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা ।।

প্রাথমিক পর্যায়ের খাদ্যোৎপাদক আর্থিক বিধির আরও দুটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক আছে। খাদ্যোৎপাদনের বিধি যে রকম হোক না কেন, তার মধ্যে উদ্বৃত্ত খাদ্য সঞ্চয়ের একটা প্রবণতা ও সুযোগ দেখা দেয়। ফসল কেটেই কেউ খেয়ে শেষ করে ফেলে না। গোটা বছর কিংবা আগামী ফসলের মরশুম পর্যন্ত হাতের ফসল মজুত রাখার চেষ্টা করতে হয়। তাছাড়া বীজের জন্যও কিছুটা শস্য আলাদা করে রাখা দরকার। মজুত রাখা খুব কঠিন নয়। তার জন্য দুটি জিনিস আবশ্যক। প্রথমতঃ প্রয়োজন আধারের, আর দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন দূরদর্শিতা এবং মিত-ব্যয়িতার। সঞ্চয়ের পক্ষে গোলা এমন অপরিহার্য যে গোলা তৈরীর জন্য অনেক ক্ষেত্রে বসতবাড়ি তৈরি করার চাইতে বেশী যত্ন নিতে হয়েছে। নবোপলীয় পল্লী হিসাবে মিশরের ফায়য়ুম প্রাচীনতম পল্লীর অন্যতম। চাটাই আর খড়ের ঝুড়ি দিয়ে সেখানকার মানুষ যে ধরনের শস্যের গোলা তৈরি করত, তার চিহ্ন পাওয়া গেছে।

এই তো গেল শস্যের কথা। গৃহপালিত পশু সম্পর্কেও মানুষকে যথেষ্ট হিসেবী হতে হয়েছে। শুকনোর দিনে বহু শ্রমে যেসব পশু বাঁচিয়ে রাখা গেছে, নির্বিচারে তাদের বধ করে খেয়ে ফেলা যায় না। তাহলে পাল থাকে না। পাল বাড়াতে হলে কিংবা দুধ পেতে হলে বকনা গরুর বাছুর আর ভেড়ীগুলিকে অন্ততঃ রেহাই দিতে হবে। একবার যদি এই সব কথা মাথায় ঢোকে, তাহলে খাদ্য-সংগ্রাহক মানুষের চাইতে খাদ্যোৎপাদক মানুষের পক্ষে বাড়তি খাদ্য সঞ্চয় করা সহজ হয়ে পড়ে। আবাদী জমির উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ক্রমান্বয় বেড়েছে। গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে গেছে। তার ফলে দলের দৈনন্দিন খাদ্যের জন্য যতটা শস্য অথবা মাংস প্রয়োজন তার চাইতে বেশী শস্য ও মাংস পাওয়া গেছে। খাদ্যশস্য মজুত করা এবং নিহত পশুর মাংসের চাইতে জ্যান্ত মাংস রক্ষা করা গরমের দেশে অনেক সহজ। এই মজুত খাদ্য দুর্দিনের সহায়। ফসল মারা গেলে এই মজুত খাদ্যের উপর নির্ভর করে বিপদ কাটান যায়। জনসংখ্যা বেড়ে গেলে বাড়তি খাদ্য দিয়ে সমাজের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করা যায়।

শেষ অবধি দ্রব্য বিনিময়ের মারফত এই সঞ্চয় দিয়ে ব্যবসায়িক লেনদেন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, এই আর্থিক বিধি স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্যোৎপাদনের সরল বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত মানবগোষ্ঠীকে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য দ্রব্য বিনিময়ের উপর নির্ভর করতে হয় না। বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করার প্রয়োজন তাদের হয় না। প্রয়োজনীয় খাদ্য তারা নিজেরা উৎপন্ন করে অথবা সংগ্রহ করে। হাতিয়ার তৈরীর জন্যও তারা হাতের কাছের সহজলভ্য কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে। দলের মানুষেরা নিজেদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় হাতিয়ার, বাসনপত্র অথবা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে।

তবে আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল বলে প্রতিটি দল পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, এমন কথা বলা যায় না। খাদ্যোৎপাদন বিধির মধ্যে যেমন বিভিন্নতা ছিল, তেমন খাদ্যের চাহিদা মেটাবার জন্য বিভিন্ন দল যুগপৎ বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করত। তার ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে স্বভাবতঃ পারস্পরিক যোগাযোগ সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন দলের রাখালদের সঙ্গেও গ্রীষ্মকালীন পশুচারণ ক্ষেত্রে দেখাশোনা হতে পারে। বিভিন্ন দলের মানুষ যখন মরু অঞ্চলে শিকারের অভিযানে বেরিয়েছে, মরূদ্যানে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে নিশ্চয়ই। এইভাবে বিভিন্ন দলের বিচ্ছিন্নতা ভেঙেছে। তার মানে নবোপলীয় দুনিয়ার মানবগোষ্ঠী মোটেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল না। বরং আর্থিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ পারস্পরিক যোগাযোগ-সম্পন্ন মানবগোষ্ঠীর মালা ছিল নবোপলীয় যুগের পৃথিবীতে। প্রতিবেশী দলের মধ্যে নিয়মিত কোন যোগাযোগ না থাকতে পারে। কিন্তু সাময়িক দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে তাদের যোগাযোগ বড় কম হত না।

॥ প্রয়োগ পদ্ধতির পার্থক্য ॥

আধুনিক অসভ্যদের জীবনযাত্রার রীতিনীতি এবং নবোপলীয় যুগের স্মারক-চিহ্নের ভিত্তির উপর খাদ্যোৎপাদনের সরল আর্থিক বিধির এই ছবি আঁকা হয়েছে। কিন্তু এই আর্থিকবিধি যে ঠিক এই পদ্ধতিতে এবং যুগপৎ একাধিক স্থানে পত্তন হয়েছিল, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কোন জায়গায় হয়ত এই আকারে এবং এই পদ্ধতিতে নবোপলীয় আর্থিক বিধি পুরোপুরি বাস্তব রূপ পায়নি। আবার বিভিন্ন স্থানে এক সময়ে এই আর্থিক বিধি চালু হয়েছে, এমন কথাও বলা যায় না। কারণ প্রাগৈতিহাসিক কালের কোন ঘটনার সমকালীনত্ব প্রমাণ করা যায় না। এমন কি মধ্য-মিশরের তাসা, ফায়্যুম আর

নীল নদের মোহানা অঞ্চলের নবোপলীয় আর্থিক বিধি সমকালীন কি না জানা যায়নি। মিশর আর উত্তর সিরিয়ার আর্থিক বিধির সমকালীনত্ব প্রমাণ করা আরও কঠিন। তবে মানুষের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথে এই আর্থিক বিধি যে সুস্পষ্ট একটি অস্থায়ী পর্যায়, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই স্তর অতিক্রম করে মানুষকে আধুনিক সভ্যতার দিকে এগোতে হয়েছে। পুরাবিদ্যা এত তথ্য-প্রমাণ আবিষ্কার করেছে যে এই আর্থিক বিধির সার্বজনীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। নীল নদের উপত্যকা অঞ্চলের তাসায়, তার মোহানা অঞ্চলে, মিশরের প্রাচীন এক হ্রদের পারে ফায়য়ুম পল্লীতে, উত্তর সিরিয়ার আলেপ্পো এবং মোসুলে, আর ইরানের মালভূমিতে এই আর্থিক বিধি সাত হাজার বছর আগে দেখা দিয়েছিল। কিছু পরে পত্তন হয়েছিল ক্রীট দ্বীপে, এশিয়া মাইনরের মালভূমিতে আর গ্রীসের থেসালি প্রভৃতি স্থানে। আরও কিছুদিন পরে স্পেন, উক্রাইন, বেসারবিয়া এবং দানিয়ুব নদীর ভাটিতে, হাঙ্গেরীর সমভূমিতে আর মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এই আর্থিক বিধির সন্ধান পাওয়া যায়। ইংলণ্ড সহ গোটা পশ্চিম ইউরোপে এই আর্থিক বিধি চালু হয়েছিল আরও অনেক পরে। ডেনমার্ক, উত্তর জার্মানি আর সুইডেনে এই ব্যবস্থা পত্তন হয়েছে মাত্র হাজার চারেক বছর আগে। পশ্চিম চীনে যেসব নবোপলীয় মানবগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের প্রাচীনত্ব এর চাইতে বেশী নয়।

এই সব খাদ্যোৎপাদক সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের হাতিয়ার, পাত্র, অস্ত্রশস্ত্র, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, আর্ট আর অলঙ্কারের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যের ছাপ সুপরিস্ফুট। এমন কি মূল আর্থিক বিধির প্রয়োগ-পদ্ধতির মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ইউরোপ আর পশ্চিম চীনের মানুষ ছিল যাযাবর কোদাল-চাষী। কিন্তু ক্রীট ও থেসালির চাষী সেই তুলনায় স্থিতিবান ছিল। শস্যোৎপাদন আর গবাদি পশু, ভেড়া ও শুয়োর পালন এবং শিকার পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দলের জীবনযাত্রায় সমান গুরুত্বসম্পন্ন ছিল। কিন্তু খাদ্যের প্রয়োজনে পশুপালন মধ্য ইউরোপে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। শিকারের গুরুত্ব ছিল আরও কম। নবোপলীয় যুগের চীনারা শুধু শুয়োর পুষত। মিশরের তাসাতে গবাদি পশু আর ভেড়া পোষার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু শুয়োরের কোন চিহ্ন নেই। আবার ঐ মিশরের ফায়য়ুম আর নীল নদের মোহানা অঞ্চলে শুয়োর প্রধান গৃহপালিত পশু ছিল। তাছাড়া উৎপন্ন শস্যের মধ্যেও প্রকারভেদ ছিল। এম্মার থেকে গম জন্মাত মিশর, আসিরিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপে। দানিয়ুবের মোহানা অঞ্চলের গম জন্মাত ভিংকেল থেকে। আবার সিরিয়া আর তুর্কীস্থানের

গম ছিল ভিন্ন জাতের। কাজেই নবোপলীয় সভ্যতা বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব ছিল না। বিভিন্ন জাতের মানবগোষ্ঠী বিভিন্ন প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করত। মাটি ও জল-বায়ুর এই পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে খাদ্যোৎপাদনের আর্থিক বিধির মূলনীতিকে তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রয়োগ করেছে। তার ফলে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে স্বভাবতঃ স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছে।

নবোপলীয় যুগের এই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিস্ময়কর নয়। এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে আছে সেই যুগের আর্থিক বিধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য—তার স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকৃতি। আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল বলে কোন সম্প্রদায়কে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল হতে হয়নি। প্রতিবেশীর উপর নির্ভরশীলতা ছিল না বলে প্রতিটি সম্প্রদায় বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে পেরেছে এবং স্বকীয় প্রতিভা অনুসারে নিজস্ব শিল্পরীতি গড়ে তুলতে পেরেছে।

তবে বাস্তবক্ষেত্রে পুরোপুরি আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা কোথাও দেখা দেয়নি। সর্বত্র প্রতিবেশী দলের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ এবং দ্রব্য বিনিময় হত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাময়িক লেনদেনের ফলে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই দ্রব্য বিনিময় কোন সম্প্রদায়ের আর্থিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল না। এই লেনদেনের মারফত যেসব দ্রব্য আমদানি করা হত, এক দিক থেকে তাকে বিলাসের সামগ্রী বলা যায়। তবু এই যোগাযোগ মানুষের অগ্রগতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই যোগাযোগের মাধ্যমে এক সমাজের ধ্যান-ধারণা অন্য সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। সমুদ্র, অরণ্য কিংবা জংলা পাহাড় পর্বতের ব্যবধান থাকলে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং ধ্যান-ধারণার প্রসার ব্যাহত হয়। তবে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল ভাগ এবং প্রাচ্যের শুকনো অঞ্চলে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সুযোগ ছিল বলে এই অঞ্চলে অতি দ্রুত ধ্যান-ধারণার ব্যাপক প্রসার হয়েছে।

।। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ।।

নবোপলীয় যুগের খাদ্যোৎপাদক আর্থিক বিধির প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে তারতম্য থাকলেও, জীবনসংগ্রামের এই নতুন কৌশল বহুভাবে সমাজের সকলের জীবন প্রভাবিত করেছে। জনসংখ্যার উপরেও তার প্রভাব না পড়ে পারে না। সেকালের জন্ম-মৃত্যুর এমন কোন খতিয়ান নেই যা থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব পাওয়া যেতে পারে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা সমধিক। খাদ্যসংগ্রাহক মানব-গোষ্ঠীর সংখ্যা খাদ্যের সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। নির্দিষ্ট কোন এলাকায়

শিকারযোগ্য পশু, মাছ এবং খাদ্যের উপযোগী ফলমূল প্রাপ্তির সম্ভাবনা দ্বারা এই সংখ্যা সীমিত হত। মানুষের চেষ্টায় এই খাদ্যের সরবরাহ বাড়ান সম্ভব হত না। বরং শিকার কিংবা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আহরণের মাত্রা যদি বেড়ে যায়, তাহলে সরবরাহের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে আসে। কৃষিকর্ম আরম্ভ হওয়ায় এই সীমাবদ্ধতার বাঁধ ভেঙে গেল। বেশী করে বীজ বুনে এবং বেশী জমি আবাদ করে খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হল। আবার লোক যদি বাড়ে তো জমি আবাদের লোকও বাড়বে। তাছাড়া শিশুরাও এক্ষেত্রে খাদ্যোৎপাদনের সহায়ক হতে পারে। শিকারীর কাছে শিশু বোঝার মত। বহুদিন লালন-পালন করলে তবে সে সমাজের বা সংসারের কাজে লাগতে পারে। চাষী কিন্তু অল্প বয়সেই শিশুকে খেতের কাজে লাগাতে পারে। তাকে দিয়ে জমির আগাছা তোলাতে পারে কিংবা পাখী বা জন্তু তাড়াবার কাজে নিয়োগ করতে পারে। ভেড়া বা গরু চরাবার ভারও অনায়াসে শিশুদের উপর ছেড়ে দেওয়া যায়। এই সব কারণে মনে করা হয়, নতুন আর্থিক বিধি পত্তন হবার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও বেড়েছিল।

জনসংখ্যা যে সত্যই দ্রুত বেড়েছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ পুরাবিদ্যার আবিষ্কারের মধ্যেও পাওয়া যায়। মিশরের ফায়য়ুম হ্রদের পারে পুরোপলীয় যুগের বিস্তর হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এই সব হাতিয়ার এত দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে যে নির্মাতাদের সংখ্যা নগণ্য ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু কৃষিকর্ম আরম্ভ হবার পরে এই হ্রদের পারে বহু জনবহুল পল্লী গড়ে ওঠে। শুধু এইখানেই নয়। নীল নদের উপত্যকার প্রথম জলপ্রপাত থেকে আরম্ভ করে কায়রো পর্যন্ত সারিবদ্ধ সমৃদ্ধ কৃষিপল্লী গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। জনসংখ্যা না বাড়লে কৃষিপল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হতে পারে না।

উত্তর ইউরোপের জংলা সমভূমিতেও এই ধরনের অবস্থা লক্ষ্য পড়ে। তুষার যুগের পরে এখানকার সমুদ্র সৈকতে, হ্রদের পারে অথবা জঙ্গলের বালুকাস্তীর্ণ স্থানে বিচ্ছিন্ন কিছু শিকারী আর মেছোর বস্তি ছিল মাত্র। একালের যত নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেগুলি সম্ভবতঃ কয়েক হাজার বছর ধরে তৈরি হয়েছে। কাজেই জনসংখ্যা তখন বেশী থাকতে পারে না। কিন্তু এর কয়েক শতাব্দী পরে প্রথমে ডেনমার্ক এবং তার পরে দক্ষিণ সুইডেন আর উত্তর জার্মানিতে বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরী বহু সমাধির চিহ্ন দেখা যায়। এই সব সমাধির কোন কোনটি এত বড় যে তার মধ্যে ত্রিশ কঙ্কাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেক লোক না হলে বিশাল বিশাল প্রস্তর খণ্ড দিয়ে এত বড় সমাধি তৈরি করা সম্ভব নয়। জনসংখ্যা যদি দ্রুত না বেড়ে থাকে তাহলে এই লোকবল এল কোথেকে? সত্য

ঘটে এই সব সমাধি যারা নির্মাণ করেছিল সেই চাষীদের পয়লা দলটি বহিরাগত মানুষ ছিল। স্পেন থেকে এসেছিল নৌকা করে উত্তর সাগর দিয়ে। কিন্তু বহিরাগতের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেশী ছিল না। কয়েকটি বহিরাগত পরিবারের বংশবৃদ্ধির ফলে এত বড় বড় সমাধি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল পাওয়া যেতে পারে না। উত্তরের পোড়ো জমিতে চাষ-আবাদ আরম্ভ করায় স্থানীয় শিকারীদের বংশও নিশ্চয়ই দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই উভয় দলের বর্দ্ধিত লোকবলের যুক্ত প্রচেষ্টায় এই সব সমাধি গড়ে উঠেছে, এ কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। তাছাড়া পুরোপলীয় যুগের যত কঙ্কাল ইউরোপ খণ্ডে পাওয়া গেছে তার তুলনায় নবোপলীয় যুগের কঙ্কালের সংখ্যা কয়েক শত গুণ বেশী। অথচ কালবিচারে ইউরোপের নবোপলীয় যুগ পুরোপলীয় যুগের ব্যাপ্তির শত ভাগের ভাগও নয়। এই সব কারণে পণ্ডিতেরা মনে করেন, মানব-সমাজের প্রথম বিপ্লবের পর অর্থাৎ খাদ্যোৎপাদনের আর্থিক বিধি পত্তন হবার পরে মানুষের সংখ্যা সত্যই অতিদ্রুত বাড়তে আরম্ভ করেছে।

॥ নবোপলীয় হাতিয়ার ॥

শস্যোৎপাদন আর পশুপালন ছাড়াও নবোপলীয় যুগের মানবসমাজে অনেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। সর্বত্র থাক বা না-থাক, বহু নবোপলীয় সমাজ এই সব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। কাঠের কাজ, মাটির পাত্র নির্মাণ আর কাপড় বোনা এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম।

নবোপলীয় বিপ্লবের সূচনায় উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার বারিপাতের পরিমাণ এখনকার চাইতে বেশী ছিল। এখনকার নিষ্পাদপ অঞ্চলে তখন প্রচুর গাছপালা জন্মাত। তুষার যুগের ইউরোপে যেসব জায়গায় তৃণভূমি এবং তুন্দ্রা অঞ্চল ছিল, এই সময় সেখানে বনভূমি সৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই মানুষ তখন কাঠ নিয়ে কারবার করতে বাধ্য হয়েছে। এই প্রয়োজনের তাগিদ থেকে পালিশ করা পাথুরে কুঠারের সৃষ্টি হয়। প্রাচীনপন্থী পুরাবিদ্যাবিদেরা এই কুঠারকে নবোপলীয় পর্যায়ের যুগ-প্রতীক বলে গণ্য করতেন। মিহিদানার পাথরের টুকরা দিয়ে হাতিয়ারটি তৈরী হত। একটি প্রান্ত ঘষে ঘষে কাটার উপযোগী করে ধারাল করা হত। অপর প্রান্ত লাঠি অথবা হরিণের শিঙের সঙ্গে বেঁধে নেওয়া হত।

পুরোপলীয় যুগের শেষের দিকে কুঠারের মত হাতিয়ারের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়নি। কাজেই সেই যুগের হাত-কুঠার থেকে এই হাতলওয়ালা কুঠারের উদ্ভব হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। নবোপলীয় যুগের সব হাতিয়ারের প্রান্ত

ধারাল। ঘষে ঘষে ধারাল করা হত। পাথরের উপর পাথর রেখে শস্যের দানা ভাঙার পদ্ধতি লক্ষ্য করে এই নতুন কৌশলের কথা মনে জাগতে পারে। কিংবা জমি খোঁড়ার জন্য লাঠির মাথায় হয়ত পাথরের টুকরা বেঁধে কোদাল তৈরি করা হত। বেলে মাটির সঙ্গে ঘর্ষণে এই পাথরের টুকরার অগ্রভাগ ক্ষয়ে ধারাল হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকেও ঘর্ষণের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হতে পারে।

প্রতিটি খাদ্যোৎপাদক পল্লীতে নবোপলীয় কুঠারের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই বলে এই নতুন আর্থিক বিধির প্রয়োজনে এই হাতিয়ারটি সৃষ্টি হয়েছে এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কৃষিকর্ম চালু হবার বহু পূর্বে কুঠারের মত হাতিয়ার ইউরোপের বলটিক অঞ্চলে ব্যবহৃত হত। হাড় বা শিঙের হাতিয়ারের ছাঁদে এই কুঠার তৈরি করা হত। চাষ-আবাদ এবং পশুপালন সম্পর্কে অজ্ঞ উত্তর ইউরোপের একদল বুনো মানুষ নিশ্চয়ই এই হাতিয়ার ব্যবহার করত। ইউরোপের বাইরেও বহু খাদ্যসংগ্রাহক দল হাতলওয়ালা কুঠার ব্যবহার করত। আবার প্যালেস্টাইনের নেতুফিয়ান দলটি কাস্তের সাহায্যে শস্যোৎপাদন করত। কুঠার তাদের ছিল না। কাজেই হাতলওয়ালা কুঠারকে নবোপলীয় আর্থিক বিধির অপরিহার্য প্রতীক বলে গ্রহণ করা যায় না।

যাই হোক, হাতিয়ারটি বেশ শক্ত। তার প্রান্তভাগ এমন ছিল যে কয়েক ঘায়ে ভোঁতা হয়ে বা ভেঙে যেত না। তাই এই হাতিয়ার দিয়ে মানুষ কাঠ কাটতে পারত। তার ফলে ছুতোরের কাজের সূচনা হয়। লাঙল, চাকা, তক্তার নৌকা এবং কাঠের ঘর তৈরি করতে কুঠার আর বাইস একান্ত প্রয়োজন। কাজেই হাতলওয়ালা কুঠার আবিষ্কৃত না হলে পরবর্তীকালের এই সব আবিষ্কার সম্ভব হত না।

॥ মৃৎপাত্রের সূচনা ॥

খাদ্যশস্য সঞ্চয়ের জন্য আধার প্রয়োজন। আবার রান্না করার জন্যও এমন পাত্র দরকার যা তরল পদার্থ ধরে রাখতে পারে এবং উত্তাপ সহ্য করতে পারে। এই দুটি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই হয়ত মাটির পাত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। পাত্র-নির্মাণ নবোপলীয় সমাজের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়। প্যালেস্টাইনের নেতুফিয়ানরা অবশ্য পাত্র ব্যবহার করত না। খাদ্যোৎপাদক আর্থিক বিধি চালু হবার আগেই হয়ত মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। জল ধরে রাখতে সক্ষম মাটির পলাস্তর লাগান ঝুড়ি অকস্মাৎ কখনও হয়ত আগুনে পুড়ে গেছে। তাতে সেই বাস্কেটের যে রূপান্তর হয়েছে তাই দেখে হয়ত বা মাটির পাত্রের কল্পনা উদ্ভূত হয়েছে।

কেনিয়া দেশে পুরোপলীয় যুগের মাটির স্তরে মাটির পলাস্তর লাগান ঝুড়ির কয়েকটি টুকরা পাওয়া গেছে। তাই দেখে এই সম্ভাবনার অনুমান করা হয়। তবে মৃৎপাত্রের আবিষ্কার যদি আগে হয়ে থাকে তাহলেও নবোপলীয় যুগে ব্যাপকভাবে মাটির পাত্র তৈরী হবার প্রমাণ পাওয়া গেছে। নবোপলীয় পল্লীর ধ্বংসাবশেষ সাধারণতঃ মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরায় আকীর্ণ।

বিজ্ঞানের সূচনা এবং মানুষের চিন্তাধারার বিকাশের পথে এই নতুন শিল্প বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মাটির পাত্র তৈরি করতে গিয়ে মানুষ হয়ত সর্বপ্রথম সচেতনভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাল। কুমারের মাটির বৈজ্ঞানিক নাম অ্যালুমিনিয়ামের হাইড্রেটেড্ সিলিকেট অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের রাসায়নিক সংযোগে অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর সিলিকেট পদার্থে গঠিত মাটি। মৃৎপাত্র নির্মাণ করতে গিয়ে উত্তাপের সাহায্যে এই যৌগিক পদার্থ থেকে জলের অণু নিষ্কাশন করা হয়। ভিজা মাটির ডেলা নরম। বেশী জল পড়লে গলে যাবে আবার শুকিয়ে গেলে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু ৬০০ ডিগ্রীর বেশী তাপমাত্রার সাহায্যে যদি মাটির জলীয় অণু নিষ্কাশন করা হয়, তাহলে আর তার নমনীয়তা থাকে না। ডেলাটি তখন জমাট বেঁধে যাবে। গুঁড়িয়ে কিংবা গুঁতিয়ে ভেঙে না ফেললে তার আকার বদলাবে না। কুমারের শিল্পের বাহাদুরি এইখানে যে মাটির ডেলাকে সে ইচ্ছামত আকারে রূপান্তরিত করতে পারে এবং আগুনে পুড়িয়ে সেই আকারে স্থায়িত্ব আরোপ করতে পারে।

বস্তুর এই গুণগত রূপান্তর প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কাছে নিশ্চয়ই ভোজবাজি বলে মনে হয়েছে। ধুলো-কাদাকে পাথর হতে দেখে ভেলকি বলে মনে করা নিতান্ত স্বাভাবিক। তাছাড়া বস্তুর স্বরূপ এবং একত্ব সম্পর্কে দু চারটে দার্শনিক প্রশ্নও মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়।

যাই হোক, উপরে যে রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা বলা হল, সেই পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে মৃৎপাত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই কৌশল বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে আরও নতুন জিনিস শিখতে হয়েছে। পাত্র তৈরি করতে ভিজা মাটি দরকার। কিন্তু ভিজা মাটির পাত্র সরাসরি আগুনে পোড়ালে ফেটে যায়। রোদের তাতে কিংবা আগুনের কাছাকাছি রেখে মাটির জলীয় অংশ খানিকটা শুকিয়ে তবে আগুনে পোড়াতে হয়। তাছাড়া যে কোন মাটি হলে চলবে না। বেছে নিতে হবে। সেই নির্বাচিত মাটি পাত্র-তৈরীর উপযোগী করে নিতে হবে। মাটির মধ্যে যদি বড় বড় কাঁকর থাকে, তাহলে পাত্রটি দেখতে ভাল হবে না। আবার কাঁকর যদি একেবারে না থাকে তাহলেও মাটি বেশী

আঁঠাল হয়ে যাবে। আগুনে পোড়াবার সময় ফেটে যাবে। এই অসুবিধা এড়াবার জন্য মাটির মধ্যে খানিকটা বালি, গুঁড়ান পাথর অথবা শুক্তি কিংবা খড়ের কুচি মিশিয়ে দেওয়া আবশ্যক।

পোড়াবার সময় মাটির স্বাভাবিক গড়নই শুধু বদলায় না। তার রঙও পালটে যায়। পোড়াবার পর মাটির রঙ পালটে কি হবে, তা নির্ভর করে পোড়াবার পদ্ধতি এবং মাটির রাসায়নিক মিশ্রণের উপর। অধিকাংশ মাটির মধ্যে লোহার মরচে (আয়রন অক্সাইড) থাকে। পোড়াবার সময় গরম পাত্রে যদি অবাধে হাওয়া লাগে তাহলে তার রঙ রাঙাটে হবে। লোহা অক্সিডাইজ্‌ড হয়ে রাঙা ফেরিক অক্সাইড সৃষ্টি করবে। আবার পাত্রটি যদি জলন্ত কয়লায় পরিবেষ্টিত থাকে, তাহলে তার রঙ ফ্যাকাশে কালো হবার সম্ভাবনা। কারণ ফেরেসোফেরিক অক্সাইডের রঙ কালো। মাটির মধ্যে কার্বনের অংশ বেশী থাকলেও রঙ কালো হতে পারে। এই সব রাসায়নিক পরিবর্তনের রহস্য বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে না জেনে মৃৎপাত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। মাটির পাত্রের রঙ প্রথম দিকে হয়ত স্থানীয় অবস্থা এবং হাতের কাছের মাটি ও জ্বালানির প্রকৃতি দ্বারা নিরূপিত হত। রঙ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল, এমন কি মাটির পাত্রের গায়ে নকশা আঁকার কৌশল আয়ত্ত হয়েছে পরে।

কাজেই কুমারের কাজটি বেশ জটিল। বহু ক্রিয়া-পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়েছে। ছোটখাট পাত্র তৈরি করা তবু সহজ। কিন্তু বড় পাত্রের ঝামেলা অনেক বেশী। গোটা পাত্র একসঙ্গে তৈরি করা সম্ভব নয় বলে তার মুখের ও তলার অংশ আলাদাভাবে তৈরি করে নিতে হয়। তারপর পেটের বেড়ের সমান পট্টি তৈরি করে উপর ও নীচের অংশ দুটি সুকৌশলে জোড়া দিয়ে তবে একটি বড় পাত্র তৈরি করা যায়। এই কাজে বেশ কয়েক দিন সময়ও লাগে।

কুমারের শিল্পের গঠনমূলক রূপটি মানুষের মানসলোকে নিশ্চয় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই মৃৎপাত্র। মাটির একটি তাল নিয়ে খুশিমত তার রূপ দেওয়া যায়। পাথরের কিংবা হাড়ের হাতিয়ার তৈরি করতে গিয়ে শিল্পীকে খানিকটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। পাথর বা হাড়ের স্বাভাবিক আকারকে খুশিমত পালটে দেওয়া যায় না। কুমারের শিল্পে এই সীমাবদ্ধতা নেই। তবে কুমারের শিল্পের এই স্বাধীনতা প্রথম দিকে পুরোপুরি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। কারণ কল্পনা কখনও শূন্যতার মধ্যে কাজ করতে পারে না। একটা অবলম্বন থাকা চাই। জ্ঞাত কোন জিনিস অবলম্বন করে তার ছাঁচে

নতুন জিনিস সৃষ্টি করা যেতে পারে। তাছাড়া মাটির পাত্র মেয়েরা তৈরি করত তাদের নিজেদের ব্যবহারের প্রয়োজনে। গৃহস্থালীর জন্য। মেয়েরা সাধারণতঃ আমূল পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকে পড়তে কুণ্ঠা বোধ করে। কাজেই প্রাচীনতম পাত্রগুলি পরিচিত আধার, অর্থাৎ কুমড়া, মূত্রাশয়, ঝিল্লী, চামড়া, ঝুড়ি, এমন কি মাথার খুলির ছাঁচে তৈরী হয়েছে। পরিচিত জিনিসের সঙ্গে সাদৃশ্য বাড়াবার জন্য পাত্রের গায়ে ঝুড়ির বুননির অথবা কুমড়ার বোঁটার নকশাও আঁকা হত। তাতে নতুন সৃষ্টিটি সাবধানী গৃহিণীদের চোখে তেমন অভিনব মনে হত না হয়ত বা।

॥ তকলি আর তাঁত ॥

মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার নবোপলীয় পল্লীর স্মারকচিহ্নের মধ্যে বয়নশিল্পেরও সূচনা দেখা গেছে। প্রথমে সুতী কাপড় এবং পরে পশমী কাপড় এই সময় চামড়ার পরিচ্ছদের এবং পাতার স্কার্টের বদলে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। এই নতুন আবিষ্কারের জন্য আরও কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ আবশ্যক। আরও একদফা জটিল আবিষ্কার প্রয়োজন হয়েছে কাপড় বোনার কৌশল আয়ত্ত করতে। প্রথমেই আবশ্যক সুতোর মত লম্বা আঁশওয়ালা জিনিসের। ফায়য়ুম হ্রদের তীরবাসী নবোপলীয় মানুষ শণের ব্যবহার আগে থাকতে জানত। গাছটি বেছে নিয়ে নিশ্চয় তারা খাদ্যশস্যের সঙ্গে সঙ্গে তার আবাদ আরম্ভ করেছিল। এশিয়ায় হয়ত আর এক জাতের শণ ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। সুইজারল্যাণ্ডের নবোপলীয় মানুষ ভিন্ন এক জাতের শণ ব্যবহার করত।

শণ বেছে নেবার আগে অন্যান্য জিনিসও পরখ করে দেখা হয়েছে নিশ্চয়ই। খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের অব্যবহিত পরে সিন্ধু উপত্যকায় তুলার চাষ আরম্ভ হয়েছে। মেসোপটেমিয়ার মানুষও ঠিক এক সময়ে পশমের ব্যবহার আরম্ভ করে। নির্বাচিত প্রজননের সাহায্যে পশম-প্রসূ মেষ জন্মাবার আগে ভেড়া বা ছাগলের লোম দিয়ে হয়ত কাপড় বোনা হয়েছে। কাজেই শুধু শণ, তুলা বা পশম জাতীয় জিনিস চিনলেই বয়নশিল্প গড়ে তোলা যায় না। তার জন্য নির্দিষ্ট কয়েক জাতের গাছের আবাদ করতে হবে, নির্বাচিত প্রজনন-পদ্ধতি সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে।

সুতো কাটতে শেখা এই শিল্পের আর একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। সুতো কাটার জন্য যে যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তার মধ্যে পুরাবিদ্যাবিদেরা শুধু তকলির প্রমাণ পেয়েছেন। একখানা কাঠির মাথায় পাথর বা মাটির চাকতি লাগিয়ে তকলি তৈরি করা হত। সেকালের কাপড়ের নমুনা কিংবা কাপড় তৈরীর

জন্য ব্যবহৃত কাঠের সরঞ্জাম বড় পাওয়া যায়নি। তবে তাঁতের ব্যবহার যে নবোপলীয় যুগেই আরম্ভ হয়েছে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। যন্ত্র হিসাবে এটি বেশ জটিল যন্ত্র। কারা এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিল জানা যায়নি। তবে আবিষ্কারটি যে মানুষের সৃজনী বুদ্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

।। শিল্পশিক্ষার পদ্ধতি ।।

এই যেসব শিল্পের কথা বলা হল তার প্রত্যেকটি কুটির শিল্প। কিন্তু কারিগরী দক্ষতা ছাড়া কুটির শিল্পের কাজও করা যায় না। সেই দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষানবীসী এবং অভ্যাস প্রয়োজন। নবোপলীয় সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কর্ম-বিভাগ থাকতে পারে, কিন্তু দক্ষতা অনুসারে শ্রম-বিভাগ ছিল না। এখনও এই কর্ম-বিভাগের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোদাল-চাষীদের মধ্যে চাষ-আবাদ, পাত্র তৈরী এবং বোনার কাজ মেয়েরা করে। পুরুষেরা শিকার করে, মাছ ধরে এবং ছুতোরের কাজ করে। প্রয়োজনীয় হাতিয়ারও পুরুষেরা তৈরি করে। এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। কাপড় বোনা উত্তর আমেরিকার যোরুবাদের মধ্যে পুরুষের কাজ।

কোদাল-চাষ থেকে আরম্ভ করে কাপড় বোনা পর্যন্ত নবোপলীয় যুগের যত শিল্পের কথা বলা হয়েছে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করে তার কোন শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই সব শিল্প পত্তন করতে হয়েছে। সব কয়টি শিল্প বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ থেকে উদ্ভূত। অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বাস্তব জ্ঞান ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে আর সম্প্রসারণশীল এই জ্ঞান প্রতিটি শিল্প নিয়ন্ত্রিত করেছে। পুরুষ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়েছে এই বাস্তব অভিজ্ঞতা। বাপের কাছ থেকে ছেলে শিখেছে। আবার ছেলের কাছ থেকে শিখেছে তার বংশধর। কোন্ জমি আবাদ করলে ফসল ভাল হবে, কোন্ সময় জমিতে কোদাল লাগাতে হবে, শস্যের অঙ্কুর আর আগাছার অঙ্কুরের পার্থক্য কি করে বোঝা যাবে, এই সব তথ্য চাষীর ছেলেকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখতে হয়েছে। কুমারের সন্তানকেও শিক্ষানবীসী করে শিখতে হয়েছে তার শিল্পের প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিস। এইভাবে শিল্পগাথা গড়ে উঠেছে। এক দিক থেকে এই গাথাকে ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আর রসায়নশাস্ত্রের টুকরা খবর বলা যায়। আধুনিক কালের বর্বরদের আচরণ-পদ্ধতি থেকে মনে হয়, আমরা যাকে অর্থহীন যাদুবিদ্যা বলে থাকি তার সঙ্গে অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সিদ্ধান্তের যোগাযোগ

নিবিড়তম। তাই এক একটি নির্দিষ্ট ধর্মাচরণ প্রতি শিল্পের প্রতিটি প্রক্রিয়ার অনুসঙ্গী হয়ে আছে। এই দুই রকম ক্রিয়াই (বাস্তব ও যাদুক্রিয়া) কারিগরী ঐতিহ্যের অঙ্গ। বাপ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের মারফত তার সন্তানের হাতে এগুলি তুলে দিয়ে যেত। মেয়ে মাকে মাটির পাত্র তৈরি করতে সাহায্য করত। নিবিষ্ট মনে সে মায়ের কাজ লক্ষ্য করত, তাকে নকল করত, আবার তার কাছ থেকে উপদেশও নিত। এইভাবে শিখতে হয়েছে মেয়েকে। তার মানে এই দাঁড়ায় যে শিক্ষানবীসীর মাধ্যমে নবোপলীয় যুগের ফলিত-বিজ্ঞান পুরুষ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়েছে।

নবোপলীয় যুগের শিল্প ঘরোয়া শিল্প সন্দেহ নেই। কিন্তু এই শিল্পের ঐতিহ্য যৌথ ঐতিহ্য। কোনটি ব্যক্তিগত ঐতিহ্য নয়। সমাজের সকলের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়ত জড়ো হয়ে এই ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। আধুনিক কালের আফ্রিকার পল্লীতে গৃহিণীরা অন্তরালে বসে মৃৎপাত্র তৈরি করে না কিংবা সেই পাত্র পোড়ায় না। গাঁয়ের সমস্ত মেয়ে একসাথে কাজ করে। এমন কি পরস্পরকে সাহায্যও করে। বৃত্তিটি প্রকাশ্যে আচরণীয়। সকলের অভিজ্ঞতার সমষ্টি ফলের মধ্য দিয়ে পাত্র নির্মাণের নিয়ম-কানুন গড়ে ওঠে। এই কারণেই হয়ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে কোন নবোপলীয় পল্লীর শিল্প-নিদর্শনের মধ্যে একটা একঘেয়ে সমধর্মিতা লক্ষ্য পড়ে। সব কয়টি নিদর্শন যৌথ ঐতিহ্যের চিহ্ন বহন করে।

সমবেত চেষ্টা ছাড়া নবোপলীয় আর্থিক বিধির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। জঙ্গল সাফ করা কিংবা বিলের জল নিষ্কাশন করার মত কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ সমবেত চেষ্টা ছাড়া সফল হতে পারে না। নালা খোঁড়া কিংবা বন্য অথবা হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বস্তির চারপাশে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যও সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন। মিশর কিংবা পশ্চিম ইউরোপের নবোপলীয় পল্লীর ঘর-বাড়ি সার বেঁধে তৈরি করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, সমাজের ক্রিয়াকাণ্ডের সমন্বয়-সাধন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন একটা সামাজিক সংগঠন অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেই সংগঠনের রূপ বা প্রকৃতি সঠিক জানা যায়নি। একটা জিনিস খুব সম্ভাব্য বলে মনে হয়। নবোপলীয় যুগের সামাজিক সংগঠন সাধারণতঃ ছোট ছিল। থেসালির (গ্রীস) একটি পল্লীর আয়তন মাত্র এক একর ছিল। পল্লীটি অবশ্য নবোপলীয় যুগের উত্তর ভাগের। আবার মধ্য ইউরোপের যত নবোপলীয় সমাধি পাওয়া গেছে তার কোনটিতে বিশটির বেশী কবর ছিল না। তবে প্রতিটি সমাধিস্থানে কত জনের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়েছে, সে খবর জানা যায়নি। সাম্প্রতিক কালের

কোদাল-চাষীদের মধ্যে পুরান পল্লী ভেঙে নতুন পল্লী গড়ে তোলার একটা প্রবণতা দেখা যায়। বিয়ের পরে কিছু যুবক অন্যত্র গিয়ে নূতন পল্লী গড়ে তোলে। প্রবীণদের খবরদারি এখানে থাকে না। স্বাধীনভাবে বউ নিয়ে বসবাস করার বাধা কম। তাছাড়া নতুন বস্তির কাছাকাছি নতুন আবাদী জমি থাকায় ক্ষেতে যাওয়া আসা করতে খুব বেশীদূর হাঁটাহাঁটি করতে হয় না। গাঁয়ের জনসংখ্যা যদি বেড়ে যায় এবং কাছাকাছির সব জমি যদি আবাদ হয়ে যায়, তাহলে নূতন বস্তি গড়ে তোলা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আবাদের নতুন জমি যদি পাওয়া যায়, তাহলেই এই ভাবে পৃথক হওয়া সম্ভব। কিন্তু জমির অভাব অন্ততঃ নবোপলীয় যুগে ছিল না।

।। সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি ।।

সমবেত ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে নবোপলীয় যুগজীবনের সেই বৈশিষ্ট্য যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। এই সব সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থা যে যাদুবিদ্যাশ্রয়ী ধর্মের বিধিবিধান দ্বারা প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত হত, সে বিষয়েও সংশয়ের অবকাশ নেই। নবোপলীয় বিপ্লবের ফলে মানুষ যেসব নতুন শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে, নতুন নতুন শিল্প চালু করে যে নতুন জ্ঞান অর্জন করে তার ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গীর নিশ্চয় পরিবর্তন হয়েছিল। এই নতুন জ্ঞান তার ধর্ম, তার সামাজিক সংগঠনেরও পরিবর্তনসাধন করেছে। কিন্তু নবোপলীয় যুগের সামাজিক সংগঠন এবং নবোপলীয় যুগের ধ্যান-ধারণা সাংগঠনিক দিক থেকে কোন্ রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তার খোঁজ জানার উপায় নেই।

আবার নবোপলীয় আর্থিক বিধির উপর কি ধরনের সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে অনুমান করেও লাভ নেই। কারণ ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে সেই অনুমানের মধ্যে প্রতিফলিত হবে এমন কথা বলা যায় না। তাছাড়া সেকালের গুটিকয়েক স্থানের স্মারকচিহ্নের ভিত্তিতে সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে সর্বদেশ-গ্রাহ্য কোন মন্তব্য করাও সমীচীন নয়। আবার আধুনিক কালের অসভ্যদের রীতি-নীতি অথবা প্রতিষ্ঠান থেকেও ছয় হাজার বছর আগেকার অসভ্য মানুষের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ঠিকানা জানা যায় না। আর্থিক বিধিবিধানের দিক থেকে দুটি মানবগোষ্ঠী সমস্তরে থাকলেও, কালগতভাবে উভয়ের মধ্যে পাঁচ হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে। মানবসমাজে ইতিমধ্যে এমন বহু বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে যার প্রভাব বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। এই সব বিপ্লবের কোন প্রভাব আধুনিক

যুগের অসভ্যদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী কোনভাবে প্রভাবিত করেনি এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

প্রকৃতপক্ষে গুটিকয়েক সাধারণ নীতি এবং ধ্যান-ধারণার ভিন্নরূপী বাস্তব প্রয়োগ ছাড়া 'নবোপলীয় সভ্যতা' বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই 'নবোপলীয় রাজনৈতিক সংস্থা' অথবা 'নবোপলীয় ধর্মে'র আলোচনা করেও লাভ নেই। সত্যই এমন কোন জিনিসের অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ। নবোপলীয় বিপ্লব আসলে কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে মানবসমাজে এই জীবনধারা দেখা দিয়েছে। খাদ্যসংগ্রাহক শিকারী মানুষের সামাজিক সংস্থা আর যাদুবিদ্যাশ্রয়ী ধর্মীয় বিশ্বাস এই পরিবর্তনের কয়েকটি পর্যায়ে সংশোধিত হয়েছে বটে কিন্তু নতুন আর্থিক বিধিসম্মত নতুন সামাজিক রীতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক পরে। তার আগে পরবর্তী অর্থনৈতিক বিপ্লবের সূচনা হয়ে গেছে। বাঁধাধরা কোন মতবাদ অথবা দৃঢ়মূল কোন সামাজিক সংস্থা ছিল না বলেই হয়ত, দুই হাজার বছরের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম দ্রুত উন্নতি লাভ করে শিল্প-বাণিজ্যসমৃদ্ধ শহরে পরিণত হতে পেরেছে। দৃঢ়মূল কুসংস্কার অথবা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্থা সামাজিক পরিবর্তনের পরিপন্থী। এই প্রতিক্রিয়াশক্তি কতটা প্রভাব বিস্তার করবে তার মাত্রা আবার সমাজের আর্থিক নিরাপত্তার মাত্রার উপর নির্ভর করে। যে দল সব সময় কোন-মতে উপবাস এড়িয়ে চলে, তারা সাধারণতঃ পরিবর্তনের ঝুঁকি নিতে চায় না। কেন না চিরাচরিত যে রীতি তাদের অন্ন যোগাচ্ছে তার সামান্য ব্যতিক্রম ঘটলে গোটা দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। এই শঙ্কা মনে থাকায় যাদুবিদ্যার রহস্যময় শক্তিকেও তারা রুষ্ট করতে ভরসা পাবে না। সেই রহস্যময় শক্তি যদি বিমুখ হয়, তাহলেও তো সর্বনাশের সম্ভাবনা।

প্রথম বিপ্লবের পরেও স্বয়ংসম্পূর্ণ চাষীদের ছোট ছোট দলের জীবনযাত্রা বড় অনিশ্চিত অবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। অনাবৃষ্টি কিংবা শিলাবৃষ্টি হলে আকালের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। জগৎজোড়া বাণিজ্যের সূচনা তখনও হয়নি। কাজেই ভিন্ন অঞ্চলের বাড়তি খাদ্য আমদানি করে অন্নকষ্ট দূর করার সুযোগ ছিল না। তাছাড়া সামান্য কয়েক রকম খাদ্যের উপরে তাদের নির্ভর করতে হয়েছে। যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই খাদ্য সাবাড় হয়ে যেতে পারে। শিকার ও গৃহপালিত পশুসহ ক্ষেতের ফসল পর্যন্ত বিপর্যয়ের ফলে শেষ হয়ে যেতে পারে। এমন বাড়তি খাদ্য মজুত থাকতে পারে না যার উপর ভরসা করা যায়।

কাজেই প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষক দল জানত, তার অস্তিত্ব রোদ ও বৃষ্টি, বজ্র

ও ঝড় নিয়ামক শক্তির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই সব শক্তি বড় খামখেয়ালী। বড় মারাত্মক তাদের হালচাল। তাই যে কোন উপায়ে হোক এই সব শক্তিকে তুষ্ট করতে হবে। একবার যদি মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মে যে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া দ্বারা এই শক্তিকে প্রশমিত করা যায়, কিংবা নির্দিষ্ট যাদুক্রিয়া বলে তাদের বশে আনা যায়, তাহলে সেই বিশ্বাস মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে পড়বে এবং বিপদের মধ্যে সান্ত্বনা দেবে। তখন কেউ এই বিশ্বাস ত্যাগ করতে ভরসা পাবে না। যাদুক্রিয়ার উপর এই ধরনের আস্থা মানুষের মনে একবার যদি দৃঢ়মূল হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপ্লবের প্রসার বাধা না পেয়ে পারে না। তাছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা সম্পর্কে বিশ্বাস, রাজার দেবত্ব এবং পিতৃপুরুষের আত্মার প্রভাবজাতীয় দৃঢ়মূল সংস্কার, বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিঘ্নিত না করে পারে না। বিভিন্ন পুরীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে আন্তর্জাতিক আর্থিক বিধি গড়ে তোলার পথেও এই সংস্কার বাধা সৃষ্টি করে। মনে হয়, প্রথম বিপ্লব যখন যাদুবিদ্যার উপযোগিতা এবং তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ফলাফলের উপর মানুষের আস্থা শিথিল করে এনেছে, ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের আর্থিক বিপ্লবের নতুনতর ভাবধারা এবং সেই সঙ্গে তার আবিষ্কার দেখা দিতে আরম্ভ করে। হয়ত নবোপলীয় আর্থিক বিধিসম্মত নতুন সংগঠন এবং নতুন ভাবধারা দৃঢ়মূল হবার আগেই প্রাচ্য দেশে নবোপলীয় আর্থিকবিধিতে ভাঙন শুরু হয়েছে।

তবু নবোপলীয় যুগে যেসব প্রতিষ্ঠান ছিল অথবা ছিল না তার সম্পর্কে খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। ক্ষেত্র বিশেষে এই সব প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয় বিপ্লবের সমকালীন প্রতিষ্ঠানের আচার ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। নীল নদের উপত্যকায় টোটেম দলের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সব দল পরবর্তীকালের নবোপলীয় পল্লী গড়ে তুলেছে বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক যুগে এই সব পল্লী যখন ধর্মীয় রাজধানীতে পরিণত হল, তখন তাদের নামকরণ হয়েছিল টোটেম-জন্তু হাতি অথবা বাজপাখীর নাম অনুসারে। প্রাগৈতিহাসিক কালের মৃৎপাত্রের গায়েও এই সব টোটেম-জন্তুর নকশা আঁকা আছে। আধুনিক কালের খাদ্যোৎপাদক দলের মধ্যে এই ধরনের টোটেম দলের অস্তিত্ব বিরল নয়। এগুলি হয়ত নবোপলীয় যুগের স্মারকচিহ্ন।

টোটেম দলের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া গেলেও দলপতি বলে কিছু ছিল কি না সঠিক জানা যায়নি। নবোপলীয় যুগের পূর্ব ভাগের সমাধি অথবা পল্লীতে দলপতিত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাব আছে। সম্মানিত ব্যক্তির সমাধি বলে গণ্য করা যায় এমন কোন সমাধি, অথবা প্রাসাদ বলে মনে করা যায়

এমন কোন বাড়ি নবোপলীয় পল্লীর স্মারকচিহ্নের মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে সাধারণ বাসগৃহের চাইতে বড় বাড়ি ইউরোপের কিছু নবোপলীয় পল্লীতে দেখা গেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপবাসীরা অবিবাহিতদের জন্য যেসব বাড়ি তৈরি করত সেগুলিও বড়। ইউরোপের এই সব বড় বাড়িও সেই ধরনের কোন সামাজিক মিলনকেন্দ্র হতে পারে। তাছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহের সুনিশ্চিত প্রমাণও নেই। নবোপলীয় সমাধির মধ্যে যেসব অস্ত্র পাওয়া গেছে, সেগুলি যুদ্ধাস্ত্র না হয়ে শিকারের হাতিয়ারও হতে পারে। কাজেই দলপতির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়।

মানুষের জীবনসংগ্রামের এই নতুন বিধিতে নারীজাতি এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। খাদ্যোৎপাদন এবং শিল্প-পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ভূমিকা ছিল মেয়েদের। তাতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। তবে সত্যই তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছিল কি না সঠিকভাবে বলা যায় না।

সেকালের যাদুবিদ্যাশ্রয়ী ধর্মাচরণ সম্পর্কে বলা যায় যে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে নবোপলীয় মানুষের মনোভাব পুরোপলীয় যুগের মানুষের মনোভাবের তুলনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কিছু নবোপলীয় পল্লীতে সমাধির অস্তিত্ব না থাকলেও মৃতদেহ সাধারণতঃ সযত্নে সমাধিস্থ করা হত। সেই সমাধিতে মৃতের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে খাদ্য, পানীয়, আধার, প্রসাধন দ্রব্য এবং হাতিয়ার রেখে দেওয়া হত। প্রাগৈতিহাসিক কালের সমাধিপাত্রের গায়ে মিশরবাসীরা নানা জীবজন্তু এবং অন্যান্য ভোগ্য বস্তুর নকশা এঁকে দিত। প্রতীক হিসাবে এই সব নকশার তাৎপর্য পুরোপলীয় যুগের গুহাচিত্রের সমান। মৃতব্যক্তি চিরকাল যাতে চিত্রাঙ্কিত বস্তু ভোগ করতে পারে এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভারের অভাব যাতে তাকে ভোগ করতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যে সমাধির মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য বস্তু আর অন্যান্য ভোগ্য বস্তুর নকশা আঁকা হয়েছে। পিতৃপুরুষের আত্মা সম্পর্কে এই জাতীয় মনোভাবের সূচনা বহু আগে হয়েছে। নবোপলীয় যুগের মানুষ মনে করত, পিতৃপুরুষের আত্মার একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। মৃত ব্যক্তি বসুন্ধরার গর্ভে শায়িত থাকে। আবার এই বসুন্ধরার গর্ভ থেকে খাদ্যশস্যের চারা অঙ্কুরিত হয়। নবোপলীয় যুগের মানুষ মনে করত, মৃত পূর্বপুরুষেরা এই অঙ্কুরোদ্গমে সাহায্য করে। তাই তাদের আত্মার সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য সমাধিতে এত আয়োজন করা হত।

যাদুবিদ্যা বলে প্রজনন শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং বৃদ্ধি করা যায় এই বিশ্বাসও নবোপলীয় যুগে বেড়েছিল। পুরোপলীয় যুগের ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ডে নারীমূর্তি খোদাই

করা হত। এই সব মূর্তির যৌনকেন্দ্রগুলি সুচিহ্নিত ছিল। নবোপলীয় যুগের মানুষ মাটি দিয়ে এই ধাঁচের মূর্তি তৈরি করত। এই সব মূর্তিকে বলা হত 'মাতৃরূপা দেবীমূর্তি'। নারীদেহের উর্বরতা সম্পর্কে মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। যে বসুন্ধরার গর্ভ থেকে খাদ্যশস্যের অঙ্কুরোদ্‌গম হয়, তাকেও এরা নারীস্বরূপা দেবী বলে গণ্য করত হয়ত বা।

প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্য সমাজে মাঝে মাঝে এক 'পবিত্র বিবাহোৎসব' সাড়ম্বরে পালন করা হত। 'রাজা' ও 'রানীর' বিবাহ বলা হত একে। দেবতার প্রতীক বলে গণ্য করা হত এদের। বসুন্ধরার গর্ভাধান সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এবং তার প্রতীক হিসাবে এই মিলনোৎসবের আয়োজন করা হত। কিন্তু অঙ্কুরোদ্‌গমের আগে বীজের মৃত্যু ও সমাধি হওয়া দরকার। না হলে আবার সে অঙ্কুরিত হয়ে বংশবৃদ্ধি করবে কি করে? বীজের মৃত্যু ও পুনর্জন্মের এই কল্পনা থেকে এক সময় এক নতুন রীতির উদ্ভব হয়। শস্যের প্রতিকল্প হিসাবে মানুষ বধ করে তার দেহ সমাধিস্থ করা হত। নিহত ব্যক্তিকে বলা হত 'শস্যাধিপতি'। তারপর নতুন ফসলের প্রতীক হিসাবে আর একজন তরুণ যুবককে শস্যাধিপতির স্থলাভিষিক্ত করা হত। তাকেও আবার বীজের মত সমাধিস্থ হতে হয়েছে। ঐতিহাসিক যুগে এই যাদুক্রিয়া কার্যতঃ ভিন্নভাবে আচরিত হলেও, বহু উপকথার মধ্যে এই প্রাচীন রীতির আভাস পাওয়া যায়। নবোপলীয় যুগে মানুষ বধ করে হয়ত এই রীতি পালন করা হয়েছে।

গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্পর্কেও মানুষের ধ্যান-ধারণা এই যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। দেবতা জ্ঞানে কিছু গ্রহ পূজিত হয়েছে। চাষ-আবাদের জন্য বৎসরের ঋতুচক্র বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। কোন্ ঋতুতে আবাদ করলে ভাল ফসল জন্মাবে সে কথা জানা না থাকলে অসুবিধা। সূর্যের অবস্থান অনুসারে ঋতু নির্ণীত হয়। পৃথিবীর উত্তরার্ধের অক্ষাংশে অয়নান্তের মধ্যবর্তীকালে সূর্যের অবস্থানের তারতম্য অনেকটা স্পষ্ট বলে ঋতুর রহস্য উপলব্ধি করা কঠিন নয়। এই রহস্য পর্যবেক্ষণ করতে গেলে ঋতুর নিয়ামক হিসাবে সূর্যের গুরুত্বও ধরা পড়বে আর তার দেবত্বও সুনিশ্চিত হবে।

গ্রীষ্মমণ্ডলে সূর্যের অবস্থানের তারতম্য এত স্পষ্ট নয়। এখানকার মেঘমুক্ত আকাশের নক্ষত্র থেকে অনায়াসে সৌরবৎসরের বিভিন্ন কালনির্ণয় করা যায়। অভিজ্ঞতা থেকে যখন মনে হয় যে বীজ বোনার আইয়াম এসেছে, তখন হয়ত লক্ষ্য পড়ল যে বিশেষ একটি নক্ষত্র নভোমণ্ডলের এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছে। ফসল কাটার সময় আর একটি নক্ষত্রের অবস্থান লক্ষ্য পড়ল। এইভাবে নক্ষত্রের

অবস্থানকে দিশারী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। নক্ষত্রের অবস্থান থেকে মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে নভোমণ্ডলের এই সব আলোকবিন্দু সত্যই পার্থিব ঘটনা প্রভাবিত করে। কালগত একটা যোগাযোগকে তার ফলে কার্য-কারণ সম্পর্ক-বিশিষ্ট ঘটনা বলে ভুল করা হয়। নীল নদে যখন বন্যা শুরু হত লুব্ধক নক্ষত্র উষালগ্নে তখন দিগন্তে অবস্থান করত। তাই থেকে মনে করা হত, লুব্ধক নক্ষত্র নীল নদের বন্যার কারণ। এই ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে জ্যোতিষশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। মেসোপটেমিয়াতে নক্ষত্রই দেবতার প্রতীক ছিল। এইভাবে হয়ত সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির উপসনা-পদ্ধতি নবোপলীয় যুগে প্রসার লাভ করেছে। তবে দেবত্ব সম্পর্কে এই যুগের মানুষ কতটা ধারণা গঠন করতে পেরেছিল তার ঠিকানা জানা যায়নি।

নগর সভ্যতার গোড়াপত্তন

নবোপলীয় যুগের বিভিন্ন জনপদে যে জীবনধারা কায়েম হয়েছিল, পল্লীকেন্দ্রিক সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক বিধি বিকাশলাভ করতে দীর্ঘ দিন লেগেছে। কি ভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে, কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করে খাদ্যোৎপাদন আর পশুপালনের মিশ্র-আর্থিক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সংস্কৃতি মানবসমাজে দেখা দিয়েছিল তার পুরো কাহিনী জানা যায়নি। জানা গেছে শুধু শেষ পরিণতির কথা। জ্ঞাত-অজ্ঞাত যত পথ, যত পদ্ধতি অনুসরণ করে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিক না কেন, তার ফলাফল আমরা জানি। নতুন নতুন আরও কতকগুলি আবিষ্কার মানবসমাজে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটায়। নতুন কারিগরী কৌশল আয়ত্ত করে নতুনতর পদ্ধতিতে মানুষ প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সামাজিক উৎপাদনবিধির পরিবর্তন হওয়ায় সমাজের আর্থিক কাঠামো নতুন ছাঁদে ঢেলে সাজাতে হয়। তার ফলে নবোপলীয় যুগের ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিপল্লী শিল্প-বাণিজ্যসমৃদ্ধ জনবহুল শহরে রূপান্তরিত হয়। আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার বদলে পারস্পরিক নির্ভরতার অর্থাৎ ব্যবসায়িক লেনদেনের সূচনা হয়েছে। কৃষির পাশাপাশি গড়ে ওঠে নতুন নতুন শিল্প। নীল নদ থেকে আরম্ভ করে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে এই নাটকীয় রূপান্তর ঘটেছে। মানুষের ইতিহাসে এও আর এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মানুষের কাহিনী এই পরিবর্তনের ফলে প্রাগিতিহাসের প্রান্তসীমা অতিক্রম করে ঐতিহাসিক পর্যায়ে পদার্পণ করে।

খৃস্টপূর্ব ছয় হাজার থেকে তিন হাজার বছরের মধ্যে মানুষ ষাঁড় আর হাওয়ার শক্তিকে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির কাজে লাগাতে শেখে। এই সময়ের মধ্যে সে লাঙল, চাকা, চাকাওয়ালা গাড়ি এবং পাল-তোলা নৌকা উদ্ভাবন করে। তাম্রপিণ্ড কিংবা অন্যান্য ধাতু গলাবার অভিজ্ঞতা থেকে সে বিভিন্ন ধাতবপদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে। নির্ভুল সৌরপঞ্জিকা উদ্ভাবনের কাজও এই যুগে আরম্ভ হয়। যুগান্তকারী এই সব আবিষ্কার, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলা-কৌশলের এই উন্নতি পৌর জীবনযাত্রার ক্ষেত্র তৈরি করে। কিন্তু নবোপলীয় আর্থিক জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা ভেঙে সমাজের হাতে মূলধন

আকারে বাড়তি খাদ্যশস্য মজুত না হওয়া পর্যন্ত এই নতুন আর্থিক বিধি, এই নতুন সমাজব্যবস্থা কায়েম হতে পারেনি। কেমন করে প্রাচ্যের নবোপলীয় পল্লী-জীবনে এই পরিবর্তন এল তার কথা বলছি।

নবোপলীয় বিপ্লবের ফলে খৃস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে নীল নদ থেকে আরম্ভ করে ইরাক, সিরিয়া আর ইরান বরাবর সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বহু কৃষিপল্লী গড়ে উঠেছিল। সুস্থিত কৃষিপল্লী যেমন ছিল তার আশেপাশে বিচ্ছিন্ন কিছু যাযাবর কিংবা অর্ধ-যাযাবর জনসমষ্টিও তেমন বাস করত। তারা হয় শিকারী কি মেছো কিংবা পশুপালক অথবা বাগিচা-চাষী। তাদের জীবনধারা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবু তাদের অস্তিত্বে সন্দেহ করা যায় না। স্থিতিবান যেসব সম্প্রদায় এই অঞ্চলে বসবাস করত কেবলমাত্র তাদের ঠিকানা পুরাবিত্তাবিদেরা জানতে পেরেছেন। তাদের কিছু বাসস্থানে পরবর্তীকালে শহর গড়ে উঠেছে। নতুনতর কলা-কৌশলে বলীয়ান হয়ে স্থিতিশীল কৃষক সম্প্রদায় তাদের বসতির পরিসর বৃদ্ধি করেছে। কালক্রমে সেই বসতি নগরে রূপান্তরিত হয়েছে।

॥ পল্লীজীবনের স্থিতিশীলতা ॥

নীল নদ থেকে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তীর্ণ শুষ্কপ্রায় এলাকার বিভিন্ন জনপদের সংস্কৃতির মধ্যে এখনও যেমন পার্থক্য আছে নবোপলীয় যুগেও তেমনি পার্থক্য ছিল। আর্থিক বিধির প্রয়োগ-রীতি এবং শিল্পকলার মধ্যে এই পার্থক্য প্রতি-ফলিত হত। তবু এই অঞ্চলের বিভিন্ন জনপদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এখানকার মানুষ দৈনন্দিন জীবনের কাজের ফাঁকে বসে কাটাবার প্রচুর অবসর পেত। যেখানে তারা বসতি স্থাপন করেছে ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত সেখানে কায়েমীভাবে বসবাস করেছে। বসতি বদল করতে চায়নি। জনসংখ্যা খুব বেশী বেড়ে গেলে নতুন বসতি পত্তন করার প্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু তার আগে পল্লীর পরিসর যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হত।

বসতির উপর এতটা মায়ার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ আছে। নবোপলীয় যুগের কৃষক সম্প্রদায়ের বাসস্থান যদি কতকগুলি প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ না করত, তাহলে কায়েমীভাবে বসবাসের প্রবণতা দেখা দিতে পারত না। মানুষের বসতির পক্ষে জল সরবরাহের সুনিশ্চিত স্থায়ী ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। জল মানুষের নিজের জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজন—প্রয়োজন তার গৃহপালিত পশুর জীবনধারণের জন্য। পর্যাপ্ত বারিপাত না হলে আবার

ফসল জন্মে না। নালা কেটে তখন জলসেচের ব্যবস্থা করতে হয়। মরু অঞ্চলে কিংবা আধা-মরু অঞ্চলে জলের স্বাভাবিক প্রবাহের দারুণ অনটন। জল একমাত্র মরূদ্যানে পাওয়া যায়। দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টির ফলে এই স্বাভাবিক জলপ্রবাহের সংখ্যাও কমে আসছিল। কাজেই মানুষ যেখানে জলের কাছাকাছি বসতি গড়ে তুলেছিল, প্রথম বিপ্লবের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই বাসস্থান অমূল্য সম্পদ হয়ে ওঠে।

তাছাড়া জলের প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের প্রয়োজনে লাগাতে সমাজের সকলকে সম্মিলিতভাবে কঠোর শ্রম করতে হয়েছে। যত বেশী ফসল ফলাতে চাইবে তত বেশী শ্রম করে জমিজমা আবাদযোগ্য করে তুলতে হবে। মিশর আর সুমেরের দৃষ্টান্ত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

নীল নদের বন্যা শুধু জলের অভাব পূরণ করেনি। নতুন পলি এনে এই বেনোজল জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল প্রথম দিকে জংলা জলাভূমি ছিল। এই জমি আবাদযোগ্য করা কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ। নালা কেটে জল নিষ্কাশন করে, জঙ্গল সাফ করে, বন্য শ্বাপদ তাড়িয়ে এই জমি আবাদযোগ্য করতে হয়েছে। সাফ-করা জমি আবার যাতে বেনোজলে ডুবে না যায় তার জন্য বাঁধ তৈরি করতে হয়েছে। বাঁধ বা নালার যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকেও হুঁশিয়ার থাকতে হয়েছে। এই বিপুল শ্রমসাধ্য কাজ করা দশ-বিশজন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। বহু লোক একসাথে মিলে কঠোর শ্রম করতে রাজী হলে এই ধরনের ডুবো জায়গা চাষ-বাসের উপযোগী করে তোলা যায়। বহু আয়াসসাধ্য এই কাজ একবার যদি করে ফেলা যায়, তাহলে যে জমি পাওয়া যায় মানুষ তাকে পবিত্র সম্পদ বলে গণ্য করে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে বাস্তুভিটা সে তৈরি করে, সেই ভিটা কিছুতেই ছেড়ে যেতে চায় না। তাছাড়া ছেড়ে যাবার প্রয়োজনও খুব দেখা দেয়নি। নদীর বন্যা প্রতি বছরেই তো জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

সুমেরের আদিবাসীরাও সমান অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। তাইগ্রিস আর ইউফ্রেতিস নদীর দুই ধারার মাঝখানে বিশাল এক জলাভূমি ছিল। মাঝে মাঝে নল-খাগড়ার জঙ্গল, দু চারটে বালির বাঁধ কিংবা টিলা আর খেজুরের দু চারটে ঝোপ এই বিলের মধ্যে ছড়ান ছিল। নদীর পলি জমে সবে এই বিল তখন পারস্য উপসাগরের স্তর থেকে উঁচু হয়েছে। প্রচুর মাছ ও পশুপক্ষী এই বিলে বাসা বেঁধেছিল। এই শিকারের লোভেই হয়ত সুমেরের আদিবাসীরা তাইগ্রিস আর ইউফ্রেতিস নদীর উপত্যকা বাসোপযোগী করার দুঃসাধ্য কাজে ব্রতী হয়েছিল।

ব্যাবিলনের বড় বড় শহর যে জমির উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তার সবটা সুমেরের আদিবাসীদের নিজেদের হাতে বাঁধান। নিজেদের হাতে নালা কেটে তারা ক্ষেত-খামারে জল সেচ করেছে। বিলের জলনিকাশও করেছে সেই ভাবে। বাঁধ দিয়ে, ঢিবির মত উঁচু পাদপীঠ তৈরি করে তারা মানুষ-গরুকে বন্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তারাই বিলের জঙ্গল সাফ করে তার মধ্যে নালা কেটেছে। প্রকৃতির সঙ্গে এইভাবে লড়াই করে তারা খেজুরের মস্ত পুষ্টিকর খাদ্য পেয়েছে। ক্ষেত-খামার থেকে পেয়েছে অঢেল ফসল। আর গৃহপালিত জন্তুর জন্য তৈরি করেছে স্থায়ী গোচারণ ক্ষেত্র।

এত শ্রম, এত কষ্ট করে যে ক্ষেত-খামার তারা তৈরি করল তার উপর স্বভাবতঃই প্রবল টান থাকবে। স্বেচ্ছায় এই জমি ছেড়ে স্বভাবতঃ তারা যেতে চাইবে না। তাছাড়া একবার যদি পাড় বেঁধে মূল বসতি তৈরি করা যায়, তাহলে চাষ-বাসের জমির পরিসর অনায়াসে বাড়ান যেতে পারে। অতিরিক্ত লোকবল থাকলে কাটাখাল প্রসারিত করা যায়। নতুন বাঁধ তৈরি করে বিলের মধ্যে নতুন নতুন জমি চাষ-বাসের উপযোগী করা যায়।

সিরিয়া কিংবা ইরানের প্রাকৃতিক পরিবেশে চাষ-বাসের ক্ষেত্র তৈরি করা এতটা কষ্টসাধ্য ছিল না। তবু এই অঞ্চলেও নালা কেটে জলনিকাশ ও জলসেচের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

এই সব নজীর থেকে বোঝা যায়, পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে পশ্চিম এশিয়ার সেরা সেরা বসতি পত্তন করতে হয়েছে। মানুষ তার শ্রমের মূলধন জমির উপর নিয়োগ করেছে। এই মূলধনের মায়ায় সে মাটির সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। সুনিশ্চিত মুনাফার আশা ছেড়ে দূরে চলে যেতে পারেনি।

তবে মানুষের এই শ্রমের সবটা যৌথ শ্রম। সমাজের সকলে একসাথে এই শ্রম করেছে। সামগ্রিক বিচারে সকলেই তার ফলে লাভবান হয়েছে। সকলেই শ্রমের ফলের ভাগীদার।

মানুষের শ্রম ছাড়াও এই সব কাজে বাড়তি খাদ্যের আকারে মূলধনের আবশ্যক হয়েছে। এই বাড়তি খাদ্য সকলের যৌথ চেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তার মালিকানাও সমাজের। নালা কিংবা বাঁধ তৈরীর কাজে যেসব শ্রমিক নিযুক্ত হবে, তাদের খাওয়ান দরকার। কিন্তু এই কাজ করার সময় যে খাদ্য তারা খেয়েছে, সেই খাদ্য তারা উৎপন্ন করেনি। সমাজের সৃজনী পরিকল্পনা যত উচ্চাভিলাষী হয়েছে তত আরও বেশী করে বাড়তি খাদ্য মজুত রাখার প্রয়োজন হয়েছে। গ্রামকে শহরে রূপান্তরিত করার পক্ষে বাড়তি খাদ্য মজুত

রাখা একান্ত প্রয়োজন। বসতির আশপাশের বিল ও মরুভূমি থেকে নতুন নতুন অনাবাদী জমি উদ্ধার করে এই চাহিদা পূরণ করা হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ার কৃষিনির্ভর পল্লীজীবনে স্থিতিশীলতা দেখা দেবার পক্ষে আর একটি কারণের গুরুত্বও কম নয়। যব আর গম চাষীদের প্রধান খাদ্য ছিল। এইবার তার সঙ্গে খেজুর, ডুমুর, জলপাই জাতীয় পুষ্টিকর ফল যুক্ত হল। সুমেরের খেজুর আর সিরিয়ার ডুমুর অন্যত্র পাবার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ চাষীরা যদি স্থানত্যাগ না করে, তাহলে বছরের পর বছর এক গাছ থেকে এই সব পুষ্টিকর খাদ্য পেতে পারে। এই গাছ অন্যত্র জন্মাবার কৌশল তখনও আয়ত্তের বাইরে। তাই চাষীরা এই সব পুষ্টিকর খাদ্যের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছে।

কিছুকাল পরে এই সব ফলপ্রসূ গাছ এবং আঙুরের চাষ আরম্ভ হয়ে যায়। এই চাষের কায়দা সম্পূর্ণ নতুন। কি ভাবে মানুষ এই কৌশল আয়ত্ত করেছিল তার খোঁজ জানা যায়নি। কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই কৌশল প্রাগৈতিহাসিক কালেই মানুষের আয়ত্তাধীন হয়েছিল। অচিরে মানুষ এই নতুন কৃষিকাজের সুফল উপলব্ধি করতে পারল। গম ক্ষেতের তুলনায় খেজুরের ঝাড় বা ফলের বাগান এক পক্ষে স্থায়ী সম্পদ। গমের ক্ষেতে বীজ বোনার কয়েক মাস পরে ফসল পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিবারের ফসলের জন্য নতুন করে বীজ বুনতে হয়। খেজুর কি জলপাইর গাছ অথবা দ্রাক্ষালতায় বছর পাঁচ-ছয় কোন ফল জন্মায় না। তারপর থেকে বছরের পর বছর নিয়মিত ফল পাওয়া যায়। এই সব স্থায়ী ফলের বাগিচার মালিক অনিবার্যভাবে মাটির মায়ায় আটকা পড়ে। ফলের গাছের মত মাটির সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড় হয়।

তাছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে এখানকার চাষীদের প্রচুর অবসর জুটত। বসে বসে সময় কাটাবার প্রচুর সুযোগ তারা পেত। এই অবসর গৃহনির্মাণ পদ্ধতির উন্নতিসাধনের সহায়ক হয় এবং স্থাপত্য বিদ্যার সূচনা করে।

কাদার পলাস্তর লাগান নল-খাগড়ার পর্দা ঝুলিয়ে মিশরের আদিচাষীরা ঘর তুলত। সুমেরের আদিবাসীরা সুড়ঙ্গের মত ঘরে বাস করত। নল-খাগড়ার আঁটির উপর মাদুর টাঙিয়ে এই ঘর তৈরি করা হত। এর কিছুকাল পরে মিশর ও এশিয়ায় কাদামাটির ঘর তৈরি হতে আরম্ভ করে। খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের অনেক আগে সিরিয়া কি মেসোপটেমিয়ার মানুষ ইট তৈরি করতে শিখেছিল। কাদামাটির সঙ্গে খড় মিশিয়ে তখন ইট তৈরি করা হয়েছে। তারপর রোদে শুকনো হত। ছাঁচ তৈরি করা হত কাঠ দিয়ে।

যে পদ্ধতিতেই ইট তৈরি করা হোক না কেন জিনিসটি আশ্রয় নির্মাণের

অবাধ সুযোগ এনে দেয়। ইটের উপর ইট সাজিয়ে যেভাবে খুশি গৃহনির্মাণের সুযোগ পাওয়া গেল। মৃৎপাত্র নির্মাণের মত এই ক্ষেত্রেও মানুষ তার কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার অবাধ স্বাধীনতা পেল। তাছাড়া পরিমাণের দিক থেকেও যত খুশি ইট তৈরি করার বিশেষ বাধা রইল না। কাজেই শিল্পটি নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত শিল্পপ্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বহু হাতের সমবেত শ্রমে হয়ত ইট তৈরী হয়েছে।

।। আর্থিক স্বাতন্ত্র্যে ভাঙন ।।

মরুস্থানে কি নদীর উপত্যকায় জলসেচের বন্দোবস্ত করে খাদ্যোৎপাদনের যে সুবন্দোবস্ত মধ্যপ্রাচ্যের চাষীরা করেছিল, তার ফলে অচিরে তাদের মধ্যে বেশ সম্পন্নতা দেখা দেয়। আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা বর্জন করার একটা প্রবণতাও এই সময় দেখা দিয়েছিল বলে মনে হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিপল্লীর আশেপাশে নানাবিধ আর্থিক ব্যবস্থা চালু ছিল বলেই হয়ত চাষীদের গোঁড়া মনোভাব তত প্রবল ছিল না। সমৃদ্ধ কৃষিপল্লীগুলির মধ্যবর্তী এলাকায় মেছো, শিকারী আর অর্ধ-যাযাবর পশুপালকের দল বাস করত। চাষীদের খামারেও অনায়াসে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা যেত। এই বাড়তি খাদ্যের বিনিময়ে মাছ, মাংস কিংবা পশুপালকদের তৈরী অন্যান্য খাদ্য সংগ্রহ করতে নিশ্চয়ই তারা কুণ্ঠা বোধ করত না। গরীব যাযাবরেরাও সানন্দে খাদ্যশস্যের সঙ্গে দ্রব্য-বিনিময় করতে রাজী হত। স্থিতিবান কৃষিপল্লী আর মেছো, শিকারী কিংবা পশুপালকদলের মধ্যে এইভাবে একটা পারস্পরিক নির্ভরতার অবস্থা দেখা দিতে পারে। এই ধরনের খানিকটা পারস্পরিক নির্ভরতা আধুনিক কালেও আছে। আরবের উট-পালকেরা এখনও খাদ্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য স্থিতিবান চাষীদের উপর নির্ভর করে। তবে কোন্ সময় যে এই পারস্পরিক নির্ভরতার অবস্থা দেখা দিয়েছিল, সুনিশ্চিতভাবে তার হদিস জানা যায়নি।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আর্থিক বিচ্ছিন্নতা যে ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়েছিল তার সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রাগৈতিহাসিক কালের সমাধিস্তূপ আর কবরের মধ্যে। সমাধির মধ্যে ক্রমেই বেশী বেশী বিদেশী জিনিসের সমাবেশ দেখা যায়। লোহিতসাগর আর ভূমধ্যসাগরের শুক্তি মিশরের নবোপলীয় পল্লীর স্মারক-চিহ্নের মধ্যে পাওয়া গেছে। এর পরবর্তীকালের মিশরীয় সমাধিতে ম্যালাকাইট (উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের খনিজ প্রস্তর), ধুনা, লাপিস লাজুলি (নীল পাথর) আর

অবসিডিয়ানের (বোতলের মত সবুজ রঙের আগ্নেয়শিলা) খোঁজ পাওয়া যায়। ভিন্ন দেশ থেকে এই সব প্রস্তর আমদানি করা হয়েছে। সিনাই পর্বত কিংবা নুবিয়ার মরুভূমি থেকে আনতে হয়েছে ম্যালাকাইট। ধুনা আনতে হয়েছে সিরিয়ার পাহাড়ে অঞ্চল কিংবা দক্ষিণ আরব থেকে। ইজিয়ান সাগর অঞ্চল, আরব, আর্মেনিয়া কিংবা আবিসিনিয়া ছাড়া অবসিডিয়ান পাওয়া যায়নি। লাপিস লাজুলি হয়ত ইরানের মালভূমি থেকে এসেছে।

স্থিতিবান কৃষি পল্লীগুলির মধ্যবর্তী এলাকায় সচল যাযাবর দল ছিল একথা যদি ধরে নেওয়া যায়, তাহলে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন জনপদের মধ্যে মাল চলাচলের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এই যুক্তি মেনে নিলে এও প্রমাণ হয় যে, চাষী আর যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক যোগাযোগ ছিল। যাই হোক, এই লেনদেন থেকে বাণিজ্যের সূচনা হয়। ধাতু-বিস্তার সূত্রপাতও এই লেনদেন থেকে হয়েছে।

রঞ্জন জাতীয় জিনিস কিংবা মূল্যবান পাথর মিশর অথবা সুমেরের আদি-বাসীদের কাছে বিলাসের জিনিস বলে গণ্য হত না। প্রসাধন বা অঙ্গসজ্জার জন্য তারা রঞ্জন কি মূল্যবান পাথর ব্যবহার করত না। এই জিনিস জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ ছিল। মিশরীয়রা চোখের পাতায় ম্যালাকাইট পাথরের কাই লাগাত। জন্তুর প্রতিকৃতির আদলে পাথরের পাটা তৈরি করে তার উপর ঘষে ঘষে কাই বার করা হত। ম্যালাকাইটের প্রস্তর খণ্ডটিও তারা নকশা-কাটা চামড়ার বটুয়ায় বয়ে বেড়াত। ম্যালাকাইটের সবুজ রঙ রৌদ্রের ঝাঁজ প্রতিরোধ করত। আর তার কপার কার্বনেট বীজাণু নাশ করে চোখের অসুখের প্রতিষেধকের কাজ করত। পাথরের এই গুণ মিশরীয়দের কাছে যাদুশক্তির ক্রিয়া বলে মনে হয়েছে। রহস্যময় শক্তি আধার হিসাবে তাই ম্যালাকাইটের এত কদর ছিল। তাই তার কাই তৈরি করার জন্য এমন বিশেষ আয়োজন।

এই কথা শুধু ম্যালাকাইট সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। আমদানি করা সমস্ত জিনিসকে তারা 'মানা' শক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ রহস্যময় শক্তির আধার বলে গণ্য করত। কড়ি দেখতে যোনিমুখের মত। তাই প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য তারা কড়ি ধারণ করত। এই শুক্তিটিও যাদুশক্তির আধার বলে পরিগণিত হয়। এই বিশ্বাস এত প্রবল, এমন ব্যাপক হয়ে পড়েছিল যে এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েক অঞ্চলে জিনিসটি মুদ্রার মর্যাদা পায়। কার্নেলিয়ান, ওপাল, আগেট প্রভৃতি মরু অঞ্চলের রত্ন অথবা তার চাইতেও দুষ্প্রাপ্য টার্কিজ, লাপিস লাজুলি জাতীয় রত্নের কদর শুধু সৌন্দর্যের জন্য ছিল না। যাদুশক্তির আধার হিসাবে এই সব রত্ন সমাদৃত হত। রত্নের রহস্যময় শক্তির কথা প্রাচীন সাহিত্যে হামেশা বলা হয়েছে।

আধুনিক যুগেও এই বিশ্বাসের ঘোর কাটেনি। গ্রহশান্তির জন্য এখনও জ্যোতিষীরা রত্ন ধারণের নির্দেশ দিয়ে থাকে। কাজেই রত্নের কামনা শুধু অলংকারের জন্য করা হয়নি। সাফল্য, ধনলাভ ও সন্তান লাভের কামনাতেও রত্ন ধারণ করা হয়েছে। এই দিক থেকে বিচার করলে রত্নকে অত্যাবশ্যক জিনিস বলে গণ্য করা যায়।

যাদুশক্তি সম্পন্ন অর্থাৎ মানার অধিকারী কোন বস্তুর মধ্যে যদি রহস্যময় শক্তিধর অপর কোন বস্তুর রূপারোপ করা হয়, তাহলে সেই বস্তুর যাদুশক্তি আরও বেড়ে যাবে। এক খণ্ড লাপিস লাজুলি পাথর দিয়ে যদি ষাঁড়ের মূর্তি গড়া হয়, তাহলে সেই প্রস্তর খণ্ড আকাশের সুনীল স্বচ্ছতা আর ষাঁড়ের বীর্য এই দ্বিবিধ গুণের অধিকারী হবে। যে সেই প্রস্তর খণ্ড ধারণ করবে তার মধ্যেও এই দুটি গুণ আরোপিত হবে বলে বিশ্বাস করা হত। এইভাবে কবচের উদ্ভব হয়। এই কবচ নির্মাণের জন্য রত্ন কাটার সুকঠিন কৌশলও আবিষ্কার করতে হয়। মালা অথবা কবচ তৈরীর জন্য প্রাচ্যের প্রায় সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে রত্ন কাটার অথবা রত্ন ছিদ্র করার কৌশল প্রচলিত ছিল।

রত্ন কেটে কবচ তৈরি করার পরিবর্তে তার উপর যদি কোন বস্তুর নকশা অথবা স্বস্তিকার মত রহস্যময় প্রতীকচিহ্ন খোদাই করা হয়, তাহলেও তার যাদুশক্তি বৃদ্ধি পায়। এই সব খোদাই করা রত্নের আর একটা গুণ আছে। নরম মাটির উপর যদি এই প্রস্তর খণ্ড চেপে ধরা যায় তাহলে মাটির উপরে তার ছাপ পড়বে। ছাপ-মারা মাটিও তখন যাদুশক্তিমান হয়ে পড়ে। মাটিও তখন 'মানা'র অধিকারী হয়। কারণ প্রতীকচিহ্নের যাদু তখন মাটির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তার ফলে তার উপর 'টাবুর' নিষেধ আরোপ করা হল। যে এই নিষেধ লঙ্ঘন করবে যাদুক্রিয়ার শক্তি তাকে বিপন্ন করবে। খোদাই করা রত্নটি এইভাবে সীল হয়ে পড়ে। কোন জিনিসের উপর সীল মেরে দেবার অর্থ তার উপর টাবুর নিষেধ আরোপ করা। নিষেধ ভাঙার বিপদ সম্পর্কে মানুষকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া। জিনিসের উপর সীল মেরে এইভাবে তার মালিকানা এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হত। লেখা আবিষ্কারের পর সীল স্বাক্ষরের স্থান অধিকার করেছে।

আসিরিয়ার প্রাচীনতম নবোপলীয় পল্লীতে খোদাই করা রত্ন সীল হিসাবে ব্যবহৃত হত। ইউফ্রেতিস নদী থেকে ইরান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় সুপ্রাচীন কাল থেকে সীলের প্রচলন ছিল। মিশর আর ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে প্রচলন ছিল কবচের। তবে ব্যবহারের এই ভাগাভাগি সুপ্রাচীন কালেই লোপ পেয়েছে। সর্বত্র দুটি জিনিস ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

॥ ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার ॥

যাদুশক্তিধর স্বর্ণ ও রত্নের খোঁজ করতে গিয়ে মানুষ এমন আর একটি জিনিস আবিষ্কার করল যা তার ব্যবহারিক জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে। মানুষের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ভেঙে দেবার পক্ষেও এই জিনিসের প্রভাব অপরিসীম। চাষীরা সাধারণতঃ স্থিসেবী হয়। কিন্তু যে জিনিস জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে অথবা সৌভাগ্যলাভের সহায়ক হয়, সেই জিনিস পাবার জন্য নিশ্চয়ই তারা তাদের ফসল ও ফল বিনিময় করতে রাজী হয়েছে। মরুবাসী যাযাবরদের কাছে এই যাদুশক্তিধর রত্ন পাওয়া যেত। তারা খাদ্যশস্যের কাঙাল। তাই অচিরে এই দুটি জিনিসের বিনিময়ের মারফত নিয়মিত ব্যবসায়িক লেনদেন শুরু হয়ে যায়।

এই সব মহামূল্য রত্নের আকর আবিষ্কার করার জন্য খোঁজাখুঁজিও নিশ্চয়ই চলেছে। মনে রাখতে হবে, রাসায়নিক হিসাবে ম্যালাকাইট পদার্থটি বেসিক কপার কার্বনেট আর টার্কিজ হচ্ছে তামা মেশান অ্যালুমিনিয়ামের ফসফেট। দুটি জিনিসই তাম্রপিণ্ডের (কপার ওর) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই ম্যালাকাইট, টার্কিজ কিংবা অন্যান্য রঙিন প্রস্তরের খোঁজে অনিবার্যভাবেই মানুষকে ধাতুময় এলাকায় ঘোরাফেরা করতে হয়েছে। তার ফলে তাম্রপিণ্ডও তার হাতে পড়েছে। ধাতুবিদ্যার উদ্ভবের পেছনে এই দিক থেকে যাদুবিদ্যার পরোক্ষ প্রভাব আছে বলা যেতে পারে।

ধাতুর কাজ করতে গিয়ে মানুষ প্রধানতঃ দুটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। দেখা গেল, তামা উত্তপ্ত অবস্থায় গলে যায়। তাকে তখন ইচ্ছামত আকারে রূপান্তরিত করা যায়। শীতল হলে এই জিনিস আবার শক্ত হয়। পাথরের মত তার ধার থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এও জানা গেল, কয়লার আগুনে এক ধরনের পাথর অথবা মাটির পিণ্ড পোড়ালে এই শক্ত তীক্ষ্ণ রাঙাটে ধাতুটি পাওয়া যায়।

এখন কথা হচ্ছে, কি ভাবে মানুষ এই ধাতুটি আবিষ্কার করতে পারে। পুরাবিদ্যাবিদেরা মনে করেন, আকস্মিক যোগাযোগের ফলে মানুষের পক্ষে তামা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। তামা ঠিক ধাতব অবস্থায় পাওয়া যায় না। কোন মিশরীয় অকস্মাৎ হয়ত আগুনের মধ্যে ম্যালাকাইট ফেলে দিয়ে দেখতে পেয়েছে যে জলজলে তামার বড়ি বেরিয়ে আসছে। ধাতুময় এলাকায় কখনও যদি আগুন জ্বালা হয়ে থাকে তাহলেও তাম্রপিণ্ড থেকে তামা বেরোতে পারে।

তবে তামা আবিষ্কারের পরেই যে তার তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পেয়েছে তা নয়। তামার তৈরী ছোটখাট জিনিস অবশ্য মিশরীয়দের সুপ্রাচীনকালের কবরের

মধ্যে পাওয়া গেছে। কিন্তু তামার সেই সব বস্তু ধাতুটির কৌশলী ব্যবহারের সূচক নয়। পাথর বা হাড় যেমন কেটে, পিটে অথবা বাঁকিয়ে কার্যসাধক করা হয়েছে, তামাকেও সেই পদ্ধতিতে কার্যসাধক করে নেওয়া হয়েছে।

ধাতু গালান যায় এবং ছাঁচে ঢেলে ইচ্ছামত আকারে তাকে রূপান্তরিত করা যায়। এটা ধাতুর অন্যতম অভিনব বৈশিষ্ট্য। গালান তামা একান্ত নমনীয়। যে কোন আকারের ছাঁচে ঢেলে তাকে ঢালাই করা যেতে পারে। আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তার ছাঁচের আকার বজায় থাকবে। গলিত ধাতুর রূপ শুধু ছাঁচের প্রকৃতি দ্বারা সীমিত। যতটা খুশি তামা ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দেওয়া যায়। আবার ছাঁচ তৈরি করাও কঠিন নয়। কুমোরের মাটি দিয়ে এই ছাঁচ তৈরি করা যায়।

গালান তামা নরম হলেও শীতল অবস্থায় তার প্রকৃতি হাড় বা পাথরের মত হয়। যত খুশি ছুঁচলো বা ধারাল করা যেতে পারে। তাছাড়া ধাতুটি শুধু নমনীয় নয়, তার স্থায়িত্বও হাড় বা পাথরের চাইতে কম নয়। বরং বেশী। শক্ত জিনিসের উপর কাজ করতে গেলে পাথরের কুঠার ভোঁতা হয়ে যায়। বার বার শান দিয়ে না নিলে কাজ করা যায় না। কিছুদিন পরে হাতিয়ারটি একেবারে অকেজো হয়ে যাবে। কিন্তু তামার কুঠার ভেঙে কি ভোঁতা হয়ে গেলে যতবার খুশি তাকে গালিয়ে নতুনভাবে কুঠার তৈরি করা চলে। প্রতি বারে নতুন কুঠার পাওয়া যায়। ধাতুর এই সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য মানুষ যেদিন উপলব্ধি করতে পেরেছে, যেদিন সেই অনুসারে সে কাজ করতে শিখেছে, সেই থেকে মানবসমাজে ধাতু-বিদ্যার শুরু হয়েছে বলা যায়।

তবে এই বিদ্যা আয়ত্ত করার আগে মানুষের চিন্তাধারা ঢেলে সাজাতে হয়েছে। ধাতুর রূপান্তরের পদ্ধতি নাটকীয়। ধাতু পিণ্ড গালিয়ে পাওয়া গেল গলিত ধাতু। আবার সেই থেকে পাওয়া গেল শক্ত ধাতু। এই পরিবর্তন অবশ্যই প্রাগৈতি-হাসিক মানুষের কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়েছে। কঠিন তাম্রপিণ্ড, মুচির মধ্যের গালান ধাতু আর ছাঁচে ঢালা ধাতুর একত্ব হয়ত তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। এই কাজ করতে গিয়ে পদার্থের যে রূপান্তর তারা প্রত্যক্ষ করল তার ফলে পদার্থের প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের আগেকার সরল বিশ্বাস নিশ্চয়ই বদলেছে।

তাছাড়া পদার্থের এই রূপান্তর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বহু জটিল কৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছে। তামা নিষ্কাশনের জন্য সেন্টিগ্রেডের ১২০০ ডিগ্রীর কাছাকাছি তাপমাত্রা আবশ্যক। বড় চুল্লী না হলেও চলে না। আবার আগুনের শিখার সঙ্গে হাওয়ার প্রবাহের যোগাযোগ ঘটাবার একটা কৌশলও আয়ত্ত করতে হয়েছে। হাপর আবিষ্কার করে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে হয়েছে। তবে

খৃস্টপূর্ব ১৬০০ বছরের আগে হাপর আবিষ্কৃত হয়েছে বলে জানা যায়নি। তারপর ঢালাই করার জন্য ছাঁচ চাই। চ্যাপটা কিছু তৈরি করতে হলে মাটির সমতল ছাঁচের উপর ঢেলে সহজেই সেই কাজ করা যায়। কিন্তু দু পাশে শিরওয়ালা পোক্ত ছোরা তৈরি করার জন্য দুই টুকরা ছাচ দরকার। ছাঁচের দুটি ভাগ অবিকল সমান হওয়া চাই। অংশ দুটিকে বেঁধে অথবা জোড়া দিয়ে দিতে হবে। খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ার মানুষ ছাঁচ তৈরীর এক অভিনব কৌশল বার করেছিল। কল্পিত জিনিসের আদলে মোম দিয়ে প্রথমে মডেল তৈরি করা হত। তারপর সেই মডেলের উপর মাটি লেপে দেওয়া হত। আগুনে পোড়াবার পর পোড়ামাটি শক্ত হয়ে যেত আর মোম গলে বেরিয়ে যেত। পোড়ামাটির ছাঁচের মধ্যে তখন গালান ধাতু ঢেলে দেওয়া হত। ছাঁচটি ভাঙার পরে দেখা যেত যে বস্তুটি অবিকল মোমের মডেলের মত হয়েছে।

ঢালাইর কাজ যতটা জটিল বলে মনে হয়, হাতে কাজ করতে গিয়ে তার চাইতে অনেক বেশী জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। গালান ধাতু যাতে ছাঁচে আটকে না যায় কিংবা অক্সিজেনের সঙ্গে মিশ্রিত হতে না পারে (অক্সিডাইজ), আগে থাকতে সেই বিষয়ে হুঁশিয়ার হতে হবে। আটকান ছাঁচের মধ্যে বুদবুদ সৃষ্টি হবার শঙ্কাও বড় কম নয়। তা যদি হয়, তাহলে ঢালাই করা জিনিসটি পোক্ত বা মজবুত হবে না। দেখতেও সুন্দর হবে না নিশ্চয়ই। তাছাড়া ঢালাই করার পর হাতিয়ারটি পিটে বা রেতি দিয়ে ঘসে মসৃণ করাও আবশ্যক।

তার মানে এই দাঁড়ায় যে কর্মকারকে অনেক কায়দা-কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। বহুদিনের বহুতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তার শিল্প গড়ে উঠেছে। এই সব বাস্তব অভিজ্ঞতা বহুবিধ শিল্পগাথার মধ্যে বিধৃত। সবটা তার জানা চাই। তবেই সে কাজ করতে পারবে। কুমোরের শিল্পগাথা যেমন করে লোকপরম্পরায় প্রচারিত হয়েছে, এই শিল্পগাথাও সেইভাবে প্রচারিত হতে পারে। তবে কর্মকারের কাজ কুমোরের কাজের চাইতে অনেক বেশী জটিল। ফলিত-বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক বেশী জ্ঞান দরকার কর্মকারের।

কৃষিকর্মের ফাঁকে ফাঁকে কুটির শিল্প হিসাবে ধাতুর কাজ করা সম্ভব হয়েছে কি না সেই বিষয়ে প্রবল সন্দেহ আছে। আধুনিক কালের আদিবাসীদের মধ্যে কর্মকারের কাজ সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞের কাজ বলে গণ্য হয়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ধাতুর কাজ হয়ত পুরো সময়ের কাজ বলে গণ্য হত। কিন্তু সমাজে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়তি খাদ্য না থাকে, তাহলে এই ধরনের কারিগরী বৃত্তি চলে না। কাজেই ধাতুর শিল্পগত ব্যবহারের প্রমাণ পেলে বুঝতে হবে,

সমাজে বিশেষ বৃত্তিবান কারিগরের উদ্ভব হয়েছে এবং সেই সমাজের উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণও স্বাভাবিক প্রয়োজনের চাইতে বেশী।

শুধু তাই নয়। এই সমাজের আর্থিক স্বাধীনতাও লোপ পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তাম্রপিণ্ড যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। সমভূমিতে কদাচিৎ তামার পিণ্ডের সন্ধান মেলে। এই জিনিস সাধারণতঃ জংলা পাহাড়ে অঞ্চলে দেখা যায়। অথচ নবোপলীয় যুগের চাষীরা সাধারণতঃ সরস সমভূমিতে বাস করত। কাজেই কয়টি কৃষিপল্লীর নিজস্ব এলাকায় যে তামা পাওয়া যেত সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। অধিকাংশ পল্লীকে তামা অথবা তাম্রপিণ্ড আমদানি করতে হত। তার মানে বাড়তি খাদ্যের বিনিময়ে কিনতে হত।

ধাতু নিয়ে কাজ করার চাইতে ধাতু উত্তোলনের তাৎপর্য বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও দূরপ্রসারী। তাম্রপিণ্ড সাধারণতঃ পুরান পাহাড়ের কঠিন প্রস্তরের স্তরে পাওয়া যায়। অতি সাধারণ রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে এই পিণ্ড থেকে তামা পাওয়া যায়। জলন্ত কার্বনের সংস্পর্শে এলে এই পিণ্ড থেকে তামায় নিষ্কাশিত হবে। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কাছে এই রূপান্তর নিশ্চয়ই বিস্ময়কর মনে হয়েছে। এই পরিবর্তনের তাৎপর্য নিশ্চয় তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। তবে কোন্ প্রস্তরপিণ্ড গালালে তামা পাওয়া যাবে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান মানুষ সেকালেই অর্জন করেছিল।

সচরাচর এই প্রস্তরপিণ্ড পাওয়া যায় না এ কথা আগেই বলেছি। কিন্তু প্রস্তর-পিণ্ড গালালে ধাতু পাওয়া যেতে পারে এই তথ্য জানার পর তামার সন্ধান করতে গিয়ে সেকালের মানুষ নিশ্চয়ই নানাবিধ পাথর পরীক্ষা করে দেখেছে। বহু পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে সন্দেহ নেই। আবার এই পরীক্ষার ফলে অন্যান্য ধাতুও আবিষ্কৃত হয়েছে। মিশরের প্রাগৈতিহাসিক কালের সমাধিতে রূপা ও সীসা পাওয়া গেছে। খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ার মানুষ হামেশা এই ধাতু দুটি ব্যবহার করত। কিছুকাল পরে লৌহপিণ্ডও মাঝে মাঝে মেসোপটেমিয়ায় গালান হত। তবে খৃস্টপূর্ব চৌদ্দ শত বছরের আগে লোহা কোথাও শিল্পকর্মে ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায়নি। সুমের আর সিন্ধু উপত্যকার মানুষ খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের অব্যবহিত পরে টিন ব্যবহার করেছে। ঢালাইর পদ্ধতি সহজতর করার জন্য তামার সঙ্গে তখন টিনের খাদ মেশান হত।

যাই হোক, পৃথিবীর উপরিভাগে যতটা তাম্রপিণ্ড পাওয়া গেছে তাই নিয়ে হয়ত ধাতুটির ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। মাটির উপরে এমন ধাতুপিণ্ড সেকালে নিশ্চয় পাওয়া যেত। কিন্তু সেই সম্পদ আধুনিক কালের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

আরম্ভ হবার আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। সহজলভ্য ধাতুপিণ্ড খতম হয়ে গেলে খনির গর্ভে নামতে হয়েছে। কি ভাবে মানুষ খনির কাজ শিখেছে তার সন্ধান সঠিকভাবে না জানলেও বলা যায় যে খনির গর্ভে কাজ করার নিরাপদ পদ্ধতি তাকে উদ্ভাবন করতে হয়েছে। খনি মজুরকে শিখতে হয়েছে কি ভাবে আগুন জেলে প্রস্তরের স্তর থেকে ধাতুপিণ্ড কেটে বার করতে হয়। উত্তপ্ত খনিস্তর জলসিঞ্চন করে ঠাণ্ডা করার কায়দাও শিখতে হয়েছে। খনির গ্যালারি অথবা চাল যাতে ভেঙে না পড়ে তার জন্য কাঠের পেয়ালা দেবার পদ্ধতিও উদ্ভাবন না করে পারা যায়নি। খনির ভেতর থেকে ধাতুপিণ্ড উপরে চালান দেবার কায়দাও বার করতে হয়েছে। এই সব কায়দা-কৌশল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখতে হয়েছে সন্দেহ নেই। তবে তার পুরো ইতিহাস আমরা জানি না।

ধাতু নিষ্কাশনের কৌশলও কম জটিল নয়। ধাতু গালাতে যেমন চুল্লী দরকার, ধাতু নিষ্কাশনের জন্যও তেমনি চুল্লী আবশ্যক। ধাতুপিণ্ডের পরিমাণ যদি বেশী হয় তাহলে বেশ বড় রকম অগ্নিকুণ্ড চাই। পৃথিবীর উপরিভাগে যে তাম্রপিণ্ড পাওয়া যায় তাকে শুধু কয়লার আগুনে পোড়ালে খাঁটি ধাতু পাওয়া যাবে। খনিগর্ভের ধাতুপিণ্ড সাধারণতঃ গন্ধকের সঙ্গে মেশান থাকে। কাজেই ধাতুপিণ্ড গালাবার আগে তাকে খোলা জায়গায় অগ্নিকুণ্ডে ঝলসে নেওয়া দরকার। অন্যান্য ধাতুপিণ্ড গালাবার কৌশল আলাদা। তাম্রপিণ্ড গালাবার জন্য যে ধরনের খোলা চুল্লী ব্যবহার করা হয়, সীসার পিণ্ড যদি সেইভাবে গালাতে চেষ্টা করা হয় তবে ধাতুটি ধোঁয়ার সঙ্গে উড়ে যাবে।

কাজেই কর্মকারের চাইতে অনেক বেশী জানাশোনা দরকার খনিসন্ধানী, খনি-মজুর আর ধাতুনিষ্কাশকদের। বাইরের লক্ষণ থেকে তাদের ধাতুপিণ্ড চিনতে হবে। শ্রেণী-বিভাগ করতে হবে ভিন্ন প্রকৃতির ধাতুপিণ্ডের। তারপর সেই ধাতুপিণ্ড পোড়াবার এবং গালাবার বিবিধ কায়দা-কৌশল জানতে হবে। এই অভিজ্ঞতা তাদের নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়েছে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে। কাজেই খনির কাজ কামারের কাজের চাইতে অনেক কঠিন। তাছাড়া খনির কাজ যারা করবে তাদের পক্ষে খাদ্য-উৎপাদন করা কোনক্রমে সম্ভব নয়। সমাজের বাড়তি খাদ্যের উপরে তাদের নির্ভর করতে হয়েছে। এই খাদ্য তারা নিজেদের শিল্পজাতদ্রব্যের বিনিময়ে পেয়েছে।

খৃস্টপূর্ব চার হাজার বছরের পূর্বে পশ্চিম এশিয়ায় খনির কাজ শুরু হয়েছে। ধাতুর ব্যবহারও সমকালীন। তবে ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের

হাতিয়ারের ব্যবহার উঠে যায়নি। পাথুরে কোদালের ফলা দিয়ে অনায়াসে কোদাল-চাষ করা যায়। মাঝে মাঝে ফলাটা বদলে নিতে হয় এই যা। তাতেও খুব অসুবিধা হবার কথা নয়। মাংসের ছাল ছাড়ান, ফসল কাটা, চামড়া কাটা কি দাড়ি কামাবার কাজও পাথরের ছুরি দিয়ে করা যায়। তবে এই ছুরি বড় তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়। কিন্তু নতুন একখানা তৈরি করতেও তো দু-পাঁচ মিনিটের বেশী লাগে না। গাছ কাটতে, খুঁটি চাঁচতে কিংবা ক্যানো তৈরি করতে পাথরের কুড়াল অথবা বাইস দিয়ে তামার কুড়ালের মত কাজ চলে। কিন্তু এই কুঠারও ক্ষয় হয় তাড়াতাড়ি। তার মানে এই দাঁড়ায়, পাথরের হাতিয়ার কার্যসাধক হলেও তার ক্ষয় বড় তাড়াতাড়ি হয়। পাথুরে হাতিয়ারের এটাই প্রধান অসুবিধা। কিন্তু হাতের কাছে নতুন হাতিয়ার তৈরি করার মত পাথর পাওয়া গেলে এই অসুবিধা অসহ্য মনে হয় না। যেখানে তা পাওয়া যায় না, হাতিয়ার তৈরি করার পাথর যেখানে বহুদূর থেকে নিয়ে আসতে হয়, সেই সমভূমির মানুষের কাছে তাই ধাতুর কদর বেড়ে যায়। সেই সব জায়গাতে হাতিয়ার তৈরি করার এই নতুন জিনিসের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এই চাহিদা পূরণের জন্য তারা যান-বাহনের নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেছে। তার মানে, পশুবল ও হাওয়ার শক্তিকে নিজদের কাজে লাগাবার কায়দা বার করেছে।

।। পশুবলের ব্যবহার ।।

পশুর বল আর হাওয়ার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করল। এই দুটি শক্তিকে কার্যসাধনে নিয়োজিত করে দেখা গেল, শারীরিক বল প্রয়োগ না করেও অনবরত শক্তি প্রয়োগ করা যায়। এইভাবে নিজের দেহকে নির্মম খাটুনি থেকে অব্যাহতি দেবার পথ খুঁজে পাওয়া গেল। এই সূচনা থেকে পরবর্তীকালে আমরা ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক মোটর, বাষ্পচালিত হাতুড়ি এবং যন্ত্রচালিত নৌবহর পেয়েছি।

চাষীদের মধ্যে যারা পশুপালন করত পশুশক্তি নিয়োগ করার জন্য তাদের অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। গৃহপালিত গরু দিয়ে অনায়াসে সেই কাজ করা গেছে। লাঙল টানার জন্য বলদ নিয়োগ করে সর্বপ্রথম পশুশক্তির ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। তার আগে অবশ্য লাঙল আবিষ্কার করে নিতে হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক কালের মিশরীয়রা লম্বা-ফলার এক রকম কোদাল ব্যবহার করত। হয়ত বা তার মডেল থেকে লাঙলের উদ্ভব হয়েছে। যাই হোক, লাঙল আবিষ্কার করার পর কৃষিকর্মে এক যুগান্তকারী বিপ্লব দেখা দিল। লাঙল

দিয়ে অনেকটা গভীর করে মাটির বুক চেরা যায়। ফসলের শিকড় তাতে বেশ খানিকটা গভীরে প্রবেশ করতে পারে। গাছ তাতে আরও বেশী পুষ্ট হয়। তাছাড়া কোদাল দিয়ে সারাদিনে একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে যতটা জমি চাষ করা সম্ভব, লাঙলের সঙ্গে এক জোড়া বলদ জুড়ে তার দশ গুণেরও বেশী জমি চাষ করা যায়। ফসলী জমির পরিসরও তাতে অনায়াসে বাড়ান সম্ভব। ফালি ফালি জমির বদলে তখন বিরাট বিরাট মাঠে আবাদ করা যেতে পারে। মোট কথা, লাঙল প্রচলন হবার পরেই প্রকৃত কৃষিকর্ম শুরু হয়। তার ফলে ফসলের পরিমাণ বাড়ে অর্থাৎ অধিক খাদ্য পাওয়া যায়। জনসংখ্যাও বাড়ে সেই সঙ্গে। এই ধরনের চাষ-আবাদ করা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই দায়িত্ব মুখ্যতঃ তখন পুরুষকে বহন করতে হয়।

ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হবার অনেক আগে চাষ-আবাদের এই নতুন পদ্ধতি পশ্চিম এশিয়ায় চালু হয়েছে। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে যে চালু হয়েছিল, সঠিকভাবে তার কালনির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

॥ চাকা আবিষ্কার ॥

লাঙল টানা ছাড়া স্লেজ জাতীয় চাকাহীন গাড়ি টানার কাজেও বলদ ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। আধুনিক কালের আদিম শিকারীদলের মধ্যে এখনও এই ধরনের রীতি চালু আছে। স্থানান্তরে যাবার সময় নিজেদের তাঁবু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা বলদ-টানা স্লেজ ব্যবহার করে। খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে মিশর দেশের রাজকীয় শবাধার বহনের জন্য বলদ-টানা স্লেজগাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তারও বহু পূর্বে আর একটি আবিষ্কার স্থলপথে চলাচল ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছিল। চাকা আবিষ্কার করেছিল মানুষ। আধুনিক কালের সমস্ত যন্ত্রের মূলভিত্তি এই চক্র। যানবাহনে এই চাকা যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে চাকাহীন স্লেজ চাকাওয়ালা গাড়িতে পরিণত হল। আজকের মোটর ও লোকো ইঞ্জিনের ভিত্তি রচিত হল সেই সুদূর অতীতে। প্রাগৈতিহাসিক কালের ছুতোর-মিস্ত্রির অবিস্মরণীয় শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই চাকা।

কি ভাবে চাকা আবিষ্কার হতে পারে তা অনুমান করা সহজ। কিন্তু এই আবিষ্কার সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। কাঠের জিনিস খুব বেশী দিন টেকে না। সেকালের চাকার কোন নিদর্শন তাই পাওয়া যায়নি। তবে কালজয়ী কিছু জিনিসের উপর যেসব নকশা পাওয়া গেছে, সেই আঁকা ছবি

থেকে আমরা সেকালের চাকার আদি ইতিহাস জানতে পেরেছি। খৃস্টপূর্ব সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার সুমেরের আর্টে চাকার নকশা পাওয়া গেছে। সিরিয়ার নকশাগুলি তারও আগেকার বলে মনে করা হয়। খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে এলাম, মেসোপটেমিয়া আর সিরিয়ায় হামেশা গাড়ি, মালগাড়ি, এমন কি রথ পর্যন্ত ব্যবহার করা হত। সিন্ধু উপত্যকায় চাকাওয়ালা গাড়ির ব্যবহার সম্ভবতঃ খৃস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে আরম্ভ হয়েছে। অন্ততঃ তার আগেকার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। ক্রীটদ্বীপ আর এশিয়া মাইনরে চাকার ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে তারও শ পাঁচেক বছর পরে। মিশরীয়রা কিন্তু খৃস্টপূর্ব ১৬৫০ বছরের আগে চাকার ব্যবহার জানত না।

তিন টুকরা কাঠ চামড়ার ফিতে দিয়ে বেঁধে তার উপর তামার পেরেক ঠুকে প্রথমতঃ চাকা তৈরি করা হত। এই চাকার মধ্যে কোন ফাঁক থাকত না। যে এক্সলের উপর এই চাকা ঘুরত চামড়ার ফিতে দিয়ে সেটি গাড়ির তলায় বেঁধে দেওয়া হত। সিন্ধু প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের গাড়িতে আধুনিক কালেও এই রীতি অনুসরণ করা হত।

চাকা শুধু যানবাহন ব্যবস্থাতে বিপ্লব ঘটায়নি। খৃস্টপূর্ব সাড়ে তিন হাজার বছর আগে শিল্পকর্মেও চাকার ব্যবহার আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। কুমোরের চাকা তার নিদর্শন। এই চাকার সাহায্যে কুমোরের পক্ষে যেমন দ্রুত কাজকর্ম করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি চাকার সাহায্যে তৈরি করা পাত্রগুলিও সমমাত্রিক হয়েছে। দেখতেও অনেক ভাল হয়েছে। আগে যেসব পাত্র তৈরি করতে একাধিক দিন লাগত, চাকার সাহায্যে সেই পাত্র অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি করা সম্ভব হল।

মৃৎপাত্র নির্মাণ-শিল্পকে এই দিক থেকে আদি যান্ত্রিক (মেকানাইজ্‌ড) শিল্প বলা যায়। তার ফলে বৃত্তিটির প্রকৃতি বদলে যায়। এখনও কোন কোন জায়গায় দেখা যায় যে কুমোরের চাকা চালায় পুরুষে কিন্তু হাতে যেসব পাত্র তৈরী হবে তার কাজ মেয়েরা করে। প্রাগৈতিহাসিক কালেও এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তার মানে এই দাঁড়ায়, কুমোরের শিল্পে চাকার প্রবর্তন হওয়ায় মানবসমাজে নতুন ধরনের শ্রম-বিভাগ দেখা দিল। মৃৎপাত্র নির্মাতারা দক্ষ কারিগর হয়ে পড়ল। খাদ্যোৎপাদনের কাজ থেকে তারা সরে গেল। নিজেদের শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে তারা সমাজের বাড়তি খাদ্যে ভাগ বসাত।

যাই হোক, পশুবাহিত চাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন হওয়ায় চলাচলের গতিবেগ যেমন দ্রুত হল তেমন যানবাহন ব্যবস্থাও অনেকটা সহজ হয়ে পড়ল।" তবে পশুকে শুধু গাড়িটানার কাজে নিয়োগ করা হয়নি। তার বহনের কাজেও

তাকে বাহন করা হয়েছে। পিঠে মালপত্র চাপিয়ে দিয়ে মানুষ নিজেও তার পিঠে চড়ে বসেছে। খৃস্টপূর্ব দু হাজার বছর আগে ব্যাবিলন আর এশিয়া মাইনরের ব্যবসায়িক লেনদেন খচ্চরকে বাহন করে চালান হত। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় খচ্চরের বাসভূমি। কাজেই খৃস্টপূর্ব হাজার তিনেক বছর আগে তার বহনের জন্য নিশ্চয়ই তাকে পোষ মানান হয়েছিল। মিশরের সমসাময়িক নিদর্শনের মধ্যেও পোষা গাধার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেসোপটেমিয়াতেও ঠিক ঐ সময়ে গাধা দিয়ে লাঙল টানান হত। তারপর থেকে গাধা এই সব অঞ্চলের প্রধান ভারবাহী পশু হয়ে পড়ে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঘোড়াকেও বাহন করার জন্য পোষ মানান হয়েছিল। মধ্য এশিয়ার স্তেপভূমি আর ইউরোপের জন্তু ঘোড়া। পশ্চিম এশিয়ায় তার অস্তিত্বের প্রমাণ খৃস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে পাওয়া যায়। মিশর আক্রমণকারী হিকসসরা খৃস্টপূর্ব ১৬৫০ সালে জন্তুটিকে মিশরে নিয়ে যায়। সিন্ধু উপত্যকাতেও খৃস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছরের কাছাকাছি ঘোড়া ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু যে স্মারকচিহ্নকে পিঠদানি মনে করে এই সিদ্ধান্ত করা হয়, আসলে সেটি বসার আসন কি না সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাই হোক, খৃস্টপূর্ব এক হাজার বছরের আগে ঘোড়াকে পোষ মানাবার কোন সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু ঘোড়াকে যখন বাহন হিসাবে কিংবা গাড়িটানা পশু হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যানবাহনের দ্রুততা তখন অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এই বাহনে চড়ে অনেক বেশী দূরে ভ্রমণ করা সম্ভব হয়েছে।

এই সঙ্গে আর একটি বাহনের কথাও মনে রাখা দরকার। উটকেও সম্ভবতঃ খৃস্টপূর্ব হাজার তিনেক বছর আগে পোষ মানান হয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে মরুর বাধা আর যাতায়াতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে না। অনায়াসে এই বাহনের সাহায্যে মরু অঞ্চলের বিভিন্ন জনপদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

॥ পাল-তোলা নৌকা ॥

স্থলপথে চলাচলের জন্য নতুন নতুন যানবাহন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জলপথে চলাচলের অসুবিধাও একালের মানুষ অতিক্রম করেছিল। কিন্তু জলযানের আবিষ্কার সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণের অভাব খুব বেশী। তবে কৃষি-বিপ্লবের

আগেই যে মেছোরা চামড়া দিয়ে কিংবা আস্ত গাছের গুঁড়ি খুঁড়ে ডিঙি তৈরি করতে শিখেছিল, এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বিপ্লবের কিছুদিন পরেকার মিশরীয় পাত্রে পাপিরাসের ডাঁটা দিয়ে তৈরী বড় বড় নৌকার ছবি দেখা যায়। আঁটি বাঁধা পাপিরাসের ডাঁটা এক সাথে বেঁধে এই ভেলা তৈরি করা হত। জন চল্লিশেক কি তারও বেশী মাঝি-মাল্লায় এই জলযান চালাত। ভেলার মাঝামাঝি জায়গায় কেবিনের মত ছোট্ট একটি ছই থাকত বলেও মনে হয়। তবে পাল-তোলা নৌকার ছবি খৃস্টপূর্ব সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার কোন মিশরীয় স্মারকচিহ্নের মধ্যে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া এই ধরনের নৌকা নীল নদের বুকে সচরাচর দেখা যেত না। হয়ত ভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে। অথচ খৃস্টপূর্ব হাজার তিনেক বছর আগে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের বুকে পাল-তোলা নৌকা হামেশা চলাচল করত। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব থাকলেও এই ধরনের নৌকা সময় সময়ে আরবসাগরের বুকেও চলাচল করেছে।

তার মানে এই দাঁড়ায়, জলপথে চলাচলের যান্ত্রিক অসুবিধা অতিক্রম করার কায়দা-কৌশলও মানুষ আয়ত্ত করে ফেলল। তক্তা দিয়ে নৌকা তৈরি করতে এবং তাতে পাল খাটাতে শিখে গেল। সমুদ্র বক্ষে চলাচলের জন্য ভূগোল এবং জ্যোতিবিদ্যায় যতটুকু জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেটুকু জ্ঞানও মানুষের আয়ত্তাধীন হল। স্থলপথ ও জলপথে চলাচলের নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করে প্রাচ্যের বিভিন্ন জনপদ এই সময় নিজের নিজের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের পথ সুগম করেছিল। এই সম্মিলিত জ্ঞানভাণ্ডার সকলের উন্নতি ও অগ্রগতির সহায়ক হয়েছে।

যত শিল্প, যত কলা-কৌশল অথবা যত নতুন যন্ত্রের কথা বলা হল, তার সব কিছু মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সঞ্চিত অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে এই সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা যত প্রসার লাভ করেছে তত মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বিবিধ অভিজ্ঞতা একত্রিত হয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপকৃত করেছে। জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার লেনদেনের ফলে প্রাচ্যের মানুষ প্রকৃতির উপর এমন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করল, যার ফলে নতুন আর্থিক বিধি, নতুন সমাজ-জীবন পত্তন করে তাদের পক্ষে নগর সংস্কৃতি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এই নতুন জ্ঞান, এই নতুনতর অভিজ্ঞতা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবার আগে মানুষের গোষ্ঠীজীবনে আরও কতকগুলি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল বলে জানা গেছে।

॥ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ॥

মানুষের জীবনধারায় যে সব পরিবর্তনের কথা বলা হল, তার আলোচনা করতে গিয়ে নীল নদ থেকে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে একটি মাত্র আর্থিক ইউনিট হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অথচ এই বিরাট অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক বিধি চালু ছিল। তাছাড়া এই সব পরিবর্তন অবাধে শান্তিপূর্ণ পথে সাধিত হয়নি। পুরাবিত্থার নজীর থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশর, ইরান, মেসোপটেমিয়া কি সিরিয়ার প্রাগৈতিহাসিক কালের মৃৎপাত্র এবং গৃহস্থালীর আসবাবপত্রের নির্মাণ-কৌশল কিংবা সেখানকার আর্ট অথবা অন্ত্যেষ্টির রীতির মধ্যে মাঝে মাঝে গুরুতর পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায়। পুরাবিত্থাবিদেরা মনে করেন, স্থায়ী বাসিন্দাদের স্থানচ্যুতি কিংবা আশ্রয়প্রার্থী অথবা আক্রমণকারী হিসাবে বাইরের মানুষের আগমনের ফলে এই পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

অনাবৃষ্টি ও বন্যার শঙ্কা যে অঞ্চলে বেশী, বাস্তুত্যাগ সেখানে খুব সম্ভাব্য ঘটনা। মানুষ যখন খাত্ত ও পশুখাত্তের জন্য প্রকৃতির উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়, দেশত্যাগের কারণ তখন যে কোন সময় দেখা দিতে পারে। আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে যে কোন সময় গৃহপালিত পশুসহ মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে। তখন সে স্বভাবতঃ এমন জায়গায় চলে যেতে চাইবে যেখানে পর্যাপ্ত খাত্ত পাওয়া যায়। নতুন জনপদে সে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে যেতে পারে। খাত্ত ও আশ্রয়ের বিনিময়ে খানিকটা দাসত্বও স্বীকার করতে পারে। আবার শক্তির দাপটে আক্রমণকারী হিসাবেও নতুন জনপদ সে দখল করে বসতে পারে। যাই হোক, এর যে কোন ভাবে এক জায়গার মানুষ অন্যত্র গিয়ে হাজির হোক না কেন, সেই নতুন মিলনক্ষেত্রে তখন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে। পৃথক সংস্কৃতির ধারক দুই দলের মানুষের মধ্যে মেশামেশি হয়। কিংবা কায়েমী বসিন্দাদের তাড়িয়ে বহিরাগতেরা তাদের বাড়িঘর দখল করে বসে। তার ফলে বাস্তব সংস্কৃতি, আর্ট ও ধর্মাচরণের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়।

বহিরাগত নতুন মানুষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন রীতিনীতি আমদানি হয়। সেই রীতিনীতির সঙ্গে স্থানীয় রীতিনীতির সংঘাত তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে। স্থানীয় কায়েমী রীতিনীতির কঠোরতা তাতে অনিবার্যভাবে শিথিল হয়ে পড়ে।

প্রাকৃতিক প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান না করে কোন মানবগোষ্ঠীর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আবাসস্থলের চতুর্দিকের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ

করা হোক, ফসল মাঠে ফলবেই। এইভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

।। মজুত মূলধনের আবশ্যকতা ।।

নগর সংস্কৃতি গড়ে তোলার পক্ষে সমাজের হাতে খাদ্যের আকারে মজুত মূলধন থাকাও একান্ত আবশ্যক। যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা শিল্পকর্মে যেসব লোক নিয়োজিত থাকবে তাদের পক্ষে সরাসরি খাদ্যোৎপাদন করা সম্ভব নয়। অথচ তাদের জন্যও খাদ্য চাই। এই খাদ্য সমাজকে যোগাতে হবে। বাড়তি খাদ্য যদি সমাজের হাতে মজুত থাকে তাহলে খাদ্যোৎপাদন ছাড়া সারাক্ষণ অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত কিংবা খাদ্যোৎপাদনে অসমর্থ লোককে খাওয়ান সম্ভব। তাছাড়া এই বাড়তি খাদ্য এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়া দরকার যাতে সেই খাদ্য অনায়াসে সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত হতে পারে। অর্থাৎ এই মূলধন নিয়োগ করার মত সামাজিক সংস্থাও আবশ্যক।

শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহের জন্যও বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন। যে কাঁচামাল নিজেদের মুলুকে পাওয়া যায় না ভিন্ন মুলুক থেকে তাই আমদানি করতে হবে। সেই বিনিময়ের জন্যও কার্যতঃ বাড়তি খাদ্য চাই। তার মানে এই দাঁড়ায়, খাদ্যোৎপাদন ছাড়া অন্যান্য বৃত্তিতে নিযুক্ত লোকজনের জন্য যেমন বাড়তি খাদ্য প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন বাণিজ্যের জন্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি ভাবে এই বাড়তি খাদ্য মজুত হতে পারে। কারও কারও মতে দেশ জয়ের ফলে এই মূলধন সংগৃহীত হয়েছে। নীল নদের উপত্যকা কিংবা মেসোপটেমিয়ার চাষীদের পক্ষে বাড়তি খাদ্য উৎপাদন করা আদৌ কষ্টকর ছিল না। দৈনন্দিনের প্রয়োজন পূরণ করে দুর্দিনের জন্য মজুত রাখার মত খাদ্যশস্য তারা উৎপন্ন করতে পারত। কিন্তু কেন করবে তারা? মানুষ স্বভবতঃ অলস প্রকৃতির জীব। অবিশ্রান্ত খেটে বিলাসিতা করার চাইতে তারা বরং অল্প খেটে সরল জীবনযাপন করতে চায়। তবে পরদেশী কোন বিজয়ী যদি কর্তৃত্ব পায়, তাহলে এই অলসত প্রিয় ভাব কেটে যেতে পারে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

কোন পশুপালক দল যদি কোন চাষীর গ্রাম দখল করে তাহলে চাষীদের তারা জমিচ্যুত করবে না। বরং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে তার বিনিময়ে চাষীদের কাছ থেকে খাজনা হিসাবে শস্য আদায় করবে। চাষীরা তখন নিজেদের সংসারের প্রয়োজনের চাইতে বেশী শস্য উৎপন্ন করতে

বাধ্য হবে। কারণ ফসলের বেশ বড় একটি ভাগ তখন নতুন মালিককে দিয়ে দিতে হবে। এই ব্যবস্থার ফলে এক ধরনের অভিজাত ভূম্যাধিকারী শ্রেণী সৃষ্টি হয় যারা চাষীদের খাজনার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। এই নিয়ম বহুল পরিচিত। পূর্ব আফ্রিকায় এখনও চালু আছে। এই সামাজিক ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় ইউরোপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

এই অভিজাত গোষ্ঠী প্রায়শঃ আবার শাসকগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। চাষীদের তুলনায় সংখ্যায় এরা অনেক কম। অথচ এদের খাদ্যের জন্য যতটা শস্য প্রয়োজন, তার চাইতে বেশী শস্য এরা আদায় করতে পারে। তাতে এই অভিজাত গোষ্ঠীর হাতে প্রচুর বাড়তি খাদ্যশস্য জমা হয়। তার কিছুটা এরা অনায়াসে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের ভরণপোষণের জন্য নিয়োগ করতে পারে। নিজেদের প্রয়োজন এবং বাণিজ্যের জন্য বাড়তি খাদ্যের বিনিময়ে শিল্পদ্রব্য কিনতে পারে।

যাই হোক, নীল নদের উপত্যকায় এই ভাবে অর্থাৎ রাজ্যজয়ের ফলে মূলধন প্রথম সঞ্চিত হয়েছিল। তবে সর্বত্রই যে এই ভাবে মূলধন সঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। মেসোপটেমিয়ায় এই মূলধন কেন্দ্রীভূত হয়েছে দেবমন্দিরকে কেন্দ্র করে। তার স্বয়ং-নিযুক্ত পুরোহিতগোষ্ঠীর হাতে। তারা সুমেরের শহরের মূলধন নিয়ন্ত্রণ করেছে। বিজেতার শক্তির বদলে ধর্মীয় প্রতিপত্তি এবং স্থানীয় সামাজিক ঐতিহ্যের জন্য এই পৌরোহিত্য-শক্তি আভিজাত্যের মর্যাদা পেয়েছে। ভারতের প্রাচীনতম শহরে কি ভাবে সমাজিক মূলধন সঞ্চিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত হত, তার কোন হদিস জানা যায়নি। সুতরাং রাজ্যজয় ছাড়া মূলধন সঞ্চয় সম্ভব হতে পারেনি, এই যুক্তি সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

।। যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাব্যতা ।।

মূলধন সঞ্চয়ের পক্ষে দেশজয় আবশ্যিক শর্ত না হলেও যুদ্ধ-বিগ্রহ যে সেকালের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে অধিকাংশ পুরাবিদ্যাবিদ্ একমত। ভূগর্ভে খোঁজ করতে গিয়ে এক গাঁয়ের উপরে আর একটি গাঁয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভূগর্ভের স্তরে স্তরে বিন্যস্ত এই সব গাঁয়ের সংস্থাপনা, স্থাপত্য এবং আসবাবপত্র এত ভিন্ন প্রকৃতির যে তার মধ্যে কোন একটি সামাজিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছিন্ন ধারা অক্ষুন্ন নেই। বরং এই ঐতিহ্যের মধ্যে সত্যই ছেদ পড়েছিল বলে মনে হয়। সাবেক বাসিন্দাদের আবাসে নতুন মানুষ

এসে বসবাস না করলে, কিংবা কোন নবাগত দল সাবেক বাসিন্দাদের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, এই জিনিস সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু সাবেক বাসিন্দাদের জায়গায় নতুনের অধিষ্ঠান অথবা তাদের উপর নবাগতের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা শান্তিপূর্ণ ভাবে হতে পারেনি নিশ্চয়ই। গায়ের জোরে তার ফয়সালা করতে হয়েছে। তার মানে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে।

আনুসঙ্গিক তথ্য থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে অনুমান করা গেলেও পুরাবিদ্যার নজীর থেকে তা প্রমাণ করা সহজ নয়। ভূগর্ভে যেসব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, সেগুলিকে যেমন যুদ্ধাস্ত্র বলা যায় তেমন শিকারের অস্ত্রও বলা যেতে পারে। তাহলেও আদিমতম জনপদের চারপাশে রক্ষাব্যবস্থার চিহ্ন দেখা যায়। মিশরের সুসা গ্রামের চারপাশে মাটির ঢিবির রক্ষাবেষ্টনী ছিল। এই রক্ষাবেষ্টনী খুব সম্ভবতঃ মানুষ-শত্রুর কথা ভেবে তৈরি করা হয়েছিল। তবে হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে রক্ষাবেষ্টনী তৈরি করা হয়নি এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। তাই কোন কোন পুরাবিদ্যাবিদ্ স্বীকার করতে চান না যে নগর সংস্কৃতি কায়েম হবার আগে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ পুরা-বিদ্যাবিদ্ ভিন্ন মত পোষণ করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাব্যতার কথা তারা স্বীকার করেন। স্থিতিবান জনপদের উপর যাযাবর কিংবা ছিন্নমূল মানবদলের হানাদারির ফলে এই যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে বলে তাঁদের ধারণা। গৃহপালিত পশু কিংবা ক্ষেতের ফসল অপহরণ করার জন্যই হয়ত এরা হানা দিয়েছে। তার ফলে সম্পন্ন স্থিতিবান মানব সম্প্রদায়কেও সজ্ঘবদ্ধভাবে সম্পদ রক্ষার আয়োজন করতে হয়েছে। যুদ্ধের কথা যদি স্বীকার করতে হয় তবে আত্মরক্ষার সজ্ঘবদ্ধ সংগঠিত প্রয়াসের কথাও মানতে হয়।

যুদ্ধ যদি হয়ে থাকে তবে তার আর্থিক প্রতিক্রিয়াও অবশ্যই থাকবে। অন্যান্য যত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাক না কেন ধাতুর চাহিদা যুদ্ধের জন্য না বেড়ে পারে না। পশুর ছাল ছাড়াতে গিয়ে যদি পাথুরে ছোরা ভেঙে যায় তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে ছোরা ভেঙে যাবার ফল প্রাণান্তকর। কাজেই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ত তামা অথবা ব্রোঞ্জের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে। অন্যান্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও বুঝেছে সন্দেহ নেই। তবে পাথরের তুলনায় ধাতুনির্মিত হাতিয়ার যে কত মজবুত ও নির্ভরযোগ্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই অভিজ্ঞতা ভালভাবে হয়েছে।

যুদ্ধ-বিগ্রহ আবার ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য দেখাবার এবং নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করার চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করে। তাতে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা

লাভের পথ সুগম হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ সেই দিক থেকে ঐহিক ক্ষমতাবান দলপতি এবং নৃপতি সৃষ্টির সহায়ক। তাছাড়া মানুষকেও যে পশুর মত পোষ মানান যেতে পারে, এই নতুন সত্যও যুদ্ধ-বিগ্রহের মারফত উপলব্ধি করা গেছে। পরাজিত শত্রুকে বধ না করলে তাকে যে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধা যায়, জীবন রক্ষা করে তাকে দিয়ে যে কাজ করান যায়, এই শিক্ষা মানুষ প্রধানতঃ যুদ্ধ থেকে পেয়েছে। মানুষকে দাস করার আবিষ্কারকে অনেকে পশুকে পোষ মানাবার আবিষ্কারের সমান গুরুত্বসম্পন্ন মনে করেন। সে যাই হোক, ইতিহাসের আদিপর্বে দাসত্ব যে প্রাচীনকালের শিল্পের প্রধান ভিত্তি এবং মূলধন সংগ্রহের অন্যতম উৎস ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনকালের চিত্রে যুদ্ধের ছবির সঙ্গে সঙ্গে আমরণ দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ শৃঙ্খলিত বন্দীর ছবিও পাওয়া গেছে।

তবে যুদ্ধ ছাড়া ভিন্ন কারণেও দাস সৃষ্টি হতে পারে। সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল মানুষ খাদ্য ও আশ্রয়ের বিনিময়ে সম্পন্নের অধীনতা স্বীকার করতে পারে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের নির্বাসিতদেরও এই শর্তে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া অনাবৃষ্টি বা ভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে গোটা সম্প্রদায় ভিন্ন দেশে গিয়ে খাদ্য ও আশ্রয়ের বিনিময়ে দাসত্ব বরণ করতে পারে। এই রকম অবস্থার সম্মুখীন হয়ে 'ইসরাইলের সন্তানদল' মিশরে গিয়ে দাসত্বের বিনিময়ে প্রাণরক্ষা করেছিল। এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসে তেমন দৃষ্টান্ত আরও আছে। আধুনিক কালের আদিবাসীদের মধ্যেও যুদ্ধ ছাড়া ভিন্ন কৌশলে দাস সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু আছে। এই ধরনের বিধি প্রাচীনকালেও যে ছিল তার প্রমাণ প্রাচীন পুঁথির মধ্যে পাওয়া যায়।

যাই হোক, যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ এই দুটি জিনিস দাস সংগ্রহের পরম সুযোগ এনে দিয়েছে। নগর সংস্কৃতি গড়ে ওঠার পরে বিভিন্ন শহর এই সুযোগে শ্রমিক সংগ্রহ করেছে। তখনকার সর্বসাধারণের কাজে কিংবা বিভিন্ন কারিগরী বৃত্তিতে বহুসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হত। তার মধ্যে কতজন মজুরির বিনিময়ে কাজ করেছে, কতজন সামাজিক কর্তব্যবোধ অথবা নিছক ধর্মপ্রবণতার জন্য স্বেচ্ছায় খেটেছে, আর কতজন যে দাস হিসাবে খাটতে বাধ্য হয়েছে কে জানে? এইটুকুমাত্র নিশ্চয় করে বলা যায়, যারা খেটেছে অথবা যাদের খাটান হয়েছে তাদের খাওয়াতে হয়েছে। সেই খাদ্য এরা নিজেরা উৎপন্ন করতে পারেনি। কৃষকেরা যে খাদ্য উৎপন্ন করেছে তার উদ্বৃত্ত অংশ সংগ্রহ করে এদের খাওয়াতে হয়েছে।

দাস প্রথার সম্ভাব্যতার কথা স্বীকার করলে মালিক অর্থাৎ সমাজের সুবিধা-ভোগী শ্রেণী, দলপতি, এমন কি নৃপতির কথা এসে যায়। প্রথম ফারাও মেনেসের আমলে উত্তর ও দক্ষিণ মিশর যুক্ত হয়। তার আগে এই দুই অঞ্চলে স্বাধীন রাজবংশের আলাদা অস্তিত্বের সুস্পষ্ট নজীর পাওয়া যায়। মিশর একত্র হয়েছিল নগর সংস্কৃতি কায়েম হবার সমকালে। তাহলে তার আগেও যে মিশরে রাজা ছিল, এ কথা মানতে হয়। প্রাচীন সুমের সম্পর্কেও এই অনুমান করা যেতে পারে। তবে সেখানকার রাজবংশের প্রকৃতি যাই হোক না কেন।

মোটের উপর পৌর জীবন আরম্ভ হবার আগে মানবসমাজে রাজশক্তি লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এই রাজত্ব সব ক্ষেত্রে দেশ জয় করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যাদুবিদ্যাশ্রয়ী ধর্মগত মর্যাদা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিংহাসন লাভে সহায়তা করেছে। যাদুকরেরা প্রথমে সম্ভবতঃ স্বাধীন কারিগর ছিল। সমাজের উদ্বৃত্ত খাদ্যের তারাই হয়ত প্রথম ভাগীদার। সমাজের সমষ্টিগত খাদ্যোৎপাদনের প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিয়ে তারাই হয়ত প্রথম উৎপন্ন খাদ্যে ভাগ বসিয়েছে।

যাদুকরের দণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হওয়া সেকালের সমাজে মোটেই বিচিত্র ছিল না। মানুষ তখনও প্রকৃতির খেয়ালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। বৃষ্টি, বন্যা অথবা রৌদ্রের উপব তাকে একান্তভাবে নির্ভর করতে হত। আবার অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, ভূকম্পন প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনা তাকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলত। কোন যাদুকর যদি প্রমাণ করতে পারত যে তার যাদু অনিষ্টকর শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কল্যাণশক্তিকে তুষ্ট করতে পারে, সমাজে তার প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি এবং কর্তৃত্বলাভের কি অন্তরায় থাকতে পারে? তাছাড়া যাদুবিদ্যা যে সিংহাসন লাভের সহায়ক হতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তো মিশরেই পাওয়া গেছে। সৌর পঞ্জিকার আবিষ্কার সেখানে রাজকীয় ক্ষমতালাভের পথে প্রভূত সাহায্য করেছে।

সুমের, মিশর ও সিন্ধু-সভ্যতা

নবোপলীয় বিপ্লব নীল নদ থেকে আরম্ভ করে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর বরাবর সুদূর সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে বহু লোকালয় সৃষ্টি করেছিল। খৃস্টপূর্ব চার হাজার বছরের আগেই এই জনপদ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সব জনপদের মধ্যে যে আর্থিক বিধি চালু ছিল, স্থানীয় অবস্থার প্রভাবে তার মধ্যে বাস্তব পার্থক্য ছিল। সুস্থিত স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিপল্লী যেমন ছিল, তেমন শিকারী, মৎস্যজীবী, কোদাল-চাষী আর যাযাবর পশুপালক মানবদলেরও অভাব ছিল না। এদের আশেপাশে বনজঙ্গলের প্রতিবেশে অপরাপর বন্যদলের অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। আর্থিক ও সামাজিক জীবনবিধির পার্থক্য সত্বেও একালের জীবনধারা প্রধানতঃ পল্লীজীবনের বৈশিষ্টামণ্ডিত।

কিন্তু খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের সমসাময়িক মিশর, সুমের আর সিন্ধু-পঞ্জাবের জীবনচিত্র যখন পুরাবিদ্যাবিদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়, তখন কৃষিপল্লীর পরিবর্তে বিভিন্ন বৃত্তি ও শ্রেণীসমন্বিত সম্পূর্ণ নতুন এক সমাজ-জীবনচিত্র তাকে বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে। এই সমাজ-জীবনের সামনের সারিতে খাদ্যোৎপাদক এবং পশুপালক কৃষকদের দেখা যায় না। তাদের পরিবর্তে সমাজের সামনের পঙক্তি অধিকার করে থাকে পুরোহিত, রাজা, হিসাবনবীস, লিপিকার আর একদল কর্মচারী। তাদের পাশাপাশি থাকে সুদক্ষ কারিগর, মাহিনাভোগী যোদ্ধা আর বিভিন্ন কর্মে রত শ্রমিক। খাদ্যোৎপাদনের প্রাথমিক কর্তব্য থেকে এদের সকলেই অব্যাহতি পেয়েছে। খাদ্যোৎপাদকের স্থান যেমন পেছনের সারিতে, তেমন খাদ্যোৎপাদন আর পশুপালনের আর্থিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত কৃষিজীবনের দ্রব্যসম্ভার আর কুটির শিল্পজাত সামগ্রীও এই সমাজ-জীবনের স্মারকচিহ্নের মধ্যে তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তার চাইতে বরং মন্দিরের আসবাবপত্র, যুদ্ধাস্ত্র, ধাতব অলংকার, চাকে-তৈরী মৃৎপাত্র এবং সুদক্ষ কারিগরের তৈরী বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার চমক সৃষ্টি করে। কৃষিপল্লীর কুটির আর গোলাঘর চাপা পড়ে যায় বিরাট বিরাট সমাধিক্ষেত্র, মন্দির, রাজপ্রাসাদ আর কারখানা-গৃহের জৌলুসে। এই সব গৃহের মধ্যে বিদেশাগত সামগ্রীর প্রাচুর্য এত

বেশী যে সেই বস্তুসম্ভারকে বিরল বিলাসদ্রব্য বলে গণ্য না করে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। স্বভাবতঃ মনে হয়, নিয়মিত বাণিজ্যিক লেনদেনের মারফত দেশান্তরের এই বস্তু-সম্ভার আমদানি করা হয়েছে।

স্মারকচিহ্নের এই রূপান্তর স্পষ্টতঃ আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন দ্যোতনা করে। সামাজিক উৎপাদনবিধির পরিবর্তন না হলে এই সব সামগ্রী উৎপন্ন হতে পারে না। আবার বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক না থাকলে এত বহিরাগত দ্রব্যসম্ভারের সমাবেশও সম্ভব নয়। তার মানে স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিজীবনের পরিবর্তে পরস্পর-নির্ভরশীল আর্থিক জীবনবিধির প্রচলন হওয়া আবশ্যক। তবে সমাজ-জীবনচিত্রের এই রূপান্তর নিশ্চয়ই কোন আকস্মিক পরিণতি নয়। সামাজিক উৎপাদনবিধির ক্রমপরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া নদীপ্রবাহ বিধৌত সমভূমির এই সব কৃষিপল্লীকে শিল্প-বাণিজ্য নির্ভর শ্রেণীসমন্বিত পৌর সমাজে রূপান্তরিত করেছে এবং তার পটভূমি রচনা করেছে কতকগুলি যুগান্তকারী আবিষ্কার।

যেসব আবিষ্কার এই নতুন সমাজবিধির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে এবং মানব-জাতির সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে, তার খানিকটা আভাস ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে এইটুকু স্মরণ রাখলেই চলবে, একালের বিভিন্ন জনপদ ভূগোল, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, প্রাণী-বিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যার বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে যেসব বিস্ময়কর বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং কৃষিকর্ম, বলবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা আর স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে যেসব নতুন প্রয়োগ-কৌশল আয়ত্ত করেছিল, লোক চলাচল আর ব্যবসায়িক লেনদেনের মারফত সেই বাস্তব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আর নতুন কলাকৌশল বিভিন্ন জনপদের মধ্যে বিস্তারলাভ করেছে। ধ্যান-ধারণা আর সামাজিক বিশ্বাসেরও এইভাবে প্রসার হয়েছে। ভাব বিনিময়ের ফলে পরস্পরের জ্ঞানভাণ্ডার পরস্পরকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানীয় দলের বিশ্লিষ্টতার প্রাচীর ভেঙে পড়েছে, সামাজিক সংগঠনের কঠোরতা শিথিল হয়েছে এবং আর্থিক জীবনের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ জনসমষ্টি তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা পরিহার করে পরস্পর-নির্ভরশীল জীবনধারা গ্রহণ করেছে।

নীল নদের উপত্যকা, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্তী সমভূমি আর সিন্ধু উপত্যকার সন্নিহিত পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের জনপদে এই রূপান্তর দ্রুত সংঘটিত হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক জীবনবিধি পরিহার করে এখানকার বিভিন্ন জনপদের মানুষ অতি দ্রুত সম্পূর্ণ নতুন বুনিয়াদের উপর নিজেদের আর্থিক জীবন পুনর্গঠন করে।

নদীপ্রবাহের জলসিঞ্চনে এই সব জনপদে স্বাভাবিক জল সরবরাহের অপ্রতুলতা ছিল না। বন্যা প্রতি বছর ক্ষেত-খামারের সরসতা এবং উর্বরতা বৃদ্ধি করে দিয়ে যেত। তার ফলে প্রয়োজনাতিরিক্ত অঢেল খাদ্যশস্য যেমন জন্মাত তেমন জনসংখ্যাও ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাছাড়া নদীর কাছাকাছি জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমির জল নিষ্কাশন করে এখানকার আবাদী জমি তৈরি করতে হয়েছে। তার জন্য জলসেচ ও বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছে। এই জলসেচ ব্যবস্থা এবং বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমাজের সকলকে সমবেতভাবে শৃঙ্খলাসহকারে ক্রমাগত কাজকর্ম করতে হয়েছে। আর এই সেচ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজের হাতেও শৃঙ্খলা রক্ষা করার কার্যকরী ক্ষমতা এসেছে। নদী-উপত্যকা অথবা মরূদ্যানের জীবনযাত্রায় এই ক্ষমতার গুরুত্ব আদৌ উপেক্ষা করা যায় না। বৃষ্টির জল সকল জমিতে পড়ে; কিন্তু সেচ ব্যবস্থার জল শুধু খাল-নালার মাধ্যমে পাওয়া যায়। সমবেত চেষ্টায় এই খাল-নালা কাটা হয়েছে। কোন চাষী যদি সমষ্টির অভিপ্রায় উপেক্ষা করার দুঃসাহস দেখায় তাহলে তার জমিতে জলসেচ বন্ধ করে অনায়াসে সবাই মিলে তাকে জব্দ করতে পারে। সমাজ যে সুযোগ দিয়েছে সেই সুবিধা প্রত্যাহার করার ক্ষমতাও তার আছে। জলসেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষ-বাস করার জন্য যে সামাজিক সংহতি প্রয়োজন, সেই সংহতি এই ক্ষমতালাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে। এখানকার জীবন-যাত্রার পরিবেশ এমন যে অবাধ্য হবার চেষ্টা করলে বিপদে পড়তে হবে। মরূদ্যানের বাইরের জমি জলহীন। সেখানে নতুন পল্লী গড়ে তোলা অসম্ভব। এই অবস্থায় সামাজিক অভিপ্রায়ের মধ্যে শুধু নৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিফলিত হয় না, তার মধ্যে উৎপীড়নক্ষম শক্তিও নিহিত থাকে।

যাই হোক, নদীপ্রবাহ সিঞ্চিত জনপদে অঢেল খাদ্যশস্য উৎপন্ন হলেও এই সব অঞ্চলে সভ্য জীবনের পক্ষে অপরিহার্য অন্যান্য কাঁচামালের বড় অভাব ছিল। নীল নদের উপত্যকায় ঘর-বাড়ি তৈরীর কাঠ, ধাতুপিণ্ড আর বাহুশক্তিমান পাথরের বড় অনটন ছিল। সুমেরের অবস্থা আরও খারাপ। খেজুর গাছের কাঠ ছাড়া কোন সহজলভ্য কাঠ সেখানে ছিল না। পাথরের আকরও মিশরের চাইতে অনেক দূরে দুর্গম অঞ্চলে ছিল। মিশরীয়রা অন্ততঃ এই বিষয়ে খুব অসুবিধা ভোগ করত না। কারণ নীল নদের আশেপাশের পাহাড়ে হাতিয়ার তৈরীর ভাল পাথর পাওয়া যেত। কিন্তু পাথর আর তামা দুটোই সুমেরে দুষ্প্রাপ্য ছিল। হাতিয়ার তৈরীর জন্য বরাবর তারা বিদেশ থেকে পাথর আমদানি করেছে। সিন্ধুদেশ এবং পঞ্জাবেও সুমেরের মত কাঁচামালের অনটন ছিল।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, নদীপ্রবাহ বিধৌত সমভূমির জনপদে জলনিকাশ এবং জলসেচের বিধিব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সামাজিক সংগঠন সুসংহত করার এবং কেন্দ্রীভূত আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। সেই সঙ্গে অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামালের অভাব পূরণের জন্য সুমের, সিন্ধু ও মিশরের নদী উপত্যকার মানুষ বাধ্য হয়েছে যে কোন প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন অথবা দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। জমির উর্বরতা এত বেশী ছিল যে আমদানি করা মালের বিনিময়-মূল্য দেবার অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু এই ব্যবসায়িক সম্পর্কের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক জীবন বর্জন করতে হয়েছে এবং নিজের দেশে প্রভূত উদ্বৃত্ত সামগ্রী উৎপন্ন করতে হয়েছে। তার ফলে সমাজের আর্থিক কাঠামো নতুন করে ঢেলে সাজার প্রয়োজন হয়েছে। কেন না বাড়তি শস্য আর দেশজ দ্রব্য দিয়ে এক দিকে যেমন বহিরাগত সামগ্রীর বিনিময়-মূল্য দিতে হবে, তেমন ব্যবসায়িক লেনদেনে নিযুক্ত বণিক আর যানবাহন কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদেরও পোষণ করতে হবে। আমদানি করা মাল নিয়ে যেসব সুদক্ষ কারিগর কাজ করবে তাদের ভরণপোষণের জন্যও উদ্বৃত্ত সামগ্রী প্রয়োজন। উদ্বৃত্ত দ্রব্যসম্ভারের চাহিদা এইখানেই শেষ হয় না। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে হলে আসা-যাওয়ার পথে মালপত্রের 'কনভয়' রক্ষার জন্য শান্ত্রীর প্রয়োজন। আবার বণিকদেরও অনেক সময় অস্ত্রবল দিয়ে সহায়তা করতে হয়। তাছাড়া ব্যবসায়িক লেনদেন জটিলতর হয়ে উঠলে হিসাব রাখার জন্য হিসাবনবীস প্রয়োজন। এমন কি, বিরোধী স্বার্থের সংঘাত মেটাবার জন্য সরকারী আমলার প্রয়োজনও উপেক্ষা করা যায় না। এই সব কাজে যত লোক নিযুক্ত হবে তাদের সকলে উৎপন্ন খাদ্যের ভাগীদার হলেও, সরাসরি খাদ্যোৎপাদন তাদের কেউ করে না। তাই এদের জন্য খাদ্যোৎপাদকদের বাড়তি খাদ্য উৎপাদন করতে হয়।

স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্যোৎপাদক আর্থিক জীবনবিধির পরিবর্তে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিশেষ বিশেষ কারিগরী বৃত্তিজাত দ্রব্যোৎপাদনের উপর নির্ভরশীল আর্থিক-বিধি যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয়, তাহলে আর্থিক জীবনের সেই পরিবর্তন-কেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও স্পষ্টতঃ বেড়ে গিয়েছিল। পুরোহিত, আমলা, বণিক, কারিগর আর সৈনিক হিসাবে যে দলটি সমাজের মধ্যে দেখা দেয় শ্রেণী হিসাবে তারা নতুন। স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্যোৎপাদক সমাজে এই সব শ্রেণীর জীবিকার কোন সুযোগ থাকতে পারে না। শিকারী দলের মধ্যে এদের অস্তিত্ব ততোধিক অসম্ভব।

তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুমান যে প্রত্যক্ষ সত্য, পুরাবিদ্যার স্মারকচিহ্নের সাক্ষী থেকে তা প্রমাণ হয়। একালের শহরগুলি আয়তনে কৃষিপল্লীর তুলনায় অনেক বড় আর তার মধ্যে অনেক বেশী লোক বাস করতে পারত। মহেঞ্জোদারোর শহরটি এক বর্গ মাইলের উপর গড়ে উঠেছিল আর তার প্রশস্ত পথ বা সরু অলি-গলির সুবিন্যস্ত ঘনসন্নিবিষ্ট দোতলা বাড়ি অনেক লোকের স্থান সঙ্কুলানের উপযোগী ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন শহরের সমাধিক্ষেত্রে শুধু সম্পদের জৌলুসের প্রমাণ পাওয়া যায় না। শবের সংখ্যা থেকেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

নীলনদের উপত্যকার প্রতিটি পল্লীর আলাদা সমাধিস্থান ছিল। তথাপি রাজা-রাজাড় এবং আমলাদের জন্য আলাদা সমাধিক্ষেত্র ব্যবহার করা হত। সমাজে এদের সংখ্যা খুব বেশী হতে পারে না। তবু সুমেরের উর শহরের তথাকথিত রাজকীয় সমাধিস্থানে সাতশ মৃতদেহের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এই সমাধিক্ষেত্র বড় জোর দেড়শ থেকে তিনশ বছর ব্যবহৃত হয়েছে। তবু তার মধ্যে কয়েক হাজার বছর পরেও সাত শতাধিক শবের চিহ্ন দেখলে স্বভাবতঃ মনে করা যায় জনসংখ্যা নিশ্চয়ই বেড়েছিল, না হলে এত শব এল কোথেকে? প্রাগৈতিহাসিক যুগের যত সমাধির সন্ধান পাওয়া গেছে তার কোনটিতে এত শবের সমাবেশ দেখা যায়নি।

মিশর, মেসোপটেমিয়া আর সিন্ধুদেশে শিল্পবাণিজ্য-নির্ভর জীবনবিধি কায়েম হবার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিণতি দেখা দেয় তার মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। এই সাদৃশ্য নিছক তত্ত্বগত সাদৃশ্য মাত্র। বাস্তব ক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রতিটি এলাকায় আলাদা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর্থিক কাঠামোর খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যেই শুধু বিভিন্নতা ছিল না। আর্থিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিধিব্যবস্থার মধ্যেও সুস্পষ্ট বিশিষ্টতা ছিল। অতি সাধারণ পুরাতাত্ত্বিক স্মারকচিহ্নের মধ্যে এই পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। প্রতিটি এলাকার কর্মকার সমধর্মী সরল পদ্ধতিতে রাসায়নিক বস্তু নিয়ে কাজকর্ম করে হাতিয়ার এবং অস্ত্রসস্ত্র তৈরি করে সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণ করেছে। কিন্তু তাদের উৎপন্ন দ্রব্য, তাদের কুড়াল, ছুরি-ছোরা এবং বর্শাফলকের আকৃতি আলাদা। তিন এলাকায় কুম্ভকারের শিল্প প্রচলিত থাকলেও মিশরীয়, সুমেরীয় আর ভারতীয় মৃৎপাত্রের মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে। মানুষের প্রতিটি কর্মপ্রয়াসের মধ্যে এই পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। কাজেই এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তত্ত্বগত সাধারণ আলোচনা থেকে আর্থিক পরিবর্তনের বাস্তব গতি-প্রকৃতি মালুম করা যাবে না।

।। সুমেরের পৌর সংস্কৃতি ।।

মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাঞ্চল সুমের আর উত্তরাঞ্চল আক্কাদের কিশ, জেমদেৎ নাশর, ওপিস, এশুন্না আর মারি নামে স্থানে পুরাবিস্তাবিদেরা এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কয়েকটি পর্যায় বিশেষভাবে অনুধাবন করার সুযোগ পেয়েছেন। সুমেরের যে ছয়টি শহরে (এরিদু, উর, এরেক, লাগাস, লারসা আর শুরুপ্পাক) এই সুযোগ মিলেছে তার আর্থিকবিধির মধ্যে শুধু সাদৃশ্য নয় অভিন্নত্ব আছে। বিচার-বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে, এই অভিন্নত্ব ভাষা, ধর্ম এবং সামাজিক সংগঠনের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই যে কোন একটি শহরের ক্রমপরিবর্তনের ধারা বর্ণনা করলে সব কয়টি শহরের অবস্থা বোঝা যাবে। এরেক নামে স্থানটি খনন করে পুরাবিস্তাবিদেরা যে তথ্য জেনেছেন এখানে শুধু তার কথা বলব।

নবোপলীয় চাষীর পল্লী হিসাবে এরেকের সূচনা। পর পর কয়েকটি পল্লীর ধ্বংসাবশেষ জমে এখানে এমন একটি ঢিবির সৃষ্টি হয়, যা আশপাশের জলাভূমির চাইতে উঁচু। এই কৃত্রিম টিলার নীচের দিকের পঞ্চাশ ফুট নলখাগড়ার কুটির আর কাদামাটির কুটিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে গড়া। তার মধ্যে যেসব সামগ্রী পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণ হয়, এই সব পল্লীতে কুমোরের চাক আর ধাতুর ব্যবহার ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ক্রমে পল্লীটি বড় হচ্ছিল, তথাপি তার পল্লীরূপ বদলায়নি।

এর উপরের স্তরে সহসা এক বিরাট সৌধের ভিতের চিহ্ন দেখা যায়। স্মারক-চিহ্নগুলি এক বা একাধিক মন্দিরের। তার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম পাহাড়ের চিহ্ন নজরে পড়ে। ঐতিহাসিক যুগে সুমেরের প্রতিটি মন্দিরের অঙ্গ হিসাবে জিগ্গুরাত নামে একটি স্তূপ তৈরি করা হত। এই স্মৃতিচিহ্ন তার স্মারক বলে পুরাবিস্তাবিদেরা মনে করেন। এটি পুরোপুরি কাদার তাল দিয়ে তৈরী। উচ্চতা পঁয়ত্রিশ ফুটের মত। জিগ্গুরাতটির মাথার আয়তন হাজার বর্গ গজের বেশী। স্তূপটির খাড়া পাশের কোথাও তাক কাটা আবার কোথাও ঠেস লাগান। তাছাড়া মাটি যখন নরম ছিল সেই সময় সারি বেঁধে লাগোয়াভাবে হাজার হাজার মাটির পানপাত্র বসিয়ে এই পার্শ্বদেশ সজ্জিত করা হয়েছে।

মাটির ইট দিয়ে তৈরী ছোট্ট একটি মন্দির ছিল স্তূপের মাথায়। তার দেওয়াল চুনকাম করা। তাছাড়া দেবতা যাতে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে পারেন তার জন্য মন্দিরটির লাগোয়া ঊর্ধ্বমুখী একটি সিঁড়ি ছিল। স্তূপের পাদদেশে আরও জমকালো একাধিক মন্দির ছিল।

এই স্মৃতিচিহ্নটির বিচার করতে গেলে প্রথমে ধরে নিতে হয় যে কৃত্রিম পাহাড় আর মন্দির তৈরি করতে, তার মাল-মসলা সংগ্রহ করতে, মালপত্র বয়ে নিয়ে আসতে এবং হাজার হাজার মৃৎপাত্র তৈরি করতে বেশ বড় একদল সুশৃঙ্খল শ্রমিক ও কারিগর আবশ্যক। পারিশ্রমিক যদি তাদের নাও দেওয়া হয় তবু বাড়তি খাদ্যের ভাণ্ডার থেকে তাদের পরিপোষণের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। কেন না এই কাজে লেগে কেউ আর সরাসরি খাদ্যোৎপাদন করতে পারেনি। স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন্ ভাণ্ডার থেকে এই বাড়তি খাদ্য আসতে পারে। তার জবাবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, মন্দির যখন দেবতার নামে উৎসর্গীত তখন দেবতা স্বয়ং হয়ত কোন খাদ্য ভাণ্ডারের মালিক ছিলেন এবং ধর্মভীরু সংস্কারাচ্ছন্ন চাষীরা স্বর্গীয় দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণামী দিয়ে সেই ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই ধরনের মন্দির নির্মাণ করতে হলে সযত্নে রচিত পরিকল্পনা আর কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলীর আবশ্যক। দেবতা তো জনমনের কাল্পনিক সৃষ্টি। তার পক্ষে পরিচালক অথবা তত্ত্বাবধায়ক হওয়া সম্ভব নয়। সেই দায়িত্ব তার সেবক অথবা সেবকগোষ্ঠীকে বহন করতে হয়েছে। দেবতার নামে যে সম্পদ সঞ্চিত হচ্ছে তার সামান্য এক অংশের বিনিময়ে এই সেবকদল তাঁর কাজ করতে নিশ্চয়ই অনিচ্ছা প্রকাশ করেনি। বরং সানন্দে এই পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায় তারা গ্রহণ করেছে এবং দেবতার পার্থিব সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করেছে।

নবোপলীয় সমাজের যাদুকরেরা ক্ষেত-খামারে কাজ করার পার্থিব দায় থেকে মুক্ত হয়েছিল। তারা দেবতার সেবায়েত হিসাবে পুরোহিত সংঘরূপে আত্মপ্রকাশ করে। দেবাদিষ্ট এবং দেবানুগৃহীত এই পুরোহিত দল শ্রমজীবী জনসাধারণের কাছে দেবতার অভিপ্রায়ের প্রবক্তা হয়ে ওঠে। যেসব যাদুক্রিয়া দ্বারা নবোপলীয় সমাজের মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে অনুকূল করার চেষ্টা করেছে, এই পুরোহিত-গোষ্ঠী সেই সব প্রাকৃতিক শক্তির অধিদেবতার তুষ্টিবিধানের জন্য সাবেক যাদু-ক্রিয়ার প্রকারণ পরিবর্তন করে নানাবিধ জটিল ক্রিয়াকাণ্ডের বিধান দিতে থাকে। এইভাবে নতুন নতুন ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্ভাবন প্রসঙ্গে দেবতার নামে মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা তাদের মনে উদ্ভূত হয়। ঐতিহাসিক যুগের রাজারাও বলতেন যে মন্দির নির্মাণের জন্য তাঁরা স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন এবং স্বপ্নের মধ্যেই মন্দিরের নির্মাণ-পদ্ধতি তাদের বলে দেওয়া হয়েছে।

এরেকের মন্দির সর্বপ্রথম যখন নির্মিত হয়, তখনও এক পুরোহিতগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল বলে পুরাবিদ্যাবিদেরা মনে করেন। পরবর্তী যুগের পুরোহিত-গোষ্ঠীকে দেবতার ধনভাণ্ডারের তত্ত্বাবধান করতে দেখা যায়। এই পুরোহিত-

গোষ্ঠীও সেই কাজ করত। বিপুল বৈভবের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে তাদের বহু বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দেবতার নামে যত সামগ্রী অর্পিত হত তার হিসাব রাখার দায় তার অন্যতম। হিসাব যদি না রাখা হয়, তাহলে দেবতার কাছে কৈফেয়ত কি ভাবে দেওয়া যাবে? প্রকৃতপক্ষে এরেকের এই প্রথম মন্দিরের মধ্যে আবিষ্কারকেরা এমন একটি ফলক (টেবলেট) পেয়েছেন যার উপর সীলের দাগ এবং গর্ত আছে। এই গর্তগুলি পুরাবিদ্যা-বিদ্‌দের মতে তৎকালীন সংখ্যাবাচক চিহ্নের দ্যোতক। সেই হিসাবে এই ফলক-খানিকে দুনিয়ার প্রাচীনতম ফলক এবং সুমেরীয় মন্দিরের উত্তরকালীন জটিল হিসাবপত্র সংক্রান্ত দলিলের অগ্রদূত বলে গণ্য করা হয়।

সুমেরের প্রথম মন্দিরের মধ্যে তাহলে এমন এক সমাজচিত্রের আভাস পাওয়া যায় যখন শহর গড়ে উঠেছে, দেবতার হাতে প্রভূত বাড়তি মূলধন সঞ্চিত হয়েছে এবং এক পুরোহিতগোষ্ঠী দেবতার নামে সেই উদ্বৃত্ত ধনসম্পদ তত্ত্বাবধান করছে। তাছাড়া সমাজের মধ্যে সংগঠিত শ্রমজীবী দল, বিশেষ ধরনের শিল্পসংস্থা এবং যে কোন রকম ব্যবসা-বাণিজ্য আর যানবাহন ব্যবস্থাও ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। হিসাবপত্র রাখা আর লেখার সূচনাও হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। এগুলি কেবলমাত্র এরেকের একক বৈশিষ্ট্য নয়। সুমেরের সব কয়টি শহরে অবিকল এক সাংস্কৃতিক পর্যায়ের স্মারকচিহ্ন পাওয়া গেছে। কালবিচারে সেই স্মারকচিহ্ন সমান সুপ্রাচীন।

নগর সভ্যতা গড়ে ওঠার এই পর্যায় থেকে লিখিত ইতিহাসের সূচনার যুগ পর্যন্ত এই সব স্থানের ক্রমিক পরিবর্তনের ছেদহীন ইতিহাস অনায়াসে অনুধাবন করা যায়। সেই ইতিহাস মূলতঃ সঞ্চিত ধনবৃদ্ধির ইতিহাস—কারিগরী দক্ষতার ক্রমোন্নতি, বাণিজ্যের প্রসার এবং উৎপাদনী শ্রমের ক্রমবিশিষ্টতা লাভের কাহিনী।

॥ পৌর সভ্যতার ক্রমোন্নতি ॥

এরেকের মন্দির বার কয়েক ভেঙে গেছে এবং কমপক্ষে বার চারেক পুনর্নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি নতুন মন্দির তার পূর্ববর্তী মন্দিরের চাইতে জমকালো। তার কারুকার্যের মধ্যে উন্নততর শিল্প-নৈপুণ্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। প্রথম জিগুরাতের গায়ে মৃৎপাত্র বসান ছিল। কিন্তু তার পরেরটির গায়ে লাল, কালো অথবা সাদা রঙকরা পোড়া মাটির শঙ্কু (কোণ) বসান হয়েছে। ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় মাটির শঙ্কুর পরিবর্তে লাল রঙের কার্নেলিয়ান পাথর আর শুক্তি ব্যবহার করা

হয়েছে। মন্দিরটির ভেতরকার দেওয়ালে প্রথম মাটি দিয়ে জীবজন্তুর প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছে। পরে সেখানে পাথর অথবা শুক্তির উপর খোদাই করা প্রতিকৃতি বিটুমেন দিয়ে লাগান হয়েছে। ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় দেওয়াল চিত্রণের জন্ত তাম্রমূর্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এই সব মূর্তির কোনটি ঢালাই করা আবার কোনটি পিটে তৈরি করা।

মন্দিরটি তৃতীয় বার পুনর্নির্মাণ করার সময় এখানকার সংস্কৃতি যে পর্যায়ে ছিল, আক্কাদের (উত্তর ব্যাবিলন) জেমদেৎ নাশরেও অবিকল সেই সাংস্কৃতিক পর্যায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। সীসা, রূপা আর লাপিস লাজুলির ব্যাপক ব্যবহার থেকে বোঝা যায়, দুটি শহরই তখন বিস্তীর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছে এবং উভয় শহরের মানুষ ফলিত-রসায়নে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছে। ধন-সম্পদও প্রভূত পরিমাণে বেড়েছিল। হালকা যুদ্ধরথ আর চকচকে আঠা দিয়ে নানা দ্রব্যসম্ভার তৈরি করার কৌশল শিল্পীদের উন্নততর কারিগরী নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে। হিসাবের ফলকে প্রতীক চিহ্ন এবং সংখ্যাবাচক সাংকেতিক চিহ্নের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতীক চিহ্নগুলি চিত্রধর্মী। তার মধ্যে এমন সব চিহ্ন দেখা যায় যার সঙ্গে কোন বস্তুর সাদৃশ্য নেই। তবু সেই সব সাংকেতিক চিহ্নের তাৎপর্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল। দশ, ষাট আর একশ বোঝাবার জন্ত তখন আলাদা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে। গণনার জন্ত সরল গাণিতিক সূত্রও তখন আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই স্তরের পরবর্তী পর্যায়ের স্বাক্ষর পাওয়া যায় উর শহরের তথাকথিত 'রাজকীয় সমাধিক্ষেত্রে'—রাজার সমাধির মধ্যে সাজান দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে। সেখানে এই সমাজ-জীবন পদ্ধতির চরমোৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বর্ণকারেরা তখন সোনার তার, সোনার শিকল, কারুকার্যখচিত স্বর্ণালংকার আর গালা দিয়ে জোড়া লাগাতে শিখে গেছে। তাম্রকারও ঢালাইয়ের কাজে অনেক বেশী দক্ষতা অর্জন করেছে। হাতুড়ি আর ঢালাইর ছাঁচ ব্যবহার করে সে তখন অন্যান্ত কারিগরকে কুড়াল, বাইস, বাঁটালি, ড্রিল, ছুরি, করাত, পেরেক, সূঁচ, ফুটো করার যন্ত্র আর বল্লমী জাতীয় সামগ্রী সরবরাহ করছে। জহুরীরা কঠিনতম রত্নখণ্ড ছিদ্র করতে এবং তার উপর সীল খোদাই করতে শিখেছে। স্থপতিরা চুনা পাথরের উপর মূর্তি খোদাই করতে আরম্ভ করেছে। ছুতোর মিস্ত্রি শুধুমাত্র নৌকা, রথ আর কোচ তৈরি করছে না। হার্প এবং লায়ার জাতীয় বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের কাজেও সে হাত পাকিয়েছে। এই সব বাদ্যযন্ত্র বাজাবার মত লোকও সমাজে ছিল নিশ্চয়ই।

এই দ্রব্যসম্ভারের সমারোহ এবং শিল্প-নৈপুণ্যের উৎকর্ষ দেখে বোঝা যায়, সমাজের হাতে প্রভূত মূলধন সঞ্চিত হয়েছে এবং তার মধ্যে নানাবিধ সুনিপুণ কারিগরীবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে। ফলিত-বিজ্ঞানে নতুন নতুন আবিষ্কার আর নতুন নতুন শিল্পশাখাকে আশ্রয় করে সমাজ-জীবনে এই উৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল। সাচ্চা তামার তাল দিয়ে সুমেরীয়রা অমন ভাল ঢালাইর কাজ করতে পারেনি। তার জন্ত তামার সঙ্গে টিনের খাদ মেশাতে হয়েছে অর্থাৎ আমরা যাকে ব্রোঞ্জধাতু বলি সেই ধাতু আবিষ্কার করতে হয়েছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে তামার সঙ্গে টিনের খাদ মিশিয়ে তারা ঢালাইর কাজ করত।

কিন্তু ব্রোঞ্জ ধাতু আবিষ্কারের কৃতিত্ব যে সুমেরীয়দের প্রাপ্য এমন কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কারণ ভারতবর্ষেও তখন ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, তাম্রপিণ্ড গালাতে গিয়ে তার সঙ্গে টিনের প্রাকৃতিক অথবা আকস্মিক মিশ্রণের ফলাফল দেখে মানুষ খুব সম্ভবতঃ তামার সঙ্গে টিনের খাদ মিশিয়ে ব্রোঞ্জ ধাতু তৈরি করতে শিখেছে। অর্থাৎ ছুটি ধাতুর আকস্মিক যোগাযোগের ফলাফল প্রত্যক্ষ করে এই কৌশল আয়ত্ত করেছে। যে সমাজের শিল্পীরা নানাস্থানের তামা ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে শুধুমাত্র তাদের পক্ষে অঞ্চল বিশেষের তামার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ অনুধাবন করতে গিয়ে তুলনামূলক বিচার করে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তাম্রপিণ্ডের গাত্রলগ্ন মলের (ইমপিওরিটি) মধ্যে নিহিত। একবার যদি একথা বোঝা যায় তাহলে মল আলাদা করার বিষয় চিন্তা করা যায় এবং শেষ পর্যন্ত ইচ্ছামত খাদ মেশান যায়। সুচিন্তিত তুলনামূলক বিচার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া ছুটি আলাদা ধাতু মিশিয়ে সেকালে ব্রোঞ্জ ধাতু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন না।

আরও ছুটি পরীক্ষায় একালের সুমেরীয়রা সাফল্য অর্জন করেছিল। লোহা এবং কাঁচ আবিষ্কার করেছিল তারা। একালের স্মারকচিহ্নের মধ্যে ছোট্ট একখানি লোহার ছোরা পাওয়া গেছে। লৌহপিণ্ড থেকে লোহা নিষ্কাশন করে ছোরা তৈরি করা হলেও এটি বিচ্ছিন্ন পরীক্ষা মাত্র। কেন না এই আবিষ্কারের রীতি অনুসরণ করে আর কোন লৌহজাত দ্রব্য তৈরি করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টপূর্ব তেরশ বছরের আগে শিল্পকর্মে লোহার ব্যবহার আরম্ভ হয়নি। আর সেই ব্যবহারও মেসোপটেমিয়ায় হয়নি—হয়েছে এশিয়া মাইনরের অন্তরে।

স্বচ্ছ কাঁচও আবিষ্কৃত হয়েছিল এই সময়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিকারীরা চকচকে পাথরের সন্ধান জানত। মেসোপটেমিয়াতেও খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার

বছরের আগে এই জাতের পাথর তৈরীর কলাকৌশল প্রবর্তিত হয়েছিল। তার কিছুকাল পরে স্বচ্ছ কাঁচের নজীর দেখা যায়। তাই প্রথম কাঁচ আবিষ্কারের কৃতিত্বও সুমেরীয়দের প্রাপ্য। পুরাবিদ্যাবিদেরা মনে করেন, নানা ধরনের চকচকে জিনিস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে কাঁচ আবিষ্কৃত হয়েছে।

যেসব কাঁচামাল দিয়ে সুমেরীয়রা শিল্পকর্ম করেছে তার অধিকাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করা। কিছু কিছু তামা আমদানি হত পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী ওমান থেকে। সীসা আর রূপা হয়ত বা এশিয়া মাইনরের তাউরাস পর্বতমালা থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। আরবসাগর আর পারস্যোপসাগর থেকে শুক্তির খোলক আমদানি করতে হত। জাগ্রোস অথবা লেবাননের উপকূল থেকে কাঠ নিতে আসতে হয়েছে। লাপিস লাজুলি হয়ত আফগানিস্থান থেকে এসেছে।

বিদেশগত এত সব জিনিস নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজকর্ম করার সাক্ষী-প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, নদী প্রবাহ বিধৌত এই সমভূমির বাসিন্দারা প্রথমাবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে অব্যাহত বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিল। বাণিজ্যের মারফত শুধু কাঁচামাল সংগৃহীত হয়নি। ভারতবর্ষ আর মিশরেও সমকালে পৌর সংস্কৃতি পত্তন হয়েছিল এবং সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে সুমেরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এক দেশের শিল্পজাত সামগ্রী অন্যদেশের বাজারে বিক্রি হত। মেসোপটেমিয়ার কয়েকটি শহরে এমন সব সীল ও মালা, এমন কি মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যা সুমেরের শিল্পজাত সামগ্রী নয়। অথচ সমকালীন সিন্ধু ও পঞ্জাবের শহরে ঐ রকম সীল, মালা ও মৃৎপাত্র হামেশা পাওয়া যেত। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে মনে করা হয়, সুবিশাল মরু-প্রান্তর আর দুর্গম গিরিকান্তার অতিক্রম করে ক্যারাভান দল স্থলপথে এবং আরবসাগরের উপকূল বরাবর পাল-তোলা ডাউ (আরবী অর্ণবপোত) জলপথে এই দুটি নদীর মোহানার মধ্যে বাণিজ্যিক যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল।

এই ধরনের বাণিজ্য প্রাচ্যখণ্ডে শুধুমাত্র মাল চালানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাণিজ্যের মারফত আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ছে—এক দেশের ধ্যান-ধারণা ও কলাকৌশল ভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে।

সেকালের যানবাহন ব্যবস্থার কথা স্মরণ করলে স্বভাবতঃ মনে হবে, সুদূর গন্তব্য স্থলে পৌঁছবার পথে ক্যারাভান দল এবং বাণিজ্যপোতকে পথিমধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করতে হয়েছে। যে দেশ থেকে মাল আমদানি হচ্ছে সেই দেশের ঔপনিবেশিকও রয়েছে গন্তব্যস্থলে। তারা এই মাল খালাস করেছে এবং

ফিরতি পথের মাল বোঝাই করে দিয়েছে। এই অবসরে দুরাগত বণিকদলকে আদর-আপ্যায়ন করার দায়িত্বও তাদের বহন করতে হয়েছে। এই কারণে পুরাবিদ্যাবিদেরা মনে করেন, উর আর কিশ্ শহরে ভারতীয় বণিকদের উপনিবেশ ছিল, যার মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পাওয়া গেছে।

তাছাড়া প্রাচ্যখণ্ডের কারিগরদের মধ্যে আবাহমান কাল ধরে স্থানান্তর গমনের একটা প্রবণতা দেখা যায়। যেখানে গেলে কাজকর্ম করে ভালভাবে জীবিকানির্বাহ করা যাবে সেইখানে তারা চলে যেতে চায়। পৌর সভ্যতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সুদক্ষ কারিগরের যে নতুন শ্রেণীটি সৃষ্টি হল সরাসরি খাদ্যোৎপাদনের দায় তাদের ছিল না। কাজেই মাটির মায়া তাদের পেছনে টানেনি। দলগত বন্ধন (ট্রাইবাল বণ্ড) থেকেও তারা মুক্তি পেয়েছিল হয়ত বা। আবার নতুন যে রাষ্ট্র-শক্তি গড়ে উঠছিল তার প্রতি আনুগত্যের বন্ধনও তখন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই অবস্থায় জীবিকার খোঁজে কারিগর আর আবিষ্কারকও ক্যারাভানের সঙ্গে সঙ্গে দেশান্তরী হয়েছে। তাছাড়া দক্ষ কারিগরেরা যদি দাস হয়, তাহলে তাদের দেশান্তরে পাঠান আরও সহজ। মোটের উপর মনে করা হয়, দক্ষ কারিগরেরা সচল ছিল বলে কারিগরী নৈপুণ্য এত দ্রুত প্রসার লাভ করতে পেরেছে এবং সেকালের সংস্কৃতির মধ্যে খানিকটা আন্তর্জাতিকতার ভাব সৃষ্টি হয়েছে।

পৌর সভ্যতা কায়েম করার জন্য মেসোপটেমিয়াকে যেসব স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে আর শিল্পক্ষেত্রে এবং আর্থিক জীবনে তার ফলে যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, মোটামুটিভাবে তার বিবরণ দেওয়া হল। ধন সঞ্চয় এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উন্নতির কয়েকটি স্তরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। কিন্তু সমাজ-জীবনের সর্ব বিষয়ে, বিশেষতঃ রাজনীতিক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। খুব সম্ভবতঃ বিদেশী আক্রমণের ফলে এবং বিদেশী বিজেতার প্রভাবে ধারা-বাহিকতা ছিন্ন হয়েছে। অগ্রগতির ধারা কখন বাধাপ্রাপ্ত কখন ত্বরান্বিত হয়েছে।

সুমেরের অন্ত্যেষ্টিরীতির মধ্যেই ধারাবাহিকতার অভাব দেখা যায়। নবোপলীয় চাষীরা সাধারণতঃ সটান লম্বাভাবে চিত করে শুইয়ে শব সমাধিস্থ করত। জেমদেৎ নাশরে এই সমাধিরীতি পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। মেসোপটেমিয়ার সংস্কৃতির তৃতীয় পর্যায়ে এখানে হাঁটু ভেঙে উপুড় করে শুইয়ে শব সমাধিস্থ করা হয়েছে। উরের রাজকীয় সমাধিতে দেখা যায়, ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ যে ভাবে শুয়ে থাকে সেই ভাবে শবগুলি সমাধিস্থ করা হয়েছে, আর তাদের সঙ্গে জীবন্ত কিছু মানুষকেও সহমরণে পাঠান হয়েছে।

স্থাপত্যবিদ্যার কলাকৌশলের মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা যায় তাকে শুধু কারিগরি উন্নতির স্বাক্ষর বলে গ্রহণ করা হয় না। এরেকের দ্বিতীয় মন্দিরটি চুনা পাথরের ভিতের উপর তৈরী। সুমেরের চৌপট জমিতে এই জিনিস দুর্লভ। কাজেই প্রস্তর খণ্ড বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছে। মন্দির নির্মাণের নতুন কলাকৌশলও হয়ত বা বিদেশী। পরবর্তী মন্দিরটি নির্মাণ করতে প্রস্তর খণ্ড ব্যবহার না করে চুল্লীতে পোড়ান চ্যাপটা ইট ব্যবহার করা হয়েছে। তার অনুবর্তী সব কয়টি মন্দির ও সমাধি স্তম্ভ এক পাশ চ্যাপটা এবং অপর পাশ কুশনের মত (প্লানো-কনভেক্স) ইট দিয়ে তৈরী। স্থাপত্যশিল্পে নতুন যেসব নির্মাণ-পদ্ধতির কথা বলা হল, এই নির্মাণ-কৌশল বিদেশী ফ্যাশানের প্রভাবের ফল। বিদেশী আক্রমণকারীরা সুমেরে এই নির্মাণ-কৌশল আমদানি করেছে বলে মনে করা হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ যে হয়েছে তার প্রমাণ কিন্তু সীলের মধ্যেও পাওয়া গেছে।

বহিরাক্রমণের ফলে এবং পরদেশী বিজেতার প্রভাবে সুমেরের সামাজিক জীবনে, বিশেষতঃ সুমেরের আদিবাসীদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তার প্রকৃতি এতদিন পরে জানা সম্ভব নয়। তবে জাতিগত বিশিষ্টতার পরিবর্তন যে বাস্তব সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারেনি এ কথা সত্য। যত সংকট এসে থাক দেবতা এবং তাঁর মন্দির সেই সংকট উত্তীর্ণ হয়েছে। সামাজিক কাঠামোর অন্যান্য দিকে যাই ঘটুক না কেন পুরোহিতগোষ্ঠী বরাবর তাদের সত্তা বজায় রেখে গেছে। ব্যাবিলনের লিখিত ইতিহাসে বহু রাজবংশের উত্থান-পতন, বহু বহিরাক্রমণের নজীর আছে। এই সব বিপর্যয়ের সময় দেবমন্দির লুণ্ঠিত, এমন কি চূর্ণবিচূর্ণ হতে পারে। তবু নতুন রাজা হোক কিংবা বিদেশী বিজয়ী হোক সকলেই বরাবর মন্দির পুনর্নির্মাণ করে দিয়েছে এবং নতুন ধন-দৌলত সংগ্রহ করে মন্দিরের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। প্রাগৈতিহাসিক মন্দিরের বারংবার পুনর্নির্মাণের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, পুরোহিতগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অব্যাহত ছিল এবং তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

তার ফলে মন্দিরের ধন-দৌলত ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই বর্ধমান সম্পদ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ক্রমে দুর্বহ হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় পড়ে জটিল ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব রাখার জন্য পুরোহিতেরা উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে বাধ্য হয়েছে। কালক্রমে তারা লেখার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। সেই পদ্ধতি শুধু যে তাদের সহকর্মীদের বোধগম্য ছিল তা নয়, আধুনিক যুগের পণ্ডিতেরাও তার পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন। এরেকের চতুর্থ মন্দিরটি যে

সময়ে নির্মিত হয় প্রাগৈতিহাসিক পুরাবিস্তার তৎকালীন সিদ্ধান্ত লিখিত নজীর দ্বারা সমর্থিত।

লিখিত নজীর থেকেই সুমের ও আক্কাদের খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের অব্যবহিত পরবর্তীকালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের চিত্র পাওয়া যায়। গোটা দেশ তখন রাজনৈতিক দিক থেকে স্বায়ত্তশাসনশীল পনর-বিশটি নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে প্রতিটি নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য ছিল আর আর্থিক জীবনে ছিল পারস্পারিক নির্ভরশীলতা। নগরের অধিদেবতা এবং অপরাপর দেবতার মন্দির নিয়ে গঠিত দুর্গ প্রতিটি শহরের মূল কেন্দ্র ছিল। সেকালের মানুষের কাছে দেবতারা হয়ত বা যাদুশক্তির অধিপতি বলে গণ্য হতেন। শস্যের অঙ্কুরোদ্গম সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, তার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম অর্থাৎ বীজ বপন ও ফলনের প্রতীক হিসাবে এককালে কতকগুলি যাদু-ক্রিয়ার প্রচলন ছিল। শস্য আর তার রহস্যময় উর্বরতার প্রতীক হিসাবে যে সব অভিনেতা সেই সব নাটকীয় যাদুক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করত, কালক্রমে জনসাধারণের কাছে তারা যাদুশক্তির নিয়ামক দেবতার প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে। যে যাদুশক্তিকে মানুষ নিমন্ত্রণ করতে চেয়েছে তাকে দেবতাজ্ঞান করে তার তুষ্টি-বিধানের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছে। এইভাবে কাল্পনিক এক ব্যক্তিসত্তার প্রতি সমাজের সমষ্টিগত ইচ্ছাশক্তি এবং মিলিত আশা-আশঙ্কা নিবদ্ধ করে মানুষ তাকে দেশের অধিপতিজ্ঞানে পূজা করেছে।

দেবকল্পনার উদ্ভব যেভাবে এবং যে কারণে হোক না কেন, সকল দেবতার পার্থিব অধিষ্ঠানের ক্ষেত্র ছিল। নগরের মন্দিরেই তাঁরা অধিষ্ঠিত থাকতেন। তাছাড়া প্রত্যেক দেবতার দেবোত্তর সম্পত্তি, দাস-দাসী এবং এক-একটি পুরোহিত-গোষ্ঠী ছিল। মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনতম দলিলের পাঠোদ্ধার করে দেখা গেছে, সেগুলি মন্দিরের হিসাবপত্রের খতিয়ান। পুরোহিতেরা সেই হিসাব রাখতেন। এই সব দলিল থেকে বোঝা যায়, দেবমন্দির শুধু নগরের ধর্মজীবনের কেন্দ্র ছিল না। মূলধন সঞ্চয়ের প্রধানতম কেন্দ্র হিসাবে ব্যাঙ্কের মত এই সব মন্দির কাজ করেছে। দেবতা ছিলেন দেশের সর্বপ্রধান পুঁজিপতি। পুরোহিতেরা তার মুৎসদ্দী হিসাবে কাজ করত। প্রাচীনতম দলিলে দেখা যায়, দেবতার মহাজনী কারবার ছিল। চাষীদের তিনি বীজশস্য এবং হাল-টানা পশু ধার দিতেন—ক্ষেত-খামার জমা দিতেন। ভ্রাম্যমান বণিকদেরও তিনি সোনা এবং খাদ্যশস্য আগাম দিতেন। তাছাড়া সূত্রকার, নৌকার মিস্ত্রি, মদ প্রস্তুতকারক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মাহিনা দিতেন। দেবতা নিজে সমাজের শ্রেষ্ঠ ধনী হলেও সমাজের

কাজেই তার ধন-দৌলত প্রযুক্ত হত। এই ধন-দৌলত তো আসলে সমাজের লোকের ধর্মনিষ্ঠার জন্যই সঞ্চিত হতে পেরেছে। আবার এই ধর্মনিষ্ঠার জন্যই ঋণ পরিশোধের সময় লোকে শুধু আসল ফিরিয়ে দিয়ে অব্যাহতি পায়নি। তার সঙ্গে আরও কিছু অতিরিক্ত প্রণামী দিয়ে যেতে হত। পুরোহিতেরা এই পূত কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। এমন কি আগাম বলে দেওয়া হত কতটা বেশী দিতে হবে। আধুনিক কালে এই প্রণামীকে সুদ বলা হয়। অধার্মিকেরা তাই ইচ্ছে করলে বলতে পারেন, সেকালের দেবতা সুদখোর ছিলেন। তবে যে আর্থিক ব্যবস্থা দেবতাকে বিরাট পুঁজিপতি এবং ভূম্যাধিকারী করেছে, তাঁর মন্দিরকে ব্যাঙ্কে পরিণত করেছে, তার মূল প্রাগৈতিহাসিক কালের মধ্যে প্রসারিত।

খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের সমকালে প্রতিটি শহরে দেবতা ছাড়া আর একজন পার্থিব অধিপতির আবির্ভাব হয়। নিজেকে তিনি সবিনয়ে দেবতার প্রতিনিধি, এমন কি রাজা বলে ঘোষণা করতেন। এক কালে ইনি হয়ত দেবতার বিগ্রহ হিসাবে শস্যের অঙ্কুরোদ্গমের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত পবিত্র যাদুক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছেন। সেই পবিত্র নাটকের কোন কোন অংশে এই সময়েও তাকে দেবতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হলেও মূল অভিনেতার পরিণতি তাকে বরণ করতে হয়নি। অর্থাৎ বীজের মত তাকে ভূগর্ভে সমাধিস্থ হতে হয়নি। তাছাড়া দেবতার ঐহিক ক্ষমতার বেশ মোটা অংশ এই নতুন প্রতিনিধি দখল করে নিয়েছিলেন। সুপ্রাচীন দলিল বলে, ইনি প্রজাদের উৎপীড়ন পর্যন্ত করতেন। তার মানে এই দাঁড়ায়, রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব সমাজের মধ্য থেকে হলেও এই শক্তি সমাজের উর্ধ্বে তার স্থান করে নিয়েছিল।

তথাপি সুমেরীয় সমাজের উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় আর্থিক দায়িত্ব রাজারা পালন করেছেন। ঐহিক শাসক এবং সামরিক নেতা হবার উপযোগী ক্ষমতা তাঁর করায়ত্ত ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর বিরোধী স্বার্থের সংঘাতে সমাজ-জীবন যাতে বিপর্যস্ত হয়ে না পড়ে তার জন্য নিশ্চয়ই তিনি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন দলিল সেই সম্পর্কে নীরব। তবে ব্যক্তিগত মালিকদের কার্যকলাপের সমর্থনে রাষ্ট্রশক্তি যে ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রমাণ আছে। সাবেক কালের রাজারা তাদের আর্থিক কার্যকলাপের জন্য গর্বানুভব করতেন। খাল খনন, মন্দির নির্মাণ, সিরিয়া থেকে কাঠ আর ওমান থেকে পাথর ও তামা আমদানি করার কথা তারা সগর্বে ঘোষণা করেছেন। প্রাচীন কিছু চিত্রে রাজাদের রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেও দেখা যায়।

রাজশক্তির উদ্ভব মূলধন সঞ্চয়ের পদ্ধতি ত্বরান্বিত করেছে। এই উদ্বৃত্ত ধন-

সম্পদ দিয়ে রাজদূত, অমাত্য, সঙ্গীতজ্ঞ আর সেনাবাহিনী পোষণ করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান যাযাবর দলের হানাদারি থেকে দেশের খাল-নালা, আবাদী জমি, পশুচারণের মাঠ আর শহর রক্ষা করে সেনাবাহিনীও আর্থিক দায়িত্ব পালন করেছে। পরিশেষে এই ব্যবস্থা এমন এক রাজনৈতিক বিধান সৃষ্টি করেছে যা নগর-রাষ্ট্রের তুলনায় অর্থ নৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে অনেক বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মেসোপটেমিয়ার উত্তরাংশ (আক্কাদ) ভৌগোলিক দিক থেকে অবিভাজ্য। সেখানে যে কয়টি নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তাদের সকলকে জীবনধারণের জন্য দুটি নদীর উপর (তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস) নির্ভর করতে হত। সভ্য জীবনযাত্রার জন্যও সকলকে বিদেশাগত সামগ্রীর উপর নির্ভর করতে হত। আর সেই সব সামগ্রী সংগ্রহের সূত্রও ছিল এক। সকলেই অভিন্ন জলধারার উপর নির্ভর করত বলে জমি ও জলের ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। বিদেশাগত শিল্প-সামগ্রী আমদানির সূত্র এক হওয়ায় অনিবার্যভাবে বিভিন্ন স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছে। তার মানে আর্থিক দিক থেকে যে অঞ্চল অবিভাজ্য রাজনীতি ক্ষেত্রে তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকায় অন্তর্ঘাতী যুদ্ধের মধ্যে এই স্ববিরোধিতা আত্মপ্রকাশ করেছে। মন্দিরের সুপ্রাচীন দলিলের মধ্যেও প্রতিবেশী শহরের মধ্যে যুদ্ধ এবং সাময়িক শান্তিস্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজশক্তি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে। কিন্তু খৃস্টপূর্ব পঁচিশ শ বছরের আগে এই অন্তর্ঘাতী যুদ্ধ-বিগ্রহের স্থায়ী ফয়সালা হয়নি। সারগন নামে এক সেমিতিক শাসক এই সময় সমগ্র ব্যাবিলনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং সাময়িক বিদ্রোহ সত্ত্বেও প্রায় একশ বছর (খৃস্টপূর্ব ২৩৫০--২২৫০) তার সাম্রাজ্য টিকে ছিল। তার পর উর এবং অন্যান্য শহরের রাজারাও এই প্রচেষ্টা করে মোটামুটি সাময়িক সাফল্যলাভ করেছিলেন। কিন্তু ব্যাবিলনের প্রকৃত রাজনৈতিক ঐক্য খৃস্টপূর্ব আঠারশ বছরের পূর্বে বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য হয়ে ওঠেনি। ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরবির অধীনে গোটা উত্তর মেসোপটেমিয়া এক রাজ্যে গ্রথিত হয়েছিল এবং এক রাজধানী থেকে সমগ্র দেশ শাসিত হত। গোটা দেশে তখন অভিন্ন পঞ্জিকা, অভিন্ন লিখিত আইন-কানুন এবং একটি মাত্র স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

।। মিশরের রাজনৈতিক সংযুক্তি ।।

মিশরে কিন্তু রাজনৈতিক সংযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পৌর সভ্যতার পত্তন হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। নীল নদের উপত্যকার অর্থনৈতিক একত্ব ভৌগোলিক

বিচারে মেসোপটেমিয়ার সমভূমির চাইতে অনেক বেশী। এই অর্থনৈতিক একত্ব তার রাজনৈতিক সংযুক্তির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। ঐতিহাসিক বিচারে মিশরের রাজনৈতিক সংযুক্তি বলতে দক্ষিণাঞ্চলের সংকীর্ণ উপত্যকা অঞ্চলের সঙ্গে উত্তরাংশের সুবিস্তীর্ণ মোহানা অঞ্চলের সংযুক্তি বোঝায়। সারগনের আমলে ব্যাবিলনের সংযুক্তির শ পাঁচেক বছর আগে মিশরের সংযুক্তি নিষ্পন্ন হয়েছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলেও মিশরের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। বিদেশী মালের আমদানির উপর মেসোপটেমিয়াকে যতটা নির্ভর করতে হয়েছে মিশরকে ততটা নির্ভর করতে হত না। নিজের দেশে প্রচুর ভাল ভাল পাথরের সুলভতার জন্য তার শিল্পকর্মে ধাতুর ব্যবহার তেমন অপরিহার্য ছিল না। ব্যাবিলনের কারিগর যখন শুধুমাত্র ধাতব হাতিয়ার ব্যবহার করেছে, মিশরের কারিগর এবং চাষী তার হাজার বছর পরেও ব্যাপকভাবে পাথুরে হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। মিশর প্রধানতঃ ম্যালাকাইট পাথর, রত্ন, সোনা, মসলা ইত্যাদি আমদানি করত। তার মানে যাদুক্রিয়ার প্রয়োজনে এবং বিলাসের জন্য সে বিদেশী মাল আমদানি করেছে। এই সব দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদার জন্য তাকে বিদেশের সঙ্গে নিয়মিত বাণিজ্য করতে হয়েছে এবং দেশের মধ্যে বিশেষ বিশেষ শিল্পসংস্থা গড়ে তুলতে হয়েছে। তবে দেশের মধ্যে যদি এমন কোন শ্রেণীর উদ্ভব না হয় যারা এই সব দ্রব্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয় এবং সেই দ্রব্য পাবার জন্য অকাতরে উদ্বৃত্ত ধন ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে এই সব দ্রব্যের চাহিদা বাড়তে পারে না।

তার মানে এই দাঁড়ায়, আর্থিক ব্যবস্থার রূপান্তরের জন্য যে উদ্বৃত্ত মূলধন প্রয়োজন সেই মূলধন মিশর দেশের দেব-মন্দিরে সঞ্চিত হয়নি। এখানে সেই ধন সঞ্চিত হয়েছে রাজার হাতে। সমাজের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়ে ইতিমধ্যেই তিনি জনসাধারণের ও জনসমাজের ঊর্ধ্বে নিজের মর্যাদা উন্নীত করে নিয়েছিলেন। দক্ষিণ মিশরের রাজা মেনেস যখন উত্তরের মোহানা অঞ্চল জয় করলেন তখনই সংযুক্ত মিশর দেশে শিল্প-বাণিজ্য এবং খাদ্যোৎপাদনের উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু মেনেসের পূর্বপুরুষেরা এমন কোন বাস্তব প্রমাণ রেখে যায়নি যা থেকে মিশর দেশে রাজশক্তির উত্থানের ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ধার করা যায়। তাই মিশরের রাজশক্তির উত্থান এবং সেখানকার পৌর সভ্যতার ক্রমিক অগ্রগতি সম্পর্কে পণ্ডিতেরা অনুমানের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছেন।

তাঁরা মনে করেন, নীল নদের উপত্যকার স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাগৈতিহাসিক গ্রাম্য সমাজ এককালে হয়ত এক শ্রেণীর যাদুকরের প্রভাবে পড়েছিল। লোকে যখন সুপ্রাচীন যাদুক্রিয়ার ব্যর্থতা উপলব্ধি করতে পেরেছে তখন স্বভাবতঃ তারা চতুর লোকের সুকৌশলী যাদুক্রিয়ার উপর আস্থা স্থাপন করেছে। এই সব যাদুকরের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত দাবি করেছে যে যাদুক্রিয়া বলে সে নীল নদের বন্যা, আবহাওয়া এবং শস্যের উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পঞ্জিকা উদ্ভাবন করে বন্যার কাল সঠিকভাবে বলে দিতে পারলে এই দাবি বিশ্বাসযোগ্য হয়। আবার বাঁধ নির্মাণ করে জল রুখতে পারলে হাতে-কলমে প্রমাণ হয়ে যায় যে জল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই সব কৃতিত্ব দেখাতে পারলে অবশ্যই সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, এমন কি খানিকটা কর্তৃত্ব লাভ করা যায়। তার ফলে যাদুকর ব্যক্তিটি সমাজের প্রধান হয়ে উঠতে পারে। তবে এই কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা যেত বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। কারণ যাদুকর স্বাস্থ্যবান ও বলবান না হলে এই ধরনের যাদুক্রিয়া করা সম্ভব হত না। কাজেই বার্ধক্যের দরুন শক্তিহীন হবার আগে সেই যাদুকর-প্রধানকে বধ করে অন্য বলশালী যুবককে তার স্থলাভিষিক্ত করা হত। কিন্তু কোন যাদুকর যদি তার অনুগামীদের বোঝাতে পারে যে গোপন যাদুক্রিয়ার বলে তার পক্ষে দৈহিক দৌর্বল্যের হাত এড়ান সম্ভব তাহলে সে হয়ত এই পরিণতি এড়াতে পেরেছে। ঐতিহাসিক যুগের সকল মিশরীয় নৃপতি পুনর্যৌবন লাভের উদ্দেশ্যে 'শেদ উৎসব' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। এই দৃষ্টান্ত থেকে পুরাবিত্যাবিদেরা মনে করেন, মেনেসের কোন পূর্ব-পুরুষও হয়ত এইভাবে যৌবনলাভের দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

কেবলমাত্র এইভাবে সমাজের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করা সম্ভব হয়নি। যাদুকর-প্রধানেরা এই সঙ্গে আরও কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করেছে। টোটেম প্রাণীকে দলের সকল লোক এক কালে অভিন্ন কুলপতি জ্ঞানে পরম শ্রদ্ধা করত। যে কোন কৌশলে হোক এই টোটেম প্রাণীর সঙ্গে অভেদত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করে যাদুকর-প্রধানেরা কুলপতির আসন দখল করে বসে এবং লোকসমাজে তার প্রতিমূর্তি বলে পরিগণিত হতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীকে টোটেম বলে গণ্য করত। মেনেস যে দলের লোক ছিলেন সেই দলের টোটেমের নাম ছিল হোরাস নামে বাজপাখী। মেনেসের জয়লাভের অর্থ বাজপাখী দলের প্রধানের মাধ্যমে হোরাসের জয়লাভ। অন্যান্য টোটেম তার ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবপর্যায়ে অবনমিত হল।

তাছাড়া মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক অস্তিত্ব সম্পর্কে মিশরীয়রা বরাবর

কতকগুলি সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মিশরীয়দের আচরণ দেখে মনে হয় তারা যেন বিশ্বাস করত যে সমাধিস্থ মৃতদেহেরও জীবিত মানুষের মত আহার্য, পানীয়, বাসনপত্র এবং অলঙ্কারাদির প্রয়োজন। ঐতিহাসিক যুগেও তারা এই মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে যেন মৃত রাজা সমাধি থেকেও যাদুক্রিয়া বলে তাদের মঙ্গলবিধানে সমর্থ। আবার রাজারাও এই রকম মনোভাব প্রকাশ করতেন যেন মৃত্যুর পরেও যাদুশক্তি বলে তারা জীবিতাবস্থার মত ভোগ-বিলাস করতে পারেন। কাজেই রাজ্য জয় করে রাজারা এক দিকে যেমন অপরিমিত সম্পদের অধিকারী হয়েছেন অপরদিকে তেমনি অমরত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করে দেবত্বের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন। রাজ্য জয় করে মেনেস অপরিমিত সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। লুণ্ঠিত ধনসম্পদ আর পরবর্তী কালের ভূমিরাজস্ব তাকে প্রভূত সম্পদের অধিকারী করেছিল। কিন্তু এই সঞ্চিত ধন প্রধানতঃ তার অমরত্বের দাবি সুদৃঢ় করার জন্য ব্যয়িত হয়েছে। কেন না এই দাবি, রাজার অমরত্ব সম্পর্কে আস্থা, তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুনিশ্চিত রক্ষাকবচ।

রাজারা অবশ্যই মারা যেত। তাদের পুত্র কি ভাই তাদের স্থলাভিষিক্ত হত। মাঝে মাঝে রাজবংশ পরিবর্তনের দৃষ্টান্তও দেখা যায়। তথাপি রাজার দেবত্ব সম্পর্কে আস্থা, রাষ্ট্রীয় সংগঠন, রাজকর্মচারীদল এবং আমলাতন্ত্র পরিচালিত রাজ্যশাসনবিধি রাজা ও রাজবংশের পরিবর্তন সত্ত্বেও রাজশক্তির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

তবে রাজারা শুধুমাত্র অবাস্তব আশীর্বাদ বর্ষণ করে প্রজাদের আনুগত্য লাভ করতে পারেননি। কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য দেবরূপী ফারাওকেও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আর্থিক সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। মেসোপটেমিয়ার দেবতার মত মিশরের নর-দেবতাও রাজ্যের সমৃদ্ধিসাধনের জন্য নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছেন। রাজস্বের মোটা অংশ প্রকৃতই উৎপাদনী কার্যে নিয়োজিত হত। তাছাড়া সেকালের রাজারা নিজেরাও যে নানাবিধ কাজে অংশ গ্রহণ করতেন তার প্রমাণও পাওয়া যায়। নিজের হাতে মাটি কেটে রাজারা খাল-খননের উদ্বোধন করতেন। বন্যার জল নিয়ন্ত্রণ করার কাজেও প্রত্যক্ষভাবে তারা অংশ গ্রহণ করেছেন। মেনেসের আমলে নীল নদের জল পরিমাপের জন্য নাইলোমিটার নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়। মূলতঃ কর ধার্য করার উদ্দেশ্যে এই যন্ত্র আবিষ্কার করা হয় বটে কিন্তু পরিমাপক যন্ত্রটি করদাতা এবং করগ্রহীতা উভয়কে উপকৃত করেছে।

শিল্পের জন্ত কাঁচা মাল এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্ত নানাবিধ সামগ্রী আমদানি করার ব্যয়ভার রাজকোষ থেকে বহন করা হয়েছে। তামা ও টার্কিজ সংগ্রহের জন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে সিনাই পর্বতে সৈন্যরক্ষিত অভিযাত্রীদল পাঠান হত। সিডার কাঠ আর রজন আমদানির জন্তও নৌবাহিত সংগ্রাহক দল উত্তর সিরিয়ায় পাঠান হয়েছে। সরকারী আমলাদল দক্ষিণ মিশরে অভিযান করে সোনা ও মশলা নিয়ে ফিরে আসত।

মিশরের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানতঃ যাদুদ্রব্য এবং বিলাসদ্রব্য সংগ্রহের উদ্দেশ্তে পরিচালিত হলেও এই বাণিজ্যের ফলে দেশের মধ্যে এমন সব সামগ্রী আমদানি হত যা বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্তক। এই বাণিজ্য জীবিকার নতুন পথ খুলে দিয়েছে এবং সমাজ-জীবনে বণিক, নাবিক, সৈনিক, কুলি, কারিগর, কেরানী প্রভৃতি শ্রেণী সৃষ্টি করেছে। নর-দেবতা ফারাও যে উদ্বৃত্ত রাজস্ব সংগ্রহ করতেন তাই দিয়ে এদের সকলের ভরণপোষণ করা হত।

এছাড়া অন্তান্তভাবেও মিশরের রাজশক্তি জনহিতকর কাজকর্ম করেছে। নীল নদের তীরে যত পল্লী গড়ে উঠেছিল সীমানা ও জলের অধিকার নিয়ে স্বভাবতঃ তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। মিশরের ইতিহাসে এই ধরনের বিরোধ আদি যুগ থেকে চলে আসছে। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দুর্বল হলে এই রেষারেষি মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। মেনেস আর তার উত্তরাধিকারীরা এই আত্মঘাতী অন্তর্বিরোধ দমন করে রাজ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা এনেছিল। আবার যাযাবর পশুপালক ও শিকারী দলের হামলা থেকে কৃষিপল্লীগুলিকে রক্ষা করার জন্ত সৈন্তদল নিয়োগ করে তারা জনগণের নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করেছে।

এই সব বাস্তব বিধি-ব্যবস্থার ফলে মিশরের রাজনৈতিক সংযুক্তির পর তৎকালীন পুরাতাত্ত্বিক স্মারকচিহ্নের মধ্যে প্রভূত ধন-সম্পদ বৃদ্ধি ও লোকালয় বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃস্টপূর্ব দু হাজার বছর পর্যন্ত প্রাচীন মিশরের স্মারকচিহ্ন প্রধানতঃ সমাধিগর্ভে পাওয়া গেছে। খৃস্টপূর্ব পাঁচ হাজার থেকে তিন হাজার বছর পর্যন্ত অর্থাৎ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগের কালের যত সমাধির সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে বেশীর ভাগ দ্রব্য কুটির শিল্পজাত। পরবর্তীকালের সমাধিতে বহিরাগত বিলাসদ্রব্যের সমাবেশ দেখা যায়। গর্ত খুঁড়ে সাদাসিধে ভাবে এই সব সমাধি তৈরি করা হত। কিন্তু মেনেস এবং তার অনুবর্তী রাজার আমলে আর্বিদাসে ইট-কাঠের তৈরী যে সমাধিটি নির্মাণ করা হয়েছে তাকে ছোটখাট একটি সৌধ বলা যেতে পারে। মরুভূমির বালির মধ্যে বিরাট গর্ত খুঁড়ে মাটির তলায় এই সমাধি নির্মাণ করা হয়েছে। তার সঙ্গে মাটির উপরে

লিখিত একটি মুস্তবা আছে। অর্থাৎ চ্যাপটা চাল আর ঢালু পাশের একটি সমাধি-মন্দিরও তৈরি করা হয়েছিল। এই সমাধিমন্দিরে যেসব সামগ্রী সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার জৌলুস দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কাঠের নানাবিধ আসবাব-পত্র, অস্ত্র শস্ত্র, মৃৎপাত্র, প্রসাধন দ্রব্য এবং সিডার কাঠ, সোনা, তামা, আলাবাস্টার, অবসিডিয়ান, লাপিস লাজুলি, টার্কিজ প্রভৃতি দেশী-বিদেশী সামগ্রীর কারুকার্য-খচিত অলংকারাদি সত্যই বিস্ময়কর। সমাধির ভাঁড়ারে তেল, মদ, খাদ্যশস্য জাতীয় নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ভর্তি মাটির পাত্রের ঠাসাঠাসি। নীল এবং কাঠের ফলকের উপর উৎকীর্ণ লিপি থেকে বোঝা যায়, লেখন-পদ্ধতিও তখন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া রাজার সঙ্গে যেসব ভৃত্য এবং রাজকর্মচারীকে সহমরণে পাঠান হয়েছে তাদের দেহ রাজা যে প্রকোষ্ঠে সমাধিস্থ হয়েছেন তার পাশের প্রকোষ্ঠে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

এই সমাধিমন্দির নির্মাণ করতে অবশ্যই বহু শ্রমিকের আবশ্যক। তার মধ্যে ইট-কাঠ বয়ে আনার জন্য অদক্ষ শ্রমিক যেমন প্রয়োজন তেমন ইমারত গড়ে তোলার জন্য সুদক্ষ রাজমিস্ত্রীরও প্রয়োজন হয়েছে। সমাধির মধ্যে রক্ষিত দ্রব্যসম্ভার থেকে সুনিশ্চিত বোঝা যায়, সমাজের মধ্যে তখন সুদক্ষ এবং বিশেষভাবে শিক্ষিত ছুতোর, কর্মকার, খোদাইকার, স্বর্ণকার ও মণিকার জাতীয় শিল্পীর উদ্ভব হয়েছে। দক্ষ-অদক্ষ এই সব শ্রমিক ও কারিগর খাদ্যোৎপাদনের প্রাথমিক কাজ করতে পারেনি। কাজেই রাজকোষের উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদ দিয়ে তাদের ভরণপোষণ করতে হয়েছে। রাজা সেই সম্পদ সংগ্রহ করেছেন রাজ্য জয় করে আর নিয়মিত কর আদায় করে। সিডারকাঠ, তামা, অবসিডিয়ান আর লাপিস লাজুলি জাতীয় বিদেশী মাল সংগ্রহের জন্যও এই উদ্বৃত্ত সম্পদ ব্যবহার করতে হয়েছে। সমাধিব উপর উৎকীর্ণ লিপি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, রাজকর আদায়ের জন্য যেমন আমলা-কর্মচারী ছিল তেমনি সমাধিসৌধের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার তত্ত্বাবধানের জন্যও আলাদা লোক ছিল। তার মানে এই দাঁড়ায়, রাজনৈতিক সংযুক্তির ফলে মিশর দেশেও সুমেরের মত নতুন নতুন বৃত্তিধারী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রধান কাজ ছিল রাজকীয় শবের সংরক্ষণ।

পরবর্তীকালের বিপুলতর সম্পদ এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও এই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছে। রাজার শবের অধিকতর নিরাপত্তাবিধানের জন্য শ্রমিকেরাও তখন পাহাড় কেটে সমাধিস্থান নির্মাণ করেছে। তার ফলে অতি সাধারণ হাতিয়ার দিয়ে পাথরকাটা শ্রমিকদের কঠিন পাহাড় কাটতে শিখতে

হয়েছে। তাছাড়া স্থপতিদেরও সবটা দেখার সুযোগ না পেয়ে সমাধির ছক তৈরি করার দুরূহ দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে। এইভাবে সমাধিস্থাপত্যের উৎকর্ষসাধন করে তৃতীয় রাজবংশের আমলে অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ২৭৫০ থেকে ২৪০০ বছরের মধ্যে মিশরীয় কারিগরেরা চাপ তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে।

মাটির উপরে মুস্তবা নামে যে সমাধিমন্দির তৈরি করা হত তার নির্মাণ কৌশলও এই সঙ্গে উন্নত হতে থাকে। তৃতীয় রাজবংশের আমলে (খৃস্টপূর্ব ২৭৫০-২৪০০) এই মন্দির কাদামাটির ইটের বদলে পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়। পাপিরাসের আঁটি দিয়ে প্রথমে রাজপ্রাসাদের খুঁটি দেওয়া হত। তৃতীয় রাজবংশের আমলে অবিনশ্বর পাথরের সারিবাঁধা স্তম্ভ সেই প্রাসাদের শোভাবর্ধন করেছে। নল-খাগড়ার মাদুর ঝুলিয়ে আগে যে প্রাসাদের বেড়া দেওয়া হত সেখানে উঠল চকচকে টালির দেওয়াল। রাজা জোশরের আমলে মুস্তবাটি সুপরিসর হয়ে খাড়া পিরামিডের আকার ধারণ করে এবং চতুর্থ রাজবংশের আমলে (খৃস্টপূর্ব ২৭৫০-২৪০০) পুরোপুরি পিরামিডে পরিণত হয়।

এই সব কাজ সুসম্পন্ন করতে বিপুল লোকবলের প্রয়োজন। পিরামিডের বড় বড় চুনাপাথরের চাঙড়ার কোন কোনটার ওজন তিনশ পঞ্চাশ টনের মত। নীল নদের পুবপারের তুরা নামে পল্লী থেকে পাহাড় কেটে এই পাথর বার করতে হয়েছে। তারপর ভাঁটির টানে জলের মধ্য দিয়ে কায়রোর উত্তরে গিজা পর্যন্ত এনে নদী থেকে প্রায় একশ ফুট উঁচুতে ঠেলে তুলতে হয়েছে। এই থেকে বোঝা যায়, পিরামিড তৈরি করতে কি বিপুল লোকবল প্রয়োজন হয়েছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলেছেন, শুধু পাথর কাটার জন্য লাখ খানেক লোক ক্রমাগত দশ বছর খাটাতে হয়েছে। এদের মধ্যে সকলেই হয়ত স্বাধীন শ্রমিক ছিল না। কিন্তু যত রাজমিস্ত্রী, কুলি আর পাথর কাটার শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়েছে তাদের সকলকে রাজকোষ থেকে খাদ্য ও আশ্রয় দিতে হয়েছে। তার জন্য অবশ্যই প্রভূত উদ্বৃত্ত ধনের প্রয়োজন।

তাছাড়া শুধু শ্রমিক নিয়োগ করলেই এই বিরাট কাজ নিষ্পন্ন হতে পারে না। শ্রমিকদের কাজের সমন্বয়সাধন ও তত্ত্বাবধানের জন্য অবশ্যই স্থপতি নিয়োগ করতে হয়েছে আর তাদেরও এই গুরুদায়িত্ব বহনের কৌশল শিখতে হয়েছে। কি ভাবে এত বড় বড় প্রস্তর খণ্ড নিয়ে আসা যায় তার কায়দাকৌশলও নিশ্চয়ই এদের উদ্ভাবন করতে হয়েছে। পিরামিডের নির্মাণকৌশল এমন নির্ভুলভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে যে অবাক হয়ে যেতে হয়। পিরামিডের ভূমি চতুষ্কোণ

হিসাবে এবং তার পার্শ্বদেশ ৭৭৫½ ফুট হিসাবে পরিকল্পিত। স্থপতি এবং শ্রমিকেরা এমন নিখুঁতভাবে এই পরিমাপ বজায় রেখে কাজ করেছে যে কোন পাশের মাপ কখনও এক ইঞ্চি বেশী হয়নি। অক্লান্ত ধৈর্যসহকারে কাজ করে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই নির্ভুলতা তাদের অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু তবু পিরামিড নির্মাণের মত বৃহৎ কাজের পরিকল্পনা এবং নিখুঁত পরিমাপ অবশ্যই আগাম করে নিতে হয়েছে এবং জ্যামিতিক সূত্রের সাহায্য না নিয়ে এই কাজ সুসম্পন্ন করা যায়নি। সেকালের কিছু গাণিতিক গণনা থেকে এই অনুমান সমর্থিত হয়।

চতুর্থ রাজবংশের আমলে (খৃস্টপূর্ব ২৭৫০-২৪০০) রাজার মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে গিয়ে মিশরীয়রা আর একটি নতুন বিদ্যা আয়ত্ত করে। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে মৃতদেহগুলি সচরাচর মরুভূমির বালির মধ্যে সমাধিস্থ করা হত। মরুভূমির শুষ্ক বালির সংস্পর্শে মৃতদেহের মাংস এবং চুল স্বাভাবিকভাবে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু কাঠ বা আলাবাস্টারের শবাধারে রক্ষিত মৃতদেহের পচন রোধ করা সম্ভব ছিল না। তাই রাসায়নিক পদ্ধতিতে মলম মাখিয়ে এবং শুকিয়ে মৃতদেহগুলি অবিকৃত রাখার কৌশল উদ্ভাবন করা হয়। এইভাবে রক্ষিত মৃতদেহ 'মমি' নামে পরিচিত। এই বিদ্যা আয়ত্ত করে মানুষের শারীরস্থান সম্পর্কে মিশরীয়রা প্রভূত প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করে। সমাজের মধ্যেও তার ফলে একদল নতুন বৃত্তিধারী মানুষের উদ্ভব হয় যাদের কাজ ছিল মলম তৈরি করা এবং মলম মাখান।

কাঠ বা পাথরের উপর মৃত ব্যক্তির প্রতিমূর্তি খোদাই করে যাদুমন্ত্র বলে তাকে যদি সঞ্জীবিত করা যায় তাহলেও সে লোক অমরত্ব পেতে পারে এই বিশ্বাস থেকে কাঠ ও প্রস্তরের উপর মিশরীয়রা মৃতব্যক্তির পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি খোদাই করেছে এবং তার ফলে প্রাচীন রাজবংশের আমলে (খৃঃ পূঃ ২৭৫০—২৪০০) কয়েকটি অপূর্ব প্রস্তরমূর্তি নির্মিত হয়েছে।

তাছাড়া মৃতব্যক্তি ইহলোকে যেসব দ্রব্য ব্যবহার করেছে পরলোকেও তার ব্যবহারের জন্য সেই সব সামগ্রী প্রয়োজন, জীবিতাবস্থায় যে ভাবে সে সেবিত হয়েছে মৃত্যুর পরেও তার সেই ধরনের সেবা আবশ্যক, এই বিশ্বাস থেকে সমাধির মধ্যে শুধু মাত্র আসবাব পত্র এবং ভোগের উপাচার রাখা হয়নি। ভোগ্য-বস্তুর সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য মৃতব্যক্তির নামে সম্পত্তি দান করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে সমাধির প্রাচীর গাত্রে উৎসর্গীত সম্পত্তির জীবনচিত্র অঙ্কিত করা হত। এই চিত্র থেকে সেকালের লৌকিক জীবনধারা এবং আর্থিক সংগঠনের

আভাস পাওয়া যায়। এই চিত্রের মধ্যে যে আর্থিক জীবনবিধির আভাস ফুটে বেরোয় তাকে পৌর-জীবন না বলে মধ্য যুগীয় জমিদারীর জীবনচিত্র বলা যেতে পারে। পেয়াদা ও তত্ত্বাবধায়কের অধীনে এই সব ফার্মের চাষীরা কাজকর্ম করত। ছবির মধ্যে ক্ষেতের কাজ, গবাদি পশুর পাল দেওয়া, শিকার ও মাছ ধরার দৃশ্য আঁকা হয়েছে। তাছাড়া উৎপন্ন শস্য দিয়ে চাষীদের খাজনা দেবার এবং হিসাবনবীসদের তার হিসাব রাখার ছবিও আছে। তথাপি এস্টেটগুলি পুরোপুরি কৃষি-ফার্ম ছিল না। তার মধ্যে যে কুমোরের, ছুতোরের, কর্মকারের এবং মণিকারের কারখানা ছিল তার প্রমাণও আছে। তত্ত্বাবধায়কেরা মেপে মেপে কারিগরদের কাঁচামাল দিত আর হিসাবনবীস তার হিসাব টুকে রাখত। তবে এই সব এস্টেটের জীবনচিত্র দেখে মনে হয় যেন এগুলির মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু বাস্তব বিচারে মিশরের বৃহত্তর আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এই সব এস্টেটের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সেই বৃহত্তর আর্থিক ব্যবস্থা এস্টেটের কারিগরদের কাঁচামাল যোগাত এবং ফার্মের বাড়তি উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে নিত। একালের বড় বড় শহরের স্মারকচিহ্ন পাওয়া না গেলেও তেমন দু চারটি শহর ছিল বলে পুরাবিদ্যাবিদেরা অনুমান করেন।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, মিশরের রাজনৈতিক সংযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নীল নদের উপত্যকায় এমন এক আর্থিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল যার মধ্যে কৃষিকর্ম, শিকার ও মাছ ধরার পাশাপাশি শিল্পোৎপাদন এবং বাণিজ্য সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষিকর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজবিধি মেসোপটেমিয়ার মত মিশরেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল এবং সেখানে লেখন-পদ্ধতি ও গণিতের সূচনা করেছিল। তবু দুই দেশের সমাজব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর মৌলিক পার্থক্য ছিল। এক দেশের উদ্বৃত্ত ধন সঞ্চিত হয়েছিল পুরোহিতগোষ্ঠীর হাতে আর অপর দেশের উদ্বৃত্ত ধন মজুত হয়েছিল রাজার ভাণ্ডারে। সুমেরের এক-একটি শহর গড়ে উঠেছিল সন্নিহিত কৃষিপল্লী আর তার ক্ষেত-খামারের পটভূমির উপর। আর্থিক দিক থেকে তার প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা ছিল। কিন্তু মিশর দেশের আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল রাজার রাজ্যকে কেন্দ্র করে। এই রাজ্য তার জমিদারীর নামান্তর মাত্র। এই রাজ্যকে ছোট ছোট এস্টেট বা শহরে ভাগ করা যেত বটে কিন্তু গোটা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেই সব এস্টেটের জীবনযাত্রা অচল হয়ে যেত অথবা সেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিপল্লীতে পরিণত হত। তার মানে স্বতন্ত্র আর্থিক সত্তা তাদের কোনটির ছিল না। কাজেই মিশরের সভ্যতাকে

কোনক্রমে সুমেরের সংস্কৃতির সৃষ্টি অথবা সুমেরের সভ্যতাকে মিশরীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি বলা যায় না।

॥ সিন্ধু-সভ্যতার দীপালোক ॥

সিন্ধু উপত্যকায় যে সুপ্রাচীন সভ্যতার স্মারকচিহ্ন পাওয়া গেছে তার মধ্যে যদি লিখিত নজীর পাওয়া যেত তাহলে তত্ত্বগত ঐক্য সত্ত্বেও সেখানকার সভ্যতার সঙ্গে সুমের ও মিশরের সভ্যতার পার্থক্য আরও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ত বলে পুরাবিদ্যাবিদেরা মনে করেন। এখানকার পৌর সভ্যতাও সুমের ও মিশরের নগর সভ্যতার সমকালীন। খৃস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর হতে না হতে এই সভ্যতা পূর্ণতা লাভ করে। ঐ সময়ে পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে বহু নগর গড়ে উঠেছিল। কোন কোনটির আয়তন এক বর্গ মাইলের বেশী। শহরের ঘরবাড়ি তখন চুল্লীতে পোড়ান ইট দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। দোতলা বাড়িও ছিল। বড় বড় রাস্তা এবং অলিগলির বিন্যাস দেখে মনে হয় যেন পূর্ব কল্পিত ছক অনুসারে সেগুলি তৈরি করা হয়েছে এবং শহর পুনর্নির্মাণের সময়েও এই ছক পরিবর্তন করা হয়নি। তাছাড়া প্রতিটি বাড়ির সংলগ্ন পয়ঃপ্রণালী ছিল। শহরের ঘরবাড়ির মধ্যে যেমন দোকানঘর ও কারখানার প্রমাণ পাওয়া যায় তেমন বিত্তবান বণিক অথবা আমলাদের সুবিন্যস্ত গৃহের সঙ্গে কারিগর আর যানবাহন শ্রমিকদের খুপরির পার্থক্যও স্পষ্ট বোঝা যায়।

এই সব গৃহের ভগ্নাবশেষের মধ্যে যেসব সামগ্রী পাওয়া গেছে সেগুলি বিশেষ কুশলী ছুতোর, কুমোর, তামা ও সোনার কর্মকার, মণিকার এবং পাথরকাটা কারিগরের তৈরী। তাছাড়া পথঘাটের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা থেকে মনে হয় যেন নগর পরিচালনার জন্য অবশ্যই কোন সংগঠন ছিল আর তার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য কর্মচারীও ছিল। নালা-নর্দমা যখন ছিল তখন সেগুলি পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ধাঙড়ের কাজ করার লোকও ছিল বলে মনে করা হয়। তাছাড়া লেখন পদ্ধতি, সংখ্যাবাচক সাংকেতিক চিহ্ন এবং ওজন ও মাপের মান যখন প্রচলিত ছিল তখন এই সব কাজ করার জন্য কেরানী শ্রেণীও অবশ্যই থাকবে। এই সব বৃত্তিজীবী শ্রেণীর সংখ্যা সমাজের মধ্যে নিশ্চয়ই নগণ্য ছিল না। সন্নিহিত গ্রাম ও শহরের চাষীরা যে বাড়তি খাদ্য উৎপন্ন করেছে তাই দিয়ে এদের ভরণ-পোষণ করতে হয়েছে। আরবসাগরের জেলেরাও সাহায্য করেছে, কারণ সামুদ্রিক শুঁটকী মাছও আমদানি করা হত। তাছাড়া শিল্পের জন্য যে কাঁচামাল প্রয়োজন নদীর মোহানা অঞ্চলের সমভূমিতে দুর্লভ সেই কাঁচামাল বিদেশ

থেকে আমদানি করার জন্য বিনিময় মূল্য হিসাবে শহরের শিল্পীদেরও বাড়তি শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করতে হয়েছে। এজন্য ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়েছে। দেবদারু কাঠ আনতে হয়েছে হিমালয় থেকে, বিভিন্ন ধাতু ও রত্নের সন্ধানে যেতে হয়েছে সুউচ্চ মালভূমি অঞ্চলে। আবার বেলুচিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক পল্লীর সঙ্গেও শিল্প-দ্রব্যের বিনিময়ে ব্যবসা করতে হয়েছে। সুদূর মেসোপটেমিয়ার সঙ্গেও যে সিন্ধু উপত্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণও দুর্লভ নয়।

তবে সিন্ধু উপত্যকার এই নগর সভ্যতার প্রাগিতিহাস এখনও অপরিজ্ঞাত। যেসব জনপদ ক্রমান্বয় এই শহরে রূপান্তরিত হয়েছে তাদের ইতিহাস জানা যায়নি। কিন্তু খৃস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছরের সমসাময়িক কালে সিন্ধু নদের মোহানা থেকে আরম্ভ করে পঞ্জাবের সমভূমি বরাবর সমপ্রকৃতির সভ্যতা যে গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে এই সাংস্কৃতিক একত্বের সঙ্গে সঙ্গে কোন রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল কি না জানা যায়নি। এমন কি, কি ভাবে এই পৌর সভ্যতার মূলধন সঞ্চিত হয়েছিল সেই তথ্যও অজ্ঞাত। এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে ধনী ও দরিদ্র এই দুটি শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেলেও সমাজের শীর্ষে কোন রাজা কিংবা দেবতা ছিল কি না নিশ্চয় করে বলা যায় না। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রাজ-প্রাসাদ অথবা মন্দিরের সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কাজেই এর কোনটির অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ।

॥ লেখন পদ্ধতির সূচনা ॥

সুমের মিশর ও সিন্ধুদেশের পৌর সভ্যতার আমলে আরও কয়েকটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের সূচনা হয় যার কথা খানিকটা না বললে এই সভ্যতার কাহিনী অসমাপ্ত থেকে যাবে। মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং তার সংস্কৃতির অগ্রগতির পথে একালের যেসব আবিষ্কার অন্যতম সহায়ক হয়েছে লেখন পদ্ধতি, গণিতশাস্ত্র আর ওজন ও পরিমাপের মান উদ্ভাবন তার অন্যতম। একালে অবশ্য এই সব বিষয়ের সূচনা হয়েছিল মাত্র। তথাপি এই সাংস্কৃতিক পর্যায়ের স্মারকচিহ্নের মধ্যে লেখন পদ্ধতির ব্যবহার, গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগ এবং ওজন ও পরিমাপের মান ব্যবহারের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। পৌর সংস্কৃতির পূর্ববর্তী কোন সাংস্কৃতিক পর্যায়ের পরিজ্ঞাত স্মারকচিহ্নের মধ্যে এই জাতীয় কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। কাজেই লেখন পদ্ধতি ও গণিতশাস্ত্রের সূচনা একালেই হয়েছিল, ওজনের মান এবং পরিমাপের মানও এই পর্যায়ে উদ্ভাবিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা

সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সব যুগান্তকারী আবিষ্কারের সঙ্গে পৌর সভ্যতার যোগাযোগ নিছক কালগত অথবা আকস্মিক নয়। বরং বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, শিল্প ও বাণিজ্য-নির্ভর নতুন আর্থিকবিধির ব্যবহারিক প্রয়োজনে নগর সভ্যতাসম্ভূত বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে লেখন পদ্ধতি, গণিতশাস্ত্র এবং ওজন ও পরিমাপের মান উদ্ভাবন করতে হয়েছে।

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত যেসব বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে পৌর সভ্যতার আর্থিক ভিত্তি রচিত হয়েছে, অভিজ্ঞতা সঞ্জাত যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান যথাযথভাবে প্রয়োগ করে সুমের মিশর ও সিন্ধুদেশের মানুষ পৌর সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পেরেছে, সেই জ্ঞান তাদের কাছে মৌখিক উপদেশ এবং দৃষ্টান্তের মারফত বাহিত হয়ে এসেছে। জ্ঞান বিস্তারের এইটিই ছিল তৎকালীন প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু পৌর সংস্কৃতি গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্কৃতির স্রষ্টারা এমন কতকগুলি অভূতপূর্ব বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হল যার সুষ্ঠু সমাধান অভিজ্ঞতা সঞ্চারের প্রচলিত সামাজিক পদ্ধতি দ্বারা সম্ভব নয়। তখন তাদের ভিন্ন পদ্ধতির কথা চিন্তা করতে হয়েছে। নতুন আর্থিক জীবনবিধির প্রয়োজনে সমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা প্রকাশের বাহন হিসাবে প্রচলিত রীতির পরিবর্তে নতুন রীতি প্রবর্তন করতে হয়েছে। তার ফলে লেখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

মিশর বা সিন্ধুদেশে লেখার সূচনা ঠিক কি কারণে হয়েছিল সুনিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও সুমেরের তথ্য-প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে এই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় যে সমাজ-জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের পন্থা হিসাবেই সেখানে লেখার সূচনা হয়েছিল। পৌর সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য যে উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদ আবশ্যক সুমেরে সেই সম্পদ দেবতার মন্দিরে সঞ্চিত হয়েছিল। তার তত্ত্বাবধায়ক ছিল পুরোহিতগোষ্ঠী। দেবতা ছিলেন বিশাল জমিদারী, বিরাট পশুপাল আর বিপুল রাজস্বের মালিক। পুরোহিতেরা ছিল তার মুৎসদ্দী। এই ধন-দৌলত দেশের মানুষকে কর্জ অথবা দাদন হিসাবে দেওয়া হত। জমিজমা পত্তন দেবার রীতিও প্রচলিত ছিল। সুদসহ এই কর্জ শোধ করতে হত। পত্তনি জমির খাজনা বাবদ উৎপন্ন ফসলের ভাগ দিতে হত। এই লেনদেনের হিসাব-নিকাশের সমস্ত দায় পুরোহিতদের বহন করতে হত।

কিন্তু এই ধন-সম্পদের লেনদেন করতে গিয়ে তারা এক অভূতপূর্ব বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হল। এমন পরিস্থিতি মানব-ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও দেখা দেয়নি। কারণ ইতিপূর্বে কখনও এত ধন-সম্পদ একক কর্তৃত্বাধীনে সঞ্চিত এবং পরিচালিত হয়নি। শুধুমাত্র স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে এত বিপুল বৈভবের

লেনদেন করা সম্ভব নয়। দেবতার ধন, কাজেই ভুলত্রুটি হলে দেবতার কাছে অপরাধী হতে হবে। আবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞানের উপর নির্ভর করাও অসমীচীন। কারণ পুরোহিতগোষ্ঠীর একটা ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্নতা থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে পুরোহিতেরা নশ্বর। যে পুরোহিত কর্জ দিয়েছিল, ঋণ শোধ করার আগে তার মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়। তখন সেই কর্জ, দেবতার সেই ধন আদায় করার ভার অন্য পুরোহিত তথা পুরোহিতগোষ্ঠীকে বহন করতে হবে। কিন্তু মৃত পুরোহিত যদি কেবলমাত্র তার নিজের বোধগম্য কোন স্মারকচিহ্ন রেখে যায় তাহলে অন্য পুরোহিতের পক্ষে সেই অভিজ্ঞানের অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সেই স্মারকচিহ্ন মূল্যহীন। কাজেই লেনদেনের হিসাব রাখার জন্য এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা আবশ্যক হয়ে পড়ল যার অর্থ এবং তাৎপর্য সকল পুরোহিতের বোধগম্য। তার মানে হিসাব রাখার জন্য সমাজ-স্বীকৃত এবং সকলের বোধগম্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। এই সামাজিক প্রয়োজনবোধ থেকে লেখন পদ্ধতি উদ্ভাবনের সূচনা হয়।

এই জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পুরোহিতেরা প্রথম কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন উদ্ভাবন করেছিল। এই চিহ্নের অর্থ পুরোহিতগোষ্ঠীর সকলেই বুঝত। এরেক শহরের প্রথম মন্দিরটির ভগ্নাবশেষের মধ্যে যে মৃৎফলকটি পাওয়া গেছে তার উপর গুটিকয়েক সাংকেতিক চিহ্ন খোদিত আছে। পুরাবিদ্যাবিদদের ধারণা, এই চিহ্ন কোন সুসংবদ্ধ লেখন পদ্ধতির সূচক না হলেও সংখ্যাবাচক সাংকেতিক চিহ্নের নিদর্শন। খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের আগেকার সংখ্যাসূচক চিহ্নের দ্যোতক এমন আরও বহু মৃৎফলক সুমেরের অন্যান্য শহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে।

সুমের দেশে মৃৎফলকের উপর যে চিহ্ন আঁকা হত তার অধিকাংশ সাংকেতিক চিত্রের মত (শর্টহ্যাণ্ড পিকচারস্)। যেমন, মৃৎপাত্র, ষাঁড়ের মুণ্ড, জোড়া ত্রিভুজ ইত্যাদি। ছবির দিকে তাকালেই বোঝা যায় সেগুলি কিসের চিত্ররূপ। সুমেরীয় লিপির এই চিত্রধর্মিতার জন্য তাকে চিত্ররূপী লিপি (পিকটোগ্রাফিক স্ক্রিপ্‌ট) বলা হয়। কিন্তু চিত্ররূপ থাকা সত্ত্বেও এই সব সাংকেতিক চিত্রের অবশ্যই খানিকটা সমাজসম্মত তাৎপর্য ছিল। সমাজের লোকে হয়ত ষাঁড়সূচক অনেকগুলি চিত্রের মধ্যে একটি মাত্র চিত্রকে ষাঁড় সূচক চিহ্ন বলে গ্রহণ করেছে। তাছাড়া এই সব সাংকেতিক চিহ্নের মধ্যে কয়েকটি এমন সামাজিক অর্থলাভ করেছিল যা শুধু ছবি দিয়ে বোঝান সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসাবে পরিমাপের এককের কথা বলা যেতে পারে। এই চিহ্নগুলি ভাবসূচক এবং ভাবসূচক প্রতীকচিহ্নকে আইডিওগ্রাম বলা হয়। যে কোন বস্তুর নামোল্লেখ না করে তার ভাবসূচক যে

প্রতীকচিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে আইডিওগ্রাম বলে। গণিতের যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ সূচক চিহ্নগুলি আইডিওগ্রামের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এছাড়া আরও কতকগুলি চিহ্নের প্রমাণ এই সব মৃৎফলকে আছে যাকে নির্দিষ্টভাবে কোন বস্তুর চিত্র বলে গ্রহণ করা যায় না। সেগুলির অর্থ সামাজিক স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন, ভেড়া বোঝাবার জন্য সুমেরের মানুষ একটি চিহ্ন আবিষ্কার করেছিল। সেই চিহ্ন দিয়ে বিভিন্ন জাতের ভেড়ার পার্থক্য বোঝান যেত না। সেই কারণে তারা আরও কতকগুলি সমাজসম্মত প্রতীকচিহ্ন প্রবর্তন করেছিল। এক একজন পুরোহিত এই সব চিহ্নের আবিষ্কর্তা। কিন্তু পুরোহিতগোষ্ঠী তথা সমাজের স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত এই সব প্রতীকচিহ্নের কোন সামাজিক উপযোগিতা থাকতে পারে না। মন্দিরের হিসাবপত্র যেহেতু ব্যক্তিগত দলিল নয় এবং প্রতীকচিহ্নগুলি যেহেতু ব্যক্তিবিশেষের স্মারকচিহ্ন হলে অসুবিধা সেই কারণে যে লেখন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হবে সেই পদ্ধতি সমাজ দ্বারা স্বীকৃত এবং রীতিসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

তাছাড়া এই সব চিহ্নের তাৎপর্য শেখারও প্রয়োজন ছিল। মন্দিরের সমস্ত তত্ত্বাবধায়ককে এই সব সমাজসম্মত চিহ্নাবলী শিখতে হত। পাঠ নেবার এই রীতিকে আমরা সচরাচর লেখাপড়ায় হাতেখড়ি বলে থাকি। লেখাপড়ায় হাতেখড়ি বলতে সহজ কথায় এই বোঝায় যে, বর্ণরূপী বায়ান্নটি প্রতীকচিহ্ন সামাজিক রীতি অনুসারে যে যে ধ্বনির সূচক সমাজসম্মত রীতি অনুসারে সেই সেই ধ্বনি যথাযথভাবে উচ্চারণ করতে শিখতে হবে এবং সমাজসম্মত পদ্ধতি অনুযায়ী সেই চিহ্নগুলি লিখতে হবে। এই প্রয়োজন সেকালেও অবশ্যই ছিল। সেকালের স্মারকচিহ্নের মধ্যে কিছু কিছু চিহ্নতালিকা পাওয়া গেছে। মনে হয়, এইগুলি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হত। শুরুপ্পাক শহরে যেসব মৃৎফলক পাওয়া গেছে তার প্রকৃতি থেকে পণ্ডিতেরা মনে করেন, তার কিছু পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হত আর কিছু মন্দিরের হিসাব পত্র।

খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের পরবর্তী মৃৎফলক থেকে সুমেরীয় লেখন পদ্ধতির তৎকালীন অবস্থা আন্দাজ করা যায়। কোন কোন মৃৎফলকের চিহ্নগুলি বিষয় অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। যেমন একটি ফলকের মধ্যে বিভিন্ন জাতের মৎস্যসূচক চিহ্নগুলি ক্রমান্বয় সাজান রয়েছে। প্রতিটি চিহ্নের অঙ্গে আবার চিহ্নটির আবিষ্কারক পুরোহিতের নাম যুক্ত থাকত। তাছাড়া চিত্ররূপী চিহ্নগুলি এই সময় এমন সরল ও সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে অনেক চিহ্ন থেকে চিহ্নসূচক বস্তুটি চেনা কঠিন। তার মানে এই সব চিহ্নের রীতিসিদ্ধ সামাজিক তাৎপর্য

ছিল। সেইজন্য চিত্রগত মিল না থাকলেও অর্থ বোঝার অসুবিধা হত না। তাছাড়া ভাব বা বস্তু বোঝাবার জন্য যেমন প্রতীকচিহ্ন ব্যবহার করা হত তেমন বিবিধ ধ্বনি বোঝাবার জন্যও এই সময় বিবিধ চিহ্ন ব্যবহার করা হত। তার অর্থ ঐ সব চিহ্ন কথ্য-ধ্বনিসূচক প্রতীকচিহ্ন (ফোনোগ্রাম) হয়ে পড়েছিল। ধ্বনিসূচক চিহ্নের সাহায্যে এই সময় শব্দের বানান করাও সম্ভব হয়েছে।

খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের পরে সুমেরের লিখিত দলিলের মধ্যে হিসাব-পত্র চুক্তিনামা এবং সাংকেতিক চিহ্নের তালিকা ছাড়া নাম, উপাধি, সন্ধিনামা, ঐতিহাসিক নজীর, বানান এবং আইনসূচক দলিল পাওয়া যায়। এই সময়ের লিপি আরও সরল হয়ে উঠেছে। কীলকের মত 'স্টাইলাস' দিয়ে তখন চিহ্নগুলির বিভিন্ন অংশ নরম মাটির উপর ছেপে দেওয়া হত। চিহ্নগুলির ছাপ কীলকের মত ছিল বলে ব্যাবিলনের প্রাচীন লিপিকে কীলকাকার (কিউনিফরম) লিপি বলা হয়। আধুনিক যুগের সূচনা পর্যন্ত এই লিপি প্রচলিত ছিল এবং হিটাইট, ভ্যান্নিক, পারসিক প্রভৃতি পরদেশী ভাষা লেখার জন্য এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

সুমেরীয়রা যে লিপি আবিষ্কার করেছিল, খৃস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছরের আগেই সেই লিপির সাহায্যে তাদের সেমিতিক স্বদেশীয়দের (আক্কাদীয়দের) ভাষা লেখা হতে আরম্ভ করে। সেমিতিক নাম লেখার জন্য সুমেরীয় হরফ ব্যবহার করার ফলে সুমেরীয়দের লিপির ভাব-প্রকাশক চিহ্নগুলি দ্রুত কথ্য-ধ্বনিসূচক চিহ্নে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি চিহ্নের সাহায্যে একাধিক ধারণা প্রকাশের সম্ভাবনা তার ফলে বেড়ে যায়।

যাই হোক, কাদামাটিকে সুমেরীয়রা লেখার উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছে এবং বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেই কাদামাটি আগুনে পুড়িয়েছে বলে লেখন পদ্ধতির সূচনা থেকে মেসোপটেমিয়ার লিপির গোটা ইতিহাস জানা সম্ভব হয়েছে। এই ইতিহাস থেকে জানা যায় যে শহুরে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লেখন পদ্ধতির অগ্রগতি হয়েছে এবং তার উদ্ভবও হয়েছে নগর সভ্যতার বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে।

আর কোথাও লেখন পদ্ধতির সূচনা থেকে পর্যালোচনা করার সুযোগ পাওয়া যায়নি। ভিন্ন জাতের মানুষ হয়ত নশ্বর পদার্থের উপর লিখতে আরম্ভ করেছিল। লেখন পদ্ধতি যখন খানিকটা উন্নত হয়েছে তখন কালজয়ী জিনিসের উপর লিখেছে। তাই সূচনার সন্ধান সুপরিজ্ঞাত নয়।

মিশর দেশের প্রাচীনতম লেখার নিদর্শন আবিদাসের রাজকীয় সমাধি মন্দিরে পাওয়া গেছে। এই নজীর বড় জোর খৃস্টপূর্ব ৩০০০ সালের। কিন্তু সুমেরের

প্রাচীনতম দলিলের লিপির চেয়ে এই মিশরীয় লিপি অনেকটা উন্নত। চিহ্নগুলি সহজবোধ্য চিত্রের মত। লেখা প্রবর্তনের সূচনায় এই চিহ্ন অবশ্যই চিত্রধর্মী ছিল। রাজাদের নাম এবং উপাধির প্রাচীনতম দলিলের চিত্র প্রায় জীবন্ত চিত্রের মত। কতকগুলি চিহ্নের আবার ভাবপ্রকাশক তাৎপর্য ছিল। অর্থ-নির্দেশক চিহ্নও (ডেটারমিনেটিভ্‌স) ভাবপ্রকাশক প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে যুক্ত থাকত। এই লিপি যতদিন চালু ছিল ততদিন এই অর্থ-নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

রাজা মেনেসের আমলেও এমন বহু চিহ্ন ব্যবহার করা হত যার শুধুমাত্র কথ্য ধ্বনিসূচক তাৎপর্য ছিল। শুধুমাত্র ভাবপ্রকাশক প্রতীক চিহ্ন দিয়ে শব্দ গঠন না করে কথ্য ধ্বনিসূচক চিহ্ন দিয়েও এই সময় শব্দের বানান করা হত। তার মানে লিপির চিত্রধর্মী রূপের স্তর তখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এর কিছুকাল পরে মিশর দেশে বর্ণমালার উদ্ভব হয়। এক একটি ব্যঞ্জনবর্ণসূচক চব্বিশটি চিহ্ন দিয়ে এই বর্ণমালা গঠিত। স্বরবর্ণ লেখা হত না। এই সব চিহ্নের সাহায্যে যে কোন শব্দের বানান করা সম্ভব হলেও ভাবপ্রকাশক প্রতীক চিহ্ন আর অর্থ-নির্দেশক চিহ্ন মিশরীয়রা কখনও বর্জন করেনি।

মিশর দেশের চিত্ররূপী চিহ্ন আর সুমেরের চিত্রধর্মী চিহ্নের তুলনামূলক বিচার করে মিশরীয় চিহ্নকে পণ্ডিতেরা বেশী বাস্তবানুগ বলে সাব্যস্ত করেছেন। এই লিপির শব্দ, শব্দাংশ অথবা ধ্বনি বোঝাবার জন্য প্রতীক হিসাবে এক একটি বস্তুর চিত্র ব্যবহার করা হত। সেই কারণে মিশরের এই লিপিকে হিয়ারোগ্লিফিক লিপি বলা হয়। এই লিপিরও রীতিসিদ্ধ সামাজিক তাৎপর্য ছিল। সমাজের স্বীকৃতি ছাড়া কোন বস্তুর চিত্রপ্রতীক দিয়ে বিশেষ বিশেষ শব্দ, শব্দাংশ অথবা ধ্বনি বোঝান সম্ভবপর নয়।

পরবর্তীকালে মিশরীয় লেখকেরা এক ধরনের দ্রুত লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। পাণ্ডুলিপির উপর এই পদ্ধতিতে লেখা হত। এই লিখন পদ্ধতির নাম হিয়ারেটিক পদ্ধতি অর্থাৎ পুরোহিতদের, বিশেষতঃ প্রাচীন মিশরের লেখন পদ্ধতি। এই লিখন পদ্ধতির চিত্র-চিহ্নগুলির প্রকৃতি এমন সরল করা হয়েছিল যে অঙ্কিত চিত্রটি যে কোন বস্তুর দ্যোতক চিহ্ন থেকে তা বোঝা যেত না।

মিশরের প্রাচীনতম লিখিত দলিলের মধ্যে প্রধানতঃ কতকগুলি নাম, উপাধি এবং ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই নজীরের উপর নির্ভর করে বলা যায় না যে কোন প্রেরণায় মিশরীয়রা লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। তবে সমাজের বাস্তব প্রয়োজনে খৃস্টপূর্ব ২৯৫০ থেকে ২৭৫০ সালের মধ্যেই যে

লিখন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে তার সুস্পষ্ট নজীর পাওয়া যায়। সেকালের রাজকর্মচারীদের তালিকার মধ্যে লেখকের নাম আছে। পরবর্তীকালের সমাধিচিত্রের মধ্যেও দেখা যায় যে প্রজারা খাজনা দিচ্ছে আর লেখকেরা তার হিসাব লিখে রাখছে। কারখানার ছবিতেও তাদের হিসাব লেখার কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়। এখন কথা হচ্ছে, লেখকেরা যখন রাজকর্মচারী তখন এমন পদ্ধতিতে অবশ্যই তাদের লিখতে হয়েছে যে পদ্ধতি তাদের অন্যান্য সহকর্মী, উর্ধ্বতন রাজপুরুষ এবং নরদেবতা ফারাওর বোধগম্য হয়। তার মানে মিশরের লেখকদেরও সামাজিক রীতিসিদ্ধ পদ্ধতি মেনে চলতে হত। লিখতে এবং পড়তে শেখার প্রয়োজনও তাহলে ছিল নিশ্চয়ই।

মিশর দেশে লেখার সূচনা সম্পর্কে খানিকটা তথ্য জানা গেলেও সিন্ধু দেশের লিপি সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি। সেখানেও যে লিখন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ সীল ও তাম্রফলকের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এই লিপির পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয়নি।

তথাপি একমাত্র সুমেরের দৃষ্টান্ত থেকে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে নগর সভ্যতার নতুন আর্থিক বিধির প্রয়োজনে সর্বত্র লিখন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। সুমেরের লিখন পদ্ধতি পুরোহিতেরা আবিষ্কার করেছিল সত্য, কিন্তু ধর্মীয় কুসংস্কার প্রচারের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেনি। পার্থিব সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে তাদের লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হয়েছে। মিশরীয় লেখকেরা যাদুক্রিয়া এবং উপাসনার জন্য এই বিদ্যা প্রয়োগ করেছে, কিন্তু সুমেরের পুরোহিতেরা লিখন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে বৈষয়িক লেনদেনের হিসাব-নিকাশের জন্য।

লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার নিঃসন্দেহে মানবেতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। লিখিত নজীর আছে বলে আজও আমরা আমাদের সংস্কৃতির স্রষ্টাদের চিন্তাজগতে প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছি। তাছাড়া লিখন পদ্ধতি মানুষের জ্ঞানবিস্তারের চিরাচরিত পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। লেখার মাধ্যমে শুধু যে দেশান্তরের সমসাময়িক মানুষের কাছে নিজের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা পৌঁছে দেওয়া যায় তা নয়, ভাবীকালের মানুষের হাতেও নিজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সমর্পণ করে সেই অভিজ্ঞতাকে অমরত্ব দান করা যায়। লেখাকে বাহন করে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে। নিঃসন্দেহে তারই সূচনা হয়েছিল নগর সভ্যতার আমলে।

কিন্তু সুমের বা মিশরের আদিলিপি এই সুমহান দায়িত্ব বহনের সার্থক

বাহন হতে পেরেছিল মনে করলে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করা হবে। এই লিপির সাহায্যে ভাবপ্রকাশের গণ্ডী নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। দুই হাজার বছর ধরে সরল করার পরেও সুমেরের লিপিতে ছয়শ থেকে হাজার চিহ্ন ছিল। মিশরীয় লিপির বর্ণমালা থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে বহু ভাবপ্রকাশক প্রতীক চিহ্ন এবং অর্থ-নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহার করা হত। তার ফলে এই লিপির চিহ্নসংখ্যাও শ' পাঁচেকের কম ছিল না।

এতগুলি প্রতীক চিত্র এবং প্রতীক চিহ্ন আঁকতে শেখা বড় সহজ কথা নয়। ধৈর্যসহকারে দীর্ঘদিন শিক্ষানবিশী না করলে লেখার মত দুরূহ আর্ট আয়ত্ত করা যেত না। পড়তে শেখাও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে দুর্জ্ঞেয় রহস্যোদ্ধারের সামিল ছিল। শিক্ষার্থী হিসাবে দীর্ঘদিন পাঠ না নিলে এই রহস্যোদ্ধার করার ক্ষমতা অর্জন করা যেত না। খুব সামান্য লোকেরই এত দীর্ঘদিন পাঠ নিয়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ বা অবসর ছিল। এতটা ধীশক্তিও হয়ত খুব বেশী লোকের ছিল না। কাজেই প্রাচ্যখণ্ডের প্রাচীন সমাজে লিপিকারের সংখ্যা বরাবর নগণ্য ছিল এবং শ্রেণী হিসাবে লিপিকারের অস্তিত্ব থাকলেও স্বতন্ত্র বর্ণ বলে গণ্য হবার মর্যাদা তারা কোনকালে পায়নি। জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে কোন স্থানে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে বলেও জানা যায়নি। তবে ছাত্র নির্বাচনের জন্য কোন পদ্ধতি যে অনুসৃত হত, সে কথাও আমরা জানি না।

কিন্তু সমাজ-জীবনে লেখাপড়া জানা মানুষের খুব কদর ছিল। কারণ সমাজের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তখন লিপিকারদের উপর নির্ভর করতে হত। তাই কামার-কুমোর বা ছুতোরের বৃত্তির মত লেখাকেও বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যেত এবং লেখাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণের জন্যই অনেকে লেখাপড়া শেখার দিকে আকৃষ্ট হত। কেন না লিপিকারের বৃত্তি গ্রহণ করলে সমাজ-জীবনে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং লক্ষ্মীলাভের সুযোগ উন্মুক্ত হত। কাজেই লেখাপড়া শেখার পেছনে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা যতটা ছিল সামাজিক মর্যাদা এবং সমৃদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা তার চাইতে বড় কম ছিল বলা যায় না।

তাছাড়া লেখাপড়া জানার আরও একটা সামাজিক তাৎপর্য ছিল এবং এই তাৎপর্যের জন্যও লেখাপড়া শেখার প্রতি আকর্ষণ বোধ করা অস্বাভাবিক নয়। লিপিকারের বৃত্তি সম্মানের বৃত্তি হিসাবে গণ্য হত। এই বৃত্তি গ্রহণ করলে কায়িক শ্রমসাধ্য কাজ করার দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত এবং সমাজের উপরতলায় স্থান করে নেওয়া যেত। মিশর দেশের লেখাপড়া জানা মানুষকে কোন কায়িক শ্রমসাধ্য কাজ করতে হত না। রাজা, পুরোহিত, অভিজাত আর

সেনানায়কেরা এই সমাজ-জীবনে প্রকৃতপক্ষে উপরতলার মানুষ, আর চাষী, মজুর, জেলে এবং কারিগরেরা নীচুতলার মানুষ বলে গণ্য হত। লিপিকারদের কাজ সমাজের দৃষ্টিতে সম্মানের কাজ ছিল বলে লিপিকারেরা শ্রেণীগতভাবে রাজা-পুরোহিতের দলের মানুষ বলে গণ্য হত।

লিপিকারের বৃত্তির এই শ্রেণীচরিত্র লেখার বিষয়নির্বাচনেও প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাগৈতিহাসিক সমাজের সম্পদবৃদ্ধির মূলে ছিল কারিগরী নৈপুণ্যের উন্নতি। চাষী ও কারিগরেরা সরাসরি এই উন্নতিবিধান করেছে হয়ত বা। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত শহুরে সমাজে শ্রমজীবী শ্রেণীর স্থান ছিল সমাজের নীচের তলায়। লেখকেরা উপরতলার মানুষ ছিল বলে চাষী-মজুর বা কামার-কুমোরের বৃত্তি সম্পর্কে খানিকটা বীতস্পৃহ ছিল, উন্নাসিক মনোবৃত্তি নিয়ে খানিকটা অবজ্ঞার ভাবও পোষণ করত। কাজেই এদের বৃত্তিসংক্রান্ত তত্ত্ব বা তথ্য লিখিত বিষয়ের মধ্যে স্থান পায়নি। শিল্পগাথার সুমহান ঐতিহ্যের কোন লিখিত নজীর আমরা পাই না। তাতে মনে হয়, বৃহৎ জনসমষ্টির ব্যবহারিক জীবনের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে শিক্ষার আত্মিক যোগাযোগ খুব একটা ছিল না।

॥ একালের অঙ্কশাস্ত্র ॥

তবে সুমের বা মিশরের শিক্ষার্থীদের শুধু লিখতে বা পড়তে শিখলেই চলত না। লেখাপড়া জানা মানুষকে ব্যবহারিক জীবনে যেসব কাজ করতে হত সে সম্পর্কেও তাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। সেই দিক থেকে সকল শিক্ষার্থীকেই অঙ্কশাস্ত্র শিখতে হয়েছে। অনেকে আবার জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, শল্যবিদ্যা, কিমিয়াবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা গ্রহণ করত। পাপিরাসের পাতা এবং মৃৎফলকের উপর লিখিত একালের যেসব দলিলকে পুরাবিদ্যাবিদেরা গণিত, চিকিৎসা এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত দলিল বলে অভিহিত করে থাকেন, সেগুলি খুব সম্ভবতঃ বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হত।

প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা সমাধান করা সুমের ও মিশরের অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ব্যবসায়িক লেনদেন উপলক্ষে এবং সামাজিক কোন নির্মাণ-কার্য প্রসঙ্গে যেসব সমস্যা সমাধান করা আবশ্যক হয়ে পড়ত, একালের অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে শুধুমাত্র সেই সব সমস্যা সমাধানের প্রয়াস দেখা যায়। ঠিক তেমনিভাবে পরিজ্ঞাত রোগ নিরাময়ের লক্ষ্য ছিল চিকিৎসাবিদ্যার। জ্যোতির্বিদ্যার লক্ষ্য ছিল কৃষিঋতু নিরূপণ; আর মানুষের ভাগ্য গণনা ছিল জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

তাতে বোঝা যায়, একালের শহুরে সমাজ যে আর্থিক কারণে লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল ঠিক তেমনি আর্থিক কারণেই তাকে অঙ্কশাস্ত্র আবিষ্কার করতে হয়েছিল। কোন কর্মচারীকে যদি দেবমন্দিরের ধনদৌলতের ব্যবসায়িক লেনদেন করতে হয় অথবা রাজার রাজস্বের তত্ত্বাবধান করতে হয়, তাহলে ওজন ও পরিমাপের সুনির্দিষ্ট মান, সংখ্যাজ্ঞাপক সাংকেতিক চিহ্ন এবং গণনার সহজ সরল নিয়মাবলী ছাড়া তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে যেগুলি ছিল না সেগুলি আবিষ্কার করতে হয়েছে, আর যা ছিল তাকে নতুন আর্থিকবিধির প্রয়োজনে পরিশোধিত করে নিতে হয়েছে।

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ওজন পরিমাপের সূচনা অবশ্য শহুরে সভ্যতার আমলে হয়নি। মানবসমাজে শিল্পসৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিমাপের পদ্ধতির সূচনা হয়েছে। পরিমাপ করতে না জানলে ধনুকে জ্যা লাগান কিংবা কুড়োলে হাতল লাগান সম্ভব নয়। নৌকা তৈরি করতে হলেও প্রতিটি তক্তা মেপে লাগাতে হয়। তবে প্রথমদিকে আঙুল, করতল, হাত জাতীয় প্রাকৃতিক বস্তু পরিমাপের মান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। লেনদেনের ক্ষেত্রে শস্যভরা পূর্ণপাত্র ব্যবহৃত হয়েছে ওজনের একক হিসাবে। কিন্তু আঙুল, করতল বা হাত ব্যক্তিগত পরিমাপের মান মাত্র। লোকভেদে এই মানের তারতম্য হয়। সামাজিক কাজের যে ক্ষেত্রে নির্ভুলতা প্রয়োজন অথবা যে কাজে একাধিক শ্রমিকের সহযোগিতা আবশ্যক সেখানে ব্যক্তিগত পরিমাপের মানের উপর নির্ভর করে কাজ করা যায় না। কারণ দুটি শ্রমিকের হাতের দৈর্ঘ্য যে সমান হতেই হবে এমন কথা বলা যায় না। পূর্ণপাত্রের মাপকে ওজনের মান হিসাবে গ্রহণ করলেও অবিচার হবার সম্ভাবনা।

কাজেই পরিমাপের জন্য মান (স্ট্যাণ্ডার্ড) সৃষ্টি করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ আঙুলের মাপ, হাতের মাপ অথবা পূর্ণপাত্রের মাপের উপর সুনির্দিষ্ট সামাজিক মূল্য আরোপ করতে হয়। সমাজ যাকে দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক বলে গ্রহণ করে সেই একক তখন কাঠির উপর দাগ কেটে চিহ্নিত করা হয়—পূর্ণপাত্রের ওজনের প্রতীক হিসাবে নির্দিষ্ট ওজনের প্রস্তর খণ্ড বা ধাতু-খণ্ড ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে দৈর্ঘ্য, ঘনফল, কিংবা ওজন পরিমাপের সামাজিক রীতিসিদ্ধ এককগুলির পুরান নাম বজায় থাকলেও, এই এককগুলির একটির সঙ্গে অন্যটির একটা গাণিতিক সম্পর্ক থাকে। এই অবস্থায় হাত শুধুমাত্র বিস্তার পরিমাপের গুণিতক হিসাবেই গৃহীত হয়। তার মানে এই দাঁড়ায় যে ভাষা ও লিপির মত পরিমাপের মানও সামাজিক

স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক সম্মতি ছাড়া এই মান স্থির করা যায় না।

মনে রাখতে হবে, পরিমাপ করতে গেলে খানিকটা বিমূর্ত চিন্তার আশ্রয় নিতে হয়। দুটি বস্তুর তুলনামূলক বিচার করে পরিমাপ করার পদ্ধতির চাইতে সামাজিক রীতিসিদ্ধ মান অনুযায়ী পরিমাপ করার মধ্যে বিমূর্ত চিন্তার প্রভাব বেশী। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, কোন এক খণ্ড কাপড়ের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ মাপার সময় আমরা তার রঙ, বনাত বা কারুকার্যের দিকে লক্ষ্য না করে শুধু মাত্র তার দৈর্ঘ্যের অথবা প্রস্থের কথা ভাবি। কিন্তু দৈর্ঘ্য বা প্রস্থের কল্পনা বিমূর্ত কল্পনা এবং সেই দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ পরিমাপের রীতিসিদ্ধ মানের একটা বিমূর্ত রূপ আছে। এই পদ্ধতি থেকে শেষ অবধি 'শুদ্ধ রাশির' (পিওর কোয়ানটিটি) কল্পনার উদ্ভব হয়। কিন্তু সুমেরের বা মিশরের সুপ্রাচীন সমাজের মানুষ অন্তহীন দৈর্ঘ্য এবং শূন্য দেশ (স্পেস) সম্পর্কে মোটেই আগ্রহশীল ছিল না। ব্যবহারিক প্রয়োজনে যেটুকু বিমূর্ত চিন্তা করা একান্ত আবশ্যক তার বেশী চিন্তা তারা করত না। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, কালি করার জন্য অথবা ওজন করার জন্য সুমেরীয়রা একই নামের একক ব্যবহার করত। উভয় ক্ষেত্রে পরিমাপের ক্ষুদ্রতম এককের নাম ছিল সী অথবা শস্য। তার মানে সুমেরীয়দের 'বর্গক্ষেত্রের মাপ' মূলতঃ শস্যের দানার মাপ ছিল। নিজের নিজের জমিতে ফসল বুনতে কতটা বীজশস্য প্রয়োজন সেই সম্পর্কেই তারা আগ্রহশীল ছিল। জমি সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে কখনও তারা ভাবেনি যে জমিখানা কতটা 'শূন্য দেশ' দখল করে আছে। তারা ভেবেছে জমি বুনতে কতটা বীজ প্রয়োজন তার কথা। আবাদের অযোগ্য মরুভূমি অথবা নীল আকাশের ক্ষেত্রফল সম্পর্কে কোন আগ্রহ তারা বোধ করত না।

এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণ রাখতে হবে যে ওজন করতে হলে দাঁড়িপাল্লা উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। মিশরের প্রাগৈতিহাসিক কালের সমাধির মধ্যে কিছু কিছু স্মারকচিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে যাকে কোন কোন বিজ্ঞানী নিক্তি বলে অভিহিত করতে চান। তা যদি হয়, তাহলে স্বীকার করে নিতে হয় যে নিক্তির আবিষ্কার এবং পরিমাপের মান নির্ণয়ের সূচনা কালবিচারে শহুরে সভ্যতার আগেই হয়েছিল। এই অনুমান পুরাবিজ্ঞানীদের সত্য বলে মনে করেন।

সে যাই হোক, শহুরে সভ্যতা যেসব দেশে পত্তন হয়েছিল সেখানকার মানুষ তাদের নিজেদের পরিমাপের এককগুলির উপর আলাদা সামাজিক মূল্য আরোপ করত। তার ফলে শহুরে সভ্যতা কায়েম হবার পর মেসোপটেমিয়া, মিশর ও

ভারতে পরিমাপের আলাদা মান প্রচলিত ছিল। এমন কি মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন শহরে প্রচলিত মানের মধ্যেও সামান্য পার্থক্য ছিল। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা আন্তর্জাতিক রূপ ছিল বলে এক দেশের মান অন্য দেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং পরিমাপের জন্য দেশের আভ্যন্তরীণ কাজে বিদেশী মান ব্যবহার করা হয়েছে। মিশরেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নিজেদের পরিমাপের একক ব্যবহার না করে মিশরীয়রা অনেক সময় ব্যাবিলনের পরিমাপের একক ব্যবহার করত।

গণনার সূচনাও একালে হয়েছিল বলা যায় না। তার সূচনা আদিমতম মানবসমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই হয়েছে। তখন হয়ত আঙুল গুণে গণনা করা হত। তাই হয়ত অঙ্কপাতনের দশ-গুণোত্তর প্রণালী এবং এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার আলাদা নামের এত ব্যাপক প্রচলন।

যাই হোক পুরোপলীয় যুগের শিকারী অথবা নবোপলীয় যুগের পশুপালককে গণনা করে যে যোগফল স্বভাবতঃ মনে রাখতে হত সেই যোগফল যদি লাঠির উপর দাগ কেটে মনে রাখা সম্ভব হয় তবু সুমেরের দেবমন্দিরের বিপুল রাজস্ব অথবা মিশরের ফারাওর রাজস্বের হিসাব কোনক্রমে এই পদ্ধতিতে রাখা যায় না। এই বিপুল রাজস্বের হিসাব মনে রাখার জন্য পুরোহিতগোষ্ঠী এবং রাজকর্মচারীদের তাই এক-একটি রীতিসিদ্ধ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু যোগফলের হিসাব রাখার জন্য এই দুই দেশে এবং ভারতবর্ষে মূলতঃ একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। প্রথমে ক্ষুদ্রতম এককের দ্যোতক হিসাবে একটি চিহ্ন আবিষ্কার করা হয়েছে। তারপর নয় পর্যন্ত সংখ্যা বোঝাবার জন্য সেই একক চিহ্নটি যতবার প্রয়োজন পাশাপাশি লেখা হয়েছে। দশকের জন্য এবং দশকের গুণিতকের জন্য আলাদা চিহ্ন ব্যবহার করা হত। খৃস্টপূর্ব ২৯৫০ থেকে ২৭৫০ সালের মধ্যে ১, ১০, ১০০ এবং ১০০০ বোঝাবার জন্য মিশর দেশে আলাদা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হত। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার পদ্ধতি ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছে।

এরেক এবং জেমদেৎ নাশরের প্রাচীনতম মৃৎফলকে ১, ১০, ১০০ বোঝাবার জন্য যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে ঐ শহর দুটির পরবর্তীকালের মৃৎফলকে সেই সাংকেতিক চিহ্নের কোন কোনটির সংখ্যাজ্ঞাপক মূল্যমানের খানিকটা পরিবর্তন দেখা যায়। যে চিহ্নটি শতকের সূচক ছিল সেটি তখন ছয় শতকের দ্যোতক হয়ে পড়ে। তার মানে গণনার পদ্ধতিরও খানিকটা পরিবর্তন হয়। একক, দশক, শতক এইভাবে গণনা না করে এক, দশ, ষাট, ছয়শ এইভাবে গণনা করা হত। গণনার এই পদ্ধতিকে সেকসাজেসিমাল

পদ্ধতি বলা হয়। সুমের ও ব্যাবিলনের সভ্যতা যতদিন ছিল ততদিন এই পদ্ধতি চালু ছিল। সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলি কালক্রমে সরল হয়েছে এবং সেই সরলীকরণের ফলে ব্যাবিলনে বিস্ময়কর ফললাভ করা গেছে। এমন একটি অঙ্কপাতনের পদ্ধতি সেখানে উদ্ভূত হয় যার মধ্যে সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্নগুলি স্থানীয় মূল্য (প্লেস ভ্যালু) লাভ করে। একটি ত্রুটিও ছিল এই পদ্ধতির। শূন্যজ্ঞাপক কোন চিহ্ন এর মধ্যে ছিল না।

তবে সংখ্যাপাতনের এই সব ক'টি পদ্ধতিই আনাড়ী ধরনের। ১৫১ লেখার জন্য সুমেরে ছয়টি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করতে হত। মিশরীয়দের চব্বিশটি আলাদা চিহ্ন আঁকতে হত ৮৭৯ লেখার জন্য। অপর পক্ষে যোগ-বিয়োগের পদ্ধতি আঙুল গোনার মত সহজ ছিল। দশ দিয়ে গুণ বা ভাগও সহজেই করা যেত। দুইকে যদি দশ দিয়ে গুণ করতে হত তো এক-জ্ঞাপক দুটি চিহ্নের স্থলে দশসূচক দুটি চিহ্ন পাশাপাশি লিখলেই চলত।

কিন্তু শহরে সভ্যতা সমাজ-জীবনে যে জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছিল তার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য উন্নত গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দেয়। বিরাট বিরাট নির্মাণকার্যে তখন হাজার হাজার শ্রমিক নিযুক্ত হচ্ছে। এই সব কাজের জন্য কত কাঁচা মাল আবশ্যক, মজুরদের জন্য কত খাদ্য মজুত রাখা প্রয়োজন এবং প্রতিটি কাজ নিষ্পন্ন করতে কতটা সময় আবশ্যক তার বরাদ্দ আগাম করে রাখা দরকার। পিরামিড তৈরি করতে ঘনফল গণনা করা আবশ্যক। গুণপনা অথবা উৎপাদনের হার অনুসারে শ্রমিকদের মধ্যে মজুরি ভাগ করে দেবার আবশ্যকতাও অবশ্যই ছিল। তাছাড়া বেলনাকার অথবা পিরামিডাকার গোলার মধ্যে শস্য মজুত রাখা হত। এই সব গোলার কোনটিতে কতটা শস্য ধরে তার মোটামুটি হিসাবও রাজকর্মচারী কিংবা ওভারসীয়রদের জানা থাকা দরকার ছিল। অনেক সময় অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করা হত। কাজেই লাভের অংশও শেয়ারের অংশ অনুযায়ী হারাহারি ভাগ করে দিতে হত। সুমেরের দেবতাকে প্রতিদিন মদের নৈবেদ্য দেওয়া হত। এই মদ তৈরি করতে কতটা শস্য প্রয়োজন অর্থাৎ কতটা শস্যে কতটা মদ পাওয়া যায় তার হিসাব তত্ত্বাবধায়কদের জানা থাকা দরকার। গোঁড়া কুসংস্কারের বশে পিরামিড নির্মাণ করতে গিয়ে মিশরীয়রা নিখুঁত পরিমাপ বজায় রাখত। কিন্তু প্রস্তর খণ্ডের সঠিক মাপ যদি রাজমিস্ত্রীর জানা না থাকে তাহলে নিখুঁত মাপের পাথর কাটা যায় না আর পিরামিড নির্মাণেও নিখুঁত মাপ বজায় রাখা সম্ভব নয়।

এই সব সমস্যা সমাধানের সহায়ক কোন কিছুই সুমের বা মিশরের লেখকদের সামনে ছিল না। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে তাদের শহরে সভ্যতাসঞ্জাত নতুন সমস্যা সমাধানের পন্থা উদ্ভাবন করতে হয়েছে। কিন্তু তারা ব্যর্থকাম হয়নি। সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি সেকালের গণিতশাস্ত্রবিদেরা উদ্ভাবন করেছিল। প্রথমতঃ তারা গণনার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। তার জন্য প্রথমে অঙ্কপাতনের প্রণালী উদ্ভাবন করতে হয় এবং যত সব সংজ্ঞা-জ্ঞাপক নাম লোকের মুখে প্রচলিত ছিল চিহ্নের সাহায্যে সেগুলি লেখার ব্যবস্থা করতে হয়। তারপর গণনার কৌশল উন্নত করতে হয়েছে। যোগ-বিয়োগ আসলে গণনার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি মাত্র। তিনের সঙ্গে চার যোগ করলে যোগফল আট হয় এ যদি মুখস্থ রাখা যায় তাহলে আর এক-দুই করতে গুণতে হয় না। সুমের ও মিশরের সংখ্যাপাতন প্রণালী সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে এই সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির আভাস সুপ্রকাশ।

গুণনকে যোগের আরও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি বলা যায়। ছয়কে চার দিয়ে গুণ করাও যা আর ছয় চারবার যোগ করাও তাই। ছোট সংখ্যার গুণফলগুলি আমরা সাধারণতঃ মুখস্থ করে রাখি। মিশরীয়রা কিন্তু গুণফলকে মুখস্থ করার জিনিস বলে মনে করত না। অন্ততঃ আমরা যে পদ্ধতিতে গুণ করে থাকি সেই পদ্ধতি তারা অনুসরণ করত না। তাদের গুণনের পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১২কে ১২ দিয়ে গুণ করতে হলে তারা এই ভাবে গুণ করত:

১	১২
২	২৪
√৪	৪৮
√৮	৯৬

গুণফল: ১৪৪

তার মানে, ডানদিকে গুণ্য সংখ্যাটি লিখে তার বাঁদিকের কলমে প্রথম ১ লিখত। তারপর উভয় কলমের সংখ্যাগুলি দ্বিগুণ করে যেত যতক্ষণ না বাঁয়ের কলমে এমন সংখ্যা থাকছে তার যোগফল গুণকের সমান। তখন বাঁ-দিকের কলমের যে কয়টি সংখ্যা যোগ দিলে গুণকের সমান হয় তার বিপরীত দিকের ডান পাশের কলমের সংখ্যাগুলি যোগ করে গুণফল বার করা হত। গুণনের এই পদ্ধতিকে দ্বিগুণীকরণের পদ্ধতি বলা হত।

সুমেরীয়রাও প্রথম দিকে গুণনের জন্য খুব সম্ভবতঃ যোগ করার পদ্ধতি অনুসরণ করত। কিন্তু খৃস্টপূর্ব ২০০০ বছরের আগেই তারা আধুনিক

পদ্ধতিতে গুণ করতে শিখেছিল। তাতে বোঝা যায়, তাদের হাতে গুণনের তালিকা ছিল। যোগ করে যে ফল পাওয়া যেত তাই তারা লিখে রাখত এবং সেই ফল মুখস্থ করত। এই তালিকার জন্ত তাদের পক্ষে গণনা করা খুব সহজ হয়ে পড়ে এবং চটপট হিসাব করা সম্ভব হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাবিলনের অস্তিত্বের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেই হয়ত গণনার এমন সরল পদ্ধতি অত আগে সেখানে উদ্ভূত হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। বহির্বাণিজ্যের উপর মিশরের চাইতে অনেক বেশী নির্ভর করতে হত মেসোপটেমিয়াকে। তাছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকেও দেশটি তৎকালীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথের মিলন-কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। তাই সেখানে প্রচুর বিদেশী মালের লেনদেন হত। গুণনের এই তালিকা থাকায় স্বভাবতই সেই লেনদেন সহজ হয়েছে। সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে এই তালিকা প্রণয়নের কৃতিত্ব সর্বতোভাবে সুমেরীয় স্কুলের গবেষণা বিভাগের প্রাপ্য। তারাই গণনা করে এবং সেই গণনার ফল সুসংবদ্ধভাবে লিখে ও সাজিয়ে এই তালিকা প্রণয়ন করেছিল।

আবার সুমের ও মিশরের গণিতশাস্ত্রবিদেরা শুধু যে পূর্ণসংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তা নয়। শ্রমিকদের মধ্যে রেশন ভাগের মত বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তাদের ভগ্নাংশের হিসাবও করতে হয়েছে। সমস্যাটি সম্পূর্ণ অভিনব। আঙুল গুণে ভগ্নসংখ্যার হিসাব করা যায় না। তার জন্য আলাদা অঙ্কপাতনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হয়। হরের মাথায় একটি চিহ্ন দিয়ে এবং ১ লব হিসাবে ধরে তারা ভগ্নসংখ্যা লিখত। আমরা এখন হর ও লবের মাঝখানে একটি দাগ কেটে ভগ্নসংখ্যা লিখে থাকি। মিশরের এই পদ্ধতিতে কিন্তু ২/৫ কিংবা ৩/৪ জাতীয় ভগ্নাংশ লেখা সম্ভব নয়। তবে এই ধরনের ভগ্নসংখ্যা কখনও তারা লিখত না। ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োজনও খুব হত না। ব্যাবিলনের পণ্ডিতেরা কিন্তু খৃস্টপূর্ব ২০০০ বছরের কাছাকাছি ভগ্নাংশ সম্পর্কে পারদর্শিতা অর্জন করেছিল।

শহুরে সভ্যতার বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য জ্যামিতিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও খানিকটা জ্ঞান আবশ্যক। কোন জমিতে কতটা বীজ লাগবে তার হিসাব করতে হলে জমির কালি করতে জানা দরকার। কর নির্ধারণের জন্তও ক্ষেত্রফল জানা থাকলে ভাল হয়। কিন্তু এই ধরনের হিসাবে নির্ভুল ক্ষেত্রফল জানার খুব আবশ্যকতা নেই। তবু খৃস্টপূর্ব ৩০০০ বছরের আগেই সুমেরীয়রা আবিষ্কার করেছিল যে সন্নিহিত দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের গুণফল থেকে ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়।

অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার জ্যামিতিক সূত্রটি তারা উদ্ভাবন করেছিল।

পরবর্তীকালে অসম বাহুর চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কালি করার চেষ্টাও করা হয়েছে। প্রথমে দুই জোড়া সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্যের গুণফল আলাদাভাবে বের করা হত। তারপর সেই গুণফল দুটি যোগ করে সম দুই ভাগে ভাগ করে মোটামুটিভাবে ক্ষেত্রফল বের করা হত। এর বেশী বাহুর ক্ষেত্র হলে তাকে চতুর্ভুজ এবং ত্রিভুজে ভাগ করে ক্ষেত্রফল গণনা করা হত। মিশরীয়দের পদ্ধতি ছিল এই রকম : একজোড়া সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্যের গুণফলকে অর্ধেক করে সেই গুণফলকে আর একজোড়া সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্যের গুণফলের অর্ধেক দিয়ে গুণ করে তারা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কালি করত। ত্রিভুজ ক্ষেত্রের কালি করার জন্য দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য যোগ করে তার অর্ধেক করা হত এবং সেই ভাগফলকে তৃতীয় বাহুটির দৈর্ঘ্যের অর্ধেক দিয়ে গুণ করা হত।

সুমের ও মিশরের যেসব দলিলে জ্যামিতিক নিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলি প্রধানতঃ জমির নকশা। এই নকশায় ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের বাহুর পাশে দৈর্ঘ্যের পরিমাণ লেখা আছে এবং কোন ক্ষেত্রের নকসাই নিখুঁত স্কেল অনুযায়ী আঁকা নয়। কাজেই মিশর বা ব্যাবিলনের জমি জরিপ করার পদ্ধতি থেকে জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছে এই দাবি পরিজ্ঞাত নজীর থেকে করা যায় না।

কিন্তু স্থপতি বা ইঞ্জিনিয়ারদের যেসব কাজ করতে হত তার জন্য নিভুল গণনার আবশ্যক ছিল। পিরামিড নির্মাণ সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে খাটে। পিরামিডের পাশের প্রস্তরখণ্ডগুলি কাটার জন্য নির্ভুল হিসাব করতে হত এবং মিশরীয়রা তার নিভুল সূত্রও আবিষ্কার করেছিল। জ্যার দৈর্ঘ্য আর বৃত্তের ব্যাস জানা থাকলে ব্যাবিলনীয়রা নির্ভুলভাবে চাপের উচ্চতা হিসাব করতে পারত।

তাছাড়া একালের শিল্পকৃতির মধ্যেও জ্যামিতিক তথ্যের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ইটের পাঁজা এবং কাঠের বাক্সের আকারের মধ্যে জ্যামিতিক তথ্যের বাস্তব প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়। মাদুর তৈরীর চৌকো নকসা আয়তক্ষেত্রের স্মারক। আবার অলংকরণের আর্টের মধ্যেও জ্যামিতিক তথ্যের প্রভাব দেখা যায়। কাপড়ের উপর যেসব ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ আঁকা হত সেগুলিকে জ্যামিতিক চিত্র বলে অনায়াসে গ্রহণ করা যায়। অলংকরণের জন্য বর্গক্ষেত্র বা ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কণের আর্ট অথবা পরস্পরের ছেদক দুটি বৃত্ত আঁকার রীতি খুব জনপ্রিয় ছিল। সিন্ধু দেশে খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ সালেই কম্পাসের সাহায্যে ত্রিভুজ

অথবা চতুর্ভুজের পরিবৃত্ত আঁকা হয়েছে। কিন্তু এই কৃতিত্ব শিল্পী কিংবা কারিগরদের প্রাপ্য—গণিতশাস্ত্রবিদ্‌দের নয়।

এই সব জ্যামিতিক নিয়ম একালের মানুষ কি ভাবে উদ্ভাবন করেছিল সে কথা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। একালের অঙ্কশাস্ত্রের কোন দলিলে কোন সাধারণ নিয়ম অথবা সূত্রের উল্লেখ দেখা যায় না। কোন নিয়মে আয়তক্ষেত্রের কালি করতে হবে অথবা পিরামিডের জন্য মাপসই পাথর কাটতে হবে কোথাও তার কথা বলা হয়নি। অঙ্কশাস্ত্র সংক্রান্ত দলিলগুলি প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালের পাটিগণিতের কষে দেওয়া উদাহরণের মত। ব্যবহারিক জীবনে যে ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে তার উদাহরণ যেন নমুনা হিসাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তবে যে প্রচেষ্টার ফলে একালের অঙ্কশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে তার পরিধি শুধুমাত্র পণ্ডিতদের সামনে উপস্থাপিত সমস্যা এবং তাদের সমাধানপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উদাহরণগুলি দেখে মনে হয় যেন সজ্ঞানে এই সব সমস্যা সৃষ্টি করে তার সমাধানের পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই সজ্ঞান প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রের পণ্ডিতেরা যে কৌশল উদ্ভাবন করেছেন সেই কৌশল একদিকে যেমন পরিচিত বাস্তব সমস্যা সমাধানে প্রযুক্ত হয়েছে তেমন জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্‌রাও নিজেদের গবেষণায় সেই কৌশল ব্যবহার করেছে।

জলপথে চলাচল এবং চাষবাসের প্রয়োজনে নভোচারী জ্যোতিষ্কের গতিবিধি অনুধাবনের প্রচেষ্টা অনেক আগেই আরম্ভ হয়েছিল। ১০ থেকে ৩৫ অক্ষাংশের মধ্যে আকাশ সচরাচর নির্মল থাকে। সেই অবস্থায় নভোমণ্ডলে নিয়ত যেসব দৃষ্টিগোচর ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে পার্থিব ঘটনার যুগপত্তা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। এইভাবে পর্যবেক্ষণ করে ফসলের আইয়াম কিংবা বন্যার আবির্ভাব সম্পর্কে সার্থক ভবিষ্যদ্বাণী করা যখন সম্ভব হল, পণ্ডিতেরা তখন এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যর্থ প্রয়াস আরম্ভ করে। শহুরে সংস্কৃতি পত্তন হবার পরে এই উভয় উদ্দেশ্য নিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা চলতে থাকে এবং রাষ্ট্রশক্তি এই গবেষণার সহায়ক হয়।

কৃষিকর্ম পরিচালনার জন্য মিশর দেশে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ছিল। খৃস্টপূর্ব ২৯০০ সালের কাছাকাছি মিশরীয়রা এক নতুন পঞ্জিকা উদ্ভাবন করে চান্দ্রমাস অনুযায়ী গণনার প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গে সৌর বৎসরের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই পঞ্জিকা অশুদ্ধ ছিল বলে চাষ-আবাদের কাজের বিশেষ সহায়ক হতে পারেনি। মিশরের প্রথম দিকের

রাজবংশের আমলে এই পঞ্জিকা সংশোধনের প্রচেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ অবধি সেই প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। তবু অনির্দিষ্ট সরকারী বর্ষের হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে সাচ্চা বছরের সন্ধান মিশরীয়রা পেয়েছিল।

নভোচারী জ্যোতিষ্কের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার প্রয়োজন ব্যাবিলনে আরও বেশী ছিল। ব্যাবিলনীয়রা কখনও সরকারী প্রয়োজনে সৌর পঞ্জিকা অনুসরণ করেনি। চান্দ্রমতে তাদের বছর হত ৩৫৪ দিনে। মাসারম্ভের দিনও সরকারী আদেশে স্থির হত। রাজা হাম্মুরবির আমলের এক দলিলে দেখা যায়, কৃষ্ণপক্ষের উদয় লক্ষ্য করা একদল রাজকর্মচারীর কর্তব্য ছিল। তারা যখন রাজার কাছে এসে কৃষ্ণপক্ষের উদয় সম্পর্কে সংবাদ দিত সরকারীভাবে তখন নতুন মাসের সূচনা হত। এই কর্তব্যভার বহন করতে গেলে স্বভাবতই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আবশ্যক এবং সে ক্ষমতা রাজজ্যোতিষদল অর্জন করেছিল।

অন্ধভাবে যদি চান্দ্র-গণনার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাহলে সমাজের ধর্মীয় উৎসবাদিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য কেন না একালের ধর্মানুষ্ঠান বিভিন্ন ঋতুর কৃষি উৎসবের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই মাঝে মধ্যে একটি নতুন মাস সংযোজনার প্রথা চালু ছিল। কিন্তু এই সংযোজনের জন্য সরকারীভাবে কোন পদ্ধতি স্থির করা হয়নি। প্রয়োজন মত রাজাদেশে এই নতুন মাস সংযুক্ত হত। তবে তিনি সম্ভবতঃ রাজজ্যোতিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন, আর তারাও হয়ত সৌর বৎসরের হিসাব জানত।

মোটামুটি তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে এবং কুসংস্কারের বশে মিশর ও ব্যাবিলনে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদির গতিবিধি প্রণালীবদ্ধভাবে পর্যবেক্ষণ করা হত। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যাদিকে যদি সাচ্চা বৈজ্ঞানিক উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে সময়ের মান নির্ণয় করা এবং সেই সময়ের পরিমাপ করার যন্ত্র আবিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া শহুরে জীবন যাত্রার পক্ষে এইভাবে সময় বিভাগের আবশ্যকতাও ছিল। দিবামান ও রাত্রিমান সমভাগে ভাগ করে নিলে কারখানার এবং জমিজমার কাজের সুবিধা হয়। মিশরীয়রা প্রকৃতপক্ষে দিনমান ও রাত্রিমানকে সমান বারো ভাগে অর্থাৎ মোট চব্বিশ ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল। কিন্তু ঋতু ভেদে দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। কাজেই দিবালোক এবং অন্ধকারের এই দ্বাদশ ভাগের দৈর্ঘ্য ঋতুভেদে কম-বেশী হত। ব্যাবিলনীয়রা কিন্তু ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করত। দিনরাত্রির পূর্ণমান অর্থাৎ পৃথিবীর আহ্নিকগতির পূর্ণ সময়কে তারা বারোটি দুই ঘণ্টায় (বিরু) ভাগ করে নিত। তবে দিবারাত্রিকে দ্বাদশ ভাগে ভাগ করার

কল্পনা উভয় দেশে সম্ভবতঃ বৎসরের দ্বাদশটি মাসিক ভাগের কল্পনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

দিবালোকের ঘণ্টা নির্ধারণের জন্ত উভয় দেশের মানুষই কোন-না-কোন স্থস্থির বস্তুর ছায়াপাতের প্রকৃতির উপর নির্ভর করত। মিশরের সূর্য-ঘড়িতে (সানডায়েল) ইটের ব্লকের ছায়ার প্রস্থ থেকে সময় ভাগ করা হত। ব্যাবিলনে ব্যবহার করা হত খাড়া দণ্ডের ছায়া। তবে তার কোন স্মারকচিহ্ন পাওয়া যায়নি।

রাত্রির ঘণ্টা বিভাগের জন্ত উভয় দেশে জল-ঘড়ি ব্যবহার করা হত। সুনির্দিষ্ট আকার ও পরিমাপের পাত্র থেকে যতটা জল নির্গত হয়ে নির্দিষ্ট আকারের ভিন্ন পাত্রে পড়ত তার মাত্রা অনুযায়ী সময় ভাগ করা হত। মিশরীয় জলপাত্রগুলি ছিল কনিক আকারের। এই ধরনের পাত্র থেকে কখনও নির্ভুল হিসাব পাওয়া যায় না। ব্যাবিলনের জল-ঘড়ির আকার ছিল বেলনের মত। ঋতুভেদে দিবামান ও রাত্রিমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হলেও এই ঘড়ি সেই হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী ঠিক করে দেবার প্রয়োজন হত না। আমেনেমহাৎ নামে এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী খৃস্টপূর্ব ১৫৭১—৪১ সাল নাগাৎ মিশরীর জল-ঘড়ি এমনভাবে সংস্কার করেছিলেন যার ফলে বছরের সকল ঋতুতে সেই ঘড়ি থেকে নির্ভুলভাবে রাত্রির ঘণ্টা বিভাগের হিসাব পাওয়া যেত।

এই সব যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করে সেকালের জ্যোতির্বিদ্যাবিদেরা গ্রহ-নক্ষত্রাদির সূক্ষ্ম-গতিবিধি পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সেই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যা গড়ে তোলার তথ্যাদি সংগ্রহ করে গেছেন। মিশরীয়রা আকাশের মানচিত্র এঁকেছে, নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেছে এবং তাদের নক্ষত্রমণ্ডলে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। ব্যাবিলনেও পরম যত্নে গ্রহ-নক্ষত্রাদির মানচিত্র আঁকা হয়েছে। কিন্তু চান্দ্র পঞ্জিকার প্রচলন এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের ভাগ্য গণনার নেশায় এখানকার জ্যোতিষশাস্ত্রবিদদের দৃষ্টি চন্দ্র এবং গ্রহাদির গতিবিধি এবং গ্রহণ জাতীয় নৈসর্গিক ঘটনার দিকে বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল। তবে এই সব নৈসর্গিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে তাঁরা এমন কতকগুলি নৈসর্গিক ঘটনার সন্ধান জেনেছিলেন আপাত দৃষ্টিতে কিংবা ভাসাভাসা পর্যবেক্ষণের ফলে যা ধরা পড়ার কথা নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, খৃস্টপূর্ব ২০০০ বছরের অব্যবহিত পরেই ব্যাবিলনের জ্যোতিষশাস্ত্রবিদেরা জানতে পেরেছিলেন যে প্রায় আট বছরের মধ্যে শুক্রগ্রহ পাঁচবার আকাশ দিগন্তের একই স্থানে ফিরে আসে। এর হাজার খানেক বছর পরে ব্যাবিলনীয়রা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায়

পাটিগণিতিক সূত্র ব্যবহার করেছে এবং তার সাহায্যে বহু পরিমাপ, গণনা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। পাটিগণিতিক জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়, তবু এ কথা জোর করে বলা দরকার যে ভাগ্য গণনার ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে মিশরীয়রা জ্যোতিষশাস্ত্রের গবেষণা করলেও তাদের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি বাদ দিয়ে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার কল্পনা করা যায় না।

॥ একালের বৈদ্যশাস্ত্র ॥

রোগ নিরাময়ের চেষ্টাও শহুরে সভ্যতার বহু শতাব্দী পূর্বে আরম্ভ হয়েছে এবং সেকালের চিকিৎসা পদ্ধতি মূলতঃ যাদুবিদ্যাশ্রয়ী ছিল। যাদুক্রিয়া দ্বারাই প্রধানতঃ রোগ সারাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে পাতলা মলম জাতীয় দ্রব্যের সাহায্যও অবশ্যই নেওয়া হয়ে থাকবে। এইভাবে গুটিকয়েক ফলপ্রদ ওষুধও আবিষ্কৃত হয়েছে। সমাজের মধ্যে যাদুক্রিয়ার বিশেষজ্ঞদের উদ্ভব হবার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার একচেটিয়া অধিকার তাদের করায়ত্ত হয়। তাই শহুরে বিপ্লবের পর পুরোহিতেরাই মেসোপটেমিয়ায় বৈদ্যের কাজ করত। মিশর দেশেও ওজন আর চিকিৎসার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ইমহোতেপের চাইতে প্রাচীন বৈদ্যের নাম একালের নজীরের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু পৃথিবীর এই প্রাচীনতম পরিজ্ঞাত চিকিৎসক মিশরের রাজা জোশরের স্থপতি ছিলেন, যদিও পরবর্তীকালে তিনি চিকিৎসার অধিদেবতা হিসাবে পূজিত হতেন। মিশর ও মেসোপটেমিয়ার বৈদ্যেরা কেরানী ছিলেন বলে নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং মতামত লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। নীল নদের উপত্যকা অঞ্চলে খৃস্টপূর্ব ২৭৫০ থেকে ২৪০০ সালের নজীরের মধ্যে ভেষজশাস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। খৃস্টপূর্ব ২০০০ বছরের আগেকার মিশরীয় বৈদ্যশাস্ত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। মেসোপটেমিয়ায় খৃস্টপূর্ব হাজার বছরের আগে চিকিৎসাশাস্ত্রের বই লিখিত হয়নি। তবে একালের বইয়ের কয়েকখানি আরও হাজার বছর আগেকার মৃৎফলকের অনুলেখন হতে পারে।

যাই হোক, এই দুই দেশের কোন বইতে শারীরস্থান বা শারীরবৃত্তের আলোচনা দেখা যায় না। লিখিত নজীরের মধ্যে এক এক ধরনের রোগ চিকিৎসার পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু শব-সংরক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে গিয়ে মিশরীয়রা অবশ্যই মানুষের শারীরস্থান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিল। তথাপি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম বোঝাতে গিয়ে মিশরে যেসব প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হত সেগুলি পশু-দেহের চিত্র—মানব-দেহের নয়। যেমন, হৃদয় জ্ঞাপক চিহ্নটি ছিল ষাঁড়ের হৃদয় জ্ঞাপক চিত্র। জরায়ু বোঝান হত গাভীর যোনিচিহ্ন দিয়ে।

এই ধরনের প্রতীক চিহ্ন থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন যে শব-সংরক্ষণের পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবার আগেই মিশর দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। তাছাড়া শব-সংরক্ষণের কাজ মূলতঃ এক বিশেষ শ্রেণীর কারিগরের কাজ ছিল। তাদের জ্ঞান তাই চিকিৎসাশাস্ত্রকে সামান্যই প্রভাবিত করত। মিশরের চিকিৎসাশাস্ত্রে হৃদয়কে দেহের শিরাতন্ত্রের মূলকেন্দ্র বলে উল্লেখ করা হলেও তার মধ্যে শারীরবৃত্ত সম্পর্কে অতি প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যাবিলনের চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। দেহতন্ত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বহু ভ্রান্ত ধারণার প্রমাণ ব্যাবিলনের চিকিৎসাশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বস্তির (ব্লাডার) কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এমন কি নার্ভ আর শিরার মধ্যেও কোন পার্থক্য করা হয়নি।

এই দুই দেশের মানুষই মনে করতে যে রোগ-পীড়া হয় ভূত-প্রেত-পিশাচ অথবা যাদুশক্তির প্রকোপে। তাই চিকিৎসাপদ্ধতিও মূলতঃ যাদুক্রিয়মূলক ছিল। মন্ত্রোচ্চারণ করে কিংবা আনুষ্ঠানিকভাবে যাদুক্রিয়া করে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাব দূর করার চেষ্টা করা হত। এই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে মলম বা প্রলেপও প্রয়োগ করা হত। কিন্তু প্রলেপ যদি দুঃসহ পুতিগন্ধময় হয় অপদেবতা তাহলে চটপট ছেড়ে পালাবে। তাই এই ধরনের চিকিৎসার মধ্যে মানুষ বা জন্তুর বিষ্ঠা প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল। ওষুধ সম্পর্কে মানুষ এখনও যে বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করে তার মধ্যে রোগের উৎপত্তির কারণ হিসাবে এই প্রাচীনতত্ত্বের খানিকটা প্রভাব আছে হয়ত বা। তাছাড়া এই প্রাচীনতত্ত্ব মেনে নিয়ে ঝাড়-ফুঁকের সাহায্যে এখনও রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করা হয় না কি?

মিশর ও ব্যাবিলনে রোগ-পীড়ার কারণ হিসাবে পৈশাচিক কিংবা অতি-প্রাকৃত শক্তির প্রভাবে বিশ্বাস করা হত বলে এখানকার বৈদ্যেরা রোগোৎপত্তির বাস্তব কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার বিশেষ আগ্রহ বোধ করেনি। মানব-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কেও এই কারণে তাদের আগ্রহের অভাব ছিল। রোগোৎপত্তির এই তত্ত্ব পৌরহিত্যশক্তির ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাজেই এই তত্ত্বের বিরোধিতা করার অর্থ রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং ধর্মদ্রোহিতা। তাই কেউ ওদিকে বেশী অগ্রসর হতে চায়নি এবং তার ফলে চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষ উন্নতি লাভ করতে পারেনি।

কিন্তু শল্যচিকিৎসার অবস্থা এই রকম ছিল না। সার্জনকে যেসব আঘাতের চিকিৎসা করতে হত সেই আঘাত মানুষ কোন-না-কোন পার্থিব বস্তু থেকে পেয়েছে। তার দায়িত্ব অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর আরোপ করার সুযোগ কম।

কাজেই শল্যচিকিৎসার উপর যাদুবিদ্যার তাত্ত্বিক প্রভাব কম থাকার এবং এই চিকিৎসা পদ্ধতি আরও বাস্তবানুগ এবং বৈজ্ঞানিক হবার কথা।

ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরবির আইনে শল্যচিকিৎসকদের জন্য ২ থেকে ১০ শেকেল ফী এবং ভুল অস্ত্রোপচারের জন্য শাস্তির বিধান আছে। তথাপি মেসোপটেমিয়ার শল্যচিকিৎসা পদ্ধতির কোন লিখিত নজীর পাওয়া যায়নি। শল্যচিকিৎসা কারিগরীবিদ্যা হিসাবে গণ্য হত এবং শিল্পগাথা লেখা হত না বলেই নজীরের অভাব আছে কি না বলা যায় না। তবে মিশরে কিন্তু এই সম্পর্কে মূল্যবান একটি নজীর পাওয়া গেছে। 'এডউইন স্মিথ পাপিরাস' নামে খ্যাত এই নজীর কারও মতে খৃস্টপূর্ব ১৫০০ সালের পরবর্তীকালের লেখা। আবার কারও মতে দলিলখানি পিরামিড যুগের অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ২৫০০ সালের সমসাময়িক একখানি মূলগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে লেখা। এই দলিল থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে শল্যচিকিৎসা যাদুবিদ্যার প্রভাব মুক্ত ছিল এবং তার পদ্ধতি পুরোপুরি বাস্তবানুগ ছিল।

চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য লিখিত দলিলের মত এই দলিলখানির মধ্যেও শুধুমাত্র কয়েক ধরনের আঘাতের বিবরণ পাওয়া যায়। তবে বিবরণগুলি প্রণালীবদ্ধভাবে সাজান। প্রথম সাজান হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গ অনুসারে। মাথা থেকে আরম্ভ করে ক্রমান্বয় পা অবধি নেমে গেছে। তারপর প্রতিটি আঘাতের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, আঘাত পরীক্ষার পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার পরিণতি সম্পর্কে রায় দিয়ে শেষ অবধি চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। চৌদ্দ রকম আঘাতকে আবার চিকিৎসার অতীত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মোটের উপর, এই দলিল থেকে মিশরীয় শল্যচিকিৎসা সম্পর্কে প্রশংসনীয় ধারণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু দলিলখানি যদি পিরামিড যুগের মূলগ্রন্থের অনুসরণে লিখিত হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে হাজার-খানেক বছরের মধ্যে মিশর দেশে শল্যচিকিৎসার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি, তাই এডউইন স্মিথ পাপিরাসের অজ্ঞাতনামা লেখক প্রাচীনকালের পণ্ডিতদের দোহাই পেড়ে সেকালের গবেষণার ফলাফল অন্ধভাবে নকল করেছেন মাত্র।

অবশ্য মিশর ও ব্যাবিলনের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক দলিল পরীক্ষা করে বলা যায় না যে লেখন পদ্ধতি আবিষ্কারের পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দুই দেশের অগ্রগতি খুব দ্রুত হয়েছে যদিও লেখন পদ্ধতির আবিষ্কার তার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে এত কম লিখিত নজীর পাওয়া গেছে যে তার উপর নির্ভর করে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। তবে জ্ঞানের

বিকিরণ এবং বিনিময় যে হত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশর ও ব্যাবিলনের অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং চিকিৎসাশাস্ত্র নিজ নিজ স্বতন্ত্র পদ্ধতি অনুসরণ করে বিকাশ লাভ করেছে বটে, কিন্তু তাই বলে ভাব বিনিময়ের ফলে উভয় দেশের বিজ্ঞানের মৌলিক কাঠামো প্রভাবিত হয়নি এমন কথা বলা যায় না। মিশরের অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা তাদের সংখ্যাপাতন প্রণালী, তাদের পরিভাষা এবং ভগ্নাংশ সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিবর্তন বা সংশোধন না করেই ব্যাবিলনের জ্যামিতিক সূত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন। ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে এই ধরনের ভাব বিনিময়ের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে খৃস্টপূর্ব ১৫০০ সালের পর কিন্তু পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃস্টপূর্ব ১৩৫০ সালের মিশরীয় পররাষ্ট্র বিভাগের দলিলে বিভিন্ন রাজদরবারের মধ্যে চিকিৎসক, জ্যোতিষ এবং যাদুকর বিনিময়ের উল্লেখ আছে। খৃস্টপূর্ব ১৫০০ সালের পরেই মিশর, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার রাজধানীগুলির মধ্যে অবাধ লোক চলাচল আরম্ভ হয়েছে। প্রাচ্যের সমস্ত রাজা তখন আক্কাদীয় ভাষাকে কূটনৈতিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে এবং মেসোপটেমিয়ার কীলকাকার লিপি সর্বত্র প্রচলিত হয়। এই লিপি লেখার জন্য মিশরের ফারাওরা অবশ্যই ব্যাবিলনের লিপিকার আমদানি করেছে। ভাষা ও লিপির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে বিধৃত ধ্যান-ধারণারও প্রসার হয়েছে এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনে একটা আন্তর্জাতিকতার ভাব সৃষ্টি করেছে।

ভারত এই সভ্যতার দূর প্রান্তে অবস্থিত হলেও তার অবদানও অবশ্যই একালের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। সিন্ধু দেশের অলংকরণের আর্টে খৃস্ট-পূর্ব ২৫০০ সালেই যে জ্যামিতিক তথ্য ব্যবহৃত হত তার কথা আগেই বলেছি। তার হাজার দুয়েক বছর পরে সংস্কৃত ধর্মকর্মে জ্যামিতিক সূত্রের ব্যাপক ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু অন্তর্বর্তী কালের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণ আমরা পাইনি। তথাপি ভারতের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার যখন ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক যোগা-যোগ ছিল তখন সেও ব্যাবিলনীয় অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতিবিধানে সাহায্য করেছে বলে অনুমান করা হয়। তবে এই দাবি প্রতিষ্ঠা করার মত তথ্যের যেমন অভাব আছে তেমনি এই সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করার মত প্রমাণও নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে ভারতও স্বকীয় পদ্ধতিতে তার অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতি করে যাচ্ছিল এবং শূন্য সংখ্যা (০) সহ যে সংখ্যাপাতন প্রণালী আজকে আমরা ব্যবহার করি তার উদ্ভব হয়েছে ভারতবর্ষে। আরবদের মারফত পশ্চিম এই পদ্ধতির কথা জেনেছে।

সহজ কথায় তাহলে এই দাঁড়ায় যে নগর সভ্যতা এবং লেখন পদ্ধতির আবিষ্কারের তিনটি মূল কেন্দ্র নিজ নিজ পদ্ধতি অনুসরণ করে বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে ক্রমাগত সাহায্য করে গেছে এবং গ্রীকদের হাতে আরও খানিকটা উন্নত হবার পর সেই বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য আমাদের হাতে অর্পিত হয়েছে।

॥ নগর সভ্যতার প্রসার ॥

সমাজ-জীবনে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই যে বৈপ্লবিক রূপান্তরের কথা ইতিপূর্বে বলা হল সেই রূপান্তর সুমের, মিশর এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেও সমসাময়িক কালে দেখা দেয়। সর্বত্র এক ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এই রূপান্তর দেখা দিয়েছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই অঞ্চল তিনটির পারস্পরিক যোগাযোগের কথা স্মরণ করলে মনে করা যায় না যে সুমের, মিশর ও ভারতে এই পরিবর্তন আলাদাভাবে দেখা দিয়েছে। এই রূপান্তরের প্রাক্কালে এলাকা তিনটির যোগাযোগ বরং আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মিশরের সংযুক্তির সময় এমন কতকগুলি জিনিস সেখানে দেখা যায় যার উদ্ভব হয়েছে সুমেরে। আবার ভারতীয় শিল্পদ্রব্যও নগর সভ্যতা গড়ে ওঠার অব্যবহিত পরে সুমেরের বাজারে বিক্রি হয়েছে। তাতে বোঝা যায়, এক স্থানের সংস্কৃতি অন্যত্র প্রসার লাভ করার কোন একটা পদ্ধতি তখন প্রচলিত ছিল। তাই বলে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে কেউ সম্পূর্ণভাবে অপরের উপর নির্ভর করে নগর সভ্যতা গড়ে তুলেছে। নগর সভ্যতা এমন বস্তু নয় যাকে এক স্থান থেকে তুলে নিয়ে অন্য স্থানে পত্তন করা যায়। এই সংস্কৃতির মূল দেশের মাটির গভীরে প্রসারিত। সেই মাটি থেকে রস আহরণ করে এই সভ্যতার মহীরুহ পল্লবিত হয়ে থাকে। কাজেই অনায়াসে এই অনুমান করা যায় যে শহুরে সংস্কৃতি গড়ে তোলার আগে সুমের, মিশর আর ভারত পরস্পর বিশ্লিষ্ট ছিল না। সকলে মোটামুটিভাবে সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাগীদার ছিল। সকলে এই ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। দ্রব্য বিনিময়, ভাব বিনিময় ও কারিগরের আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষিত এবং সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সকলে তার ফলে উপকৃত হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ এই কারণে এই তিনটি স্থানে এক সময়ে একই ধরনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

কিন্তু এই তিনটি কেন্দ্রে নতুন আর্থিকবিধি পত্তন হবার পর সেই আর্থিক-বিধি মূল কেন্দ্র থেকে তার সন্নিহিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে সেখানকার জীবন-বিধিরও রূপান্তরসাধন করেছে। প্রথম ছড়িয়ে পড়েছে মিশর, ব্যাবিলন আর

সিন্ধু উপত্যকার সীমান্ত এলাকায় অর্থাৎ ক্রীট ও গ্রীক দ্বীপমালায়, সিরিয়া, আসিরিয়া, ইরান আর বেলুচিস্থানে। তারপর আরও দূরে প্রসারিত হয়ে গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে, আনাতোলিয়ার মালভূমি এবং দক্ষিণ রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তার ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিপল্লী নগরে রূপান্তরিত হয়েছে, খাদ্যোৎপাদক চাষী হয়েছে কুশলী কারিগর এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের বাহক। এইভাবে প্রতিটি নতুন কেন্দ্র থেকে নতুনতর জনপদে বিস্তার লাভ করে এই নতুন জীবনবিধি মূল কেন্দ্র থেকে দূরতম অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে মানব-সংস্কৃতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছে।

নীল নদ, ইউফ্রেতিস আর সিন্ধুনদের উপত্যকার মূল কেন্দ্র থেকে অনিবার্য কারণেই যে অন্যস্থানে শহুরে সভ্যতার বিস্তার হয়েছে থানিকটা বিশ্লেষণ করলে সে কথা বোঝা যায়। সমভূমির এই সব শহরের বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছে। তার জন্য উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদও ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় কাঁচামাল জনশূন্য বনজঙ্গলে বড় পাওয়া যেত না। কাজেই কাঁচামাল যেখানে পাওয়া যেত সেখানকার অধিবাসীরা এই উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদের ভাগীদার হয়ে বসেছে। নিজেদের জন্য যতটা কাঠ, ধাতু, মসলা এবং রত্ন প্রয়োজন মিশরীয়, সুমেরীয় এবং ভারতীয় বণিকদের জন্য তার চাইতে বেশী ধাতু, কাঠ, মসলা ও রত্ন সংগ্রহ করতে তাদের রাজী করাতে হয়েছে। যেখানে তা সম্ভব হয়নি সেখানে এদের পথপ্রদর্শক, কুলি ও শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করতে হয়েছে। তার ফলে শিল্পের কাঁচামালের অধিকারীদের মধ্যে জীবনযাত্রার নতুন সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হলে শিল্পকার্যে নিপুণতা অর্জন করা আবশ্যক। খনি অঞ্চলের লোক যদি কৃষিকর্ম ছেড়ে খনিতে কাজ করতে এবং ধাতুপিণ্ড বহনের কাজে নিযুক্ত হতে সম্মত হয় তাহলেই তারা শহুরে সভ্যতার বাড়তি ধন-সম্পদের অংশীদার হবার আশা করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটেছে। তাতে কাঁচামালের যোগানদার দেশের খাদ্যোৎপাদনের গতি অবরুদ্ধ হয়নি। কিন্তু সেই দেশে নতুন বৃত্তিধারী এমন কতকগুলি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে সাবেক আর্থিক-বিধির পক্ষে যারা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। দেশের নতুন সম্পদ এই নতুন জনশ্রেণীর জীবিকার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে পদ্ধতিটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

মিশরীয়দের সমাধি, নৌকা এবং আসবাবপত্রের জন্য প্রচুর সিডার কাঠের প্রয়োজন ছিল। এই কাঠ তারা উত্তর সিরিয়া থেকে সংগ্রহ করত এবং বাইব্লস

বন্দর থেকে জলপথে চালান দিত। কিন্তু মিশরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগেই সিরিয়ার অন্যান্য বন্দরের মত বাইব্লসে ছোটখাট একটি শহরের মত গড়ে উঠেছিল। সেখানকার আদিবাসী গিবলাইটরা মোটামুটিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক আর্থিকবিধি সৃষ্টি করেছিল। শহুরে সংস্কৃতি গড়ে ওঠার আগেই মিশরীয়দের সঙ্গে এবং সম্ভবতঃ মেসোপটেমিয়ার সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ছিল। বাইব্লস যে কাঁচামাল সরবরাহ করত শহুরে সভ্যতা পত্তন হবার পর মিশরে তার ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়। সেই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে গিবলাইটরা মিশরের বাড়তি ধন-সম্পদের ভাগীদার হবার সুযোগ পায়। এই বাড়তি ধন বের করার পদ্ধতি তাদের সম্মুখে জীবিকার নতুন পথ উন্মুক্ত করে। কৃষিকর্ম এবং মাছ-ধরার উপর নির্ভরশীল তাদের নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক জীবনের মধ্যে এই ধরনের জীবিকার কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু এই নতুন জীবিকা গ্রহণ করে তারা তাদের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিসর্জন দেয় এবং বিদেশী বাজারের কাঁচামালের যোগানদার হয়ে পড়ে।

বাইব্লসের ধ্বংসাবশের মধ্যে মেনেসের আগের কালের মিশরীয় দ্রব্য পাওয়া গেছে। তাতে বোঝা যায়, বহুকাল থেকে গিবলাইটরা মিশরের সমৃদ্ধির সহায়ক হয়ে এসেছে। মিশরীয় বণিকেরাও এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে তদারক করার জন্য এখানে বসতি স্থাপন করেছে এবং বাইব্লসের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। বাইব্লসে যে নতুন শহর ক্রমান্বয় গড়ে উঠছিল তার শাসন-সংরক্ষণের জন্যও মিশরীয়রা গিবলাইটদের উপদেশ দিয়েছে এবং রাজস্ব তত্ত্বাবধানের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছে। গিবলাইটরাও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে মিশরীয় লিপি শিখে নিয়েছে। এইভাবে গিবলাইটরা ক্রমান্বয় মিশরীয়দের আবিষ্কারাদি গ্রহণ করেছে এবং নিজেদের আর্থিকবিধিকে শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তার ফলে তাদের বসতি শহর হয়ে পড়েছে এবং অচিরে কাঁচামালের বাজার বলে গণ্য হবার মত প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। তার মানে বাইব্লসেও নতুন আর্থিকবিধি প্রসারিত হয়ে পৌর সংস্কৃতির নতুন কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। তাই বলে বাইব্লসের সভ্যতাকে মিশরীয় সভ্যতার প্রতিবিম্ব বলা যায় না। সেই সভ্যতার স্থাপত্য, মৃৎশিল্প, অন্যান্য কারিগরী বিদ্যা এবং সেখানকার বেশবাস ও ধর্মের মধ্যে স্থানীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট অক্ষুণ্ণ ছিল। তাছাড়া এই সংস্কৃতি সৃষ্টির অনুপ্রেরণা তারা যে শুধুমাত্র মিশর থেকে পেয়েছিল এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু মিশরীয় সভ্যতার তুলনায় গিবলাইটদের সভ্যতা আঞ্চলিকতার দোষদুষ্ট ছিল। মিশর থেকে ধার করা কলা-কৌশল তারা মূল

দেশের মত উন্নত করতে পারেনি। দৃষ্টান্ত হিসাবে লিপির কথা বলা যায়। কালক্রমে মিশরীয়রা তাদের প্রাচীন লিপির উন্নতিসাধন করেছিল। কিন্তু গিবলাইটরা এই লিপি গ্রহণ করার পর হাজার বছর সেই সাবেক লিপি অপরিবর্তিত অবস্থায় বজায় রেখেছে।

অনেকটা এইভাবে তাউরাস পর্বত থেকে মেসোপটেমিয়ায় তামা, রূপা ও সীসা আমদানি করতে গিয়ে এশিয়া মাইনরের মালভূমি অঞ্চলের কাপ্পাডোশিয়াতে শহুরে সভ্যতার পত্তন হয়। খৃস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে স্থানীয় অধিবাসীরা নবোপলীয় আর্থিকবিধির স্তর অতিক্রম করতে পারেনি। গ্রামবাসীরা শুধুমাত্র পাথুরে হাতিয়ার এবং হাতে তৈরী মৃৎপাত্র ব্যবহার করত। খৃস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছরের পরে আসিরিয়ার বণিকেরা এখানকার জনপদে বসবাস আরম্ভ করে এবং ধাতুপিণ্ড চালান দিতে থাকে। তার কয়েক শ' বছর পরে ব্যাবিলনের শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে স্থানীয় কাঁচামাল এবং কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময় আরম্ভ হয়। তার মানে মেসোপটেমিয়ার উদ্বৃত্ত ধন খনি-মজুর এবং ধাতুনিষ্কাশকদের জীবিকার সংস্থান করে দেয়। এরা তখন খাদ্যোৎপাদনের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন জনপদও শিল্প-বাণিজ্য-নির্ভর শহর হয়ে উঠেছে। সকলেই তখন ধাতু ব্যবহার করতে আরম্ভ করে এবং গৃহিণীদের পরিবর্তে কুমোরের বৃত্তিবান পুরুষ তখন চাকের সাহায্যে মৃৎপাত্র তৈরি করতে থাকে। নতুন আর্থিক অবস্থার প্রয়োজন মেটাবার জন্য মেসোপটেমিয়ার কলা-কৌশলও অনুকরণ করা হয়। ব্যাবিলনের লিপিও অচিরে গ্রহণ করা হল। তথাপি কাপ্পাডোশিয়ার সভ্যতা বাইব্লসের সভ্যতার মত তার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। মেসোপটেমিয়া থেকে ধার করা বিদ্যার উন্নতি এখানে মূল দেশের তুলনায় অনেক মন্থর গতিতে হয়েছে।

শহুরে সংস্কৃতির বিস্তার শুধু যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ফলে হয়েছে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে শক্তির দাপটে—সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বলে এই সভ্যতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মিশরীয়রা ঠিক এইভাবে বেদুইন অধ্যুষিত সিনাই পার্বত্য অঞ্চলে শহুরে সভ্যতার পত্তন করেছিল। খাদ্যশস্যের বিনিময়ে এখানকার যাযাবরদের খনির কাজ করতে প্রলুব্ধ করা যায়নি বলে নিজের দেশ থেকে শ্রমিক আমদানি করে খনির কাজ করান হয়েছে এবং শাস্ত্রী নিয়োগ করে বেদুইনদের হামলা থেকে খনি অঞ্চল রক্ষা করা হয়েছে।

কয়েক ক্ষেত্রে নিছক রাজ্য জয়ের ফলে জোর করে শহুরে সভ্যতার পত্তন করা হয়েছে এবং মোটামুটিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ জনপদকে শিল্প ও বাণিজ্য-নির্ভর শহরে

রূপান্তরিত করা হয়েছে। আসিরিয়ার নিনেভেতে রাজা সারগনের পৌত্র ইশতায়ের নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। তারপর এখানে আরও বহু মন্দির নির্মিত হয়েছে। এই মন্দির নির্মাণ-শিল্প এক আর্থিক বিপ্লবের প্রতীক। কেন না সুমেরের মত আসিরিয়ার মন্দিরও মূলধন সঞ্চয়ের এবং শিল্পোন্নতির মূল কেন্দ্র ছিল। এই মন্দির নির্মাণ এবং তার অঙ্গসজ্জার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিককে পোষণ করা গেছে এবং লাপিস লাজুলি, কাঠ, ধাতু জাতীয় জিনিসের নতুন চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তার ফলে নিনেভে সংস্কৃতি প্রসারের গৌণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আসিরিয়ার অন্যান্য শহরেও এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকতে পারে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের ভুক্তভোগীরা পরদেশী আক্রমণকারীদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের বাস্তব সংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছে। সুমেরীয়রা যেসব দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করত তার কয়েক জায়গায় ইলামাইটদের মত প্রগতিশীল সম্প্রদায় বাস করত। সুমেরীয়দের ক্যারাভানের চলাচলের পথে এই ধরনের সম্প্রদায়ের বাস ছিল। এই সব সম্প্রদায় যে অঞ্চলে বাস করত সেখানে জল সরবরাহের অপ্রতুলতা ছিল না। কাজেই নবোপলীয় আর্থিকবিধির আওতায় তারা বেশ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। সুমেরীয়দের বাণিজ্যিক ক্যারাভান দেখে তারা চাকাওয়ালা গাড়ী এবং কুমোরের চাক তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করেছিল। তাছাড়া সোনা, লাপিস লাজুলি জাতীয় বিলাস দ্রব্যও তারা আমদানি করত। তা সত্ত্বেও মোটের উপর তারা নিজেদের গৃহজাত সামগ্রী ভোগ করে সন্তুষ্টচিত্ত ছিল। নিজেদের দেশজ সম্পদের উপর নির্ভর করে মোটামুটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারত। বিলাস দ্রব্যের চাহিদা তাদের মধ্যে এত নগণ্য ছিল যে সুমেরীয় শহরগুলির কাঠ ও ধাতুর ব্যাপক চাহিদা পূরণের জন্য কেউ তেমন প্রলুব্ধ হয়নি। আবার সুমেরীয় ক্যারাভান তাদের ক্ষেত-খামার নষ্ট করে দিয়ে যাবে এও তারা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। কাজেই যোগানদারী করার জন্য সুমেরীয় বণিকদের প্রস্তাব তারা হয়ত প্রত্যাখ্যান করেছে। এমন কি তাদের ক্যারাভানও আক্রমণ করে থাকতে পারে। তার ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বাণিজ্যিক পথের নিরাপত্তাবিধান এবং কাঁচামাল সংগ্রহের তাগিদে সুমেরীয়রা এই সব শত্রুকে জব্দ করার জন্য অভিযাত্রী সৈন্যদল পাঠিয়েছে এবং আক্রান্ত দেশ পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এইভাবে দেশ জয় করে সুমেরীয়রা তাদের আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে।

কিন্তু আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ শুধু মাত্র রাজ্য জয় করে শহুরে সভ্যতা বিস্তার করেনি। এই সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়েও শিল্প-বাণিজ্য-নির্ভর আর্থিক জীবনবিধির উদ্ভব হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ সফলভাবে প্রতিরোধ করতে হলে আক্রমণকারীর সভ্যতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করা আবশ্যক। ব্যাবিলনের সৈনিক ধাতব অস্ত্র ব্যবহার করত। পাথুরে অস্ত্র নিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে পরাজয় সুনিশ্চিত। কাজেই যেসব সম্প্রদায় নবোপলীয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদের ধাতব অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ব্যাবিলন থেকে কুঠার, বল্লম এবং শিরস্ত্রাণ কিনে অথবা চুরি করে এই অভাব পূরণ করা সম্ভব নয়। কাজেই ধাতুবিদ্যা শেখার প্রয়োজন হয়েছে এবং এই নতুন বিদ্যার প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের আর্থিক জীবন ঢেলে সাজতে হয়েছে। বিদেশের কারিগর বন্দী করে এনে নিজেদের দেশের অস্ত্র-নির্মাতাদের যেমন শেখাতে হয়েছে তেমন নতুন কারিগরদের ভরণপোষণের জন্য উদ্বৃত্ত শস্য উৎপন্ন করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে কাঁচামালের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত বাণিজ্যের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে, শহুরে সভ্যতার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য তাদের নিজেদের শহুরে আর্থিকবিধি গ্রহণ করতে হয়েছে। আসিরিয়ায় ধাতুবিদ্যার সূচনা এবং শহুরে জীবনযাত্রার সূত্রপাত ঠিক এই কারণে হয়েছে। শুধু আসিরিয়া কেন? উত্তর সিরিয়া, লুরিস্থান এবং ইলাস প্রভৃতি যেসব স্থান সুমেরীয়দের বাণিজ্যিক পথের মধ্যে পড়েছে অথবা রাজা সারগনের অভিযানের মুখে পড়েছে, খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের অব্যবহিত পরে সেই সব স্থানে ধাতুবিদ্যার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সকল স্থানেই সুমেরীয় পদ্ধতি অনুকরণ করা হয়েছে। তবে তার মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের রুচিবোধের বিশিষ্টতার ছাপ থাকত না এমন নয়। তার মানে মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে সুমেরীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যবাদ ধাতুবিদ্যা প্রসারের সহায়ক হয়েছে এবং এই বিদ্যা সংশ্লিষ্ট আর্থিকবিধি নতুন নতুন স্থানে পত্তন করেছে।

খৃস্টপূর্ব তিন হাজার থেকে দু হাজার বছরের মধ্যেই ক্রীট দ্বীপে, গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে, দার্দেনেলিসের সন্নিহিত ট্রয়তে, ককেসাসের উত্তরে কুবান এলাকায়, এশিয়া মাইনরের মালভূমিতে এবং প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরান ও বালুচিস্থানে ব্রোঞ্জ ধাতু ব্যবহারকারী সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। এর প্রতিটি সভ্যতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকলেও মিশর, সুমের ও সিন্ধু দেশজাত দ্রব্যসম্ভারের সঙ্গে এই সব দেশের শিল্প-দ্রব্যের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য ছিল। এই সাদৃশ্য থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে নগর

সভ্যতার আদি কেন্দ্রের কাছে তারা অশেষভাবে ঋণী। কিন্তু এই সব সভ্যতার কোনটিকে মূল সভ্যতা বলা যায় না। নগর সভ্যতার আদি কেন্দ্রের যেসব ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা এবং উৎপাদন পদ্ধতি প্রসার লাভ করেছিল সেগুলি গ্রহণ করার ফলে এই সব সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। কোথায় কোন পদ্ধতিতে সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল তার খোঁজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানা যায় না। তবে সংস্কৃতি বিস্তারের বিশেষ সার্থক পদ্ধতি যে তৎকালে প্রচলিত ছিল এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শিল্প ও বাণিজ্য-নির্ভর আর্থিক জীবনবিধি একবার কোথাও প্রতিষ্ঠিত হলে প্রসার লাভ না করে পারে না। সংস্কৃতি বিস্তারের ফলে কোন পল্লী যদি শহরে রূপান্তরিত হয় তাহলে সেই শহর আবার সংস্কৃতি প্রসারের নতুন কেন্দ্র হয়ে পড়ে। এই ভাবে ক্রমান্বয় প্রসার লাভ করে খৃস্টপূর্ব দেড় হাজার বছরের পূর্বেই নতুন শিল্পসমৃদ্ধ আর্থিকবিধি স্পেন, বৃটেন ও জার্মানিতে পৌছে গিয়েছিল এবং তার শ পাঁচেক বছরের মধ্যে স্কান্দেনেভিয়া এবং সুদূর সাইবেরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল।

কিন্তু এইভাবে প্রসার লাভ করলে সংস্কৃতির বিকৃতি ও অবনতি হয়। নতুন দেশের নতুন লোক নতুন কলা-কৌশল শিখে যথাযথভাবে সেই কলা-কৌশল প্রয়োগ করতে পারে না। দক্ষতা অর্জনের জন্য পুরুষানুক্রমিক অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। তাছাড়া কোন উন্নত সভ্যতাই পুরাপুরিভাবে গৃহীত হয় না। গ্রহীতারা সাধারণতঃ উন্নত সভ্যতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ করতে চায়—যতটুকু পরিপাক করতে পারে শুধুমাত্র ততটুকু গ্রহণ করে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, লেখন পদ্ধতি গ্রহণ না করে অথবা যে বাণিজ্যিক সংস্থার পক্ষে লেখাপড়া অপরিহার্য সেই বাণিজ্যিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা না করেও ধাতুবিদ্যা শেখা এবং অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ধাতুপিণ্ড সংগ্রহ করা সম্ভব। কাজেই উন্নত সভ্যতা আংশিকভাবে গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন পর্যায়ের সভ্যতার উদ্ভব হয় এবং সংস্কৃতির মূল কেন্দ্রের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্যের মধ্যেও তারতম্য থাকে। প্রসারিত নগর সভ্যতার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুমের, মিশর ও সিন্ধু দেশে যে নগর সভ্যতার পত্তন হয়েছিল সেই সভ্যতা যখন স্পেন থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তখন ইউরেশিয়ার মূল ভূখণ্ডে যত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার কোনটির সঙ্গে নগর সভ্যতার আদি কেন্দ্রের সংস্কৃতির পুরাপুরি মিল ছিল না। এই সব সভ্যতার পারস্পরিক রূপ ও প্রকৃতির মধ্যেও প্রভূত পার্থক্য ছিল।

।। প্রগতির মন্থরতা ।।

যাই হোক, মানবসমাজে শহুরে সংস্কৃতি পত্তন হবার পরবর্তী হাজার দুয়েক বছরের ইতিহাসকে যদি মানব প্রগতির দিক থেকে বিচার করা হয়, তাহলে এই ঐতিহাসিক পর্যায়ের অবদান নগণ্য বলে মনে হবে। শহুরে সংস্কৃতির নতুন আর্থিকবিধির দৌলতে এই সমাজের মানুষ অভূতপূর্ব সম্পদের অধিকারী হয়েছিল। জ্ঞান বিস্তারের এক নতুন পদ্ধতিও এই যুগে প্রচলিত ছিল। তথাপি আর্থিক জীবনবিধির এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের পর মানব প্রগতির উন্নতির পথে কোন নব যুগের সূচনা হয়েছে কিংবা সেই উন্নতির গতি দ্রুততর হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। বরং এই পর্যায়ের হাজার দুয়েক বছর আগেকার যুগের বিস্ময়কর প্রগতির সঙ্গে তুলনা করলে এই সাংস্কৃতিক পর্যায়ের অবদান দেখে হতাশ হতে হয়। এমন কি এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে আগেকার যুগের মানব প্রগতির ধারা এই নতুন আর্থিক জীবনবিধি কায়েম হবার পর মন্থর হয়ে গেছে—তার এগিয়ে চলার গতি বাধাকণ্টকিত হয়েছে।

খৃস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর থেকে তিন হাজার বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয় এমন কতকগুলি বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষ করেছে যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে সেকালের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সব আবিষ্কার যে জৈবিক অর্থে মানুষের উদ্‌বর্তনের সহায়ক তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও তৎকালীন জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে পাওয়া যায়। অথচ শহুরে সমাজের মত বিপুর ধন-সম্পদের অধিকারী মানবসমাজের অস্তিত্ব তখন ছিল না। এই সব আবিষ্কার করেছে সেকালের কিছু নিরক্ষর এবং আপেক্ষিক বিচারে দরিদ্র কিছু মানবগোষ্ঠী। এই সমাজের মানুষ সেচকার্যের কৃত্রিম কৌশল ও লাঙল আবিষ্কার করেছে, পশুশক্তি ব্যবহারের কৌশল উদ্ভাবন করেছে, পাল-তোলা নৌকা আর চাকাওয়ালা গাড়ী নির্মাণ করেছে এবং বাগিচা চাষের পদ্ধতি আর সন্ধানের (ফারমেন্টেশন) কৌশল উদ্ভাবন করেছে। ইট, সীল আর চাপ আবিষ্কার, তামা উৎপাদন ও ব্যবহারের পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং চকচকে (গ্লেজিং) করার কৌশল আবিষ্কারের কৃতিত্বও এই যুগের মানুষের প্রাপ্য। তাছাড়া শহুরে সভ্যতার সূচনায় সৌর পঞ্জিকা, লেখন পদ্ধতি, সংখ্যাজ্ঞাপক সাংকেতিক চিহ্ন এবং ব্রোঞ্জ ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে।

কিন্তু শহুরে সংস্কৃতি কায়েম হবার পর মোটামুটিভাবে খৃস্টপূর্ব ২৬০০ সাল থেকে ৬০০ সালের মধ্যে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তিন চারটি আবিষ্কারের উল্লেখ করা

যেতে পারে মাত্র। যে পনেরটি আবিষ্কারের কথা বলা হল তার সঙ্গে এই যুগের গুটিচারেক আবিষ্কার, যেমন দশ-গুণোত্তর সংখ্যাপাতন প্রণালী উদ্ভাবন (খৃস্টপূর্ব ২০০০ সাল), লোহা নিষ্কাশণের পদ্ধতি আবিষ্কার (খৃস্টপূর্ব ১৪০০ সাল), বর্ণমালা উদ্ভাবন (খৃস্টপূর্ব ১৩০০ সাল) এবং শহরে জল সরবরাহের জন্য জলাধার নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার (খৃস্টপূর্ব ৭০০ সাল) সমপর্যায়ভুক্ত হবার দাবি রাখে। ব্যাবিলনের মানুষ দশ-গুণোত্তর সংখ্যাপাতন প্রণালী আবিষ্কার করে গাণিতিক জ্যোতিষের ভিত্তি রচনা করেছে এবং সুষ্ঠুভাবে ভগ্নাংশ সংখ্যার হিসাব করতে শিখেছে। লোহা নিষ্কাশণের যে পদ্ধতি হিটাইট সাম্রাজ্যে আবিষ্কৃত হয় তার ফলে শিল্পকার্যে এবং ব্যবহারিক জীবনে এই ধাতুটির বহুল ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। বর্ণমালা আবিষ্কার করে ফিনিশিয়ার মানুষ লেখাপড়াকে জনসাধারণের আয়ত্তাধীন করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আর আসিরিয়ার মানুষ যখন শহরে জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে জলাধার নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করে তখন শহুরে সমাজের মৃত্যুর হার অবশ্যই হ্রাস পেয়েছে।

কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে আরও কতকগুলি উন্নতির প্রমাণ এই যুগের ইতিহাসে আছে। যেমন এই সাংস্কৃতিক পর্যায়ের মধ্যেই মানুষ নৌকার সঙ্গে হাল সংযোজনের কৌশল উদ্ভাবন করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য চকচকে করার কৌশল উন্নত করতে শেখে। কিন্তু কারিগরী নৈপুণ্যের এই ধরনের উন্নতি আবিষ্কারের দিক থেকে তেমন উল্লেখ যোগ্য নয়। তাছাড়া আগে যেসব আবিষ্কারের কথা বলা হল এর কোন উন্নতি তার সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। ধাতুবিদ্যাশ্রয়ী এবং শিল্প-বাণিজ্য-নির্ভর নতুন আর্থিক-বিধি প্রচলিত হবার পূর্বে মানবসমাজে যেসব কারিগরী পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছিল, এই সব উন্নতিকে তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ এবং রসায়ণশাস্ত্রে একালে যে উন্নতি হয়েছে সেই সম্পর্কেও এই যুক্তি প্রযোজ্য।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, শহুরে সাংস্কৃতিক পর্যায়ের আগেকার হাজার দুয়েক বছরের মধ্যে মানবজাতির প্রগতির পক্ষে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গুটি পনের আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করা গেলেও তার পরেকার দু হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে সমপর্যায়ের গুরুত্বসম্পন্ন কেবলমাত্র চারটি আবিষ্কারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তার মধ্যে শুধুমাত্র দুটি আবিষ্কার আমরা শহুরে সভ্যতার মূল কেন্দ্রের মানবসমাজের অবদান বলে গণ্য করতে পারি। এই দিক থেকে বিচার করলে মিশর, ব্যাবিলন এবং তার সাংস্কৃতিক উপনিবেশগুলির কৃতিত্ব মানব প্রগতির দিক থেকে হতাশব্যঞ্জক বলেই মনে হয়।

এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এই নতুন আর্থিকবিধির পর্যায়ে মানব প্রগতির ধারা কেন বাধা পেল? আগেকার কালের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কেন একালের মানুষ নতুন পথের দিশারী হয়ে প্রগতির ধারা বলিষ্ঠ খাতে প্রবাহিত করতে পারল না? একালের সমাজব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে তার কারণ মোটামুটি উপলব্ধি করা যায়।

শহুরে সংস্কৃতি যে সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিল তার মধ্যে কতকগুলি আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা ছিল। সমাজের হাতে ধন সঞ্চিত হয়েছিল বলে এই নতুন আর্থিকবিধির উদ্ভব হয়নি। সেই ধন দেবতা, রাজা আর মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বলে শহুরে সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। শহুরে সংস্কৃতি গড়ে তোলার পক্ষে প্রয়োজনীয় বাড়তি ধন-সম্পদের উৎপাদন সুনিশ্চিত করার জন্য এবং সেই সম্পদ যথাযথভাবে সামাজিক প্রয়োজনে নিয়োগ করার জন্য এই কেন্দ্রীভবনের প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু তার ফলে সমাজের বৃহত্তর জনসমষ্টির আর্থিক অবনতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের উদ্যোগে যেসব জনহিতকর কাজ করা হয়েছে তার ফলে চাষী, জেলে আর পশুপালকদের আর্থিক দুর্গতির খানিকটা লাঘব হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজের মধ্যে যে নতুন ধন-সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছিল এদের ভাগে তার অতি নগণ্য অংশই পড়ত। সামাজিক দিক থেকে এদের মর্যাদা ক্রমে ক্রমে প্রজা অথবা ভূমিদাসের পর্যায়ে নেমে যাচ্ছিল। কারিগর ও মজুর নামে যে শ্রেণীটি সমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছিল সমাজের বাড়তি ধন ব্যয় না করলে তাদের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায়ান্তর ছিল না বটে, কিন্তু এই দক্ষ-অদক্ষ শ্রমজীবীদের ভাগে সেই বাড়তি ধনের অকিঞ্চিৎকর অংশ পড়ত। তাছাড়া এই শ্রমজীবী শ্রেণীর এক বিরাট অংশ দাস ছিল। প্রাণ ধারণের ন্যূনতম মজুরির বিনিময়ে এদের প্রাণান্তকর শ্রম করতে হত। যারা দাস ছিল না তাদেরও এই দাস শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে কম মজুরির বিনিময়ে হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছে। তার ফলে তাদের আর্থিক দুর্গতিও ক্রমান্বয় বেড়ে গেছে।

পক্ষান্তরে এই বাড়তি ধন-সম্পদের মোটা অংশ জমা হয়েছে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে—রাজা, পুরোহিত কিংবা তাদের আত্মীয়স্বজন, অনুগত-অনুগৃহীতের হেপাজতে। তার ফলে আর্থিক ভিত্তির উপর সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। রাজা, পুরোহিত আর আমলাতন্ত্রকে নিয়ে শাসকশ্রেণী গড়ে উঠেছে। চাষী-মজুরেরা তলিয়ে গেছে সমাজের নীচুতলার মানুষের পর্যায়ে। সমাজের এই শ্রেণীবিভাগ মানব প্রগতির সহায়ক হয়নি। বরং তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

করেছে। কারণ এই নতুন আর্থিকবিধি চালু হবার আগে আসল উৎপাদকেরাই প্রগতির বাহক ছিল। তারাই হয়ত কুসংস্কারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতিবিধান করেছে। অথচ এই নতুন সমাজব্যবস্থায় তারা নীচুতলার দুর্গত মানুষের পর্যায়ে অবনমিত হল। শাসকগোষ্ঠী হিসাবে নতুন যে শ্রেণীটির উদ্ভব হল তাদের সামাজিক অধিকার ও ক্ষমতার অন্যতম নির্ভর ছিল কুসংস্কারের প্রতি মানুষের মোহ। তাই তারাও কুসংস্কারের কুহকজাল বিস্তার করে ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। মিশরের ফারাওর উদ্ভব যাদুকর থেকে হতে পারে, তথাপি নিজেকে সে দেবতা বলে প্রচার করত এবং যাদুক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠানে তার সম্পদের এক বৃহৎ অংশ ব্যয় করত। সুমেরে যে আর্থিক বিপ্লব হল তার মধু পুরোহিতগোষ্ঠীর ভাগেই বেশী জুটেছে। সেখানে যখন রাজশক্তির উদ্ভব হল তখনও সেই রাজা নিজেকে দেবতার মূর্ত বিগ্রহ বলে ঘোষণা করেছে এবং নানা অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছে। কাজেই কুসংস্কারের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা শাসক সম্প্রদায় যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা করবে এই প্রত্যাশা করা যায় না। বরং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় যে প্রত্যাশা বারবার ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছে সেই ভ্রান্ত আশার মায়াজাল সৃষ্টির জন্যই বরাবর তারা চেষ্টা করেছে।

তাছাড়া নতুন নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে এই ধরনের শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ আগ্রহ থাকার কথাও নয়। মানব প্রগতির বহু বৈপ্লবিক পদক্ষেপ মূলতঃ শ্রম লাঘব করার কৌশল মাত্র। দৃষ্টান্ত হিসাবে পশুবলের ব্যবহার, পাল এবং ধাতব হাতিয়ার আবিষ্কারের কথা বলা যায়। কিন্তু একালের শাসকগোষ্ঠীর অধীনে কুসংস্কারের মোহান্ধ অগণিত শ্রমিক এবং অসংখ্য যুদ্ধবন্দী ছিল। কাজেই শ্রম লাঘব করার কৌশল উদ্ভাবন সম্পর্কে তেমন কোন চাড় তারা অনুভব করত না।

আবার লেখাপড়া জানা যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি একালে উদ্ভূত হয়েছিল তারাও শাসকশ্রেণীর প্রতি অনুরক্ত ছিল। কাজেই তারাও শাসকশ্রেণীর সঙ্গে একযোগে অর্থহীন কুসংস্কার বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। এই সব কারণে সেকালের মিশরীয় এবং ব্যাবিলনীয় সমাজ এমন বিভ্রান্তিকর আভ্যন্তরীণ বিরোধিতার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল যা প্রগতির পরিপন্থী। এই বিরোধিতার ঐতিহ্য তারা তাদের সভ্যতার উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও সঞ্চারিত করে গিয়েছিল। হিটাইট, আসিরীয়, পারসিক আর ম্যাসিডোনীয়রা তাদের নিজস্ব নগর সভ্যতা মিশর ও ব্যাবিলনের অনুকরণে গড়ে তুলেছিল বলে মানব প্রগতির ক্ষেত্রে তাদের অবদানও অকিঞ্চিৎকর।

আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা ছাড়া আর এক ধরনের বিরোধিতার মধ্যে সেকালের সভ্যতা জড়িয়ে পড়েছিল যাকে বাইরের বিরোধিতা বলা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে কাঁচামালের দিক থেকে নীল নদের উপত্যকা কিংবা ব্যাবিলন স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। পরদেশ থেকে এই কাঁচামাল তাদের সংগ্রহ করতে হত। প্রথমে হয়ত শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে কাঁচামাল পাওয়া যেত। কিন্তু কাঁচা-মালের চাহিদা ক্রমান্বয় বেড়ে ওঠে। কাজেই বেশী কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিত করার জন্য তখন শক্তির সাহায্য নিতে হয়েছে। বাণিজ্যপথ ধরে সৈন্যদল এগিয়ে গেছে এবং কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্র জয় করে শক্তির দাপটে তাকে অধীনে রাখা হয়েছে। এইভাবে মিশর ও ব্যাবিলনে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়েছে। ব্যাবিলনের নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার পর সেখানকার শাসকগোষ্ঠী ভৌগোলিক দিক থেকে স্বতন্ত্র এলাকা সামরিক শক্তির বলে জয় করে নিজেদের আর্থিক ব্যবস্থার নিরাপত্তা বিধান করেছে। এইভাবেই খৃস্টপূর্ব ২৫০০ সালে পৃথিবীর প্রথম সাম্রাজ্য অর্থাৎ রাজা সারগনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তবে রাজা সারগন যে চিন্তা-ভাবনা করে আর্থিক সমস্যা সমাধানের পন্থা হিসাবে রাজ্য জয় করেছিল এমন কথা বলা যায় না। তবু তার রাজ্য জয়ের ফলে আর্থিক সাম্রাজ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার রাজ্য অল্পস্থায়ী হলেও সেই সাম্রাজ্য প্রাচ্যের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টান্তস্থল হয়ে পড়ে। উর ও ব্যাবিলনের রাজারা এবং তার পরবর্তী মিশরীয় হিটাইট, আসিরীয়, লিডিয়, পারসিক আর ম্যাসিডোনীয় বিজেতারাও সারগনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছে।

অল্পস্থায়ী এই সব সাম্রাজ্যও এক দিক থেকে মানব প্রগতির সহায়ক হয়েছে। এই সব সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার জন্য সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়েছে এবং তার ফলে ধনসঞ্চয়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া পর্যাপ্ত কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিত হওয়ায় শিল্প-কেন্দ্রগুলিও সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সাম্রাজ্যিক যোগাযোগের পথ বেয়ে শহুরে সংস্কৃতি নতুনতর অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে। বাণিজ্যিক পথ জ্ঞান বিস্তারের পথ হয়ে উঠেছে। তবু এই সব সাম্রাজ্যের অল্পস্থায়িত্ব দেখে বোঝা যায় যে তার মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা ছিল। অধীনতাপাশে আবদ্ধ মানব সম্প্রদায়গুলির নিরবচ্ছিন্ন বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদের আওতায় যেটুকু সুবিধা তারা ভোগ করত তার চাইতে তাদের অসুবিধার মাত্রাই অনেক বেশী ছিল। প্রকৃতপক্ষে সারগনের সাম্রাজ্যের মত সাম্রাজ্য পরোক্ষভাবে

যতটা ধন-সম্পদ সৃষ্টি করত তার চাইতে অনেক বেশী ধন-সম্পদ সরাসরি ধ্বংস করত।

প্রাচ্যের বিজেতারা নির্বিচারে বিজিত দেশের ধন-সম্পদ পাইকারীভাবে লুণ্ঠন করে নিয়ে আসত। এমন কি বিজিত দেশের মানুষকে পর্যন্ত দাস হিসাবে নিজের দেশে চালান করত। এইভাবে লুণ্ঠন করার জন্য তারা গর্ব প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করত না। কিন্তু এই ধরনের পাইকারী-লুঠতরাজে মানব-সমাজের ধনভাণ্ডার আদৌ সমৃদ্ধ হয় না। মানুষের ভোগের উপাচার বিন্দুমাত্র বাড়ে না। বর্তমান সম্পদের পুনর্বণ্টন হতে পারে মাত্র। কিন্তু সেদিক থেকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই লুণ্ঠনের ফলে দরিদ্র মানুষের ধন-সম্পত্তি অফুরন্ত ধন-সম্পদসমৃদ্ধ রাজকোষের ধন বৃদ্ধি করত। এইভাবে লুঠতরাজ করার পর বিজিত দেশ থেকে নিয়মিত কর আদায় করা বিজয়ীর প্রধান লক্ষ্য ছিল।

এক দিক থেকে একালের সাম্রাজ্যবাদকে কর আদায়ের যন্ত্র বলা যেতে পারে। আনুগত্য সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশের অবস্থা যদি দেখা না দিত এবং নিয়মিত কর আদায়ে যদি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না হত তাহলে সম্রাটের গভর্নমেণ্ট সাধারণতঃ বিজিত দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত না। কর আদায়ের জন্য যদি একান্ত প্রয়োজন না হত তাহলে প্রাচ্যের সম্রাটেরা সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন এবং সুশাসনব্যবস্থার দিকেও তেমন নজর দিত না। এই সব কারণেই বলা হয়ঃ 'যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রাচ্যের রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে সেই রাজতন্ত্র বজায় রাখতে হয়েছে আর তার ধ্বংসও হয়েছে যুদ্ধের ফলে।'

অবশ্য যুদ্ধের প্রয়োজনেও এমন বহু আবিষ্কার হতে পারে যা শান্তির সময় মানুষের উপকারে লাগে। তাছাড়া একালের সভ্যতাকে বর্বর মানবদলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আর সেই সভ্যতার আশীর্বাদ ছড়িয়ে দেবার জন্য জঙ্গীবাদের ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ত ছিল। কিন্তু এই যুক্তি মেনে নিয়েও বলা যায় যে এই যুগের জঙ্গীবাদ এই দুটি লক্ষ্যের কোন দিকেই সাফল্য লাভ করতে পারেনি। বিরাট সেনাবাহিনী এবং উন্নত যুদ্ধাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও সুমের ও আক্কাদের নগর-রাষ্ট্রসমূহ বিদেশীব আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি। অথচ এই আক্রমণকারীরা সুমের ও আক্কাদের মানুষের চাইতে সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনুন্নত এবং ধনবলে কম সমৃদ্ধ ছিল। নীল নদের উপত্যকাতেও একই চিত্র দেখা যায়। সভ্যতার এই দুটি কেন্দ্রই বারবার অনুন্নত বর্বর মানুষের আক্রমণে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

॥ গ্রন্থ-পঞ্জী ॥

যে সব প্রবন্ধ ও বই অবলম্বন করা হয়েছে :

Boas, Franz : *Anthropology & Modern Life*

Boule, Marcelin : *Fossil Men*

Briffault, Robert : *The Making of Humanity*
The Mothers

Calvertson, V. F. : *The Making of Man*

Dechelette, Joseph : *Manuel d' archeologie Prehistorique (Eng. Trans)*

Darwin Charles : *The Origin of Species*
The Descent of Man

Engels, Frederick : *The part played by labour in the transition from Ape to Man* (প্রবন্ধ)

Gordon-childe, V. : *Progress and Archeology.*
Man Makes Himself
What Happened in History

Jeans, James : *The Mysterious Universe*

Lysenko, T. D. : *The Situation in Biological Sciences*

Sapir, Edward : *Language*

Sollas, W. J. : *Ancient Hunters and Their Modern Representatives*

Wells, Wilson D. : *An Introduction to Anthropology*

Wells, H. G. : *An Outline of World History*

Wells, H. G. :
Wells, G. P. :
Huxley, Julian : *Evolution-Fact & Theory History & Adventure of Life*

Encyclopaedia Britanica
Encyclopaedia Americana

॥ ভ্রম সংশোধন ॥

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	সংশোধন
১৬	১৭	'৯১ কোটি ৫০ লক্ষ' স্থলে '৯ কোটি ১৫ লক্ষ' এবং '৯৪ কোটি ৫০ লক্ষ' স্থলে '৯ কোটি ৪৫ লক্ষ' হবে।
	২১	'৩ কোটি ৭০ লক্ষ' স্থলে '৬ কোটি ৭০ লক্ষ' হবে।
৩৬	২২	'প্রজননকোষ' স্থলে 'জননকোষ' হবে।
৪৫	৮	'পড়েছিল' স্থলে 'পরেছিল' এবং 'অঞ্চলে' স্থলে 'অঞ্চল' হবে
৫৬	৯	'ডিনোমার'-এর স্থলে 'ডিনোসার' হবে।
৫৮	২৯	'উপযুক্ত' স্থলে 'উন্মুক্ত' হবে।
৬২	২৮	'কনডিলার্থস্' স্থলে 'কনডিলার্থ' হবে।
৫৩	২৮	'আঙুলওয়ালা বা' স্থলে 'আঙুল-ওয়ালারা' হবে।
৬৪	২১	'শ্রেণীর' স্থলে 'শ্রেণী' হবে।
৬৫	২২	'যদি' স্থলে 'যদিও' হবে।
৬৮	১১	'সুচিন্তিত' স্থলে 'সুচিহ্নিত' হবে।
৮৯	২২	'উত্তরলব্ধির' স্থলে 'উত্তরলব্ধ' হবে।
১৫৫	১৮	'উদ্ভূত' স্থলে 'উদ্ভব' ও 'উদ্ভব' স্থলে 'উদ্ভূত' হবে।
১৬৯	১৩	'সন্তানের উপর' স্থলে 'জননীর উপর সন্তানের' হবে।
১৭৫	৮	'সংবেদ' স্থলে 'সংবেদন' হবে।
১৭৯	১৬	'উর্বাস্থি' স্থলে 'উর্বস্থি' হবে।
১৯২	১৬	'ডাবুইসের' স্থলে 'ডারউইনের' হবে।
২২১	১৮	'অভিজ্ঞার' স্থলে 'অভিজ্ঞতার' হবে।
৩৬১	৯	'আট' স্থলে 'সাত' হবে।
৩৭৩	৯	'বেব' স্থলে 'বিনিয়োগ' হবে।
৩৭৫	২	'ইস্তাতায়ের' স্থলে 'ইশতারের' হবে।
৩৭৬	১৮	'ইলাস' স্থলে 'ইলাম' হবে।
৩৭৮	১৮	'বিপুর' স্থলে 'বিপুল' হবে।

॥ শব্দ-পঞ্জী ॥

অক্‌সিজেন—oxygen
অক্ষাংশ—latitude
অক্ষিগোলক—eye-ball
অক্ষিপট—retina
অগ্রপদ—fore-limb
অঙ্কগর্ভ—marsupial
অঙ্গ—organ, limb, form
অঙ্গ সংস্থান—morphology
অংশীদারিত্ব—partnership
অজৈব—inorganic
অন্ত্র—intestine
অধিকল্প—era
অন্ত্র-সিকম—caecum
অনুকম্পা—compassion
অনুকরণ—imitation
অনুত্রিকাস্থি—coccyx
অনুপাত—ratio
অনুভূতি—feeling
অনুষঙ্গ—association
অববাহিকা—basin
অবক্ষয়—decay
অব্যবহার—disuse
অভিব্যক্তি—evolution
অভিযোজন—adaptation
অভ্যাস—habit
অমাবস্যা—new moon
অমেরুদণ্ডী—invertebrate
অযৌন—asexual
অয়নান্ত—solstice
অলিন্দ—auricle
অসভ্য—savage

আকস্মিক—casual
আক্কেলদাঁত—wisdom teeth
আগ্নেয়—igneous
আঞ্চলিক—regional, territorial
আত্তীকরণ—assimilation
আত্মগত—subjective
আত্মরক্ষা—self-preservation
আত্মসচেতনতা—self-consciousness
আদ্যোপলীয়—eolithic
আর্দ্রতা—humidity
আধমরুময়—arid
আনটারকৃটিকা—antarctica (কুমেরু)
আন্তর যন্ত্র—viscera
আন্তঃ-হিমবাহ—inter-glacial
আবহাওয়া বিদ্যা—metereology
আবেগ—impulse
আয়তক্ষেত্র—rectangle
আলবুমেন—ডিমের শ্বেতসার

ইন্দ্রিয় স্থান—sense organs

ঈর্ষা—jealousy

উৎকণ্ঠা—anxiety
উত্তরলব্ধি—inheritance
উত্তরলব্ধ—inherited
উৎপত্তি—origin
উদ্বর্তন—survival
উদ্ভব—descent
উদর—abdomen

উদর-অপাঙ্গ—appendics
উদ্ভিদকুল—flora
উদ্ভিদাশী—herbivorous
উন্নয়ন—elevation
উপকূল—coast
উপত্যকা—valley
উপাঙ্গ—appendage
উভয়চর—amphibian
উলকা পিণ্ড—meteorite
উলঙ্গ—naked
উল্লুক—gibbon
উষ্ণতা—temperature
উরু—thigh
উর্বস্থি—femur

একক—unit
এককোষী—unicellular
একসোলোটল—সালামান্দার জাতীয় সরীসৃপ
এমব্রিপড—খুর-নখর-থাবা-ওয়ালা স্তন্যপায়ী

কঙ্কাল—skeleton
কনডিলার্থ—খুরওয়ালা স্তন্যপায়ী
কণ্ঠ—throat
কবজি—wrist
কম্বোজ—molusc
কর—tax
কর্কক ক্রান্তি—summer solstice
করোটি—skull
কলা—tissue
কল্প—period (geologic)
কল্পনা—imagination
কশেরুকা—vertebra
কানকো—gill flap
কাঠ—wood
কাণ্ড—stem
কান্তি বোধ—aesthetic sense
কারখানা—workshop
কার্বন-ডাইঅকসাইড—গ্যাসের নাম, (বাতাসের উপাদান)

কিমিয়াবিদ—alchemist
কুকুরমুখো—dog-faced
কুণ্ডলাকার নীহারিকা—Spiral nebulae
কুলপতি—ancestor
কৃতজ্ঞতা—gratitude
কৃত্রিম—artificial
কৃন্তক দাঁত—incisor teeth
কৃমি—worm
ক্রিয়া-কলাপ, ক্রিয়া-পদ্ধতি—function
ক্রিয়োডোণ্ট—মাংসাশী স্তন্যপায়ী শাখা
কৃষ্ণসীস—graphite
কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র—central nervous system
কোদাল চাষ—hoe-culture
কোমলাস্থি—cartilage
ক্রোমোসোম—chromosome
কোষ—cell
কোষ প্রাচীর—cell wall
কৌতূহল—curiosity
কৌলিক—ancestral
কৌশল—technique
কৌষিক—cellular

খনিজ—mineral
খাজনা—rent
খাড়াভাব—erect position
খুর—hoof
খেচর—bird
খোলক, খোলস—shell

গণ—genus
গন্ধক—sulphur
গর্ভাধান—fertilization
গ্যাসীয়—gaseous
গ্রন্থি—gland
গ্রহ—planet
গ্রাহী—prehensile
গিরিখাত—gorge
গ্রীবা—neck
গুল্ম—shrub, weed
গুহামানব—caveman
গোলপোকা—round worm

ঘন—solid, dense, cubic
ঘনত্ব—density
ঘনীভবন—solidification
ঘৃণা—hate

চতুর্ভুজ—quadrumana
চতুষ্পদ—quadruped
চাক—hive
চাপ—pressure
চান্দ্র—lunar
চিহ্ন—symbol, sign
চিরহরিৎ—evergreen
চুন—lime
চুনা পাথর—limestone
চুল্লী—furnace
চেষ্টীয় নার্ভ—mortor nerve

ছত্রাক—fungus
ছিদ্রপথ—orfice
ছেদকদাঁত—canine teeth

জঙ্ঘাস্থি—tibia
জননকোষ—germ cell
জননতন্ত্র—reproductive system
জনন বিধি—process of reproduction

জনি, জনন—generation
জনিতা—parents
জন্মদাতা—progenitor
জরায়ু—uterus
জরায়ুজ—viviparous
জলচর, জলজ—acquatic
জলাতঙ্ক—hydrophobia
জলীয়—acquous
জড় পদার্থ—inorganic matter
জাতি—race
জাতিরূপ—racial type
জালক—capillaries
জ্ঞানেন্দ্রিয়—senses
জ্ঞাতিত্ব—kinship
জিহ্বা—tongue
জীব—organism
জীবজগৎ—animal kingdom
জীবাণু—microbe
জীবন-চক্র—life-cycle
জীবনবিকাশ—evolution
জীবন-সংগ্রাম—struggle for existence
জীববিদ্যা—biology
জীববিদ্যাবিদ্—biologist
জীববৃত্তান্ত—natural history
জীবাশ্ম—fossil
জেনি—gene
জৈব—organic
জৈবিক ক্রমবিকাশ—organic evolution
জৈব পদার্থ—organic matter
জৈবিক প্রগতি—organic progress
জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ—astronomy
জ্যোতির্বিজ্ঞানী—astronomer
ঝিল্লী—membrane

ডিম—egg
ডিম্বকোষ—egg-cell
ডিম্বজ—oviparous
ডিম্বাণু—ovule
ডিম্বাশয়—ovary

তটরেখা—coast line
তত্ত্ববিদ্যা—theology
তথ্য—fact
তন্ত্র—system
তরঙ্গ—wave
তলদেশ—bottom
তাম্বুলাকার জীব—cordate
তিমি—whale
ত্রিমাত্রিক—three dimensional
তীক্ষ্ণদন্তী—rodents
তীর—bank
তুণ্ড—snout
তুষার যুগ—ice age
তৃতীয় অক্ষিপল্লব—nictitating membrane
তেজষ্ক্রিয়—radio-active
তেজ প্রতিফলন—radiation
ত্বক—crust, skin, bark
স্তন্যপায়ী—mammals
স্তর—stratum, layer, stage
স্তরীভূত—stratified

থাবা—paw

দল—tribe
দায়—liability
দিগন্ত—horizon
দ্বিপদ—bipedal
দেহকন্দর—cylom
দেহপ্রান্ত—extremities
দ্রব্য বিনিময়—barter
দ্রাঘিমা—longitude

ধমনী—artery
ধাতু বিদ্যা—metallurgy
ধাতু নিষ্কাশন—smelting
ধাতব বাষ্প—metallic vapour
ধারণা—concept
ধারণাশ্রয়ী চিন্তাশক্তি—conceptual thought
ধ্রুবকতা—constancy

নক্ষত্রপুঞ্জ—constellation
নখর—claw, talon
নবোপলীয়—neolithic
নাতিশীতোষ্ণ—temperate
নার্ভ—nerve
নার্ভ-গ্রন্থি—ganglion
নালী—passage
নিউক্লিয়স—nucleus
নিদান—diagnosis
নিয়োগ—investment
নিরক্ষ রেখা—equator
নিলয়—ventricle
নিষ্কাশন—extraction
নিষিক্ত—fertilized
নিষেক—fertilization
নিসর্গবেত্তা, নিসর্গবিদ্—naturalist
নিষ্ক্রিয়—inert
নীতিবোধ—moral sense
নীহারিকা—nebula
নৃবিদ্যা—anthropology
নৃবিদ্যাবিদ্—anthropologist
নৃকুলবিদ্যা—ethnology
নৃকুলবিদ্যাবিদ্—ethnologist

পঙ্ক—sediment
পচন—putrefaction
পটকা—air bladder
পণ্য—commodity

পতঙ্গ—insect
পতঙ্গাশী—insectivorous
পদার্থ—matter
পরজীবী—parasite
পরমাণু—atom
পরাগ—pollen
পরিনেষক—crossing
পরিপাক—digestion
পরিমাপ—measurement
পরিবর্তন—modification, change
পরিব্যক্তি—mutation
পরিস্রুত—filtered
পশ্চাদ্‌পদ—hind-limb
পাকনালী—digestive track
পাকস্থলী—stomach
পাখনা—fin
পারস্পর্য—co-relation
পাললিকশিলা—sedimentary rock
পিত্ত—bile
পিত্তাশয়—gall-bladder
পুনরুৎপাদন—reproduction
পুরাবিদ্যা—archeology
পুরাবিদ্যাবিদ্—archeologist
পুষ্টিসাধন—nourishment, nutrition
পুরোপলীয়—paleolithic
পূর্বানুবৃত্তি—reversion
পূর্বপুরুষ—ancestor
পেশা—profession
পেশী—muscle
পৌষ্টিক নালী—alimentary canal
প্রকরণ } variety
প্রকার }
প্রকারণ—variation
প্রগণ্ডাস্থি—humerus
প্রজনন—breeding
প্রজননবিদ্যা—genetics
প্রজনন পদ্ধতি—reproduction system
প্রজাতি—species
প্রজ্ঞা—intuition
প্রক্ষোভ—emotion
প্রত্নপ্রাণীবিদ্যা } palaentology
প্রত্নজীববিদ্যা }
প্রতিবেশ—environment
প্রতিষঙ্গ—correspondence
প্রতিফলন—reflection
প্রতিরূপ—image
প্রতীক—symbol
প্রয়োগ—application
প্রবাল—coral
প্রবাহ—current
প্রাইমেটস—primates
প্রাক-শর্ত—pre-condition
প্রাকৃতিক নির্বাচন—natural selection
প্রাগিতিহাস—pre-history
প্রাগৈতিহাসিক—pre-historic
প্রাণশক্তি—life
প্রাণীকুল—fauna
প্রাণীরাজ্য—animal kingdom
প্রাণীবিদ্যা—zoology
প্রাণীবিদ্যাবিদ্—zoologist
প্রাণীসর্গ—animal kingdom
স্পর্শেন্দ্রিয়—sensory organs

ফলক—blade
ফলাশী—frugivorous
ফলিত—applied
ফুল—placenta, flower
ফুলকা—gill
ফুসফুস—lung

বক্ষ—chest
বংশগত—hereditary

বংশগতি—heredity
বংশবৃদ্ধি—multiplication
বনমানুষ—ape
বন্ধ্যতা—sterility
বর্ধমান অঙ্গ—nascent form
বর্বর—barbarous
বহুকোষী—multi-cellular
বাকযন্ত্র—organ of speech
বাগান চাষ—garden-culture
বান—tide
বায়ুমণ্ডল—atmosphere
বায়ুস্থলী—air bladder
বাস্তব—objective
বাস্তব সংস্কৃতি—material culture
বাষ্প—vapour
বৃক্ক—kidney
বিকাশবিধি—manner of development
বিকিরণ—radiation
বিচারশক্তি—power of judgment
বিপাক—metabolism
বিমূর্ত—abstract
বিলাতী ইঁদুর—rabbit
বিবসন পরমাণু—naked atom
বিবেক—conscience
বিশ্বজগৎ—universe
বিষয়মুখী—objective
বীজ—germ, seed
বীবর—beaver
বুদ্ধি—intellect
বুধ—mercury
বৃক্ষচর—arboreal
বৃক্ষচর ছুঁচো—tree-schrew
বৃশ্চিক—scorpion
বৃহস্পতি—jupiter
বেলেপাথর—sandstone

বৈশাদৃশ্য—contrast
ব্যক্তিতা—individuality
ব্যাকটিরিয়া—bacteria
ব্যাহতরূপের অঙ্গ—rudimentary form

ভাব—idea
ভাবানুষঙ্গ—association of ideas
ভীরুতা—timidity
ভূতত্ত্ব—geology
ভূত্বক—crust of the earth
ভূবিদ্যা—geology
ভূবিদ্যাবিদ্—geologist
ভূবিপ্লব—geologic revolution
ভৌতিক—physical
ভ্রূণ—foetus, embryo
ভ্রূণের মিহি লোমাবরণ—lanugo
ভ্রূণবিদ্যা—embryology

মঙ্গল গ্রহ—mars
মণিবন্ধ—wrist
মধ্যপলীয়—mesolithic
মধ্যবর্তী পর্যায়—intermediary stage
মণ্ডল—zone
মনযোগ—attention
মনোবিদ্যা—psychology
মনোবিদ্যাবিদ্—psychologist
মরূদ্যান—oasis
মলনালী—rectum
মস্তিষ্ক—brain
মহাজন—money lender
মহানুভবতা—magnanimity
মাংসাশী—carnivorous
মাঢ়ী—gum
মান, মানদণ্ড—standard
মানসতা, মানসিক শক্তি—mental powers

মানসিক ব্যক্তিতা—mental individuality
মালভূমি—plateau
মিনাকরা—enamelled
মিশ্রণ—mixture
মীন—fish
মুখ—mouth
মুখমণ্ডল—face
মুচি—crucible
মুণ্ড—head
মূল—roots
মূলধন—capital
মেরু—pole
মেরুদণ্ড—vertibral column
মেরুদণ্ডী—vertebrate
মেরু মণ্ডল—polar region
মেরু রেখা—axis
মেরুসাগর—polar sea

যকৃত—liver
যন্ত্র—organ, machine
যাদুকর—magician
যাদুক্রিয়া—magical act
যাদুবিদ্যা—magic
যুক্তি—reason
যূথচর—gregarious
যূথচারিতা—gregariousness
যূথবদ্ধ—gregarious
যোগান—supply
যৌগিক—compound
যৌনকার্য—sexual act
যৌন নির্বাচন—sexual selection
যৌন প্রেম—sexual love

রক্তকণিকা—red corpuscles
রশ্মি—ray
রাসায়নিক—chemical
রুচিসংক্রান্ত নার্ভ—nerve of taste

রেণু—spore
রোমন্থক—ruminant

লক্ষণ—character
লব্ধগুণ—acquired character
ললিতকলা—fine arts
লাবণিক—saline
লুপ্ত—extinct
লুব্ধক—sirius
লোমশতা—hairiness

শিং—horn
শক্তি—faculty, force
শঙ্কা—suspicion
শতপদ—centepede
শনিগ্রহ—saturn
শাকাশী—herbivorous
শাখাপ্রজাতি—sub-species
শামুক—snail
শারীরবৃত্ত—psysiology
শারীরবৃত্তবিদ্—psysiologist
শারীরস্থান—anatomy
শারীরস্থানবিদ্—anatomist
শালুক—lily
শিরা—vein
শিরালা—chinks
শিলা—rock
শিলীভবন—fossilization
শিলীভূত—fossilized
শুক্রগ্রহ—venus
শুক্তি—oyster
শুক্রাণু—sperm
শুঁয়া—larva, caterpillar
শুষ্কতা—aridity
শেওলা—moss
শ্রেণী—class, series
শৈবাল—moss

শ্বাসতন্ত্র } respiratory system
শ্বাসযন্ত্র }
শ্বেত কণিকা—white corpuscles
শ্রোণীচক্র - pelvis
শ্রোণীদেশ—pelvic region

সর্গ—kingdom
সংকর—hybrid
সংবহন—circulation
সংবেদন—sensation
সংবেদ নার্ভ—sensory nerve
সংযুক্তি—composition
সংশ্লেষণ—synthesis
সংস্কৃতি—culture
সচেতন } conscious
সজ্ঞান }
সত্তা—being, entity
সন্ন্যাসরোগ—apoplexy
সন্ধি—joint
সন্ধিপদ—anthropode
সন্ধিল—jointed
সন্ধিত পদ—jointed leg
সর্বপ্রাণবাদ—animism
সর্বাশী—omnivorous
সমবৃত্তিসম্পন্ন } analogous
সমসংস্থ }
সমভূমি—plain
সমসত্ত্ব } homogeneity
সমগোত্রত্ব }
সমাজবিদ্যা—sociology
সমাজবিদ্যাবিদ—sociologist
সমুদ্রচর—pelagic
সমুদ্র বক্ষ—sea level
সরবরাহ—supply
সরীসৃপ—reptile

সহ-অবস্থান—co-existence
সহজ প্রবৃত্তি—instinct
সহজাত—inate, congenital
সহানুভূতি—sympathy
সাধারণ ধারণা—general concept
সামাজিক—social
সামাজিক বৃত্তি } social
সামাজিক সহজ প্রবৃত্তি } instinct
সামাজিকতাবোধ—social sense, sociability
সার্বিক—all round
সাড়া—response
সীল—seal, seal-fish
সুবেদিতা—sensitiveness
সুমেরু—arctic pole
সুষমতা—symmetry
সুষুম্নাকাণ্ড—spinal chord
সুস্থিত—stable
সূচক—index
সূত্র—law, source, formula
সৈকত—beach
স্বতঃক্রিয়—automatic
স্বতঃসিদ্ধ—axiomatic
স্থায়ী—stable
স্বরযন্ত্র—larynx
স্মারকচিহ্ন—relic
স্মৃতি—memory

হনুমান—gibbon
হাঙর—shark
হাতিয়ার—tool
হিমমণ্ডল—frigid zone
হিমবাহ—glacier
হিমশৈল—iceberg
হৃদপিণ্ড—heart
ক্ষরণ—secretion